বাকলা।

(বাখরগঞ্জের প্রত্নতত্ত্ব ও আধুনিক ইতিহাস)

স্বর্গীয় রোহিণীকুমার সেন প্রণীত।

প্রকাশক

শ্রীসুধাংশুকুমার সেন।
কীর্ত্তিপাশা, বরিশাল।

১৯১৫

Printed by J. C. Ray from the Wilkins Press,
College Square, Calcutta.
&
Illustratd by Messrs. K. V. Seyne & Bros.,
60, Mirzapur Street, Calcutta.

নিবেদন।

পরলোকগত পূজ্যপাদ পিতৃদেবের রচিত একখানি ইতিবৃত্ত গ্রন্থ লইয়া আমি একান্ত সঙ্কোচের সহিত বঙ্গীয় পাঠকদিগের সমীপে উপস্থিত হইলাম। যিনি জীবিত নহেন, তাঁহার রচনা প্রকাশ অসমসাহসিকের কার্য্য সে বিষয় সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ তিনি যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রাচীন বাকলার (অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের বাখরগঞ্জের) ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, এইরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া এযাবৎ কেহই এ দেশের ইতিবৃত্ত রচনা করেন নাই। ইতিপূর্ব্বে মহামতি বেভারিজ বাখরগঞ্জের একখানি ইংরাজী ইতিহাস প্রকাশিত করিয়াছেন; উক্ত গ্রন্থখানি প্রধানতঃ আধুনিক সরকারী বিবরণ অবলম্বনেই রচিত। শাস্ত্রীয় প্রমাণ, দেশের এবং বিদেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থকারদিগের রচনা, ব্যক্তিগত অনুসন্ধান এবং জনশ্রুতি প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পিতৃদেব প্রাচীন বাকলার পুরাবৃত্ত, সমাজ এবং অপর বিবিধ প্রাচীনতত্ত্ব ঐতিহাসিক ধারাক্রমে লিপিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রন্থসমাপ্তির পূর্ব্বেই তিনি ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার রচনা কিরূপভাবে পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া পাঠকদিগের নিকট উপস্থিত করিতেন, তাহা আমি কেমন করিয়া বুঝিব! দ্বিতীয়বার পাঠ করিবার সময়ে, এই রচনার হয়ত কোন কোন অংশ তিনি স্বয়ং অনাবশ্যক বোধে ত্যাগ করিতেন; তিনি যাহা অসঙ্কোচে বর্জ্জন করিতেন, আমি তৎপ্রতি হস্তক্ষেপ করিতে অসমর্থ; পাঠকগণ তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। গ্রন্থের ভাষা এবং রচনাভঙ্গী সম্বন্ধেও আমার ঐ কথা। তাঁহার ভাষা এবং লিখনপদ্ধতি বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই, অথচ তিনি স্বয়ং আপনার রচনা সংশোধন করিবার অবসরও পান নাই; সুতরাং এই গ্রন্থে স্থানে স্থানে হয়ত ত্রুটী পরিলক্ষিত হইবে।

পিতৃদেবের রচিত এই গ্রন্থখানি আট বৎসরাধিককাল গৃহে পড়িয়াছিল; তাঁহার সংগৃহীত সমস্ত উপকরণ আমার হস্তগত হয় নাই, তজ্জন্য তাঁহার রচনার মধ্যে কতিপয় স্থানের অসমাপ্ত অংশগুলি সম্পূর্ণ করিবার সুযোগও আমার ভাগ্যে ঘটিল না। আমি কতিপয় ভদ্রমহোদয়সমীপে দুই তিনটী স্থলের বিবরণ জানিবার নিমিত্ত পত্র লিখিয়াছিলাম, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা আমার পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত প্রদান করেন নাই।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসাধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী

এম, এ, মহাশয় এই গ্রন্থের অনেক অসম্পূর্ণাংশ সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঐকান্তিক যত্ন এবং আন্তরিক সহানুভূতি ব্যতিরেকে এই গ্রন্থখানির প্রকাশ অসম্ভব হইত। তিনি আমার নিকটাত্মীয় ও পরম সুহৃদ্। তাঁহার ঋণ অপরিশোধ্য।

গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে এই জিলার সাহিত্যসেবিগণের ও অন্যান্য সুকুমার কলাবিৎ গণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ অধ্যায়ের অতি সামান্য উপকরণই পিতৃদেব সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সুতরাং এই অংশ একরূপ নূতন করিয়া লিখিত হইয়াছে। উহার সহিত গ্রন্থের ভাষা ও রচনাপ্রণালীর বৈষম্য লক্ষিত হইবে তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

যতদূর সম্ভব এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সমূহের অপ্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যগুলি সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু স্বীয় অনভিজ্ঞতাবশতঃ এবং যাঁহাদের নিকট এ সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়াছি তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও বিজ্ঞাপিত করিবার অনবসর বা অনিচ্ছা বিধায়, অনেক স্থানের বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই, হয়ত সেইজন্য অনেক আবশ্যকীয় ঐতিহাসিক তথ্য রহিয়া গিয়াছে। এইজন্য দেশবাসীর নিকট যথেষ্ট ত্রুটী স্বীকার করিতেছি। অনেক প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক চিত্রও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তারপর নানা অসুবিধা ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া আমাকে এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে হইয়াছে এজন্য গ্রন্থমধ্যে ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে, সহৃদয় ঐতিহাসিকগণ তজ্জন্য আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।

এই গ্রন্থকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার নিমিত্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ কয়েকজন ঐতিহাসিকের নিকট একটী ভূমিকা চাহিয়াছিলাম, তাঁহারা সকলেই এই পুস্তক দেখিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। রাজসাহী-বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সম্পাদক "গৌড় রাজমালা" প্রণেতা শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় এই সম্বন্ধে আমার নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"আপনি আপনার স্বর্গগত পিতৃদেবের রচিত "বাকলা" নামক গ্রন্থ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া প্রকাশিত করিবার জন্য একটি ভূমিকা চাহিয়াছেন। আমি এই গ্রন্থ দেখিলাম। এই গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় ইহার উৎকৃষ্ট অংশ। ভূমিকা লেখা অর্থ—গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা। কিন্তু আপনার পিতা এই অংশে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের অধিকারী লোক ত আমি দেখি না। অবশ্য বেভারিজের দোহাই দিয়া দুকথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু আপনার পিতা স্বয়ং অনুসন্ধান করিয়া যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, বরিশালে যিনি দীর্ঘকাল বাস করেন নাই, বরিশালকে যিনি ভাল করিয়া জানেন না, এমন লোকের পক্ষে তাহার সম্বন্ধে কোনরূপ মত প্রকাশ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। এই

গ্রন্থপাঠে মনে হয়, আপনার পিতৃদেব সহৃদয় এবং সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার রচনাও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভূমিকার কোন প্রয়োজন নাই। এই গ্রন্থের উপযুক্ত ভূমিকা আপনার পিতৃদেবের জীবনচরিত। * * *

* * যদি বাঙ্গলার কোন জেলার স্বতন্ত্র ইতিহাস থাকে এবং স্বতন্ত্র ইতিহাস লিখিত হইতে পারে তবে সে বরিশালের জেলা। প্রায় পাঁচশত বৎসরকাল বরিশালবাসী চন্দ্রদ্বীপের নৃপতিগণের নেতৃত্বাধীনে আপনাদিগের বাহুবলে কার্য্যত স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, এবং তাহারই ফলে বরিশালবাসিদিগের চরিত্রে কতকগুলি গুণ ফুটিয়া উঠিয়াছিল যাহা আজও লুপ্ত হয় নাই। বরিশালবাসিদিগের মত দৃঢ়চেতা এবং আত্মনিষ্ঠ বাঙ্গালী আর কোন জেলায় দেখা যায় না। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের ইতিহাস আপনার পিতা মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। কালেক্টরীর এবং বোর্ডের কাগজপত্র হইতে এই রাজ্যের অধঃপতনের সময়ের অনেক মূল্যবান্ তথ্য পাওয়া যাইবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

ভবদীয় শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।"

এই গ্রন্থের দুই এক স্থানে বঙ্গের কতিপয় খ্যাতনামা ঐতিহাসিকের মতের সমালোচনা পরিদৃষ্ট হইবে। বিশেষতঃ সেনরাজগণের জাতিনির্ণয় ও দনুজমর্দ্দনের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে এই গ্রন্থে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি মহোদয়গণের মত গৃহীত হয় নাই। এই বিষয়ে গ্রন্থমধ্যে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে এখনও যাহারা গোপালভট্ট, দেবীবর ঘুলোপঞ্চানন প্রভৃতি পাঠানযুগের গ্রন্থকারগণের বিবরণ অগ্রাহ্য করিয়া তাম্রফলকের "সোমবংশপ্রদীপ" প্রভৃতি দৃষ্টে সেননৃপতিগণকে বাস্তবিক ক্ষত্রবংশজাত মনে করেন, তাহাদের অবগতির নিমিত্ত মহারাষ্ট্রকুলভূষণ ভাণ্ডারকার, ও পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বিনসেণ্ট স্মিথের বহু বৎসরের গবেষণার ফল নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"The ancestors [of the sen-kings] were of southern origin, from the Deccan, and are described both as Karnata Kshatriyas, and as Brahmakshatras. The meaning of the latter term has been elucidated by Mr. D. R. Bhandarkar. His observations which throw much light on the history of caste, deserve to be quoted textually:—

'We have already seen that a Chatsu inscription speaks of a Guhilot King Bhartribhatta as Brahma-kshatr-anvita. Bhartrihbatta is not the only ancient king of India who is so called. In the Deopata inscription of Vijayasena, of the well-known Sen dynasty of Bengal Samantasena is described as Brahma-kshatriyanam Kula-siro-dama "head garland of the Brahma Kshatri family."

Now, there is a caste called Brahma Kshatri corresponding to this

Brahma Kshatra, the members of which are found all over the Punjab, Rajputana, Kathiawar, Gujarat and even the Dekkan. In my opinion, as already stated, they were originally the Brahmana classes of new tribes, afterwards turned Kshatriyas, before their final emergence into the Hindu Society.'

The author then cites the case of the Bandhara weavers and dyers in the Jodhpur State, who originally were Nagara Brahmans and proceeds:—

'Here then we have an instance of a Brahma Kshatri caste, the people of which say that they were originally Nagara Bahmans'

Mr. Bhandarkar is perfectly right. Consequently the ancestor of the Sena Kings must have been a Brahman from the Deccan. When he passed from ministerial to ruling functions, he became a Brahma-Kshatri, his descendants being accepted as full Kshatriyas capable of intermarriage with other ruling families reckoned as Kshatriyas".*

সুতরাং সেন রাজগণ যে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ (আধুনিক বৈদ্য) ছিলেন না, পরন্তু ক্ষত্রবংশজাত ছিলেন, একথা জোর করিয়া বলিবার উপায় নাই।

দনুজমর্দ্দনের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে শেষ কথা বলিবার সময় আসিয়াছে। সুন্দর-বনান্তর্গত বাসুদেবপুর গ্রামে জনৈক মুসলমান কবর খনন করিবার সময়ে একটী প্রাচীন মুদ্রা প্রাপ্ত হয়। মুদ্রাটীর এক পৃষ্ঠায় লেখা আছে "শ্রীদনুজমর্দ্দন দেব" অপর পৃষ্ঠায় আছে "শ্রীশ্রীচণ্ডীচরণ পরায়ণ শকাব্দ ১৩৩৯ চন্দ্রদ্বীপ।" † এই মুদ্রা হইতে স্পষ্টতঃ জানা যায় যে চন্দ্রদ্বীপ-পতি দনুজমর্দ্দন ১৩৩৯ শকে (১৪১৭ খৃঃ) অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজত্ব করিতেন। অতএব এই দনুজমর্দ্দনের সহিত ১২৮০ খৃঃ অব্দের (ত্রয়োদশ শতাব্দীর) দনুজমাধব সেনের অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিয়া সেনরাজ গণকে কায়স্থ প্রমাণিত করিবার চেষ্টা ব্যর্থ বলিতে হইবে।

মালদহে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ দুইটী রজতমুদ্রা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, একটী দনুজমর্দ্দন দেবের অপরটী মহেন্দ্র দেবের। বাসুদেবপুর গ্রামে আবিষ্কৃত মুদ্রাটি সর্ব্ববিষয়ে রাধেশবাবুর মুদ্রার অনুরূপ। তবে রাধেশবাবুর মুদ্রা দুইটীর সহস্রক সংখ্যাটী কাটিয়া গিয়াছে। এই শেষোক্ত মুদ্রা দুইটী পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদের দুই ক্রোশ মধ্যে আবিষ্কৃত হয়। মুদ্রাদ্বয় হইতে জানা যায় যে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহেন্দ্রদেবনামা একজন শাক্ত

* V. Smith's Early History of India, Third Edition (1914) PP 419-20.

† প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৯, ৩৮০ পৃঃ।

নরপতি গৌড়ের নিকটে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। মহেন্দ্রের মুদ্রার তিন বৎসর পরে দনুজমর্দ্দনদেব পাণ্ডুনগরে ও চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিতেছিলেন। বঙ্গের সুসন্তান শ্রদ্ধেয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করেন যে, বঙ্গেশ্বর রাজা গণেশের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র যদু স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে মহেন্দ্রদেব বিদ্রোহী হ'ন ও পাণ্ডুনগরে স্বনামে মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ করেন। যদুকে ফিরোজাবাদ (Pandua) পরিত্যাগ করিয়া গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করিতে হয়। দনুজমর্দ্দন সম্ভবতঃ মহেন্দ্র দেবের পুত্র, তিনি পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াই যদুকর্ত্তৃক তাড়িত হ'ন ও সমুদ্রোপকূলে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

পাণ্ডুয়ার নিকটে ও বাসুদেবপুরে আবিষ্কৃত মুদ্রাগুলি চন্দ্রদ্বীপ ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়কে অনেকটা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সেলিমাবাদের প্রাচীন ইতিহাস এখনও গাঢ় তিমিরে আচ্ছন্ন। রাজা রুদ্রনারায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের বিবরণ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ বর্ত্তমান। বিভিন্ন পরিবারে প্রচলিত বিভিন্ন কিম্বদন্তী হইতে ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার বড়ই দুরূহ। গ্রন্থমধ্যে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা প্রধানতঃ রায়েরকাঠীর রাজবংশ হইতে সংগৃহীত। বাইসারির রায়গণ বলিতে চাহেন যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ অনন্ত রায়ের মাতামহই সোন্দারকুল সেলিমাবাদের প্রাচীন জমীদার। অনন্তরায় এবং কাশীপুর, জাগুয়া, পাইকপাশা ও উমেদপুরের গুহগণ একই বংশসম্ভূত। অনন্ত উত্তরাধিকারসূত্রে মাতামহের সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া নথুল্লাবাদ হইতে বাইসারি আগমন করেন। অনন্তের পুত্র শ্রীমন্ত রায়, শ্রীমন্তের পুত্র যাদবেন্দ্র। যাদবেন্দ্রের নাবালক পুত্র কমলনারায়ণও রামনাথের সময়ে তাঁহাদের জমীদারী বৃদ্ধ দেওয়ান রুদ্র-নারায়ণের হস্তগত হয়। কেবলমাত্র বাইসারি ও তৎসন্নিহিত কতিপয় গ্রামে অবস্থিত নিষ্কর ভূমি কমল ও রামনাথের একমাত্র অবলম্বন হইল। আমরা এই বিবরণের সত্যা-সত্য নিরূপণে অক্ষম।

"জাতিতত্ত্ব বারিধি" প্রণেতা উমেশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় জাতিতত্ত্বের দ্বিতীয় সংস্করণে হাবিলী সেলিমাবাদের জমিদারগণের বংশাবলী ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সংগৃহীত বংশাবলীতে যে "বহু গলদ" ঘটিয়াছে তাহা তিনি নিজেই গ্রন্থের ভূমিকায় স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তৎপ্রদত্ত হাবিলী সেলিমাবাদের ইতিহাসেও যে অনেক ভ্রম রহিয়া গিয়াছে তৎপ্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে সুখী হইব। তিনি খোসাল বাবুর ইতিহাস, এবং কুলকাঠী প্রভৃতি গ্রামের বিভিন্ন লোক প্রদত্ত বিভিন্ন বিবরণ একত্রে গ্রথিত করিতে যাইয়া অনেকস্থানে পরস্পর বিরুদ্ধ মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আশাকরি, পণ্ডিত মহাশয় নূতন সংস্করণে এই ভ্রমগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন।

পরিশেষে এই গ্রন্থ প্রণয়নে যে সকল সহৃদয় ব্যক্তির আনুকূল্য ও সহানুভূতি লাভ করিয়াছি, তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি

কীর্ত্তিপাশা }
১৩২১ সাল }

শ্রীসুধাংশু কুমার সেন।

BIBLIOGRAPHY.

English Books.

1. Ain-i-Akbari—translated by Blochmann.
2. " " Gladwin.
3. " " Jarret.
4. Ancient India—R. C. Dutt.
5. Asiatic Researches.
6. Bakarganj—H Beveridge.
7. Bengal, History of—Lethbridge.
8. " " —Stewart.
9. " Journal of the Asiatic Society of.
10. " Statistical Account of—Sir W. Hunter.
11. Calcutta Review.
12. Dacca, Topography of—Taylor.
13. Eastern Bengal, Notes on the Races, Custom, Trades of—Dr. Wise.
14. Education Gazette.
15. Encyclopædia Britanica.
16. Essay on Lord Clive—Macaulay.
17. Essay on Female Emancipation—Early.
18. Hindu Chemistry—P. C. Roy.
19. Hindusthan, Reflections on the Government of—Scrafton.
20. India, Early Travellers in.
21. " History of—Abdul Karim.
22. " " —Elphinstone.
23. " Travels in—Bernier.
24. Indo-Aryans—Dr. Rajendra Lal Mitra.
25. Industan—Orme.
26. Report—Cardew.
27. Riyazu-s-Salatin.
28. Siyar-ul-Mutaakhirin.
29. Tabakat-i-Nasiri—Translated by Raverty.

Bengali Books.

১। কৃষ্ণচরিত্র (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)।

২। গোষ্ঠীকথা (ফুলো পঞ্চানন)।

৩। গৌড়ে ব্রাহ্মণ (মহিমচন্দ্র মজুমদার)।

৪। চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশ (ব্রজসুন্দর মিত্র)।

৫। জাতিতত্ত্ব বারিধি (উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন)।

৬। ডাকের (বৈদ্যকুল পঞ্জিকা)।

৭। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (চণ্ডীচরণ সেন)।

৮। নবাবী আমল (কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়)।

৯। পরিব্রাজক প্রণীত ভারত ভ্রমণ।

১০। প্রকৃতিবাদ অভিধান।

১১। প্রতাপ আদিত্য (পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী)।

১২। প্রদীপ (মাসিক পত্র)।

১৩। প্রাকৃতিক ভূগোল (রাজেন্দ্রলাল মিত্র)।

১৪। বঙ্গদর্শন (মাসিক পত্র)।

১৫। বাথরগঞ্জের ইতিহাস (খোসালচন্দ্র রায়)।

১৬। বাঙ্গালার ইতিহাস (রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়)।

১৭। বিকাশ (পত্রিকা)।

১৮। মনসা মঙ্গল (বিজয় গুপ্ত)।

১৯। মনসার ভাসান (কানাহরি দত্ত)।

২০। মায়া তিমির চন্দ্রিকা (লালা রামগতি রায়)।

২১। বিশ্বকোষ (প্রাচ্যাবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু)।

২২। সম্বন্ধ নির্ণয় (পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি)।

২৩। সাহিত্য (মাসিক পত্র)।

Sanskrit Books.

১। অমরকোষ।

১। ঋগ্‌বেদীয় পুরুষ সূক্ত।

৩। কণ্ঠহার।

৪। কায়স্থ কুলদীপিকা প্রভৃতি।

৫। কালিকাপুরাণ।

৬। গরুড়পুরাণ।

৭। চক্রদত্ত।

৮। চন্দ্রপ্রভা (ভরত মল্লিক)।

৯। দানসাগর (বল্লালসেন)।

১০। দিগ্বিজয় প্রকাশ বিবৃত্তি।

১১। দেবীপুরাণ।

১২। নিদান (মাধব কর)।

১৩। পরাশর সংহিতা।

১৪। পীঠমালা।

১৫। ভবিষ্যপুরাণ।

১৬। মনুসংহিতা।

১৭। মহাভারত (ব্যাসদেব)।

১৮। মিশ্রীগ্রন্থ।

১৯। রঘুবংশ (কলিদাস)।

২০। রত্নপ্রভা (ভরত মল্লিক)।

২১। রামায়ণ (বাল্মীকি)।

২২। লঘুভারত।

২৩। বল্লালচরিত (আনন্দ ভট্ট)।

২৪। বাচস্পত্যাভিধান।

২৫। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলপঞ্জী।

২৬। শক্তিসঙ্গম তন্ত্রম্।

২৭। শব্দকল্পদ্রুম।

২৮। শিশুপালবধম্ (মাঘ)।

২৯। সংগ্রহতত্ত্ব চন্দ্রিকা (শিবদাস সেন)।

৩০। হরিমিশ্রের কারিকা।

সূচীপত্র।

চিত্রসূচী।



শ্রীমোহিনীকুমার সেনগুপ্ত

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

স্বনামখ্যাত সুপ্রসিদ্ধ দাতা দেওয়ান কৃষ্ণরাম ও প্রাতঃস্মরণীয় রাজারাম সেনের বংশধর স্বর্গীয় জমিদার রোহিণীকুমার ১২৭৪ সনের বৈশাখ মাসে বরিশাল জিলার অন্তর্গত কীর্ত্তিপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর স্বর্গীয় জনক প্রসন্নকুমার একজন শক্তিশালী তেজস্বী ও স্বনামধন্য জমিদার বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। বাল্যকালে রোহিণীকুমারের পিতৃবিয়োগ হয়।

রোহিণীকুমারের জননী ষষ্ঠীপ্রিয়া দেবী নিরতিশয় বুদ্ধিমতী ও তেজস্বিনী রমণী ছিলেন। তিনি পতির মৃত্যুর পরে কিছুকাল জমিদারী সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন। স্বীয় জনকজননীর চরিত্র হইতে রোহিণীকুমার দয়া, পরোপকার, লোকহিতৈষণা ও তেজস্বিতা প্রভৃতি সদগুণ লাভ করিয়াছিলেন।

বিবিধ সদগুণভূষিত রোহিণীকুমার এদেশবাসী জমিদারবর্গের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন; রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, প্রজাপালন, সঙ্গীতশাস্ত্র, সাহিত্য, ফটোগ্রাফী, টাইপরাইটিং প্রভৃতি বহু বিষয়ে তাঁহার অধিকার ছিল। এরূপ বহুগুণসম্পন্ন চরিত্রবান্ রোহিণীকুমারকে আমরা নিঃসঙ্কোচে এদেশবাসী জমিদারবর্গের আদর্শস্থানীয় বলিতে পারি।

বাল্যবয়সে রোহিণীকুমারের পিতৃবিয়োগ ঘটিয়াছিল, সুতরাং বয়োপ্রাপ্ত হইয়াই তাঁহাকে স্বীয় বিস্তৃত জমিদারী রক্ষা করিবার জন্য বিষয়কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে হইল। এই সকল অনিবার্য্য কারণ পরম্পরায় রোহিণীকুমারের স্কুল ও কলেজে উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটিল না, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রসাদে বঞ্চিত হইলেও স্বীয় অসাধারণ অধ্যয়নানুরাগ রোহিণীকুমারকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি আমরণ একজন অধ্যয়নপরায়ণ ছাত্র ছিলেন। জটিল বিষয়কার্য্যের ভিতর সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি আপনার জ্ঞানার্জ্জনী স্পৃহা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত প্রায় প্রত্যহ ছয়, সাত ঘণ্টাকাল ইংরাজি ও বাঙ্গালা মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিকপত্র, সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষার সাহিত্য ও ধর্ম্মগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতেন।

শরীর, মন ও আত্মা এই তিন লইয়াই মানুষ। এই তিনের প্রকৃষ্টরূপ উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিলে মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে; রোহিণীকুমার এ সত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি এই তিনের উৎকর্ষসাধনে সতত যত্নশীল ছিলেন। একদিকে শরীর কর্ম্মক্ষম ও বলিষ্ঠ করিবার জন্য তিনি ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে বালক ও যুবকদিগের সহিত নিয়মিতরূপে খেলিতেন, অপরদিকে সাহিত্য ও ধর্ম্মপুস্তক পাঠ এবং ধ্যানধারণাদি দ্বারা মানসিক বৃত্তিনিচয় বিকশিত করিয়া মন ও আত্মার পরিপুষ্টি

সাধন করিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত অনেক যুবক সাধারণতঃ যেরূপ ইংরাজী ও বাঙ্গালা লিখিয়া ও বলিয়া থাকেন, রোহিণীকুমার উক্ত উভয় ভাষায়ই লিখিতে ও বলিতে তদপেক্ষা সুনিপুণ ছিলেন। স্বীয় অসাধারণ অধ্যবসায়বলে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজে সুলেখক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তিনি উপন্যাস, নাটক ও ইতিহাসে সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চদশ খানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে নয়খানি প্রকাশিত হইয়াছে, অপর ছয়খানি অদ্যাপি অপ্রকাশিত রহিয়াছে। স্বদেশপ্রেমিক রাজপুত বীরগণের পুণ্যময় জীবনকাহিনী অবলম্বনে তিনি "কিরণ সিংহ", "চণ্ডবিক্রম" ও "চিতোরউদ্ধার" নামক তিনখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়া মৃতপ্রায় বাঙ্গালীর হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ উদ্দীপনের চেষ্টা করিয়াছেন। এই সকল পুস্তকের কোন কোন খানি দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার মুদ্রিত হইয়াছে। ভাষার গৌরবে বা বর্ণনার চাতুর্য্যে উল্লিখিত পুস্তকগুলি বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারে অত্যুজ্জ্বলরত্ন বলিয়া পরিগণিত না হইলেও লেখকের হৃদয়ের স্বদেশ-হিতৈষণার পরিচায়ক বলিয়া তাহা সর্ব্বত্র আদৃত হইবে সন্দেহ নাই। "কনকলতা", "প্রমোদবালা", "মায়াবিনী" ও "সুধামুখী" নামক চারিখানা সামাজিক উপন্যাসে সাহিত্য-সেবক রোহিণীকুমার সমাজের সমক্ষে সতীর গৌরব অসতীর নিগ্রহ ও ভালবাসার পবিত্র ছবি উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

সঙ্গীত-শাস্ত্র-কুশল, নির্দ্দোষ আমোদপ্রিয়, চরিত্রবান্ রোহিণীকুমার স্বীয় আত্মীয়-বন্ধুবর্গকে লইয়া শারদীয় দুর্গোৎসবকালে ও বৈশাখ মাসে নাটকাভিনয় করিতেন। এতদুপলক্ষে তিনি পুরাণ, শাস্ত্র ও দেবীমাহাত্ম্য অবলম্বনে "রাজসূয়," "প্রভাবতী," "দনুজদলনী," "উষাহরণ" ও "সুরথসমাধি"-নামক কয়েকখানি ধর্ম্মভাবপ্রবণ নাটক রচনা করিয়াছেন। তিনি স্বরচিত নাটকগুলিই প্রায় অভিনয় করাইতেন। এই অভিনয়ে নিরক্ষর লোকদিগের চিত্তে আমোদের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত হইত। "সুরথসমাধি" নাটকখানিতে তিনি দেবীমাহাত্ম্যের কঠোর আধ্যাত্মিক বিষয় সাধারণের বোধগম্য প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন,তাঁহার এই নাটকখানি ও"দনুজ-দলনী"অভিনীত হইলে সত্যসত্যই লোকের মনে ধর্ম্মভাব ও ভক্তিভাব জাগিয়া উঠিত। তাঁহার রচিত নাটকগুলির মধ্যে একমাত্র "রাজসূয়" মুদ্রিত হইয়াছে, অন্যগুলি অদ্যাপি অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে।

রোহিণী কুমারের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "বাকলা" নামে বাখরগঞ্জের একখানি ইতিহাস। এই জন্য তিনি বহুপুস্তক পাঠ, যথেষ্ট অর্থব্যয়, ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি বহুকষ্ট স্বীকার করতঃ অনেক স্থানে গমন করিয়া ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, অনেক ফটোগ্রাফ তুলিয়াছেন এবং কয়েকখানি তাম্রফলক সংগ্রহ করিয়া তৎসম্বন্ধে খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। এই অভীপ্সিত গ্রন্থের জন্য শারীরিক ও মানসিক কঠোর পরিশ্রমে

অকালে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। তাই তিনি এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহা বাখরগঞ্জবাসিদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য।

অধ্যয়নানুরাগী রোহিণীকুমার আপনাদের ব্যয়ে স্বীয় বাটীতে একটী সুবৃহৎ পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছেন, উক্ত পুস্তকালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় বিভিন্ন প্রকারের বহু সংখ্যক পুস্তক আছে। শব্দকল্পদ্রুম "এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা", বিশ্বকোষ, এবং Historian's History of the World প্রভৃতি মূল্যবান্ পুস্তকও অনুসন্ধিৎসু রোহিণীকুমার ক্রয় করিয়াছেন। কেহ মনে করিবেন না, এ সকল পুস্তক কেবলমাত্র আলমারীর শোভা সম্পাদনার্থ ক্রয় করা হইয়াছিল, জ্ঞানপিপাসু রোহিণীকুমারের জ্ঞানার্জ্জন স্পৃহাই তাঁহাকে এ সকল পুস্তকক্রয়ে প্রণোদিত করিয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত তিনি শ্রেষ্ঠ ফটোগ্রাফার বলিয়া প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে সুদূর অমরাবতী প্রদর্শনী সভা হইতে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর টাইপিষ্ট ছিলেন। অসাধারণ চতুরতার সহিত তিনি ঘণ্টায় আট, দশ খানি পত্র যন্ত্রের সাহায্যে ছাপিতে পারিতেন। এ বিদ্যাভ্যাসের জন্য তিনি কাহারও সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। তিনি অসাধারণ সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। এস্রাজ, হারমোনিয়াম, তবলা পিয়ানো প্রভৃতি বহুযন্ত্রবাদনে তিনি সুদক্ষ ছিলেন। বেতনভোগী সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিতগণের নিকট প্রথমে তিনি এ বিদ্যা অভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন, পরিশেষে পুস্তকাদির সাহায্যে উত্তরোত্তর স্বীয় জ্ঞানের পরিসর বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

বিনয় বিদ্যাতরুর সুমধুর ফল, "বিদ্যা দদাতি বিনয়ং"। রোহিণীকুমারের জ্ঞানবৃক্ষে বিবিধ রসাল ফল ফলিয়াছিল। তাই তিনি আপনার জ্ঞানগৌরবে নিরতিশয় বিনীত নিরহঙ্কারী ও অমায়িক হইয়াছিলেন। সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি উলঙ্গ শিশু হইতে গলিতচর্ম্ম পলিতকেশ বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার সদালাপ ও অমায়িকতায় পরিতৃপ্ত ছিলেন। সুবৃহৎ যুক্তপরিবারস্থ ভ্রাতাভগ্নী, স্ত্রীপুত্র, আত্মীয়স্বজন, কর্ম্মচারিবর্গ ও দাস দাসী, সকলেই তাঁহার সাধু ব্যবহারে মুগ্ধ ছিলেন।

ধনাঢ্যব্যক্তি প্রায় অধিকাংশ স্থলেই বিলাসী হইয়া উঠেন এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া অকালে কালকবলে পতিত হয়েন। রোহিণীকুমার চির সম্পদের কোলে প্রতিপালিত হইলেও বিলাসিতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। পান ও আহার প্রভৃতি বিষয়ে তিনি চিরকাল মিতাচারী ছিলেন। যৌবনে পদার্পণ করিয়াই রোহিণীকুমার সুবিস্তৃত পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। এইরূপে জীবনের সন্ধিস্থলে:যৌবন, ধন-সম্পত্তি ও প্রভুত্ব সমবেতভাবে চরিত্রবান্, তেজস্বী রোহিণীকুমারের নিকট উপস্থিত হইল, ইহাদের একীভূত শক্তিও ধীর পুরুষকে বিচলিত করিতে পারে নাই। তিনি জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় তদবধি স্বীয় যাবতীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া আসিয়াছেন। যে যৌবন, ধনসম্পত্তি

ও প্রভুত্ব দুর্ব্বলচিত্ত অবিবেকীকে নরকের পথে লইয়া যায়,উহারাই ধীর ও জ্ঞানীব্যক্তির ধর্ম্মসাধনের উপকরণ হইয়া দাঁড়ায়। রোহিনীকুমারের পক্ষে ঐ সকল উপাদান বিশেষ হিতকারী হইয়াছিল।

সুপ্রসিদ্ধ দাতা কৃষ্ণরাম ও রাজারাম সেনের বংশধরগণ চিরদিনই দানশীল ও পরোপকারী। রোহিনীকুমার ইহাদের যোগ্য বংশধর ছিলেন। তাঁহার দান ও সদনুষ্ঠান সমূহের অধিকাংশই নীরবে সম্পাদিত হইত। তিনি ঢাক ঢোল বাজাইয়া দান করার পক্ষপাতী ছিলেন না বলিয়াই সর্ব্বসাধারণের নিকট দানশীল বলিয়া বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু যাহারা তাঁহার বিবরণ বিশেষরূপ অবগত আছেন তাহারা জানেন.রোহিনীকুমার কত ক্ষুধিতের অন্নসংস্থান করিয়াছেন, কত বস্ত্রহীনের লজ্জা নিবারণ করিতেন, কত পুত্রহীন জনকজননীর পুত্রস্থানীয় হইয়া তাহাদের পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এরূপ দান ও সদনুষ্ঠান তাঁহার পুণ্যময় জীবনের দৈনন্দিন কার্য্য ছিল।

রোহিনীকুমার স্বীয় অর্থে বহু দরিদ্র বালকের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি শত শত দরিদ্র বালকের স্কুলের ও পুস্তকাদির ব্যয় বহন করিয়াছেন। রোহিনী-কুমারের সাহায্যে শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ চিকিৎসা শাস্ত্রে ও শিল্প-বিদ্যায়, এবং কেহ কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন।

কতিপয় বৎসর গত হইল, একবার শস্যের ভাণ্ডার বাখরগঞ্জে দুর্ভিক্ষের হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। অন্নাভাবে শত শত নরনারী অস্থিচর্ম্মসার হইয়া উঠিতেছিল। পরদুঃখকাতর রোহিনীকুমার তখন স্বীয় বাটীতে “অন্নসত্র” খুলিয়াছিলেন। সেই দুর্দ্দিনে প্রত্যহ বহুসংখ্যক নরনারী তাঁহার অন্নে পরিতৃপ্ত হইয়া দুইবাহু তুলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিত। মাসাধিক কাল এই বিরাট ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

পরোপকারী রোহিনীকুমার ও তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতৃগণের প্রযত্নে তাঁহার বাটীতে বহুকাল হইল একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের দরিদ্র, রোগ-ক্লিষ্ট নরনারী এখানে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ঔষধ পাইয়া থাকে।

অমায়িক ও করুণহৃদয় রোহিনীকুমারকে দারুণ দুর্যোগের দিনেও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের নিঃসহায় রোগীর শয্যাপার্শ্বে দেখিতে পাওয়া যাইত। পরমাত্মীয়ের মত তাঁহাকে রোগীর পীড়ার অবস্থা, পথ্যাদির কথা এবং দরিদ্র হইলে কিরূপে চিকিৎসাদি চলিতেছে এ সকল খবর লইতে দেখা যাইত। এরূপ সমদর্শন ও অমায়িকতা বর্ত্তমান সময়ে কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পরলোকগত পিতা প্রসন্নকুমার স্বকীয় মধ্যইংরাজী বিদ্যালয়টী উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে অভিলাষী ছিলেন, কিন্তু তিনি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত

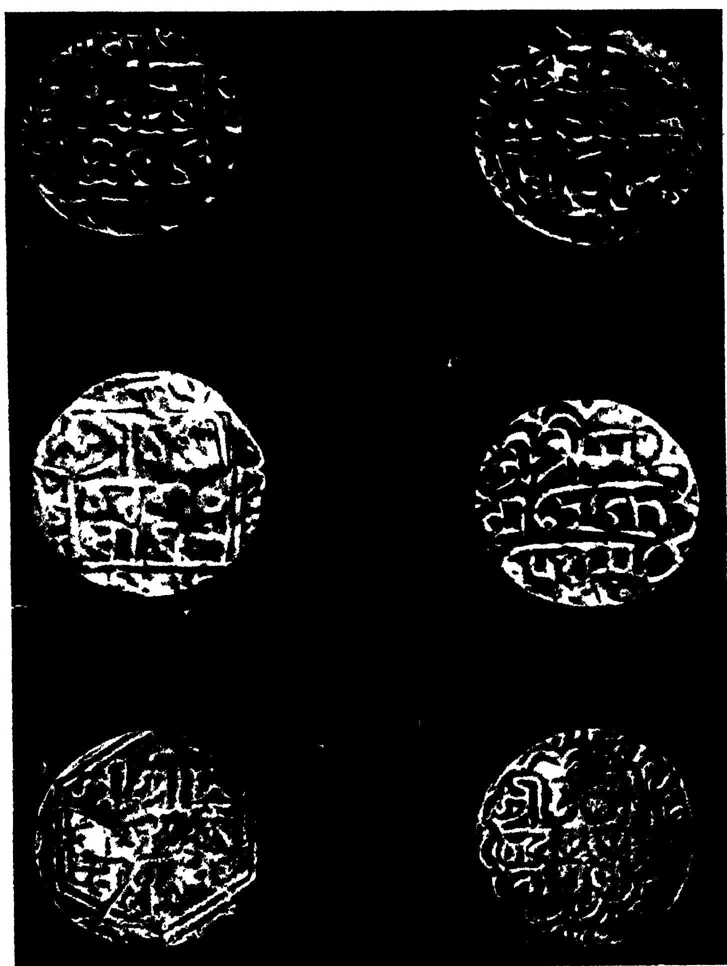
হওয়ায়, তাঁহার এই বাসনা পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। পিতৃভক্ত রোহিনী কুমার বহু অর্থব্যয় করিয়া স্বর্গীয় পিতার অভিলষিত এই লোকহিতকর কার্য্য গত ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে সাধন করিয়াছিলেন।

উল্লিখিত লোকহিতকর কার্য্য ব্যতীত দেশের ও বিদেশের যাবতীয় শুভানুষ্ঠানেই রোহিনীকুমারের আন্তরিক ও অর্থ সাহায্য পরিলক্ষিত হইত।

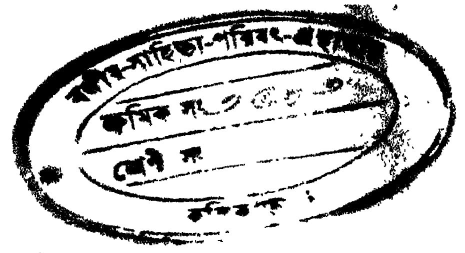
রোহিনীকুমার একজন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। দেব-দ্বিজে ভক্তিমান্ রোহিনী-কুমার চিরকাল আপন ভক্তিবিশ্বাসানুমোদিত ধর্ম্মসাধন করিয়া গিয়াছেন।

রোহিনীকুমার কিঞ্চিদধিক ৩৭ বৎসর বয়সে ১৩১১ সালের ২৯শে ফাল্গুন সোমবার রাত্রি প্রায় সাড়ে আট ঘটিকার সময় আনন্দলোকে গমন করিয়াছেন।

শ্রীশরৎকুমার রায়।



মহেন্দ্রদেব ও দনুজমর্দ্দন নামাঙ্কিত মুদ্রা।



বাকলা।

সূচনা।

বঙ্গদেশান্তর্গত বাকলা জনপদ বলেশ্বর ও মেঘনার মধ্যভাগে অবস্থিত।

এই জনপদ অতি প্রাচীন এবং পুরাতত্ত্বের আকর; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এ যাবৎ এই লোকবিশ্রুত রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা সম্বন্ধে কেহই বিশেষ অগ্রণী হ'ন নাই। রামায়ণ মহাভারতে বঙ্গদেশের উল্লেখ দেখিতে পাই; জনক ঋষির ধনুর্যজ্ঞে "বঙ্গ-রাজ্যের" কথা উল্লেখ আছে। মহাভারতে জরাসন্ধ-বধ-পর্ব্বাধ্যায়ে, তাঁহার রাজত্ব বর্ণন সময়ে "বঙ্গ" কথা দেখিতে পাই। দিগ্বিজয় পর্ব্বাধ্যায়েও "বঙ্গরাজ" কথাটা উল্লেখ আছে। আমরা মহাভারতে এই বঙ্গদেশ সম্বন্ধে যাহা পাইয়াছি তাহা পরে উল্লেখ করিব।

শক্তিসঙ্গম তন্ত্রের মধ্যে বঙ্গদেশের সীমা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা :—

রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগং শিবে।
বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধি প্রদর্শকঃ॥

ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্রহ্মপুত্র এবং সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী স্থানই পুরাকালে বঙ্গদেশ নামে অভিহিত হইত।

পুরাণে বঙ্গদেশের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা পাইয়াছি তাহাও উল্লেখ করিতেছি।

চন্দ্র বংশীয় বলী রাজার পাঁচপুত্র জন্মে; যথা—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম। ইঁহারা সকলেই বলী রাজার ক্ষেত্রজ পুত্র। ইঁহাদের মধ্যে বঙ্গ যে বিভাগে রাজ্য স্থাপন করেন তাহাই বঙ্গদেশ বলিয়া বিখ্যাত।

অতি পূর্ব্বে বর্ত্তমান সমস্ত বাঙ্গালা দেশকে "বাঙ্গালা দেশ" বলিত না; যবন অভ্যুদয়ের কিঞ্চিৎ পুর্ব্ব হইতেই "বাঙ্গালা" নাম প্রচারিত হয়। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজেন্দ্র চোড়দেবের একখানি গিরিগাত্রে খোদিত আদেশে "বঙ্গাল" দেশের প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বকালে অস্মদ্দেশীয় রাজন্যবর্গ জলপ্লাবন নিবারণার্থ স্থানে স্থানে দশ হস্ত উর্দ্ধ বিংশ হস্ত প্রশস্ত এক একটী "আল" অর্থাৎ বাঁধ্ বাধিয়া, রাজ্য রক্ষা করিতেন। বঙ্গ + আল, এই দুই শব্দের যোগে সম্ভবতঃ বাঙ্গালা হইয়া থাকিবে।*

ইউরোপীয় ভ্রমণকারিগণের বিবরণী মধ্যে "বেঙ্গালা" † নামক স্থানের উল্লেখ আছে। তাঁহারা এই নগরীকে অতীব সমৃদ্ধিশালী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ও ঢাকায় একটী বাজারের নাম "বাঙ্গালা-বাজার" দেখিতে পাওয়া যায়।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব সময় এই সমগ্র বঙ্গদেশ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের (বর্ত্তমান কামরূপ) অধীন ছিল; প্রবলপ্রতাপ মহারাজ ভগদত্ত এই প্রদেশের রাজা ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরপ্রাঙ্গনে তিনি মহাবীর অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত হইলে তাঁহার বংশের ক্রমাগত তেইশ জন ভূপতি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া শাসন-দণ্ড পরিচালন করেন। উক্ত ঐতিহাসিকগণ এই সমস্ত ভূপতিগণের রাজত্বকাল ২২০০ বৎসর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।‡

রাজসূয় যজ্ঞসভায় শিশুপালবধ পর্ব্বাধ্যায়ে বঙ্গ কথা উল্লেখ আছে, শিশুপাল কর্ণকে বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ বলিয়াছেন। §

প্রকৃত পক্ষে বঙ্গদেশ সম্বন্ধে তন্ত্রাদিতেও অনেক উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেশ যে অতি প্রাচীন তাহার আর সন্দেহ নাই।

বাকলা রাজ্য এই বঙ্গদেশের নিম্ন ভাগে অবস্থিত, ইহাও পৌরাণিক দেশ। আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে ইহার নাম এবং সীমা পর্য্যন্ত উল্লেখ আছে।

"দিগ্বিজয়প্রকাশবিবৃত্তি" নামক সংস্কৃত ভৌগলিক গ্রন্থে বাকলার দুইটী সীমা নির্দ্ধারিত রহিয়াছে।

---

* প্রকৃতিবাদ অভিধানে বঙ্গশব্দ দেখ।
Also see Gladwin's Translation of Ain-i-Akbari, vol. 1.

† Early Travellers in India.

‡ See Ain-i-Akbari, vol. II Page 144.
See also the English Translation of "Reysu-S-Salatin", by Moulavi Abdus Salaam M. A Fac. I. Page 50.

§ বঙ্গাঙ্গ বিষয়াধ্যক্ষ্যং সহস্রাক্ষ সমং বলে,
অভিকর্ণ মিমং ভীষ্ম মহাপাপ বিকর্ষণম্।
সভাপর্ব্ব শিশুপাল বধ পর্ব্বাধ্যায় ৯শ্লোক।

যথা :—

পূর্ব্বে মধুমতী সীমা পশ্চিমেচ ইছামতী।
বাদা ভূমি দক্ষিণে চ কুশোদ্বীপোহিচোত্তরে ॥

আবার অন্য স্থানে যথা :—

মেঘনানদী পূর্ব্ব ভাগে পশ্চিমেচ বলেশ্বরী।
ইন্দিলপুরী যক্ষ সীমা দক্ষিণে সুন্দরং বনং ॥
ত্রিংশৎ যোজন বিমিতো সোম কান্তাদ্রি বর্জ্জিতঃ।
সোম কান্তেচ দ্বৌ দেশৌ বিখ্যাতৌ নৃপশেখর ॥
জম্বুদ্বীপঃ পশ্চিমেচ স্ত্রীকারোহি তথোত্তরে।
বাকলাখ্য মধ্যভাগে রাজধানী সমীপতঃ ॥

মেঘনা নদী পূর্ব্ব সীমা, বলেশ্বর নদ পশ্চিমে, উত্তরে ইদিলপুর, দক্ষিণে সুন্দর বন; এই ভূভাগ মধ্যে ত্রিংশৎ যোজন পরিমিত পর্ব্বত বিহীন সোমকান্ত দেশ, ইহার মধ্যে পশ্চিমে জম্বুদ্বীপ, এবং উত্তরে স্ত্রীকার, মধ্য স্থলে বাকলা নামক রাজধানী। এই সীমা গ্রহণ করিতে আমরা সম্পূর্ণ স্বীকৃত নহি। বাকলা রাজ্য যখন উন্নতির শীর্ষ স্থানে তখন ইহার সীমা পূর্ব্বে, পশ্চিমে ও উত্তরে, অনেক দূর বিস্তৃত ছিল। আমরা তাহার যে প্রমাণ পাইয়াছি, তাহা পরে দেখাইব।

সে যাহা হউক বাকলার প্রাচীন তত্ত্ব সম্বন্ধে যতটুকু সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাই বিবৃত করিতে সাধ্য মত চেষ্টা করিব।

বাকলা।

প্রথম অধ্যায়।

সীমা।

পূর্ব্ববঙ্গে, ঢাকা বিভাগের দক্ষিণ অংশে বাকলা অথবা বাখরগঞ্জ অবস্থিত। এই ভূখণ্ড মহাবিষুব রেখার উত্তর ভাগে ২১°, ৪৮´ ০´´ হইতে ২৩° ১৪´ এবং ২৭´´ অক্ষাংশের মধ্যে, এবং গ্রীনউইচ পূর্ব্ব ভাগে ৮৯°, ৫৫´, ১০´´ হইতে ৯১°, ৪´ এবং ৫০´´ দ্রাঘিমার মধ্যে রহিয়াছে।*

ইহার পূর্ব্ব সীমা মেঘনা নদী, বঙ্গোপসাগরের কতক অংশ এবং নোয়াখালী ও ত্রিপুরার কতক ভাগ; পশ্চিমে বলেশ্বর, খুলনা এবং ফরিদপুরের কতকাংশ; উত্তরে ঢাকা, ফরিদপুরের কিয়দংশ ও পদ্মানদী; এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। ইহার বিস্তৃতি ৪০৬৬ বর্গ মাইল,† উত্তর হইতে দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রায় ৮৯ মাইল, এবং পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত প্রায় ৬০ মাইল হইবে।‡

এই গেল বর্ত্তমান অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজ লেখকগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সীমানা। একটু প্রাচীন কালের দিকে অগ্রসর হইলে দেখিতে পাই যে, বঙ্গীয় ১১৬০ সালে, ইংরাজী ১৭৫৪ খৃঃ অব্দে যখন আগা বাখর খাঁ এই সমস্ত দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন; তখন বাখরগঞ্জের সীমা উত্তরে জাহাঙ্গীর নগর, অথবা জাহাঙ্গীরাবাদ, দক্ষিণে সুন্দরবন, এবং বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে ভূষণা, যশোহর, এবং আরাকান; § তারপর বৃটীশ-রাজ্য

---

* Sir W. W. Hunter's Statistical Account of Bengal.—Bakarganj, Trubner & Co. London, 1875.

† গত Census এর সময় ৩৬৪৪ বর্গ মাইল।—বিকাশ, বরিশাল।

‡ Deducting the area of Kotwaliparah, Madaripur and Mulfatgunge.

§ Lectures on Bakarganj, Asiatic Researches vol. II.

পত্তন হইবার কিছুকাল পরে (অর্থাৎ ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ) বাখরগঞ্জের এলেকা ঢাকা বিভাগান্তর্গত পদ্মা, এবং কালীগঙ্গা নদীর দক্ষিণ পশ্চিম, এবং মেঘনা ও চাঁদপুর হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পশ্চিম প্রান্তে ভূষণা ও যশোহরের পূর্ব্ব-সীমান্তবর্ত্তী স্থানগুলিও বাখরগঞ্জের অন্তর্গত ছিল। কেবল সন্দ্বীপ তখন এই এলাকা ভুক্ত ছিল না।*

আগা বাখর খাঁর অনেক পূর্ব্বে, এমন কি মোগল সাম্রাজ্য স্থাপিত হইবারও পূর্ব্বে প্রবল পরাক্রান্ত পাঠান নরপতিগণ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেন; সুবর্ণগ্রাম নামক স্থানে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। ইলাইস সাহের বংশধর সুলতান নাসিরুদ্দিন মহম্মদসাহ, এবং তৎপুত্রপৌত্রগণ বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের রাজত্ব সময় ১৪২৬ খৃঃ অব্দ হইতে ১৪৮০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত। ঢাকা, ফরিদপুর এবং বাখরগঞ্জ, জেলালাবাদ এবং ফতিয়াবাদ নামে অভিহিত হইত।† বর্ত্তমান ঢাকা এবং ফরিদপুরের কতকাংশ জেলালাবাদ এবং বাকী অংশ ফতিয়াবাদ বলিয়াই দেশ প্রসিদ্ধ প্রবাদ রহিয়াছে। অনেক প্রাচীন দলীলে আমাদের বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ "ফতিয়াবাদ" বলিয়া উল্লিখিত আছে। এরূপ একখানি কীটদষ্ট বহু প্রাচীন দলীল আমার একজন বিশ্বাসী বন্ধু স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। দেশ প্রসিদ্ধ "বার ভূইয়াগণের" ‡ অন্যতম

---

* Sixth Report of the House of Commons of 6th April, 1781.

† 1. অনেক প্রাচীন দলীলাদিতে 'ফতিয়াবাদ" উল্লেখ আছে।

2. ১২০৪ সালের "কুইন কুইনাল" কাগজের নকলে সেলিমাবাদ, ফতেয়াবাদ উল্লেখ আছে।

3. During their reigns (Sultan Mahomed Shah and his descendants) ° ° ° the country round about Dacca, Faridpur, Bakarganj, was called Jalalabad and Fateabad.—Sir W. W. Hunter's Statistical Account of Dacca, Page 119.

‡ ১। চাঁদরায়, কেদার রায় ... ... শ্রীপুর।
২। কন্দর্প নারায়ণ ... ... চন্দ্রদ্বীপ (বাকলা)
৩। প্রতাপাদিত্য ... ... যশোহর।
৪। ঈশাখাঁ ... ... খিজিরপুর।
৫। মুকুন্দ রায় ... ... ভূষণা।
৬। লক্ষ্মণ মাণিক্য ... ... ভুলুয়া।
৭। ফজল গাজি ... ... ভাওয়াল।
৮। হাম্বিরমল্ল ... ... বিষ্ণুপুর।
৯। গণেশ রায় ... ... দিনাজপুর।
১০। কংশনারায়ণ ... ... তাহেরপুর।
১১। পীতাম্বর ... ... পুঁটীয়া।
১২। রামকৃষ্ণ ... ... সাঁতৈল (পাবনা)

কায়স্থবংশোদ্ভূত রাজা কন্দর্পনারায়ণ এবং তৎবংশধরগণ যখন এই দেশে রাজত্ব করিতেন, তখন বর্ত্তমান বাখরগঞ্জের অধিকাংশ ভূমি "সরকার বাকলা" নামে অভিহিত হইত। তখন তাহার সীমা পূর্ব্বে সমুদ্রোপকূলস্থিত মগ রাজ্য, পশ্চিমে রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের পূর্ব্ব সীমাব্যাপি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী যমুনা* নদী, দক্ষিণে সমুদ্র, এবং উত্তরে ত্রিপুরা রাজ্য ও ভাওয়ালের কতকাংশ। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের জিলা যতটুকু, পূর্ব্বে বাকলা ইহার দ্বিগুণ অথবা ততোধিক ছিল। আজ আর সেই বাকলা নাই, এবং কন্দর্পনারায়ণের সেই অতুল কীর্ত্তি ও দিঘীতিও নাই; যাহা আছে তাহা অনন্তকালসাগর-হৃদয়স্থ একটী ক্ষুদ্র বুদ্বুদ্‌মাত্র!

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রাচীন প্রাকৃতিক বিবরণ।

পূর্ব্বকালে যে এই বৃহৎ ভূখণ্ডের অধিকাংশ ভূমি জলনিমগ্ন ছিল, তাহার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়।† মাটি খুঁড়িয়া তিন চারি হস্ত পরিমাণ গর্ত্ত করিলে যে মাটি পাওয়া যায়, তাহা জোব এবং কর্দ্দমময়।

এই দেশে পুষ্করিণী পাঁচ সাত হস্তের অধিক গভীর করিবার সাধ্য নাই। কেননা খণিতগর্ত্ত, ভূগর্ভস্থ জল দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া যায়।

এই বিশাল পৃথিবী যে কোন দিন জলমগ্ন ছিল, তাহা সর্ব্ব-জাতীয় শাস্ত্র-গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি গ্রন্থে সময় এবং স্থান সম্বন্ধে মত দ্বৈধ থাকিতে পারে, কিন্তু মূল কথা একই। হিমালয় পর্ব্বত যে কোন দিন সমুদ্র তটে বিরাজিত ছিল তাহার প্রমাণও দুরূহ নহে। আমাদের হিন্দু শাস্ত্র ছাড়িয়া দিতেছি; এই সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কি বলিয়াছেন তাহা আলোচনা করা যা'ক।

---

* কেহ কেহ ইহাকে কপোতাক্ষ বলিয়া থাকেন।

† The whole district of Bakarganj is an alluvial formation, and the most general observation which can be made concerning it, is that the ground is everywhere flat. H. Beveridge, History of Bakarganj P. 3.

বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, কয়েক জন অসমসাহসী পাশ্চাত্য ভূতত্ত্ববিৎ হিমালয়ে আরোহণ করেন। তথায় কয়েক দিন নানাপ্রকার তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া এক গুহা মধ্যে কতকগুলি অস্থিপঞ্জর, শঙ্খ, এবং শম্বুকের কঙ্কাল প্রাপ্ত হন। উল্লিখিত অস্থিপঞ্জর সমূহ, পরীক্ষা দ্বারা বৃহৎ সামুদ্রিক প্রাণীর অস্থিপঞ্জর বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। তদ্দ্বারা আধুনিক পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, কোন কালে হিমালয় সানুস্থিত সমগ্র ভারতবর্ষ জলনিমগ্ন ছিল।

চীন দেশীয় পরিব্রাজক সুপ্রসিদ্ধ হুয়েনসাঙ্গ (খৃঃ অঃ ৬৩৬—৬৪৬ খৃঃ অঃ) যখন ভারত-ভ্রমণ উপলক্ষে আগমন করেন, তখন গৌড় অতীব সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। তিনি জলপথে বাকলা, কামরূপ এবং আরাকান পর্য্যন্ত গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎকালে গৌড় নগরের পূর্ব্ব ভাগ জলমগ্ন ছিল। সুতরাং উপযুক্ত নৌযানে তাঁহাকে কামরূপ (আসাম) যাইতে হইয়াছিল।*

অতি প্রাচীন কালে অস্মদ্দেশে সুগন্ধা নাম্নী এক খরস্রোতা প্রবাহিনী প্রবাহিতা ছিল। আমরা মহাকবি ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদা-মঙ্গলে সুগন্ধার নাম দেখিতে পাই, পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া জগন্মাতা দাক্ষায়ণী প্রাণ ত্যাগ করিলে, জায়াশোকোন্মত্ত ভগবান্ মহাদেব সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহাভাগ বিষ্ণু চক্র দ্বারা সেই দেহ একান্ন খণ্ডে বিভক্ত করেন। যে যে স্থানে সেই খণ্ডগুলি পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থান এক একটী পীঠস্থান হইয়াছে। আমাদের এই সুগন্ধায় দেবীর নাসিকা পড়িয়াছিল, সম্ভবতঃ সেই জন্যই নদীর ঐ প্রকার নাম হইয়া থাকিবে। রায় গুণাকর পীঠমালায় লিখিয়াছেন :—

সুগন্ধায় নাসিকা পড়িল চক্রহতা।
ত্র্যম্বক ভৈরব তাহে সুনন্দা দেবতা ॥

বর্ত্তমান শিকারপুর গ্রামে দেবীর প্রাচীন মঠ সহ পাষাণময়ী মূর্ত্তি † এবং পোনাবালিয়ার উপকণ্ঠস্থিত শ্যামরাইল নামক পল্লীতে অতি প্রাচীন

* Early Travellers in India.

† ৮।১০ বৎসর অতীত হইল ঐ মূর্ত্তি একজন দুর্ব্বৃত্ত মুসলমান কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া খণ্ডীকৃত হইয়াছে।

পাষাণময় শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। শিকারপুর এবং পোনাবালিয়া প্রায় দিনমানের পথ। সুগন্ধা নদী পূর্ব্বকালে এত দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃতা ছিল; কিন্তু বর্ত্তমান সময় তাহার গর্ভে বিশাল জনপদ।

সতী শিরোমণি প্রাতঃস্মরণীয়া বিপুলা (বেহুলা) সুন্দরী মৃত স্বামী পুনর্জীবিত করিবার জন্য, লক্ষীন্দরের শবসহ সামান্য কলার মান্দাস আরোহণে উজানী হইতে জগন্মাতা মনসার ভবনে যাত্রা করেন। অনুকূল স্রোতে ভেলা কপোতাক্ষ বাহিয়া, উত্তাল তরঙ্গময়ী সুগন্ধায় পতিত হয়; পরে ধীরে ধীরে মেঘনা বাহিয়া ব্রহ্মপুত্রে উপস্থিত হয়।*

প্রবাদ যে বর্ত্তমান "ধুবরী" পূর্ব্বে মনসা সহচরী নেতা ধোপানীর আবাস স্থল ছিল।†

সুগন্ধা নদী সম্বন্ধে এদেশে একটী জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে। স্বনাম-খ্যাত মহাপুরুষ ত্রৈলঙ্গ স্বামীর নাম বোধ হয় প্রত্যেক হিন্দু মাত্রেই জানেন। কতিপয় বৎসর হইল এই মহাপুরুষের তিরোধান হইয়াছে। এই দেশের জনৈক ত্যাগী পুরুষ, স্বামীজীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া, বহুদিন তাঁহার চরণ সেবা করিয়াছিলেন; এক দিন কথা প্রসঙ্গে মহাপুরুষ শিষ্যের বাসস্থান জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রথমতঃ তিনি নিজ গ্রামের নাম বলিলেন। মহাপুরুষ তাহাতে চিনিতে না পারায় শিষ্য "সোন্দার কূল" বলিলেন। মহাপুরুষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "সুগন্ধা কি এই সময়ের মধ্যেই লুপ্তা হইয়াছেন?" শিষ্য গুরুদেবের কথায় সমধিক আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; স্বামীজী পোনাবালিয়ার শিবলিঙ্গ এবং শিকারপুরের দেবীমূর্ত্তির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।‡

এখন দেখা যা'ক ভূমি উৎপত্তির কারণ কি? ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্রোতজলকেই ভূমির হ্রাসবৃদ্ধি এবং উৎপত্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ

---

* মহা কবি বিজয় গুপ্তের "মনসা মঙ্গলে" কিন্তু বিপুলার মাঞ্জুসের পথাতিবাহন সম্বন্ধে বিশেষ কোন নদী অথবা কোন স্থানের উল্লেখ নাই। কাণা হরি দত্ত প্রণীত একখানি বটতলার ছাপা মনসার ভাসান নামক ছোট বইতে সুগন্ধার নাম পাইয়াছি।

† ধোপা বুড়ীর ঘাট, বর্ত্তমানে "ধুবরী" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। এরূপ অনেক স্থল আছে, যাহার প্রাচীন নামের স্থলে কালক্রমে নূতন নাম হইয়াছে।

‡ এই জনরবের সত্যাসত্য সম্বন্ধে পাঠক বিবেচনা করিবেন। তজ্জন্য লেখক দায়ী নহেন। অঞ্চলদেশ কিন্তু এখনও "সোন্দার কূল" বলিয়া অভিহিত।

করেন। পর্ব্বত-গহ্বর বিদীর্ণ করিয়া নদী যখন সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হয়, তখন সেই প্রবল স্রোতবেগে ক্ষুদ্র বৃহৎ শিলাখণ্ড মৃত্তিকা প্রভৃতি অতি বেগে ভাসিয়া আসে। ঐ স্রোতজল সমতল ভূমিতে আসিলে ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া থাকে, সুতরাং শিলাখণ্ড প্রভৃতি ভারি বস্তুসমূহ নিম্নে পতিত হয়; এবং মৃত্তিকার সূক্ষ্ম অংশ গুলি স্রোত-বিক্ষিপ্ত হইয়া নদীর উভয় পার্শ্বে পতিত হয়। ক্রমশঃ ঐ মাটির উপর মাটি পড়িতে পড়িতে নদীর উভয় পার্শ্বে চর উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রূপে সাগরসঙ্গমস্থলে নদীর মোহানায় যে সমস্ত চর উৎপন্ন হয়, তদুপরি মুহুর্মুহু সমুদ্র-তরঙ্গ-বিক্ষিপ্ত বালুকারাশি উৎক্ষিপ্ত হইয়া অতি শীঘ্র সেই ভূমি উচ্চ হইয়া থাকে। এই কারণে মেঘনা, তেতুলিয়া, ইল্‌সা প্রভৃতির সাগরসঙ্গম স্থলে দক্ষিণ সাহাবাজপুর, বাদুরা, হাতিয়া, সন্দ্বীপ, বড়বা'শদিয়া, কোরালিয়া, কুক্‌রিমুক্‌রি প্রভৃতি চর অথবা দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে। যে স্থানে ভাগীরথী শত মুখী হইয়া সাগরে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই শতমুখীস্থলে সুন্দর বন উদ্ভূত হইবার কারণও ঐ প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে।

উল্লিখিত কারণে নদী গর্ভস্থ চর জলসীমা অতিক্রম করিয়া উঠিবার পূর্ব্বে স্রোত অন্য দিকে ধাবিত হইলে বিল উৎপন্ন হয়। এই জিলায় বিলের সংখ্যাও কম নহে।

কবি-কর্ণপুর স্বর্গীয় বিজয় গুপ্তের সুপ্রসিদ্ধ মনসা মঙ্গলে আমরা দুইটী নদীর উল্লেখ দেখিতে পাই। কবিবর উক্ত গ্রন্থ মধ্যে নিজ পরিচয় ও বাসস্থান নির্দ্দেশ করিবার সময় লিখিয়াছেন,—

পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূবে ঘণ্টেশ্বর।
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর॥

ঘাঘর নদীর চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে। কিন্তু ইহার আয়তন উল্লিখিত নৈসর্গিক কারণে পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রস্বতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কোটালি-পাড়া * পরগণার বৃহদায়তন বিল এই ঘাঘর নদী হইতে উৎপন্ন। ফুল্লশ্রী গ্রামের অনেক পশ্চিমে যে ঘাঘর নদী এখন বর্ত্তমান, তাহার স্রোত মন্দ, এবং আয়তনও অধিক নহে। উভয় পার্শ্বস্থ ভূমি দেখিলে সহজেই

* কোটালিপাড়া পরগণা পূর্ব্বে বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্ভূত ছিল, ১৮৭৩ সালে ফরিদপুরের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

অনুমিত হইবে যে উহা নদীর চর, ক্রমশঃ মৃত্তিকা ও বালুরাশি দ্বারা বৃদ্ধি পাইয়া উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

"Bakarganj is the granary of Bengal" বলিয়া একটী কথা আছে, বস্তুতঃ ইহা সম্পূর্ণ সত্য। এই জিলায় যে পরিমাণ শস্য জন্মে, বঙ্গদেশে আর এরূপ অপর্য্যাপ্ত রূপে কোথাও জন্মে কিনা সন্দেহ। ইহার কারণ এই যে নূতন মাটিতে শস্য বেশী হয়। নদীজল হইতে পার্শ্ববর্ত্তী চর কিয়দংশ উচ্চ হইলে, সেই ভূমি অতিশয় শস্যশালিনী হইয়া থাকে। বাখরগঞ্জের অধিকাংশ ভূমিই সদ্যোত্থিত; তাই শস্যও প্রচুর পরিমাণে জন্মে। বিল ভরিয়া মৃত্তিকাকারে পরিণত হইলে, তাহার উৎপাদিকা শক্তি হয়। মৃত্তিকা নদী হইতে যত উচ্চ হইতেছে, তাহার শস্যোৎপাদিকা শক্তি ততই হ্রাস পাইতেছে। তাই, আমাদের দেশীয় কৃষকগণ এখন পূর্ব্বের ন্যায় আশানুরূপ শস্য না পাইয়া "বাদা" অর্থাৎ সুন্দর বনে জমি রাখিতে আরম্ভ করিয়াছে।

মহাত্মা এইচ্, বেভারিজ্, (H. Beveridge) স্যার উইলিয়ম্ হাণ্টার (Sir William Hunter) প্রমুখ মনস্বী ইংরাজ লেখকগণ এই সমগ্র ভূখণ্ড গঙ্গা, মেঘনা এবং ব্রহ্মপুত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহাই প্রকৃত কথা বলিয়া অনুমিত হয়; কেননা বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে যতগুলি শাখানদী, উপনদী দেখিতে পাই, সমস্তই উল্লিখিত নদী সমূহের অংশ, অথবা স্থানবিশেষে নামান্তর মাত্র।*

আরও একটী কথা, অস্মদ্দেশে অপভাষায় নদীকে 'গাঙ্গ' বলে; তাই

* I have said that the district is an alluvial formation. In fact, it may be looked upon, as a conquest won by the Ganges and Meghna from the Bay of Bengal. With its central depression, and its deeply indented southern boundary, it has somewhat the appearance of the out-stretched palm of the hand. Thus a fanciful eye might regard it as a glove flung down by the Ganges to the ocean, in gage of battle, and as an augury of future victories.—H. Beveridge's History of Bakarganj, Page 5.

Bakarganj is a very typical part of the alluvial Delta formed by the Ganges and Brahmputra and their feeders. It exhibits an unbroken flat, traversed by countless streams and rivers twisted into a network of channels which are for ever changing their courses. * * * Each individual stream is given according to the local name, it bears at different parts of its sourse * * * .

Sir W. W. Hunter's Statistical Account of Bakarganj.

অনুমান হয় যে 'গাঙ্গ' শব্দ গঙ্গার অপভ্রংশ মাত্র † কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে নিম্নবঙ্গের সমস্ত নদীই গঙ্গা অথবা তন্নিস্থত স্রোত মাত্র।

সুগন্ধা, ঘণ্ডেশ্বর এবং ঘাঘর ব্যতীত বর্ত্তমান বাখরগঞ্জে আর কোন প্রাচীন নদীর নাম জানিতে পারি নাই। এই দেশ দেবমাতৃক এবং নদীমাতৃক। তন্মধ্যে নদী বহুল থাকায় বৃষ্টি অপেক্ষা জল বৃদ্ধিতেই শস্যের বৃদ্ধি হয়।

এই দেশের প্রত্যেক নগর, উপনগর এবং গ্রাম, নদী অথবা তৎসংশ্লিষ্ট খাল এবং দোনের পার্শ্বে অবস্থিত; তাই দেশীয় লোক নৌযানে গন্তব্য স্থানে যাতায়াতের সুবিধা বলিয়া জ্ঞান করেন। বর্ত্তমান সময় যে কয়েকটী প্রধান নদী অস্মদ্দেশে প্রবাহিতা; তাহাদের বিবরণ সংক্ষেপে নিম্নে লিখিত হইল।

১। মেঘনা,—এই নদী বাখরগঞ্জের পূর্ব্ব প্রান্ত বিধৌত করিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহারই সঙ্গম স্থলে দক্ষিণ সাহাবাজপুর দ্বীপ। এই দেশে সকল নদী অপেক্ষা এই নদী গভীর, প্রশস্ত এবং অত্যন্ত তীব্র স্রোতময়ী। মেঘনা নদীর উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী পৌরাণিক গল্প আছে। গল্পটী পাঠক বর্গের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য নিম্নে সংক্ষেপে লিখিতেছি।

"নমুচি নামক দৈত্য তপোবলে অত্যন্ত বলীয়ান হইয়া স্বর্গ রাজ্য অধিকার করিল। দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণ কোনমতে তাহার সঙ্গে আঁটিতে না পারিয়া, ইন্দ্র নমুচির সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন। এইরূপে বহুকাল গত হইল; নমুচি ইন্দ্রের প্রতি পূর্ব্বশত্রুতা ভুলিয়া তাহাকে অত্যন্ত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। একদিন সুযোগ পাইয়া অতর্কিত অবস্থায় ইন্দ্র নমুচির শিরশ্ছেদ করিবামাত্র, ছিন্ন মুণ্ড বদন বিস্তার করিয়া ইন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইল। ইন্দ্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি সমস্ত দেবতার শরণাপন্ন হইলেন; কিন্তু কেহই সেই ছিন্ন মুণ্ডের করাল গ্রাস হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে সাহসী হইলেন না। অবশেষে প্রাণ

† The river Padma or Ganges formerly flowed through this district before the sudden opening out of the Kirtinasa, and its old bed is still visible in the N. E. of the district within the jurisdiction of the police out-post of Burirhat.
Statistical Account of Bakarganj by W. W. Hunter.

ভয়ে ভীত সুরপতি দেবর্ষি নারদের পরামর্শ মত সরস্বতী নদীতে স্নান করিলেন, ছিন্ন মুণ্ডও তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে পতিত হইল। ইন্দ্র সেই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন বটে; কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা পাপ সর্ব্বদা তাঁহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তিনি কত দান, ধ্যান, যজ্ঞ করিলেন কিন্তু কিছুতেই সেই মহাপাপ হইতে উদ্ধার পাইলেন না। অবশেষে পিতামহ ইন্দ্রকে গঙ্গা স্নান করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। ইন্দ্র গঙ্গোত্রির নিকটে উপস্থিত হইবা মাত্র গঙ্গা দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। গঙ্গাকে কোথাও না পাইয়া ইন্দ্র তাঁহার তপস্যা করেন। গঙ্গা তপো-প্রভাবে সাক্ষাৎ হইয়া বলিলেন, 'হে ইন্দ্র, তুমি মেঘ রূপে ধরাতলে গমন পূর্ব্বক সমুদ্র সহ মিলিত হইয়া আমার স্পর্শ লাভ করিলে, এই মিত্রদ্রোহী মহাপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।' ইন্দ্র দেবীর আদেশে জল রূপ ধারণ করিয়া গঙ্গাসাগরসঙ্গমে প্রবেশ করিলেন।"*

সম্ভবতঃ মেঘনা তীর বাসী কোন সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি প্রাচীন তুলটের খালি পাতায় এইরূপ একটী গল্প লিখিয়া রাখিয়াছিলেন; কালে এইটী পৌরাণিক গল্প মধ্যে স্থান পাইয়াছে।†

এই গল্প সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে, সামান্য একটু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অনুমান করা যাইতে পারে। ইন্দ্র শব্দের ধাতু প্রত্যয় ইন্দ্‌+রক্‌ অর্থাৎ যিনি বর্ষণ করেন। আবার ইন্দ্রের এক নাম মেঘবাহনও বটে। ইন্দ্র বৃষ্টি দ্বারা যে প্রকার ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করেন, সেই প্রকার পূর্ব্ব কালে মেঘনা নদীর জলপ্লাবনে তৎপার্শ্বস্থ ভূমি শস্যশালিনী হইত; এই কারণেই হয়ত এই গল্পের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

২। আড়িয়ালখাঁ,—পদ্মার শাখা নদী, বর্ত্তমান গৌরনদী থানার পূর্ব্বভাগ দিয়া মেঘনায় মিশিয়াছে।

৩। আড়িয়ালখাঁর যে অংশটী বর্ত্তমান বরিশাল নগরের পূর্ব্ব ভাগে অবস্থিত, তাহার নাম কীর্ত্তনখোলা।

৪। বিশখালী নদী,—কালমেঘা ও ন্যামতির পার্শ্বে প্রবাহিতা,

* পরিব্রাজক প্রণীত ভারত-ভ্রমণ।

† রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে এইরূপ প্রক্ষিপ্ত বিষয়ের অভাব নাই।

ইহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতি কম নহে। এই মহানদী কীর্ত্তনখোলা হইতে বহির্গত হইয়া হরিণঘাটা মোহানায় পতিত হইয়াছে।

৫। বলেশ্বর নদ,—বাখরগঞ্জের পশ্চিম সীমাস্থ পিরোজপুর মহকুমার পশ্চিম পার্শ্ব বহিয়া বরাবর দক্ষিণমুখে সাগরে প্রবেশ করিয়াছে। বলেশ্বর সাগরসঙ্গমে হরিণঘাটা বলিয়া খ্যাত।

৬। সাপলেজা নদী,—বর্ত্তমান মঠবাড়িয়া পুলিশ ষ্টেশনের নিকট, এই নদীও অতীব গভীর ও তরঙ্গসঙ্কুল, দক্ষিণ মুখে বঙ্গোপসাগরে মিশিয়াছে।

৭। ইল্‌সা এবং তেতুলিয়া,—মেঘনা নদীর নামান্তর মাত্র। এই উভয় নদীই দক্ষিণ সাহাবাজপুরের পশ্চিম পার্শ্বে প্রবাহিতা এবং এই উভয় নদীই সাহাবাজপুরকে দ্বীপে পরিণত করিয়াছে, এই নদীদ্বয় অত্যন্ত বিস্তৃত, দৈর্ঘ্য প্রায় পাঁচহাজার গজ হইবে।

৮। নোহালিয়া নদী,—কীর্ত্তনখোলার শাখা খয়েরাবাদ হইতে উৎপন্ন হইয়া পটুয়াখালী এবং গলাচিপার পার্শ্ব দিয়া দক্ষিণ দিকে সমুদ্রে পতিত হইয়াছে।

৯। বিঘাই অথবা বাঘাই,—খয়েরাবাদ হইতে বহির্গত হইয়া মৃজাগঞ্জ, গুলিশাখালী এবং আমতলীর নিকট দিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে।

১০। কচানদী,—কাউখালী নদী এবং কালীগঙ্গার সঙ্গম স্থল হইতে উৎপন্ন হইয়া বলেশ্বরের সহিত মিলিত হইয়াছে।

১১। আয়লা নদী,—আয়লা এবং চাঁদখালীর নিকট দিয়া বিঘাইর সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে।

ইহা ব্যতীত ক্ষুদ্র বৃহৎ নদনদী, দোন এবং খাল, এই দেশে সংখ্যাতীত। অস্মদ্দেশে হ্রদ নাই কিন্তু স্বভাবজাত বিল আছে, সে গুলির দৃশ্য বড়ই মনোহর। স্থির জলরাশি—মধ্যে মধ্যে শৈবালদলোপরি জলচর পক্ষি-সমূহের মৃদুমধুর কখনও বা উচ্চ কোলাহল, স্ফটিকতুল্য স্থির জল মধ্যে মীনোল্লাস, দেখিতে বড়ই প্রীতিকর। ঈষৎ বাত্যান্দোলিত হইয়া যখন প্রফুটিতা সরোজিনীগুলি মৃণালোপরি ধীরে ধীরে দুলিতে থাকে, ঈষত্তরঙ্গ-বিক্ষিপ্ত বারিকণা পদ্মপত্রোপরি পতিত হইয়া সূর্য্য কিরণে জ্বলিতে

থাকে, তখন সেই নয়নাভিরাম দৃশ্য যে দেখিয়াছে সেই বুঝিয়াছে, অন্যের বর্ণনা করা অসাধ্য।

পূর্ব্বে যতগুলি বিল ছিল তন্মধ্যে অনেকগুলি এখন উর্ব্বর ভূমিখণ্ডে পরিণত, তবে যেগুলি এখনও বর্ত্তমান তাহাদের আয়তন কম নহে। কোন কোন বিলের চতুঃসীমা প্রদক্ষিণ করিতে দুই তিন দিন অথবা ততোধিক সময় লাগে। ঘাঘর হইতে উৎপন্ন কোটালিপাড়ার বিল সর্ব্ববৃহৎ; কিন্তু এই বৃহৎ জলাভূমি অনেক পরিমাণে উত্থিত হইয়াছে। ঐ স্থান এখন আর এ জিলার অধীন নাই। কতকগুলি বিল দেখিলে বোধ হয় যে, কোন প্রকার আকস্মিক প্রাকৃতিক কারণে ঐ প্রকার ঘটিয়াছে। "কালারাজাবিল"* সম্বন্ধে তথাকার কেহ কেহ বলেন যে, ঐ স্থানে কালারাজা নামক চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশীয় কোন নৃপতির বাসস্থান ছিল। ঔদ্ধত্য বশতঃ কালারাজা তদীয় গুরুদেবের প্রতি অসদাচরণ করায় তাঁহার অভিসম্পাতে এইরূপ ঘটিয়াছে। †

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুরাতন বিলগুলির মধ্যে অনেকগুলি শস্যপ্রদ হইয়াছে, শুধু পুরাতন নাম মাত্র দ্বারা স্থানের নিরাকরণ করা যায়।

স্বরূপকাঠী এবং গৌরনদী থানার অন্তর্গত ঝঞ্জনিয়া, স্বরূপকাঠী থানার মধ্যে বলদিয়া, মঠবাড়িয়া থানার অন্তর্গত চেচরির বিল, বাউফল থানার অন্তর্গত কালারাজার বিল, ধরণদি, আদমপুর, ঝালকাঠী থানার-অন্তর্গত খাজুরা, ডুমরিয়া প্রভৃতি কতক উল্লেখযোগ্য।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এই সমস্ত বিলে যেরূপ মৎস্য ছিল, এখন তাহার তিন ভাগের একভাগও নাই। কই, মাগুড়, শকুল প্রভৃতি মৎস্য অন্যান্য দেশে প্রভূত পরিমাণে রপ্তানি হইত। এখন অনেকের মধ্যে খাল উৎপন্ন হওয়াতে জোয়ার ভাটায় সেগুলির গভীরতা ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া ভূমি উত্থিত হইতেছে। ঝালকাঠীর অন্তর্গত বিলগুলি বর্ত্তমান সময় প্রায় মৃত্তিকাকারে পরিণত হইয়াছে। এখন সেই সমস্ত স্থানে, হোগোল, নল-খাগড়া প্রভৃতি বহু পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

---

* The Kalaraja is supposed to derive its name from one of the Chandradwip Rajas (H. Beveridge)

† Dead Sea সম্বন্ধে এই প্রকারের একটা গল্প আছে।

বিলগুলি মৃত্তিকাশালী হইতে আরম্ভ করিলে যখন স্বল্পতোয়া হয়, তখন নৈসর্গিক নিয়মে তথায় হোগোল, নল-খাগড়া প্রভৃতি তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ আপনা হইতেই জন্মে। এই প্রকার কতিপয় বৎসর মধ্যে বিলগুলি সমভূমি হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, উল্লিখিত বিলগুলি খালের তীরে অবস্থিত; জোয়ারের জলে এই বিলগুলি পরিপূর্ণ হয় আবার ভাটার সময় শুষ্ক হয়। মৃত্তিকার সূক্ষ্ম অংশগুলি ঐ সমস্ত তৃণ জাতীয় উদ্ভিদের মূলে পতিত হয়। এই প্রকার মাটি পড়িতে পড়িতে ক্রমে উচ্চ হইয়া উঠে। স্বরূপকাঠী থানার অন্তর্গত "উমারের পাড়" নামক স্থানে জলের প্রায় তিন চারি হাত নীচে একখানি বাঁধাঘাট পাওয়া গিয়াছে। সিড়িগুলি এখন ভগ্ন প্রায়, এক খানি ইট আমি দেখিয়াছি; দেখিলে বোধ হয় যে, বর্ত্তমান ইট হইতে তাহার আকার অনেক ভিন্ন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইট খানি সম্পূর্ণ অবস্থায় দেখিতে পাই নাই; ভগ্নাবশেষ দেখিয়া অনুমান হয় যে ইহা বহুকালের। স্থানীয় প্রবাদ যে, যখন চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ অতুল প্রতাপে বাকলায় রাজত্ব করিতেন, তখন রাণী করুণাময়ী 'গোবিন্দ রায়' বিগ্রহের নামে দেবোত্তর দান করেন। তৎকালে ঐ বিল শস্যশালিনী ভূমি ছিল। হাট, বাজার, লোকালয় প্রভৃতি সমস্তই ছিল। উমার নামক জনৈক সমৃদ্ধিশালী মুসলমান ঐ দেবোত্তরাধীনে বাস করিত, তৎকর্ত্তৃক ঐ ঘাট নির্ম্মিত হইয়াছিল, পরে নৈসর্গিক কারণে উক্ত জনপদ অকস্মাৎ বিলে পরিণত হইয়াছে।

সার উইলিয়ম হাণ্টার বলেন যে ইংরাজী ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে (১১৭৬ সালে)* বঙ্গদেশে তুমুল ঝড় বৃষ্টি ও তৎসহ সমুদ্রের জল উদ্বেলিত হইয়া অনেক স্থান প্রায় উৎসাদিত করিয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গেরও স্থানে স্থানে প্রবল ভূমিকম্প হওয়ায় অনেক স্থান একেবারেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। তাহার চিহ্ন এখনও বিরল নহে। সমুদ্রের তীরবর্ত্তী অনেক লোকালয় সেই সময় জন প্রাণী শূন্য হইয়াছিল, বর্ত্তমান সময়ে সুন্দর বনের মধ্যে অনেক দীঘি, পুষ্করিণী, এবং অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।† বলদিয়ার বিলেরও উল্লিখিত কারণে এই দশা প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব নহে।

* ইহাই "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

† এখন সেলিমাবাদে।

স্থানীয় প্রাচীন অধিবাসিগণের মধ্যে কেহ কেহ উল্লিখিত স্থানে ভগ্ন অট্টালিকার চিহ্ন জলমধ্যে দেখিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময় তাহা অনেক নীচে বসিয়া গিয়াছে।

গ্রীষ্মারম্ভে আমরা দক্ষিণ বায়ু এবং শীতারম্ভে উত্তর বায়ু পাইয়া থাকি। কিন্তু বর্ষার প্রারম্ভে, কখন কখন বা তৎপরে আমাদের এই দেশে নৈঋত কোণ হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়। তৎসঙ্গে সঙ্গে জলবৃদ্ধি হইয়া শস্যক্ষেত্র প্লাবিত করায়, ভূমির উৎকর্ষ সম্যক্ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, এবং সেই সঙ্গে বর্ষাও আগত হয়। এই স্বাভাবিক রীতির পরিবর্ত্তন হইলে আমাদের দেশে শস্য জন্মিবার পক্ষে বিশেষ বিঘ্ন হইয়া থাকে।

বায়ুর এই প্রকার গতির কারণ সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিব। পৃথিবীর ৮০ মাইল ব্যাপিয়া বায়ুমণ্ডলের অবস্থিতি, কোন কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এই বায়ুর গভীরতা ৮০ মাইলেরও অতিরিক্ত বলিয়াছেন। পৃথিবী নিয়ত ঘুরিতেছে, সেই বেগে বায়ুও ঘূর্ণিত হইয়া পৃথিবীর দেহ স্পর্শ করিতেছে, মুহূর্ত্তের জন্য ত্যাগ করিতেছে না। কোন নৈসর্গিক কারণে সূর্য্যের তাপ অপেক্ষাকৃত অধিক অথবা অগ্ন্যুৎপাতে বায়ু লঘু হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা ঊর্দ্ধে উড়িয়া যায়, তৎস্থান পূরণার্থ অন্য স্থানের বায়ু বেগে সেই স্থানে আগমন করে। এই কারণ বশতঃই ঝড়, ঘূর্ণ বায়ু প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে।

পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত কমলালেবুর মত একটু চাপা, এবং অত্যন্ত শীতল; আবার মহাবিষুব রেখার (Equator) নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি অত্যন্ত গ্রীষ্মপ্রধান, তাই তথাকার বায়ু হাল্‌কা ও ঊর্দ্ধগামী; তৎপরিপূরণার্থ দক্ষিণ ও উত্তর মেরুপ্রান্ত হইতে মহাবিষুব রেখার নিকট দুইটী বায়ুপ্রবাহ নিয়ত ধাবমান হইতেছে, মুহূর্ত্তের জন্যও বিরাম নাই; এই বায়ু স্বভাবতঃ দক্ষিণ এবং উত্তর দিক হইতে আসিতেছে। আমরা কিন্তু ঈশান এবং অগ্নি কোণ হইতে ঐ বায়ু পাইতেছি। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বলেন যে পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্বদিক পৃথিবীর নিয়ত আবর্ত্তনই ইহার কারণ। ইংরাজীতে এই বায়ুর নাম Trade wind অর্থাৎ বাণিজ্য বায়ু; স্থলভাগ স্বভাবতঃ উষ্ণ, এবং পর্ব্বতাদি দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হওয়ায়, ঐ বায়ু সমুদ্রেই অপেক্ষাকৃত বেশী অনুভূত হয়। বাণিজ্য-জাহাজসমূহ এই

বায়ুতে নির্ব্বিঘ্নে চালাইতে পারে বলিয়াই নাবিকগণ ঐ প্রকার নামকরণ করিয়াছে। ভারতমহাসাগরের উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব্বভাগ ভূখণ্ড-বেষ্টিত এবং সর্ব্বোপরি মহাপ্রাচীররূপ নগাধিরাজ হিমালয় উত্তরখণ্ড জুড়িয়া রহিয়াছে, তাই ভারতমহাসাগরে বাণিজ্য বায়ু প্রবাহিত হয় না; তৎপরিবর্ত্তে অন্য এক প্রকার বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। তাহাকে মৌসুমী বায়ু (Monsoon) বলে। এই বায়ু সমুদ্রে প্রধাবিত হইবার পূর্ব্বে উল্লিখিত কারণে ভারতে পূর্ব্বেই অনুভূত হয়। এই বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে বিপক্ষাগত বায়ুর সংঘর্ষণে প্রায় ঝড় বৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীতও সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থান, বিশেষতঃ বঙ্গোপসাগর স্বভাবতঃ ঝটিকাবর্ত্তপ্রদ; তাই ঐ প্রকার বায়ুর সহিত অস্মদ্দেশে জলবৃদ্ধি এবং বর্ষারম্ভ হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই দেশ নদী এবং দেবমাতৃক। বৃষ্টি এবং জলবৃদ্ধি উভয়ই শস্যপক্ষে বিশেষ উপযোগী। নৈঋত বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ জল বৃদ্ধি হয় তদ্রূপ সঙ্গে সঙ্গে বর্ষাও আরম্ভ হইয়া থাকে। কোন নৈসর্গিক কারণে ইহার অন্যথা হইলে শস্যের নিতান্ত ক্ষতি হয়। সমুদ্রের উপকূলস্থিত ভূখণ্ডে পূর্ব্ব বর্ণিত কারণে সময় সময় এতাদৃশ জলবৃদ্ধি হয় যে তাহাতে গৃহ, শস্য প্রভৃতি সমস্ত ভাসিয়া যায়। এই প্রকার জলপ্লাবনে বহুতর প্রাণী নষ্ট হইয়া থাকে।

যে ঋতুতে এই নৈঋত বায়ু প্রবাহিত হয় সেই ঋতুতে উহা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কতক উপকারী। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের দারুণ নিদাঘে, অগ্নিতুল্য সূর্য্য তাপে, বায়ু অত্যন্ত উষ্ণ হইয়া লঘু হয়। নৈঋত বায়ুর প্রায় এক চতুর্থাংশ জলপূর্ণ, তাই এই বায়ুর সংস্পর্শে উষ্ণ বায়ু কতক পরিমাণে শীতল হয়। গ্রীষ্মোৎপন্ন রোগ এবং ক্লেদ এই বায়ুর সংস্পর্শে প্রশমিত হইয়া থাকে।

মেঘনা, ইল্‌সা, কালাবদর প্রভৃতি বড় বড় নদীতে সময় সময় "বাণ" (bore) হয়। অকস্মাৎ জলরাশি উদ্বেলিত হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে সৈকতভূমি প্লাবিত করিয়া তট পানে ধাবিত হয়। এই বাণ নৌচালনের পক্ষে অত্যন্ত ভীতিকর এবং সময় সময় এই জন্য বহু নৌকা জলমগ্ন হইয়া থাকে। অন্যান্য ঋতু অপেক্ষা বর্ষা কালে বাণের বেশী প্রাদুর্ভাব।

সকলেই জানেন যে চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণে জোয়ার হইয়া থাকে,

কেন না উভয়ই স্বাভাবিক নিয়মে সমুদ্রের জল আকর্ষণ করে; কিন্তু সূর্য্য অপেক্ষা চন্দ্র পৃথিবীর অনেক নিকটবর্ত্তী বলিয়া তাহার আকর্ষণও বেশী। পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সূর্য্য অপেক্ষা চন্দ্র ছয় গুণ অধিক আকর্ষণ করিয়া থাকে। উল্লিখিত কারণে সমুদ্রের জল উচ্ছ্বসিত হইলেই নদীতে জোয়ার হয়, অন্যথায় নদীর নিম্নগতি অর্থাৎ ভাটা; ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম।

এক্ষণে দেখা যাউক হঠাৎ জল বৃদ্ধির কারণ কি? মহাবিষুব রেখার (Equator) দক্ষিণস্থিত সমুদ্রের জল অত্যন্ত গভীর। চন্দ্রাকর্ষণে ঐ জলরাশি উদ্বেলিত হইয়া প্রবলবেগে উত্তরাভিমুখে ধাবিত হয়। দক্ষিণ দিক হইতে উত্তর দিকে জোয়ার হওয়া প্রাকৃতিক নিয়ম। নদীমুখনিঃসৃত জলরাশির সহিত ঐ জলের প্রবল সংঘর্ষণ হইয়া অতি প্রবল বেগে উভয় জলরাশি প্রকাণ্ড প্রাচীরের ন্যায় নদী মধ্যে প্রবেশ করে ও মুহূর্ত্ত মধ্যে সৈকত, পুলিন প্লাবিত করিয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে,—ইহাই বাণ। তখন ইহার সম্মুখে যাহা পড়ে, তৎক্ষণাৎ তাহা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। আমাদের বঙ্গোপসাগরের মুখ দক্ষিণ দিকে, তাই জোয়ারের তেজ অত্যন্ত প্রবল। ইহাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত। কিন্তু ইহার বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, আমাদের প্রাচীন মুনি ঋষিগণ যে ইহা সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন, জ্যোতিষ শাস্ত্রে* তাঁহার বহু প্রমাণ আছে। চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে আমাদের তিথিগুলি হইয়াছে। তজ্জন্যই পঞ্চমী তিথি হইতে দশমী তিথি পর্য্যন্ত জল হ্রাস, তৎপর পূর্ণিমায় ও অমাবস্যায় জলবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অস্মদ্দেশস্থ যে সমস্ত বড় বড় নদী সাগরে মিশিয়াছে তাহাতে উল্লিখিত প্রাকৃতিক কারণে বাণ হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে পর্ব্বত নাই; কেননা মৃত্তিকা প্রাচীন না হইলে পর্ব্বতের উৎপত্তি হয় না। ভূকম্পে পৃথ্বীবক্ষের কোন কোন স্থান ঢিপির ন্যায় উচ্চ হয়, তারপর ক্রমশঃ মৃত্তিকাস্তর, ধাতুস্তর অথবা উদ্ভিজ্জস্তর জমিতে থাকে। এইরূপে বহুকাল পরে ঐ সমস্ত পদার্থ কঠিন প্রস্তর রূপে পরিণত হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। আমাদের দেশ নদীগর্ভ হইতে সদ্যোত্থিত, মৃত্তিকা নরম, সুতরাং প্রস্তর উৎপত্তি হওয়ার সমূহ অন্তরায়।

* "চন্দ্রোদয়াৎ আপঃ সম্যক্ উদন্তি" ইত্যাদি।

যে সমস্ত বৃহৎ নদী বঙ্গোপসাগরে মিশিয়াছে, তাহাদের মোহানায় কতকগুলি দ্বীপ আছে। তন্মধ্যে দক্ষিণ সাহাবাজপুর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং একটী প্রকাণ্ড জনপদ। এতদ্ব্যতীত বাহুরা, মনপুরা, পাঁচখালী, কল্‌মী, বড় বাঁশদিয়া, কোরালিয়া, রাঙ্গাবালী, চোপা, কুক্‌রিমুক্‌রি প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে।

বাত্যাবর্ত্ত, জলপ্লাবন, সাময়িক ঝড়বৃষ্টি এই স্থানে অন্য দেশ অপেক্ষা বড় কম নহে। ঐতিহাসিকপ্রবর আবুল ফজেল প্রণীত বিখ্যাত "আইন-ই-আকবরি" * গ্রন্থে এই দেশ সম্বন্ধে এক ভীষণ খণ্ড প্রলয়ের কথা উল্লেখ আছে।

যে সময় এই দেশের সৌভাগ্য ছিল, যখন পরম ধার্ম্মিক হিন্দু রাজা এই দেশে ন্যায়, দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতির সহিত অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতেন, তখন কায়স্থবংশোদ্ভব রাজা জগদানন্দ রায় রাজত্ব করিতেন। সেই সময় সমগ্র ভূখণ্ড বাকলা নামে অভিহিত হইত; বর্ত্তমান তেতুলিয়া নদীর সাগরসঙ্গমস্থলে তাঁহার রাজধানী ছিল। কেহ কেহ বলেন বর্ত্তমান কচুয়াই ঐ রাজধানী।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই খণ্ড প্রলয় সংঘটিত হইয়াছিল, ব্লক্‌ম্যান্ সাহেব ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রাজধানীস্থ প্রায় যাবতীয় লোক এবং রাজা জগদানন্দ এই জলপ্লাবনে বিনষ্ট হইয়াছিলেন। রাজপুত্র এবং তৎসহ অল্প সংখ্যক ব্যক্তিমাত্র ভগবানের এই সংহারিণী লীলা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন।

---

* "In the 29th year of the present reign one after noon at three o' clock, there was a terrible inundation which deluged the whole *Sarkar* (Bakla). The Rajah was at an entertainment from which he embarked in a boat, his son, Pannanand Roy with many people climed to the top of a Hindu temple, and the merchants betook themselves to a "Talar" (probably a Nahabat Khana). It blew a hurricane with thunder and lightning for five hours, during which time the sea (Bay of Bengal) was greatly agitated. The houses and boats were all swallowed up, nothing remaining but the Hindu temple on the height. Near 200,000 living creatures perished in this calamity."—Gladwin's Translation of Ain-i-Akbari.

[আবুল ফজেল রাজা জগদানন্দের পুত্র স্থানে তদীয় পিতা পরমানন্দকে (Pannanand) নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু রাজা কন্দর্প নারায়ণই জগদানন্দের পুত্র।]

বঙ্গীয় ১১৭৬ সালে (খৃঃ ১৭৬৯) যে জলপ্লাবন হইয়াছিল তাহা উল্লিখিত খণ্ডপ্রলয় হইতেও ভয়ানক। কেননা এই জলপ্লাবনে প্রায় সমস্ত বঙ্গদেশ উৎসাদিত হইয়াছিল। আষাঢ় মাসের মধ্যভাগে প্রবল বায়ুর সহিত মুষল ধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রজল সহসা উদ্বেলিত হইয়া ভয়ঙ্কর বেগে নগর, উপনগর, গ্রাম প্রভৃতি প্লাবিত করিল। প্রায় এক সপ্তাহ কাল এই প্রাকৃতিক বিপ্লব স্থায়ী ছিল। এই ভীষণ দৈব দুর্ব্বিপাকে যে কত কোটী প্রাণী শমনভবনে গমন করিয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই।* এই দুর্যোগে সমস্ত বঙ্গভূমিতে দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল, ও কোটী কোটী নরনারী অনশনে প্রাণ ত্যাগ করিতে লাগিল! দিবা ভাগে প্রশস্ত রাজবর্ত্মে মাংশাসী প্রাণীসমূহ নরদেহ লইয়া বিবাদ করিত। তখন স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গভূমি ভীষণ শ্মশান রূপে পরিণত হইয়া পিশাচগণের তাণ্ডবক্ষেত্র হইয়াছিল।

বঙ্গীয় ১২২৯ সালে† ইংরাজী ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ৬ই জুন তারিখ আর একটী ভীষণ ঝড় ও তৎসঙ্গে জলপ্লাবন হয়, তাহাতে সমুদ্রোপকূলস্থিত দক্ষিণ সাহাবাজপুর, বাউফল, মঠবাড়িয়া, গলাচিপা, প্রভৃতি স্থান প্রায় জনশূন্য হইয়াছিল।

৬ই জুন তারিখ (১৯ জ্যৈষ্ঠ) বেলা দ্বিপ্রহরের সময় হইতে প্রবলবেগে বাতাস বহিতে আরম্ভ করিল, ক্রমে ক্রমে সেই প্রবাহমান বায়ু প্রচণ্ড ঝটিকাকারে পরিণত হইল। তৎসঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড উর্ম্মিমালা মস্তকে ধারণ করিয়া ভীষণ জলরাশি সমুদ্র গর্ভ হইতে উদ্বেলিত হইয়া অতি ভীষণ বেগে তটাভিমুখে ধাবিত হইল।

রাত্রি প্রহরের পর বাতাসের বেগ এত বৃদ্ধি হইল যে, তাহাতে অনেক ঘর, বাড়ী উড়িয়া গেল। এদিকেও অত্যল্প কাল মধ্যে সেই উচ্ছ্বসিত জলরাশি ভীষণতর হইয়া কল কল নাদে সমস্ত প্লাবিত করিয়া ফেলিল। অনেক নর নারী প্রাণরক্ষার উপায় না দেখিয়া উচ্চ বৃক্ষচূড়ে আরোহণ করিতে লাগিল। প্রভাতে ঝটিকা-বেগ অনেকটা কমিল, কিন্তু

* Bengal, specially, the districts of Malda, Pabna, Rangpur, Dacca, Bakarganj and Chittagong were nearly depopulated, ennumerable souls perished.

—Stewart's History of Bengal,

† ইহাই এই দেশে "গোলোক যোগ" নামে প্রচলিত।

প্রায় সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত জলরাশি স্থানে স্থানে স্থায়ী ছিল। এই প্রলয়ে ১০৯৮৪ জন নরনারী, এবং ৯৭০০ শত গবাদি পশু ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল।*

ইংরাজী ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে এ দেশে আরও একটী ঝড় ও তৎসহ জলপ্লাবন হইয়া বহু নরনারী ও পশু পক্ষী বিনাশ করিয়াছিল। এই ঝড় অনেকক্ষণ স্থায়ী ছিলনা; যেরূপ প্রচণ্ড বেগে এই ঝটিকাবর্ত্ত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহাতে কিছু কাল স্থায়ী থাকিলে পূর্ব্বাপেক্ষাও গুরুতর সর্ব্বনাশ সাধিত হইত।

বাঙ্গালা ১২৮৩ সালে (ইং ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ৩১ শে অক্টোবর) ১৬ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে এই দেশে যে মহা ঝড় প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা অধিবাসিগণের বংশ পরম্পরায় অনেক দিন স্মরণ থাকিবে। এই জিলার এমন স্থান ছিলনা, যে স্থানে ইহাতে বিস্তর ক্ষতি না হইয়াছিল। এই মহাঝড়ে দৌলতখাঁ নামক স্থান, এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রায় ১০০০০০ নর নারী, তাহার দ্বিগুণ গবাদি পশু, এবং অন্যান্য বহু প্রাণী ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল।

দক্ষিণ সাহাবাজপুরের অন্তর্গত দৌলতখাঁ নামক স্থানে তখন একটী মহকুমা স্থাপিত ছিল † এবং বাবু উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় সেই স্থানের সব-ডিভিসনাল অফিসার (Sub Divisional Officer) ছিলেন। এই খণ্ড-প্রলয়ে তাঁহার স্ত্রী পুত্র, ধন ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সমস্তই ধ্বংস হইয়াছিল। তিনি একাকী মাত্র জীবিত ছিলেন। এই শোকাবহ ঘটনা শুনিলে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। শুনা যায় যে উক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবম্বিধ সর্ব্বনাশে সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া ৺ কাশীধামে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন। যে সময় এই খণ্ডপ্রলয় উপস্থিত হয়, সেই সময় বার্টন সাহেব এই জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট-কালেক্টর ছিলেন। এই ভীষণ সংবাদ অবগত হইয়া সদাশয় সাহেব সরকারী ষ্টীমলঞ্চে চাউল এবং বস্ত্রাদি লইয়া কতিপয় নৌকা সহ দৌলতখাঁয় উপস্থিত হন। সাহেব বাহাদুর আবশ্যকীয় খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি লইয়া উপস্থিত না হইলে যে

* Mr. Cardew's Report—9th June, 1822.

† এই মহকুমা এখন ভোলায় স্থাপিত হইয়াছে।

কয়েকজন অবশিষ্ট লোক জীবিত ছিল, অনাহারে এবং শীতে নিশ্চয়ই তাহারা শমন সদনে গমন করিত। এই ভয়াবহ খণ্ড প্রলয় সম্বন্ধে সাহেব বাহাদুর গবর্ণমেণ্টে যে সুদীর্ঘ রিপোর্ট প্রদান করিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"২রা নবেম্বর তারিখ বেলা প্রায় ৪টার সময় দৌলতখাঁ পৌছিলাম। পথে নদীর মধ্যে অসংখ্য শব আমার ষ্টীমারের দুই পাশ দিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। মানুষ, গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি পশ্বাদির মৃতদেহসহ নরনারী, বালকবালিকার শব মিশিয়া সমস্ত নদী ছাইয়া ফেলিয়াছিল; শকুণিগুলি সেই সমস্ত পচা মৃতদেহের উপর বসিয়া সেইগুলি খাইতেছিল। আমি কিছুদিন পূর্ব্বে যে স্থানে ষ্টীমার লাগাইয়াছিলাম, এখনও সেই স্থানে ষ্টীমার রাখিলাম; কিন্তু এতগুলি মৃতদেহ আমার পথ অবরুদ্ধ করিল যে খালাসীগণ বাঁশ (লাঠি) দ্বারা সেইগুলি স্রোতে ভাসাইয়া দিলে পর আমার ষ্টীমার লাগিল। তীরের দিকে চাহিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা আমার বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই। যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর পর্য্যন্ত ঘর, দ্বার, বৃক্ষ প্রভৃতি কিছুরই চিহ্ন নাই; যেন প্রকাণ্ড জনশূন্য প্রান্তর। তীরে উঠিবামাত্র এমন বিকট দুর্গন্ধ আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল যে তাহাতে আমার বমির উপক্রম হইল। যে স্থানে কাছারি ছিল, উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে তথায় তাহার কোনরূপ সামান্য চিহ্নও বর্ত্তমান নাই; কেবল নিকটবর্ত্তী যে দুই একটী বড় গাছ ছিল, তাহার উপর কতকগুলি মানুষের মৃতদেহ দেখিলাম। কোন কোন বৃক্ষে মানুষ, গরু, মহিষ, শূকর প্রভৃতিরও শব একত্রীভূত দেখিলাম। আমি জলের দাগ মাপিয়া দেখিলাম যে একুশ ফুট জল হইয়াছিল। যে কয়েক জন জীবিত মানুষ দেখিলাম, তাহাদের যে অবস্থা দর্শন করিলাম, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। এই সর্ব্বনাশী ঝটিকায় তাহাদের সকলেরই জীবনান্তিক ক্লেশ হইয়াছিল, তদুপরি অনাহারে চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট এবং কণ্ঠস্বর ক্ষীণ, অনেকের দাঁড়াইবার শক্তি পর্য্যন্তও ছিল না। আবার তাহারা প্রায় নগ্ন, আমি তাহাদের আহারীয় সামগ্রী ও বস্ত্রাদি প্রদান করিয়া সবডিভিসনাল অফিসারের অনুসন্ধান করিলাম। বহু অনুসন্ধানে তাঁহাকে পাইলাম; এই ভীষণ দৈব দুর্ব্বিপাকে, তাঁহার স্ত্রীপুত্র সকলেই

প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। শোকে দুঃখে তিনি উন্মত্তপ্রায়। আমি তাঁহাকে বিশেষ সান্ত্বনা করিলাম।"

ঝালকাঠীর অন্তর্গত বাউকাঠি নিবাসী পূর্ণচন্দ্র সেন মহাশয় দৌলতখাঁর রেজেষ্ট্রি আফিসে কেরাণী ছিলেন। তিনি ঐ প্রলয়ের সময় তথায় ছিলেন, তাঁহার নিকট যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাও নিম্নে বিবৃত হইল।

"১৬ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার বৈকাল বেলা হইতেই বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প জল বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আমাদের রেজেষ্ট্রি আফিস একটী ছোট একতালা দালান, দালানটী ৭।৮ হাতের বেশী উচ্চ হইবে না। দিবাবসানে বায়ু বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জলও বাড়িতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় দেখিলাম যে আমাদের দালানের সম্মুখস্থ উঠান (চত্বর) জলে ভরিয়া গিয়াছে, তখন আমরা বড় ভীত হইয়া পড়িলাম। আমরা তিন জন কেরাণী, সঙ্গে একজন মাত্র ভৃত্য। প্রাণভয়ে দালানের কবাটগুলি বন্ধ করিলাম; কিন্তু অনুমান এক ঘণ্টার পর কবাটের ফাঁক দিয়া কল কল শব্দে অল্প অল্প জল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন আমরা মনে করিলাম, যে ঘরের মধ্যে জলে ডুবিয়া মরা অপেক্ষা, জীবন-রক্ষার জন্য একবার চেষ্টা করা উচিত। সকলে আঁটিয়া পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করতঃ কবাট খুলিয়া দিলাম, তখন অতি বেগে জলরাশি নিমেষ মধ্যে সেই ক্ষুদ্র গৃহ পরিপূর্ণ করিল। আমরা পূর্ব্বেই প্রস্তুত ছিলাম, অতি কষ্টে সেই জলরাশি ভেদ করিয়া বাহিরে আসিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই। যে দিকে চাহিয়া দেখি সেই দিকেই জল, জল! জল! জল—চতুর্দ্দিকেই জল! পর্ব্বত সদৃশ তরঙ্গ মাথায় লইয়া ভীষণ জলরাশি চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত করিয়াছে। প্রচণ্ড বায়ু সেই জলরাশিকে যেন ঊর্দ্ধে ফুলাইয়া উঠাইতেছে। আমাদের রেজেষ্ট্রি আফিসের অনুমান একরশী (প্রায় ১০০ হস্ত) দূরে একটী নাতিবৃহৎ দেবমন্দির ছিল। তন্মধ্যে কালিকা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা, তাহার চূড়া তখন পর্য্যন্ত ডুবিয়া যায় নাই। জীবন রক্ষার আশায় সেই দিকে সাঁতার দিলাম। আমি বিলক্ষণ সন্তরণক্ষম ছিলাম। বহু কষ্টে সেই মন্দিরের নিকটে পৌঁছিয়া, তৎপ্রান্তস্থিত ইটের কোণা ধরিয়া জলের উপর ভাসিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে শত শত তরঙ্গ আসিয়া আমাদের ডুবাইয়া

দিতে লাগিল। দেখিলাম যে মন্দিরের পার্শ্বে আমাদের ন্যায় আরও কয়েক জন ঐরূপ রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের সঙ্গীয় ভৃত্যটীকে আর দেখিলাম না। দেখিতে দেখিতে মন্দিরের প্রায় সমস্তই ডুবিয়া গেল, আমরা জন-কয়েক মন্দিরের উপরস্থিত লৌহশলাকা ধরিলাম। সেই লোহার শলাকার উপর দিয়াও তরঙ্গ খেলিতে লাগিল; তখন আর জীবনের আশা করিলাম না, ঢলকে ঢলকে জল উদরস্থ হইতে লাগিল, শরীর ক্রমশঃ অবশ হইয়া পড়িল; চক্ষে কিছুই স্পষ্ট লক্ষ্য করিতে পারিলাম না। যতদূর শক্তি ছিল ততদূর সামর্থ্য প্রকাশে উচ্চৈঃস্বরে দুর্গা দুর্গা করিতে লাগিলাম, কিন্তু বাক্যস্ফুরণ হইল না; জিহ্বা ক্রমশঃ জড় হইয়া আসিতে লাগিল। অকস্মাৎ আমার সম্মুখে একখানি "চালা" ভাসিয়া যাইতেছে দেখিলাম, তখন অন্তিম বলের সহিত চেষ্টা করিয়া সেই ভাসমান চালার দিকে সাঁতরাইয়া গেলাম; বহুকষ্টে তদুপরি আরোহণ করিয়া পরিধেয় বস্ত্র-দ্বারা সেই চালার বাঁশের সঙ্গে কটিদেশ উত্তমরূপে বন্ধন করিলাম। এই চালার উপর আরও কয়েক জন ছিল। তখন আমার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল না। এক একবার ঝাপ্‌টা বাতাসে ও জলের ঢেউতে আমাকে যেন চালা হইতে ফেলিয়া দিতেছিল, কিন্তু কটিদেশ বদ্ধ থাকায় জীবনরক্ষা হইয়া-ছিল। অনেকক্ষণ এইরূপ ভাসিতে ভাসিতে একটা বৃহৎ তেঁতুল গাছ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী একটা মাদার গাছের মধ্যে চালাখানা ঠেকিয়া গেল; তখন এক বাতাস ব্যতীত তরঙ্গে বড় একটা কষ্ট দিতে পারে নাই। এইরূপ যে কতক্ষণ গত হইল বলিতে পারি না; রাত্রিশেষে যেন ঝড় অনেকটা কমিতে লাগিল, এরূপ বোধ করিলাম। আমরা যে চালাতে ছিলাম, তাহার মধ্যস্থান ভাঙ্গিয়া গেল; আমরা সেই ভগ্ন চালার উপরই দুই গাছের ডালের মধ্যে থাকিলাম। কিছুকাল পরে বোধ হইল যেন জল ক্রমশঃ কমিতেছে, এবং পূর্ব্বদিকে যেন উষার ঈষৎ শুভ্রালোক প্রভাসিত হইতেছে। এতগুলি প্রাণীর জীবন হরণ করিয়া সেই ভয়ঙ্করী নিশীথিনী যেন ভগবান সবিতৃদেবের ভয়ে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিতে লাগিল। যখন অস্পষ্টালোক বেশ পরিষ্কার হইল, তখন দেখিলাম যে আমাদের আশ্রয়-স্থান—সেই দ্বিখণ্ডীকৃত চালা—দুইখানি বৃক্ষকাণ্ডে আবদ্ধ হইয়া ঝুলিতেছে; অল্পকাল পরেই সূর্য্যদেব উদিত হইলেন। আমরা উভয় চালায় আটজন

মানুষ ছিলাম, সূর্য্য কিরণে আমাদের অবসাদ অনেকটা দূর হইল; ধীরে ধীরে বহু কষ্টে নীচে নামিলাম, কণ্টকে শরীরের অনেক স্থান ছিন্ন হইয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। তখনও প্রায় এক হাঁটু জল ছিল, আমরা সেই আটজন লোক উক্ত বৃক্ষতলায় দাঁড়াইয়া রহিলাম; অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত জল কমিয়া গেল। আমরা যেস্থানে ছিলাম তাহার পশ্চাতেই নদী; সম্মুখে যেন অনন্ত প্রান্তর ধু ধু করিতেছে। গৃহ, পথ, বৃক্ষাদির চিহ্নমাত্র নাই; কেবল স্থানে স্থানে স্তূপাকার মৃতদেহ। নদী-গর্ভেও অসংখ্য শব পরস্পর মিশিয়া রহিয়াছে। রৌদ্রোত্তাপে শরীরের গ্লানি অনেকটা কম বোধ হইতে লাগিল; তখন আশ্রয়ানুসন্ধানার্থ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কোথায় যাইব, কে আশ্রয় দিবে? কোথাও কোন গৃহাদি না পাইয়া আমরা বাজারের দিকে গমন করিলাম। তথায় দুই একখানি ভগ্নপ্রায় গৃহ ছিল; কিন্তু জনমানবের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিলাম না।

আমরা একখানি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে কয়েক বস্তা চাউল রহিয়াছে। সকলেই তখন অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত; উপায়ান্তর নাই ভাবিয়া বস্তা হইতে কতেক চাউল বাহির করিলাম এবং কিঞ্চিৎ জলসংযোগে উক্ত চাউল ভক্ষণ করিয়া ক্ষুৎপিপাসা কিয়ৎপরিমাণে নিবৃত্ত করিলাম। কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া কেহ কেহ আগুন অন্বেষণে গেল; আগুন কোথায় পাইবে? প্রায় দুইঘণ্টা পরে তাহারা ফিরিল, দুই চারি-জন জীবিত মনুষ্য ব্যতীত আর কোন জনপ্রাণীর চিহ্নও দেখিল না। এইরূপে সেইদিন কাটিয়া গেল; তার পরদিনও কোথাও আগুন না পাইয়া সেইভাবে চাউল দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলাম। আমাদের মধ্যে দুজনের কলেরায় মৃত্যু হইল। আমরা তখন ভীত হইয়া অতি সামান্য মাত্র চাউল খাইলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আগমন করিলেন। তিনি আমাদের উপযুক্ত আহার ও বস্ত্রাদি প্রদান করিয়া তাঁহার সঙ্গে বরিশাল লইয়া আসিলেন।"

এই জলপ্লাবনে আমাদের দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, পঁচিশ বৎসরেও তাহার পূরণ হয় নাই।

বর্ষার প্রারম্ভে দক্ষিণদিকে তোপধ্বনির ন্যায় এক ভীষণ শব্দ শ্রুত

হয়; কিন্তু সমুদ্রোপকূলে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বেশী উপলব্ধি হয়। এই শব্দ আরম্ভ হইলে অত্যল্পকাল মধ্যেই বর্ষা ও বাতাস আরম্ভ হইয়া থাকে। বর্ষান্তে এই শব্দ শুনা যায় না; জ্যৈষ্ঠমাসে আরম্ভ হয়, কখন কখন আশ্বিন মাসেও শ্রুত হয়। প্রাচীনদিগের মুখে শুনিয়াছি যে পূর্ব্বে এই শব্দ যে প্রকার মুহুর্মুহু শুনা যাইত, এখন আর তদ্রূপ শুনা যায় না। প্রাচীনগণ ইঁহাকে বর্ষার অল্পতার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

এই শব্দোৎপত্তির কোন কারণ এযাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই; গবর্ণমেণ্ট এই জন্য কমিশন বসাইয়া প্রভূত অর্থব্যয় করিয়াও কোন কারণ ঠিক করিতে পারেন নাই। তবে এই শব্দটা যে বঙ্গোপসাগর হইতে উত্থিত হয় তাহা ঠিক হইয়াছে। কিন্তু সমুদ্রের কোন স্থান হইতে যে এই ভীষণ শব্দ উৎপন্ন হয়, এযাবৎ তাহা নিরাকৃত হয় নাই। এই সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কেহ বলে যে রাবণরাজার বাড়ীর দরজা বন্ধের শব্দ; মুসলমানগণ বলেন যে, তাহাদের ধর্ম্মবীর ইমামের আগমন সূচক তোপ-ধ্বনি। প্রকৃত যে কি, তাহা এযাবৎ কিছুই স্থির হয় নাই। ইহাকে "বরিশাল গান" বলে।*

প্রথিতনামা বাদসাহ আকবরের রাজস্বসচিব মহাপ্রাজ্ঞ রাজা টোডরমল্ল, সম্রাট কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সাম্রাজ্যের রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন। তৎকর্ত্তৃক নিয়োজিত মির জিম্মন্ খাঁ নামক জনৈক কাননগু বাকলার রাজস্ব বন্দোবস্ত করিতে আগমন করিয়া বাকলা সম্বন্ধে যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ সংক্ষেপে নিম্নে লিখিত হইল।

* "The only natural phenomenon in the district is a metrological one, and is called *Barisal Gun*. It is a singular loud sound resembling the distant discharge of artillery, which is heard in the south of the district, and especially during the rains A paper was read on the subject by Babu Gour Das Basak, before the Asiatic Society, some seven years ago, * * * * * * but no one has yet come forward with a satisfactory explanation of the cause of this curious phenomenon. The statement, that it is caused by the action of the waves on the sea-shore, seems hardly tenable, as the sound is heard from inland, at such a distance from the coast as would preclude the possibility of this explanation; some times indeed as far north as Faridpur. No caverns or hot-springs are situated in Bakarganj."—W. W. Hunter's Statistical Account of Bakarganj, P. 175.

It is not altogether impossible that it originates in that curious submarine depression in front of Jessore and Bakarganj which is known by the name of the "*Swatch of no ground.*"—H. Beveredge's History of Bakarganj, P. 14.

"রাজা (রামচন্দ্র) বয়সে বালক হইলেও তাঁহাকে বিশেষ বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হইল। আমাদিগকে বিশেষ সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া উপযুক্ত বাসস্থান প্রদান করিলেন। তাঁহার বিস্তীর্ণ রাজ্য ধনধান্যে পরিপূর্ণ, প্রজাপুঞ্জ সুখী, অধিবাসিগণ সুস্থদেহ এবং সবল, যুবকগণ প্রায় প্রত্যহ অপরাহ্নে দলবদ্ধ হইয়া মল্লক্রীড়া করে। অনেককে অস্ত্রশস্ত্র বিদ্যায়ও বিশেষ পারদর্শী দেখিলাম। রাজাও এইজন্য সকলকে বিশেষ উৎসাহ দিয়া থাকেন।" ইত্যাদি *

আইন-ই-আকবরি পাঠে জানিতে পারা যায় যে তৎকালে বঙ্গদেশের ফুল্‌সি অর্থাৎ উৎকৃষ্ট উর্ব্বরা ভূমিতে পাকা দুই মণ আড়াই মণ ধান্য উৎপন্ন হইত। রাজকোষে বিঘাপ্রতি মাত্র দশ সের ধান্য, অথবা তদনুযায়ী রাজকর গ্রহণ করা হইত † ইহা ব্যতীত যব, গম, ইক্ষু, রবিশস্য, নানা প্রকার সুমিষ্ট ফলও প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হইত। সমস্ত সাম্রাজ্যে এই নিয়মে কর আদায় হইয়া তদ্বারা এই বিশাল ভারতবর্ষের শাসনব্যয় ও অন্যান্য যাবতীয় খরচ নির্ব্বাহ হইয়াও রাজকোষে কোটি সুবর্ণমুদ্রা এবং অনমুমেয় মূল্যবান মণিমুক্তাদি মজুত থাকিত।

গত সার্দ্ধ তিনশত বৎসরের তুলনায় বর্ত্তমান সময়ে উর্ব্বর ভূমিখণ্ডে তাহার দ্বিগুণ শস্য উৎপন্ন হয়; এখন শস্যশালিনী ভূমির সংখ্যাও অনেক বেশী, কেননা কাল পরিবর্ত্তনে অনেক নূতন স্থান সৃষ্ট হইয়াছে। অনেক বিল উত্থিত হইয়াছে; অনেক দুর্গম সুন্দরবন জনপদে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বের তুলনায় বর্ত্তমান সময়ে এই দেশ অধিকতর শস্যশালী হইলেও দেশের অভাব দূর হইতেছে না। যদিও ধনধান্যপূর্ণা শ্যামলা বাকলা

---

* Ain-i-Akbari—Ten Years' Settlement of Bengal by Raja Toder Mull.

† "His Majesty (Emperor Akbar) in return of the cares of the royalty, exacts an annual tribute of ten seers of grain from every *bigha* of cultivated land throughout the empire, and granaries are erected in different parts of the kingdom, from whence the cattle employed by the state are provided with subsistance. They are also applied to the relief of indigent husbandmen; and in the time of scarcity, the grain is sold at a low price, but the quantity is proportioned to the absolute necessities of the purchasers. Likewise throughout the empire, a great quantity of food is dressed daily for the support of the poor and needy Proper officers are appointed to the charge of granaries and to keep accounts of the receipts and expenditures."—Ain-i-Akbari, Page 189.

শস্যসম্পদে বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে, তবুও এদেশের অধিবাসিগণ দুর্ভিক্ষের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইতেছেন না। দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই ইহার প্রতীকার সাধনে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য।

সম্রাট আকবরের সময়ে একমণ ধান্যের মূল্য পাঁচ ডাম অর্থাৎ দুই আনা ছিল।* নবাব সায়েস্তাখাঁ যখন ঢাকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তখন টাকায় আটমণ চাউল বিক্রয় হইত।†

ব্রিটিশ রাজ্য পত্তন হইলে আমাদের এই দেশে ধান চাউলের যে মূল্য ছিল, তাহাও শুনিলে অবাক হইতে হয়। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে এক টাকায় আড়াই মণ চাউল বিক্রয় হইত। তারপর ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে নিম্নলিখিত দরে ধান চাউল, এবং অন্যান্য শস্য বিক্রয় হইত।‡

১নং চাউল	...	...	টাকায়	১মণ	১০ সের।
২নং ঐ	...	...	”	১মণ	২০ সের।
৩নং ঐ	...	...	”	১মণ	৩০ সের।
ধান	...	...	”	২মণ	২০ সের।
সরিষা	...	...	”	১মণ	২৯ সের।
তিল	...	...	”	১মণ	৩০ সের।
ঘোড়ার দানা, ছোলা বুট		...	”	১মণ	২৬ সের।
সোণামুগ	...	...	”	১মণ	১০ সের।
যব	...	...	”	২মণ	৩০ সের।
গম	...	...	”	১মণ	১০ সের।

তারপর ১৮০০ খৃষ্টাব্দে :—

চাউল	...	...	এক টাকায় প্রায়	১ মণ।
লবণ	...	...	চারি টাকায়	১ মণ।
তৈল	...	...	ঐ	ঐ

এই অনুপাতে সমস্ত দ্রব্যের মূল্য ক্রমেই মহার্ঘ হইতে আরম্ভ করিল।

* ডাম বর্ত্তমান টাকার $\frac{১}{৪০}$ ভাগ।

† Stewarts' History of Bengal.

‡ Report of the Proceedings of the Provincial council from 1774-79.

এই ভাবে তুলনা করিতে গেলেও এখন শরীর শিহরিয়া উঠে। আমাদের বিন্দুমাত্র শস্যপ্রদ ভূমির নাশ হয় নাই, বরং অনেক ভূমি আরও উর্ব্বরাশক্তি সম্পন্ন হইয়াছে; তবু প্রতি বৎসর এই স্থানে অনশনজনিত হাহাকার ধ্বনি। অন্নাভাব হেতু কত লোক যে অকালে শমন ভবনে যাইতেছে, কে তাহার অনুসন্ধান করে?

প্রাচীনদিগের মুখে শুনিয়াছি, যে গত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এক টাকায় আড়াই মণ মোটা ধান্য বিক্রয় হইত; এবং তাহাতে সাধারণ পরিবারের প্রায় এক মাসের খোরাক অনায়াসে নির্ব্বাহ হইত। অগ্রহায়ণ হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ধান্য বিক্রেতৃগণের নৌকায় এদেশ পরিপূর্ণ হইত; তাহারা প্রত্যেক বাড়ীতে আসিয়া ক্রয়বিক্রয় করিত। চাষীপ্রজাগণ তখন অনায়াসে চতুর্থাংশ ধান্য ভূম্যধিকারীকে রাজকর প্রদান করিত; কেহই টাকাপয়সা দ্বারা রাজকর পরিশোধ করিত না। ভূম্যধিকারী টাকা চাহিলেও প্রজারা সহজে স্বীকৃত হইত না। তাহাতে অনেক সময় ভূম্যধিকারিগণ প্রজাদের উপর অত্যাচার করিতেন। এখন কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত; এখন প্রজাগণ প্রাণান্তেও ধান্য দিতে চায় না।

পূর্ব্বকালে এ দেশের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। বর্ত্তমান সময়ে যেমন গ্রামে গ্রামে কলেরা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি কঠিন ও দুশ্চিকিৎস্য রোগের আবির্ভাব হইতেছে, তৎকালে তাহার কোন চিহ্নও ছিল না। জ্বর, উদরাময়, কাশি, আমাশয়, বেদনা প্রভৃতি রোগ প্রায়ই প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; কদাচিৎ যুবক কি বালক রোগাক্রান্ত হইত। যদিও সংক্রামক রোগের মধ্যে কদাচিৎ বসন্ত রোগের কথা শুনা যাইত; কিন্তু "টিকা" দেওয়ার প্রচলন থাকায় তৎকালে অল্পকাল মধ্যেই ঐ ভীষণ রোগের সংক্রামকতা দূরীভূত হইত। কলেরার অস্তিত্ব আদৌ ছিল না। ১৮১৭ খৃঃ অব্দে প্রথমতঃ এই রোগ যশোহর জিলার অন্তর্গত নলডাঙ্গা নামক স্থানে আরম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষ, এসিয়া, এবং তারপর সমস্ত পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে। প্রতি বৎসর যে কত কোটি নরনারী ইহার করালকবলে পতিত হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই।

১৫৭৫ খৃঃ অব্দে এক ভীষণ সংক্রামক মহামারীতে গৌড় নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত

হয়। তদবধি সেই মহাসমৃদ্ধিশালী নগর একেবারে জনশূন্য হইয়াছিল। ঘরে ঘরে মৃতদেহ পরিপূর্ণ ছিল, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবার লোক পর্য্যন্ত ছিল না; যে দুই একজন জীবিত ছিল, তাহারা পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিল। * তৎকালে বঙ্গদেশ এবং সমুদ্রোপকূলস্থিত অনেক জনপদ জনমানবশূন্য হইয়াছিল। বাখরগঞ্জের দক্ষিণে এবং পূর্ব্বে যে বিস্তীর্ণ সুন্দরবন আছে, কেহ কেহ অনুমান করেন যে ঐ সমস্ত স্থান পূর্ব্বে লোকালয় ছিল। ঐ প্রকার সংক্রামক রোগে জনশূন্য হইয়া কালে জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। নিবিড় সুন্দরবনের ভিতর অনেক স্থানে অট্টালিকা, দীঘি, প্রশস্ত রাস্তা, সেতু প্রভৃতির চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান।

"ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের" পর সমগ্র বঙ্গভূমে ভয়ানক সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইয়া প্রায় অর্দ্ধেক অধিবাসী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। বঙ্গ-সাহিত্য-সম্রাট্ মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "আনন্দ মঠে" এই ভীষণ মহামারী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"রোগ সময় পাইল, জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত বিশেষতঃ বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে? কেহ কাহারও চিকিৎসা করেনা; কেহ কাহাকে দেখে না; মরিলে কেহ ফেলে না। অতি রমণীয় বপু অট্টালিকা-মধ্যে আপনা আপনি পঁচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে গৃহ-বাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পলায়।"

ইংরাজ রাজ্য পত্তন হইলে পর ১৮০১ খৃষ্টাব্দে জ্বরের ভীষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল; কিন্তু তাহা অধিকদিন স্থায়ী ছিল না; ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ সাহাবাজপুরে এক প্রকার সংক্রামক জ্বর উপস্থিত হইয়া বহু লোকের প্রাণ বিনাশ করিয়াছিল। †

গত ১২৮৩ সালে এই জিলায় অনেক স্থানে কলেরার এমন প্রকোপ হইয়াছিল যে তাহাতে অনেক গৃহ একেবারে জনশূন্য হইয়াছিল।

গত ১৩০৬।১৩০৭ সালে গৌরনদী ও ঝালকাঠী থানার অধীনে এরূপ

* Stewart's History of Bengal. (Published 1813.)

† H. Beveredge's History of Bakarganj, Page 12

কলেরার প্রাচুর্ভাব হইয়াছিল যে কর্ত্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়া চিকিৎসক ও ঔষধাদি পাঠাইয়া রোগ প্রপীড়িতগণের চিকিৎসা করাইয়াছিলেন।

অন্যান্য ব্যাধি অপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ে উল্লিখিত ভয়ঙ্কর রোগই প্রবল : এই রোগ গ্রামের মধ্যে পূর্ব্বে শীতকালে এবং জিলা মহকুমায় গ্রীষ্মারম্ভে আরম্ভ হইত; এখন প্রায় বারমাসই ইহাতে মানুষ মরিতেছে। এই সর্ব্বনাশকর ব্যাধিতে যে কত শতসহস্র লোক অকালে কালকবলে গমন করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। গবর্ণমেণ্ট এই রোগোৎপত্তির কারণ এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে কমিশন বসাইয়া বহু অর্থব্যয় করিয়াছেন, এবং করিতেছেন, কিন্তু এ যাবৎ কোন কারণ এবং বিশেষ ঔষধ নির্ণীত হয় নাই।

অস্মদ্দেশে গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শীত এই তিন ঋতুরই বিশেষ উপলব্ধি হইয়া থাকে। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, গ্রীষ্ম এবং আষাঢ়ের প্রায় অর্দ্ধেক গত হইলে পর, বর্ষা আরম্ভ হইয়া প্রায় আশ্বিন মাসের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত থাকে, তৎপর অতি অল্পকাল শরৎ ঋতু উপলব্ধি হয় ; হেমন্ত ঋতু হইতেই শীত আরম্ভ হয় এবং এই শীতকাল প্রায় ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকে। ঋতুরাজ কেবল মাত্র দেখা দিয়া অতি অল্প সময় মধ্যেই অসহ্য নিদাঘতাপে অন্তর্হিত হইয়া থাকেন। আমরা কেবল

"সদ্যঃ প্রবালোদ্গমচারুপত্রে নীতে সমাপ্তিং নবচূতবাণে।
নিবেশয়ামাস মধুর্দ্বিরেফান্ নামাক্ষরাণীব মনোভবস্য ॥"

অনুভব করিয়া থাকি ; আবার কেহ কেহ বা

"চূতাঙ্কুরাস্বাদকষায়কণ্ঠঃ পুংস্কোকিলো যন্মধুরং চুকূজ।
মনস্বিনীমানবিঘাতদক্ষং তদেব জাতং বচনং স্মরস্য ॥"

অনুভব করেন কিনা, তাহা তাঁহারাই জানেন।

প্রাচীনদিগের মুখে শুনিতেছি যে অস্মদ্দেশে কালবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি ঋতুর যেরূপ প্রাচুর্ভাব ছিল, এখন আর ততটা নাই। তাঁহারা বলেন যে বর্ষা এবং শীত উভয়ই ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে ও গ্রীষ্মের উত্তাপ দিন দিনই বৃদ্ধি হইতেছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রাচীন তত্ত্ব সংগ্রহ।

প্রাচীন আর্য্যজাতির ধারাবাহিক কোন জাতীয় ইতিহাস নাই, তাই আজ এই ভারতের যে সমস্ত আর্য্যকীর্ত্তি পুরাণাদিতে দেখিতে পাই, তৎসমুদয়ের প্রায়ই অসম্বদ্ধ। তন্মধ্যেও আবার অনেকগুলি বর্ত্তমান পণ্ডিতসমাজে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যক্ত। তাই বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা সম্বন্ধে তাদৃশ যত্নবান নহেন। প্রকৃতপক্ষে বিশেষ গবেষণা করিলে, আমাদের পুরাণে লুপ্ত ইতিহাসের অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে।

যতগুলি পুরাণেতিহাস আছে, তন্মধ্যে রামায়ণ এবং মহাভারতই সর্ব্বপ্রধান, কিন্তু মহাভারতে আমরা রামায়ণ অপেক্ষা তৎকালীন ভারতের অনেক নূতন তত্ত্ব ও ইতিহাস বিশদরূপে দেখিতে পাই। আমাদের বক্ষ্যমাণ প্রাচীন তত্ত্ব সম্বন্ধে ইহাতে কিছু পাওয়া যায় কি না তাহা আলোচনা করা যা'ক।

সপ্তর্ষিমণ্ডলে যখন মঘা নক্ষত্র ছিল, তখন কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। * সেই হিসাবে বর্ত্তমান বর্ষ ধরিলে ৩৩৩৩ বৎসর হইয়াছে। এই সর্ব্বনাশকর মহারণে ভারতবর্ষের যাবতীয় নৃপতি এবং রণপণ্ডিত পুরুষ কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অস্ত্র ধারণ না করিলেও অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন; ভগবান বলরাম এই যুদ্ধ সময় তীর্থ-পর্য্যটনে ছিলেন, সুতরাং তিনি কোন পক্ষই অবলম্বন করিতে পারেন নাই। গদাপর্ব্বে এই তীর্থযাত্রার কারণ, এবং যে সমস্ত তীর্থ বলরাম ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার বিশদ বর্ণনা আছে;—ভগবান বলরাম যাবতীয় তীর্থ ভ্রমণান্তে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নান করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

* স্বর্গীয় রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর কৃত "কৃষ্ণ চরিত" অবলম্বনে কাল নিরূপিত হইল।

এখন দেখা যা'ক এই গঙ্গাসাগরসঙ্গম কোথায়। আমরা মানচিত্রে দেখিতে পাই যে গঙ্গা নিম্নবঙ্গে প্রবাহিতা হইয়া শতমুখী নাম ধারণ করতঃ সাগরে প্রবেশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে যেস্থানে শতমুখী, তাহার নিম্নভূমির অধিকাংশই সুন্দরবনে পরিণত। বাখরগঞ্জের দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমায় নদী এবং শাখানদীর অভাব নাই; এই সমস্ত নদী গঙ্গা স্রোত-নিস্সৃতা, এই নিমিত্ত আমাদের এদেশে যতগুলি নদী আছে, সকলগুলিই "গাঙ্গ" বলিয়া প্রসিদ্ধ; "গাঙ্গ" গঙ্গা শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। দক্ষিণ সাহাবাজপুর, হাতিয়া, সন্দ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপসমূহ গঙ্গা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।

গঙ্গাসাগরসঙ্গম যে ভারতবর্ষের একটী প্রধান তীর্থ, তাহার আর সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ ভগবান হলায়ুধ প্রাচীন বাকলার পূর্ব্ব-দক্ষিণ সীমায় গঙ্গাসাগরসঙ্গমস্থলে স্নান করিয়াছিলেন। *

এই সম্বন্ধে আরও একটী প্রমাণ আছে। রামায়ণে দেখিতে পাই যে ভগবতী গঙ্গাদেবী সাগরসঙ্গম করিয়া পাতাল প্রবেশ করিয়াছিলেন; আমাদের এই জিলার দক্ষিণ সীমায় যে বঙ্গোপসাগর বর্ত্তমান আছে, তাহার একস্থান অতলস্পর্শ। † ইহাদ্বারা দেখা যাইতেছে যে গঙ্গা এইস্থানেই পাতালপ্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রাকৃতিক কারণে স্থানের নাম, এবং অবস্থার অনেক বিপর্য্যয় হইয়াছে সন্দেহ নাই, তথাপি পুরাণ বর্ণিত স্থান, এবং নদী কতকটা ঠিক আছে বলিয়া বোধ হইতেছে।

গঙ্গার পাতালপ্রবেশ স্থানই পুরাকালে সাগরসঙ্গম তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত ছিল, পরিশেষে নৈসর্গিক কারণে স্থান বিপর্য্যয় হওয়া অসম্ভব নহে।

মহাভারতের স্থানে স্থানে আমরা "বঙ্গরাজ" এবং "বঙ্গদেশের" উল্লেখ দেখিতে পাই; তন্মধ্যে সভাপর্ব্বের দিগ্বিজয় পর্ব্বাধ্যায়ে অন্যান্য পর্ব্বাপেক্ষা বঙ্গদেশের একটু বিশেষ বর্ণনা আছে; রাজসূয় যজ্ঞকালে পাণ্ডবগণ যে যে স্থান জয় করিয়াছিলেন, তাহাদেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। মধ্যম পাণ্ডব মহাবীর ভীমসেন, মগধ জয়ান্তে বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন এবং তথাকার রাজন্যবর্গ ও সমুদ্রতীরবর্ত্তী ম্লেচ্ছগণকে পরাজিত করিয়া কর গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমরা সভাপর্ব্বের সেই কবিতা কয়েকটী উদ্ধৃত করিলাম।

---

* বর্ত্তমানে গঙ্গাসাগরসঙ্গম তীর্থ চব্বিশ পরগণা জিলার অন্তর্ভূত হইয়াছে।

† ইংরাজীতে ইহাকে Swatch of no Ground বলে।

"উভৌ বলবৃতৌ বীরাবুভৌ তীব্রপরাক্রমৌ।
নির্জ্জিত্যাজৌ মহারাজ! বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ ॥
সমুদ্রসেনং নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা ॥
সুহ্মানামধিপঞ্চৈব যে চ সাগরবাসিনঃ।
সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভ ॥
এবং বহুবিধান্ দেশান্ বিজিত্য পবনাত্মজঃ।
বসু তেভ্য উপাদায় লৌহিত্যমগমদ্বলী ॥
স সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছনৃপতীন্ সাগরানুপবাসিনঃ।
করমাহরয়ামাস রত্নানি বিবিধানি চ ॥" *

[অনুবাদ :—এই দুই পরাক্রান্ত রাজাদের (পৌণ্ড্রাধিপতি ও কৌশিকী কচ্ছনিবাসী রাজা) সংগ্রামে বিজিত করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং মহারাজ সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্তরাজ কর্ব্বটাধিপতি, সুহ্মাধিপতি, প্রভৃতিকে জয় করিয়া সমুদয় ম্লেচ্ছদিগকে পরাভূত করিলেন। মহাবল পবননন্দন এইরূপে বহুদেশ বিজয় ও সর্ব্বত্র ধন সংগ্রহ পূর্ব্বক সাগরতীরবাসী সমস্ত ম্লেচ্ছগণকে পরাজয় করিয়া নানাবিধ ধনরত্ন এবং কর সংগ্রহ পূর্ব্বক লৌহিত্যদেশে (ব্রহ্মপুত্র তীরে) উপস্থিত হইলেন]।

ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে সমুদ্রের তীরবর্ত্তী স্থানে ম্লেচ্ছগণের বসতি ছিল। বাকলার দক্ষিণ সীমায় যে সমুদ্র আছে বর্ত্তমান সময়ে তাহার অনেকস্থান জনমানবশূন্য ও অরণ্যানীতে পরিণত হইলেও পুরাকালে যে সেই সমস্ত স্থানে লোকের বসতি ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

এখন দেখা যা'ক এইস্থানে ম্লেচ্ছগণের বসতি ছিল কি না। সংস্কৃত অভিধানে আমরা দেখিতে পাই যে ম্লেচ্ছশব্দের অর্থ যবন, কিরাত, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি জাতি; যাহারা অপভাষী, কদাচার এবং সর্ব্বধর্ম্ম রহিত, ক্রিয়াকাণ্ডবিহীন, তাহাদেরও ম্লেচ্ছ বুঝায়। ম্লেচ্ছদেশ সম্বন্ধে ইহাতে লিখিত আছে :—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থানাং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে।
ম্লেচ্ছদেশঃ স বিজ্ঞেয় আর্য্যাবর্ত্তস্ততঃ পরম্ ॥

* কালীবর বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক অনূদিত এবং প্রকাশিত মূল সংস্কৃত মহাভারত, ১৭৯৯ শকাব্দা।

(যেদেশে চাতুর্ব্বর্ণ্যের ব্যবস্থা নাই, অধিবাসিগণ শিষ্টাচার রহিত, এবং অসংস্কৃতভাষী, অর্থাৎ অপভাষা ব্যবহার করে তাহাই ম্লেচ্ছদেশ)।

এসিয়াটীক সোসাইটীর ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলেন যে, বাকলার দক্ষিণ সীমাবর্ত্তী যে সুন্দরবন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তথায় পূর্ব্বকালে নীচজাতীয় লোকের বসতি ছিল, উহাদিগকে "চণ্ড-ভণ্ড" বলিত। প্রতাপ বাবু চণ্ড-ভণ্ডদের মলঙ্গী (অর্থাৎ যাহারা লবণের জ্বাল দেয়) বলিয়াছেন। আমাদের দেশেও অনেক হিন্দু ও মুসলমানের মলঙ্গী পদবী দেখা যায়। পুরাকালে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ লবণের জ্বাল দিত বলিয়া তাহাদের এই আখ্যা হইয়াছে। এই মলঙ্গী উপাধিধারী হিন্দুদিগের মধ্যে সকলেই চণ্ডাল অর্থাৎ নমঃশূদ্র জাতীয়। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখন মুসলমান বলিয়া কোন জাতি এদেশে ছিল না। আমরা এই চণ্ড-ভণ্ড জাতির উল্লেখ আরও পাইয়াছি, * বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেনের অন্যতম পুত্র মহারাজ কেশবসেন প্রদত্ত তাম্রলিপিতে এই চণ্ড-ভণ্ডের যথোপযুক্ত শাসনের উল্লেখ আছে, আমরা এই তাম্রলিপির কথা পরে বলিতেছি।

চণ্ড-ভণ্ড জাতি যে অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত ছিল, তাহার কতক আভাস এই তাম্রলিপিতে পাওয়া যায়, সম্ভবতঃ ইহারা যথেচ্ছাচার এবং দেবতা ব্রাহ্মণবিদ্বেষী ছিল; তাই রাজা ইহাদের চরিত্র জ্ঞাত হইয়াই ইহাদের শাসনের ব্যবস্থা ব্রহ্মোত্তর-গৃহীতাকেই প্রদান করিয়াছেন।

এখন মহাভারত বর্ণিত "ম্লেচ্ছ," তাম্রশাসন লিখিত"চণ্ড-ভণ্ড"এবং মলঙ্গী উপাধিধারী "চণ্ডাল" একজাতীয় কিনা তাহা আলোচনা করা যা'ক। অভিধানকার ম্লেচ্ছ শব্দের অর্থে কিরাত এবং শবর প্রভৃতি উল্লেখ করিয়াছেন।

* "There lived in this part of Bengal, a semi-barbarous tribe named Chunda-Bhunda, very similar to the Malongis or salt manufacturers of the present day. Their condition was little better than slaves. In a copper plate inscription, found in lat. no 55 of Mr. Hodge's map, near Bakarganj, Madhab, evidently a brother to Keshub Sen, of the Sen Rajas of Bengal, made a grant of some villages to a Brahman; with the villages, the King conferred on the recipient the right of punishing and employing the Chunda-Bhunda, a tribe that inhabited the place. This tribe, I believe, gave the name of the uncultivated portion of the delta which they occupied."—Asiatic Society's Journal, Paper on Sunderban by Pratap Chandra Ghosh.

মহাকবি বাণভট্ট প্রণীত কাদম্বরী গ্রন্থে চণ্ডাল অর্থে শবর ব্যবহৃত দেখিয়াছি, ইহাদ্বারা অবশ্যই প্রতীয়মান হইতেছে যে শবরব্যবসা চণ্ডালগণের জাতীয় উপজীবিকা। মাংসাহার এবং মদ্যপান হেতু তাহাদের মস্তিষ্ক সর্ব্বদাই উত্তেজিত, সুতরাং সামান্য কারণে বিচলিত হইলেই তাহাদের ক্রোধের অবধি থাকিত না, এই জন্যই সম্ভবতঃ তাহাদের নাম চণ্ডাল (চণ্ড্ + অল্) অর্থাৎ ক্রোধী হইয়া থাকিবে। ইহাদের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি প্রভৃতি চতুর্ব্বর্ণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি চতুর্ব্বর্ণের যাহা অকরণীয়, চণ্ডালগণের তাহাই কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য ছিল। এই সমস্ত জাতি যে ভদ্রসমাজ হইতে অন্যস্থানে বাস করিত, তাহা মহাভারত এবং তাম্রশাসনেই সম্পূর্ণ প্রতীয়মান হইতেছে। সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানে তাহারা বাস করিত এবং আবশ্যকমত তত্তীরব্যাপী সৈকতে এবং নিকটবর্ত্তী অরণ্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ব্যাধবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত; আবার কখন কখনও ইহারা দলবদ্ধ হইয়া দস্যুতাও করিত। বর্ত্তমান সময়ে চণ্ডালগণের মধ্যে কেহ কেহ সুসভ্য হইয়া থাকিলেও একটু বিশেষ লক্ষ্য করিলে তাহাদের চরিত্র এবং আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেকটা পূর্ব্বাভাষ পাওয়া যায়; বর্ত্তমান সময়েও অনেকেই উদ্ধত, ক্রিয়াকাণ্ড বর্জ্জিত, দুশ্চরিত্র এবং ধর্ম্মাচরণ বিরহিত।

উল্লিখিত কারণে বোধ হয় ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে পুরাণবর্ণিত ম্লেচ্ছ, তাম্রশাসন লিখিত চণ্ড-ভণ্ড এবং বর্ত্তমান চণ্ডাল একই জাতি, তবে ব্যবসাভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হইবার সম্ভব। বর্ত্তমান বাখরগঞ্জের দক্ষিণ সীমাব্যাপী বঙ্গোপসাগরের তীরে সুন্দরবনে পুরাকালে এই ম্লেচ্ছগণের বসতি ছিল।

প্রথিতনামা চীন পরিব্রাজক হুয়েনসাঙ্গএর ভারতভ্রমণে, আমরা বাকলা কথা দেখিতে পাই, * তখন বাকলা একটী সমৃদ্ধিশালী দেশ ছিল। উক্ত মহাত্মা প্রায় দশ বৎসরকাল ভারতবর্ষে ছিলেন, ইতিহাসে ৬৩৬-৬৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার ভারতাবস্থানের উল্লেখ আছে। তিনি বাকলা আসেন নাই, কেননা তৎকালে বাকলার পশ্চিমভাগে উত্তালতরঙ্গময়ী সুগন্ধা নদী প্রবাহিতা ছিল। পরিব্রাজক মহাশয় উপযুক্ত নৌযানে জলপথে কামরূপ

---

* Early travellers in India.

গিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে, কিন্তু সুগন্ধা, ঘাঘর, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি অতিবাহিত করিয়া কামরূপে গিয়াছিলেন, না অন্য পথে গিয়াছিলেন, তাহা কিছুই জানা যায় নাই। তৎকালে আমাদের এই দেশের নদীসমূহে বিলক্ষণ দস্যুভীতি ছিল। দেশী ও বিদেশী দস্যুগণ তখন বিনা-বাধায় লুণ্ঠনাদি করিত; কেহ কেহ বলেন যে হুয়েন্‌সাঙ্গের বাকলা না আসিবার ইহাই কারণ, কেননা তিনি একবার দস্যুহস্তে বিলক্ষণ বিড়ম্বনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বাকলার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আরও একটী উৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রণীত "ইণ্ডোএরিয়ান" নামক ইংরাজী গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে বিগত ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ইদিলপুর পরগণায় রাজা লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেনপ্রদত্ত একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ইদিলপুর বর্ত্তমান বাখরগঞ্জের মধ্যে একটী বিখ্যাত পরগণা, এবং এস্থানে অনেক ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থের বাসভূমি বর্ত্তমান।

উক্ত তাম্রলিপি এখনও বঙ্গীয় এসিয়াটীক সোসাইটীর পুস্তকাগারে বর্ত্তমান আছে। এই তাম্রশাসন দেবনাগর অক্ষরে উৎকৃষ্ট সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই তাম্রলিপির উপরিভাগে প্রস্ফুটিত পদ্মোপরি দশহস্ত বিশিষ্ট এক দেবমূর্ত্তি আছে, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল ইহা মহাদেবের মূর্ত্তি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। * এই মূর্ত্তির নীচে ভগবান চন্দ্রদেবের স্তুতিবাচক একটী শ্লোক আছে, কেননা তিনি (রাজা কেশবসেন) এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ চন্দ্রবংশ সম্ভূত †

---

* See Indo Aiyans Vol II. Page 236. 1881.

† ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল প্রমুখ অনেক প্রত্নতত্ত্ববিৎ বলেন যে মহারাজ আদিশূর এবং সেন রাজগণ সকলেই ক্ষত্রিয়, এবং চন্দ্রবংশসম্ভূত। অনেকের কিন্তু বিশ্বাস যে তাঁহারা বৈদ্য এবং প্রাচীন কুলগ্রন্থ-বর্ণিত বিবরণ এবং "সেন" পদবীই ইহার প্রমাণ। উল্লিখিত পণ্ডিতগণ বলেন যে "সেন" শব্দ শূরত্ব-ব্যঞ্জক। ইহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। বল্লালাদির "সেন" সংজ্ঞা যে আদিশূরের "শূর" শব্দ অথবা বসুসেন (কর্ণ) ও ভীমসেনের "সেন" শব্দের ন্যায় শূরত্বব্যঞ্জক নামৈকদেশ মাত্র নহে পরন্তু বংশোপাধি, তাহা তাম্রশাসন এবং দানসাগর গ্রন্থে সপ্রমাণ। ইদিলপুর প্রাপ্ত শাসনে কেশবসেন "সেনকুল কমল বিকাশ ভাস্কর সেনবংশপ্রদীপ" বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বিজয়সেন নিজবংশকে "সেনান্বয়" বলিয়াছেন। বল্লাল দানসাগর গ্রন্থে নিজ বংশকে "অবনেন্দুর্মণং সেনবংশ" বলিয়া বিঘোষিত করিয়াছেন। অতএব বল্লালাদি নৃপতিবৃন্দের সেনই প্রকৃত বংশপদবী সে বিষয় সন্দেহ নাই। আমরা স্থানান্তরে এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রথম বিজয়সেন নামক রাজার কথা লিখিত আছে। তিনি তৎকালীন সমস্ত রাজা আপেক্ষা বলবীর্য্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তৎপুত্র বল্লালসেন, ইঁহার শুভ্র যশে দিঙ্মণ্ডল বিভাসিত হইত। তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন, ইনি যেমন ধার্ম্মিক, তেমন বীর ছিলেন; বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইনি অনেক স্থানে বিজয়স্তম্ভ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। জগন্নাথতীর্থে গদাপাণী, এবং মূসলধর বিগ্রহের সম্মুখে, গঙ্গা ও অসি নদীর সঙ্গমস্থলে সেই পরম পবিত্র শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরধামে (কাশী), এবং ত্রিবেণীর তীরে (গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সম্মিলন স্থানে) অনেকগুলি দেবভবন এবং চৈত্য ইঁহাদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই ত্রিবেণীতে পদ্মযোনি (ব্রহ্মা) সর্ব্বপ্রথমে তপস্যা করিয়াছিলেন। এই নরপতি (লক্ষ্মণসেন) স্বীয় ধর্ম্মপত্নী মহারাজ্ঞী বসুদেবীর গর্ভে কেশবসেন নামক এক পুত্র লাভ করেন। মহারাজ কেশবসেন গজপতি, অশ্বপতি, এবং নরপতিগণের উপর স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করিয়া রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে জ্যৈষ্ঠ মাসে বনমালী শর্ম্মার পুত্র ঈশ্বর দেবশর্ম্মাকে বাগুতি * (Baguti) এবং বেতগাতা (Bettagata) নামক গ্রামদ্বয় ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছিলেন; এবং চণ্ড-ভণ্ডদিগকে শাসন করিয়া এই ব্রহ্মোত্তর ভোগ করিবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন। এখন প্রকৃত তাম্রশাসন-লিপির সঙ্গে ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের মত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দ্বৈধ দেখা যায়। তিনি যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে বাগুতি ও বেতগাতা গ্রাম, মূল তাম্রশাসনে লতা এবং টগরাঘাট বলিয়া উল্লেখ আছে; আমরা তাম্রশাসনের প্রতিলিপি উদ্ধৃত করিলাম।

ওঁ নমো নারায়ণায়।

বন্দেঽরবিন্দবনবান্ধবমন্ধকারকারানিবদ্ধভুবনত্রয়মুদ্ধরন্তম্।
পর্য্যায়বিস্তৃতসিতাসিতপক্ষযুগ্মমুত্তম্ভমদ্ভুতখগং নিগমদ্রুমস্য ॥ ১ ॥

১। অন্ধকার রূপ কারাগৃহ হইতে জগৎ উদ্ধারকারী, পর্য্যায়ক্রমে সিতাসিত পক্ষদ্বয় (শুক্ল ও কৃষ্ণ) বিস্তারকর্ত্তা, নিগম বৃক্ষের একমাত্র পক্ষীস্বরূপ পঙ্কজবন-বান্ধবকে বন্দনা করি।

---

* বাক্কাদি নামে এক গ্রাম ইদিলপুরে আছে; সম্ভবতঃ ইহাই বাগুতি।

পর্য্যন্তস্ফটিকাচলাং বসুমতীং বিশ্বগ্‌বিমুদ্রীভবন্,
মুক্তাকুট্মলমন্ধিমম্বরনদীবন্যাবনদ্ধং নভঃ।
উদ্ভিন্নস্মিত মঞ্জরী পরিচিতা দিক্‌কামিনীঃ কল্পয়ন্,
প্রত্যুন্মীলতু পুষ্পশায়কযশো জন্মান্তরশ্চন্দ্রমাঃ ॥ ২ ॥
এতস্মাৎ ক্ষিতিভারনিঃসহশিরোদর্বীকরগ্রামণী,
বিশ্রামোৎসবদানদীক্ষিতভুজা স্তে ভূভুজো জজ্ঞিরে।
যেষামপ্রতিমল্ল বিক্রম কথারব্ধ প্রবন্ধাদ্ভুত-
ব্যাখ্যানন্দবিনিন্দ্যসান্দ্রপুলকৈর্ব্যাপ্তাঃ সদস্যৈর্দিশঃ ॥ ৩ ॥
অবাতরদথান্বয়ে মহতি তত্র দেবঃ স্বয়ং,
সুধাকিরণশেখরো বিজয়সেন ইত্যাখ্যয়া।
যদঙ্ঘ্রিনখধোরণিস্ফুরিতমৌলয়ঃ ক্ষ্মাভুজো,
দশাস্যনতিবিভ্রমং বিদধিরে কিলৈকৈকশঃ ॥ ৪ ॥
নীলাম্ভোরুহসোদরোঽপি দলয়ন্ মর্ম্মাণি কাদম্বিনী
কান্তোপি জ্বলয়ন্ মনাংসি মধুপস্নিগ্ধোপি তন্বন্ ভয়ং।
নির্ণিক্তাঞ্জনসন্নিভোপি জনয়ন্ নেত্রক্লমং বৈরিণাং,
যস্যাশেষজনাদ্ভুতায় সমরে কৌশেরকঃ খেলতি ॥ ৫ ॥

২। স্ফটিক পর্ব্বতে যেন বসুমতীকে পরিব্যাপ্ত করিয়াছে, স্ফুটিত মুক্তা সমূহের ন্যায় সমুদ্রকে বিভূষিত করিয়া চিরপরিচিতের ন্যায় দিক কামিনীদিগকে মৃদু হাস্যযুক্ত করতঃ, নভোদেশকে স্বর্গীয় নদ জলে প্লাবিত পূর্ব্বক কামদেব-যশঃ ঘোষী ভগবান চন্দ্রদেব উদিত হউন।

৩। যে সমস্ত ভূপতি এই চন্দ্রমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা স্বকীয় ভুজবলে, ধরণীভার প্রপীড়িত বাসুকি শিরকে বিশ্রামসুখ দান করিতেন। তাহারা অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী, তাঁহাদের সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা নাই; তাঁহাদের এই প্রশংসা সূচক অদ্ভুত আনন্দে আনন্দিত পরিষদ এবং বন্ধুবর্গদ্বারা চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

৪। সুধা কিরণশেখর স্বয়ং মহাদেবের সদৃশ বিজয়সেন নামক এক নরপতি এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিজিত নৃপতিগণ যখন নতমস্তকে তাঁহার চরণে প্রণত হইতেন, তখন সেই সমস্ত ভূপতিগণের মুকুটমণির জ্যোতি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইত; তাহাতে বোধ হইত যেন দশাস্য রাবণ তাঁহাকে প্রণাম করিতেছে।

৫। এই বিজয়সেন, রণক্ষেত্রে যখন অসি চালনা করিতেন, তাহা দৃষ্টি করিয়া

ভাস্বন্নিস্ত্রিংশনিদ্রাবিরহবিলসিতৈ বৈরিভূপালবংশ্যান্,
উচ্ছিদ্যোচ্ছিদ্য মূলাবধি ভুবমখিলাং শাসতো যস্য রাজ্ঞঃ।
আসীৎ তেজো জিগীষা সহ দিবসকরেণৈব দোষ্ণস্তুলাভূৎ,
ভদ্রৈরাশীবিষালামজনি দিগধিপৈরেব সীম্নোর্বিবাদঃ ॥ ৬ ॥
খেলৎখড়্গলতাপমার্জনহৃতপ্রত্যর্থিদর্পজ্বরঃ,
তস্মাদপ্রতিমল্লকীর্ত্তিরভবৎ বল্লালসেনো নৃপঃ।
যস্যায়োধনসীম্নি শোণিতসরিদ্দুঃ সঞ্চরায়াং হৃতাঃ,
সংসক্তদ্বিপদন্তদণ্ডশিবিকামারোপ্য বৈরিশ্রিয়ঃ ॥ ৭ ॥
শ্রীকান্তোপি ন মায়য়া বলিজয়ী বাগীশ্বরোপ্যক্ষরং,
বক্তুং নেত্যপটুঃ কলানিধিরপি প্রোন্মুক্তদোষগ্রহঃ।
ভোগীন্দ্রোপি ন জিহ্মগৈঃ পরিবৃতস্ত্রৈলোক্য বেশাদ্ভুত
স্তস্মাৎ লক্ষ্মণসেনভূপতিরভূৎ ভূলোককল্পদ্রুমঃ ॥ ৮ ॥

জনগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইত তাঁহার খড়্গ নীল পদ্মের ন্যায় হইলেও শত্রুকুলের ধ্বংস সাধন করিত; নব জলধর তুল্য মনোজ্ঞ হইলেও তাহাদের মর্ম্ম দলন করিত; ভ্রমর সদৃশ চিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ হইলেও তাহাদের ভীতি উৎপাদন করিত, এবং অঞ্জনসন্নিভ হইলেও বৈরীদিগের ক্লেশ উৎপাদন করিত।

৬। আলস্য বিহীন, দীপ্তিময় খড়্গ দ্বারা বিজয় সেন, প্রতিদ্বন্দ্বী নরপতিগণকে সবংশে উচ্ছেদ করিয়া একচ্ছত্র রাজা হইয়াছিলেন। তেজঃ সম্বন্ধে একমাত্র মার্ত্তণ্ড দেবই তাঁহার সমকক্ষ, এবং তাঁহার বিশাল বাহুযুগল, অজগরের সঙ্গে উপমা করা হইত। তাঁহার এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের সীমা লইয়া কেবল দিগ্‌পতিগণের সঙ্গেই বিবাদ চলিত, অন্যের সহিত নহে।

৭। এই বিজয় সেনের অতুলনীয় কীর্ত্তিমান বল্লাল সেন নামক একপুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অযত্ন সম্ভূত লতা তুল্য বর্দ্ধিত খড়্গ শত্রুগণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া শোণিত প্লাবিত যুদ্ধ স্থল হইতে বিজয় লক্ষ্মীকে হস্তী দণ্ডোপরি শিবিকায় স্থাপিত করিয়া বহন করিয়াছিলেন।

৮। এই বল্লাল সেন, কল্পবৃক্ষ সদৃশ লক্ষ্মণ সেন নামক একপুত্র লাভ করেন। তাঁহার ধন অনন্ত, কিন্তু তা বলিয়া কোন প্রকার ছল অথবা প্রবঞ্চনা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করেন নাই, বল দ্বারাই ধন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বাক্‌শাস্ত্রে সম্পূর্ণ পারদর্শী হইয়াও "না" শব্দ জানিতেন না। চন্দ্রের ন্যায় অশেষ গুণসম্পন্ন

প্রত্যূষে নিগড়স্বরৈর্নিয়মিতপ্রত্যর্থিপৃথ্বীভুজাং
মধ্যাহ্নে জলপানমুক্তকরভ প্রোদ্গাল ঘণ্টারবৈঃ।
সায়ং বেশবিলাসিনীজনরণন্মঞ্জীর মঞ্জুস্বনৈ
র্যেনাকারি বিভিন্নশব্দঘটনাবন্ধ্যং ত্রিসন্ধ্যং নভঃ ॥ ৯ ॥
নূনং জন্মশতেষু ভূমিপতিনা সন্ত্যজ্য মুক্তিগ্রহং
নূনং তেন সুতার্থিনা সুরধুনীতীরে ভবপ্রীণিতঃ।
এতস্মাৎ কথমন্যথা রিপুবধূবৈধব্যকৃত্য ব্রতো
বিখ্যাতঃ ক্ষিতিপালমৌলিরভবৎ শ্রীবিশ্ববন্দ্যো নৃপঃ ॥ ১০ ॥
ন গগনতল এব শীতরশ্মির্ন কনকভূধর এব কল্পশাখী।
ন বিবুধপুর এব দেবরাজো বিলসতি যত্র ধরাবতারভাজী ॥ ১১ ॥
বাহূবারণহস্তকাণ্ডসদৃশৌ বক্ষঃ শিলাসংহতং,
বাণাঃ প্রাণহরা দ্বিষাং মদজলপ্রস্যন্দিনো দন্তিনঃ।
যস্যৈতাং সমরাঙ্গনপ্রণয়িনীং কৃত্বা স্থিতিং বেধসা,
কো জানাতি কুতঃ কৃতো ন বসুধা চক্রেঽনুরূপো রিপুঃ ॥ ১২ ॥

হইয়াও কলঙ্ক শূন্য ছিলেন। নাগরাজ তুল্য হইয়াও সর্পগণ দ্বারা বেষ্টিত ছিলেন না। (অর্থাৎ সর্প সদৃশ ক্রূর পরিষদগণ দ্বারা চালিত হইতেন না)।

৯। এই বল্লাল সেন প্রত্যূষে বন্দী নরপতিগণের বন্ধনযুক্ত শৃঙ্খল শব্দ, মধ্যাহ্নে জল পান জন্য আগত করভ (হস্তিশাবক) এবং উষ্ট্রসমূহের গল ঘণ্টা শব্দ, সায়ংকালে সজ্জিতা কামিনীগণের নূপুরের মধুর শব্দ ত্রিসন্ধ্যায় আকাশপথে প্রেরণ করিতেন।

১০। বল্লাল সেন সুপুত্র লাভেচ্ছায়, গঙ্গাতীরে মুক্তি বাঞ্ছা পরিত্যাগ করিয়া দেবাদিদেবকে তুষ্ট করিয়াছিলেন; তাহা না হইলে শত্রু কামিনীদের বৈধব্যকারী নৃপতিশেখর লক্ষ্মণ সেন জন্মগ্রহণ করিতেন না।

১১। এই লক্ষ্মণ সেন ধরাধামে বর্ত্তমান থাকাতে সুধাকর কেবল গগনে বাস করিতেন না, কল্পতরু সুমেরু শিখরে বাস করিতেন না এবং দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গে সর্ব্বদা বাস করিতেন না। (অর্থাৎ লক্ষ্মণ সেনের শরীরে এই তিন গুণ বর্ত্তমান ছিল।)

১২। লক্ষ্মণসেনের বাহুযুগল করিশুণ্ডবৎ ছিল; বিশাল বক্ষস্থল প্রস্তরবৎ কঠিন, তাঁহার হস্তিসমূহের সৃক্কণি হইতে প্রচুর পরিমাণে মদস্রাব হইত; এবং তাঁহার নিক্ষিপ্ত বাণ রিপুগণের প্রাণ বিনাশ করিত। বিধাতা তাঁহার অনুরূপ যোদ্ধা আর ধরাধামে সৃজন করিয়াছেন কিনা তাহা কেহ অবগত নহেন।

বেলায়াং দক্ষিণাব্ধের্মুষলধর গদাপাণিসংবাসবেত্যাং
ক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বরস্য স্ফুরদসিবরুণাশ্লেষগঙ্গোর্ম্মিভাজি।
তীরোৎসঙ্গে ত্রিবেণ্যাঃ কমলভবমখারম্ভনির্ব্ব্যাজপূতে,
যেনোচ্চৈর্যজ্ঞযূপৈঃ সহ সমর জয়স্তম্ভমালান্যধায়ি॥ ১৩॥
যাং নির্ম্মায় পবিত্রপাণিরভবৎ বেধাঃ সতীনাং শিখা-
রত্নং যা কিমপি স্বরূপচরিতৈর্বিশ্বং যয়ালঙ্কৃতং।
লক্ষ্মীভূর্ব্বরপি বাঞ্ছিতানি বিদধে যস্যাঃ সপত্নৌ মহা
রাজ্ঞী শ্রীবসুদেবিকাস্য মহিষী সাভূৎ ত্রিবর্গোচিতা॥ ১৪॥
এতাভ্যাং শশিশেখরগিরিজাভ্যামিব বভূব শক্তিধরঃ।
শ্রীকেশবসেনদেবোপ্রতিমভূপালমুকুটমণিঃ॥ ১৫॥
দৃষ্টিস্থানমবাপ্য বিশ্বজয়িনো যস্য দ্বিজানাং পয়ঃ,
পাত্রৈর্লৌহময়ৈর্হিরণ্যপদবী প্রাপ্তাপি কো বিস্ময়ঃ।
এতস্মিন্ নিয়মাদ্ভুতায় মহতি প্রত্যর্থিপৃথ্বীভুজাং,
যৎ পাত্রাণি হিরন্ময়ান্যপি পুনর্যাতান্যয়োবর্ণতাং॥ ১৬॥
আকৌমারমপারসঙ্গরভরব্যাপার তৃষ্ণাবশ
শ্রান্তস্যাস্য নিশম্য ধীরপরিষদ্ বন্দ্যাস্পদো বিক্রমং।

১৩। দক্ষিণ সমুদ্রের বেলাভূমিস্থ মুসলধারী ও গদাপাণির সন্নিকটে, বরুণা ও গঙ্গার সঙ্গমস্থল পবিত্র বারাণসীধামে, পদ্মযোনি কর্তৃক আরব্ধ যজ্ঞস্থলী ত্রিবেণীর তটে তিনি অত্যুচ্চ বিজয়স্তম্ভ এবং যজ্ঞ বেদিকা সমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

১৪। সতীকুল শিরোমণি বসুদেবী নাম্নী তাঁহার পট্টমহিষী ছিলেন; তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিয়া বিধাতা তাঁহার হস্ত পবিত্র করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সুনির্ম্মল চরিত্রে পৃথিবী অলঙ্কৃতা হইয়াছিলেন লক্ষ্মী এবং ধরিত্রী তাঁহার সপত্নীরূপে সকল বাঞ্ছা করিতেন।

১৫। শশিশেখর মহাদেব ও গিরিজা পার্ব্বতী হইতে যেমন শক্তিধর কুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তদ্রূপ এই রাজ দম্পতি হইতে, ভুপালগণের শিরোভূষণ স্বরূপ কেশব সেন দেব জন্ম গ্রহণ করিলেন।

১৬। যে বিশ্ব বিজয়ী নৃপতির দর্শনমাত্র আশ্রিত ব্রাহ্মণবর্গের লৌহ নির্ম্মিত পানপাত্র সকল স্বর্ণ হইত, তাঁহাকে অবলোকন করিয়া বিপক্ষীয় ভুপালবর্গের স্বর্ণ নির্ম্মিত পাত্র সমূহ যে লৌহত্ব প্রাপ্ত হইবে তাহা আর বিচিত্র কি?

নিদ্রালুং দয়িতাং বিহায় চকিতৈর্দুর্গং প্রবিশ্য দ্রুতং
নির্গচ্ছদ্‌ভিররাতিভূপনিবহৈর্ভ্রাম্যন্তিরেবাস্যতে ॥ ১৭ ॥
আকর্ণাঞ্চলমেলকারবিশিখক্ষেপৈঃ সমাজে দ্বিষাং
দানাস্তঃ কণগর্ভদর্ভকলনৈর্গোষ্ঠীষু নিষ্ঠাবতাং।
নীবীবন্ধবিসরণৈঃ পরিষদি ত্রস্যৎ কুরঙ্গীদৃশাং
অব্যাপারসুখোষিতং ক্ষণমপি প্রাপ্নোতি নৈতৎ করঃ ॥ ১৮ ॥
তাপিঞ্ছৈঃ পরিশীলিতেব সরিতাং কচ্ছস্থলী নীরদৈ
নীরন্ধ্রৈরিব নভস্তটী মরকতৈঃ ক্লৃপ্তা ভুবঃ ক্ষ্মারুহঃ।
নীলগ্রীবকদম্বকৈরবিরলা ভোগেব মুক্তাবলী
লেখাসীদদসীয় যজ্ঞহুতভুগ্‌ ধূমাবলিঃ খেলতি ॥ ১৯ ॥
কল্পক্ষ্মারুহকাননানি কনকক্ষ্মাভৃদ্‌ বিভাগান্‌ নিধে
রত্নানাং পুলিনান্তরাণি চ পরিভ্রম্য প্রয়াসালসা।
এতৎপাদপয়োধরপ্রণয়নীচ্ছায়াবিতানাঞ্চলে।
বিশ্রাম্যন্তি সতামনিদ্রবিদশোদ্ভ্রান্তা মনোবৃত্তয়ঃ ॥ ২০ ॥

১৭। এই নরপতি কৌমার কাল হইতেই সর্ব্বদা যুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতেন; তাহার অতুলনীয় বিক্রম শ্রবণ করিয়া বিপক্ষীয় ভূপালবৃন্দ নিদ্রিত রমণীগণকে পরিত্যাগ করিয়া সত্বর দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতেন; ইহাতেও তাহাদের ভয় দূর হইত না, তাহারা চিন্তিত মনে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেন।

১৮। তাহার হস্তদ্বয় কখনও বিশ্রাম সুখ লাভ করিত না, আকর্ণ আকর্ষিত বাণ সমূহের দ্বারা বিপক্ষ নৃপতিগণের সহিত যুদ্ধ; নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণগর্ভদান এবং লজ্জাশীলা কুরঙ্গনয়না সুন্দরীগণের কটি বন্ধন বস্ত্র শ্লথ করা প্রভৃতি কার্য্যে তাহার হস্তদ্বয় সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিত।

১৯। এই নৃপতির যজ্ঞীয় ধূমাবলী দ্বারা নদী এবং তত্তীরবর্ত্তী বৃক্ষসমূহ ব্যাপ্ত থাকিত। আকাশমণ্ডল যেন গভীর মেঘদ্বারা আবৃত রহিয়াছে বৃক্ষসমূহ যেন মরকত মণি দ্বারা খচিত এবং মুক্তাবলী যেন নীলকান্তমণি রূপে পরিণত হইয়াছে এরূপ বোধ হইত।

২০। ধন লিপ্সু সাধুগণের নিদ্রা বিরহিত মনোবৃত্তি কল্পদ্রুম কানন, সমুদ্রোপকূল প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া তাঁহার পাদপয়োধর প্রণয়িনী ছায়াতলে বিশ্রাম লাভ করিতেন। (অর্থাৎ এই সমস্ত সাধুগণের সকল বাসনাই এই রাজা পূর্ণ করিতেন।)

কিমেতদিতি বিস্ময়াকুলিতলোকপালাবলী,
বিলোকিত-বিশৃঙ্খল-প্রধনজৈত্রযাত্রাভরঃ।
শশাস পৃথিবীমিমাং প্রথিতবীরবর্গাগ্রণীঃ
সগন্ধপবনান্বয়ঃ প্রলয়কালরুদ্রো নৃপঃ ॥ ২১ ॥
পদ্মালয়েতি যা খ্যাতির্লক্ষ্ম্যা এব জগত্ত্রয়ে।
সরস্বত্যপি তাং লেভে যদাননকৃতালয়া ॥ ২২ ॥
আরুহ্যাভ্রংলিহগৃহশিখামস্য সৌন্দর্য্য লেখাং,
পশ্যন্তীভিঃ পুরিবিহরতঃ পৌরসীমন্তিনীভিঃ।
বার্ত্তাকূতৈর্নয়নচলিতৈর্বিভ্রমং দর্শয়ন্ত্যো
দৃষ্টাঃ সখ্যঃ ক্ষণবিঘটিতপ্রেমবন্ধৈঃ কটাক্ষৈঃ ॥ ২৩ ॥
এতন্নোন্নতবেশ্মসঙ্কটভুবা স্রোতস্বতীসৈকত
ক্রীড়ালোলমরালকোমল-কণৎক্বাণ-প্রণীতোৎসবাঃ।
বিপ্রেভ্যো দধিরে মহীমখবতানেকপ্রতিষ্ঠাভৃতা
পারপ্রক্রমশালি-শালিসরলক্ষেত্রোৎকটাঃ কর্ব্বটাঃ ॥ ২৪ ॥

ইহ খলু জম্বুগ্রাম পরিসর শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ সমস্ত সপ্রশস্ত্যপেত অরিরাজসূদন শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমদ্বিজয় সেন দেব পাদানুধ্যাত

২১। প্রলয়কালীন রুদ্রবৎ এই নরপতি রাজ্য শাসন করিতেন ; তিনি বীরশ্রেষ্ঠ ছিলেন ; বিপক্ষ রাজন্যবর্গ, তাঁহাদের বিজয়ী সৈন্য, তৎ কর্ত্তৃক ধ্বংস প্রাপ্ত অবলোকন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট নয়নে চাহিয়া দেখিতেন।

২২। লক্ষ্মীই কেবল এই জগতে পদ্মালয়া নামে খ্যাতা ; কিন্তু অধুনা সরস্বতী তাঁহার (রাজার) মুখ পদ্মোপরি সর্ব্বদা অধিষ্ঠান হেতু তিনিও 'পদ্মালয়া' নামে পরিচিতা হইয়াছেন।

২৩। পুরী বিহারকালীন সুন্দরীগণ অভ্রভেদী গৃহচূড়ায় আরোহণ করিয়া তাঁহাকে (রাজাকে) দেখিতেন ; তিনি এই সমস্ত চলিতনয়না কামিনীগণের প্রতি ক্ষণমাত্র প্রেম কটাক্ষ করিতেন।

২৪। ইন্দ্রতুল্য এই রাজা বিপ্রদিগকে উৎকৃষ্ট গৃহ, ক্রীড়মান হংসকূজন মুখরিত নদী সৈকতস্থ উৎকৃষ্ট ধান্তযুক্ত বিচিত্র ভূমি প্রদান করিতেন।

এই বিস্তীর্ণ জম্বুদ্বীপ বিজেতা, বিপক্ষনরপতিনিহন্তা প্রশংসনীয় মহারাজ বিজয় সেনের পদযুগল তৎপুত্র মহারাজ বল্লাল সেন সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন। তিনি সর্ব্ব-

সমস্ত সপ্রশস্ত্যুপেত অরিরাজস্যূদন শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমদ্বল্লাল সেন পাদানুধ্যাত সমস্ত সপ্রশস্ত্যুপেত অরিরাজ স্যূদন শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমল্লক্ষণ সেন পাদানুধ্যাত সমস্ত সপ্রশস্ত্যুপেত অশ্বপতি গজপতি নরপতি রাজ্যত্রয়াধিপতি সেনকুলকমলবিকাশভাস্কর সোমবংশপ্রদীপ প্রতিপন্নদান কর্ণ সত্যব্রত গাঙ্গেয় শরণাগত বজ্রপঞ্জর পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরম সৌর মহারাজাধিরাজ অরিরাজ ঘাতুক শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমৎকেশবসেন দেবপাদা বিজয়িনঃ সমুপাগতাশেষ রাজ রাজন্যক রাজ্ঞী রাণক রাজপুত্র রাজামত্য মহাপুরোহিত মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ মহাসান্ধিবিগ্রহিক মহাসেনাপতি মহাদৌঃসাধিক চৌরোদ্ধরণিক নৌবল হস্ত্যশ্ব গোমহিষাজাবিকাদি ব্যাপৃত গৌল্মিক দণ্ডপাশিক দণ্ডনায়ক নেয়গপত্যাদীন্ অন্যাংশ্চ সকল রাজ্যাধিপ জীবিনোঽধ্যক্ষ প্রবরাংশ্চ চট্ট ভট্ট জাতীয়ান্ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণোত্তরাংশ্চ যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ। বিদিত মস্ত্ব ভবতাং যথা :—পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপুরভাগপ্রদেশে প্রশস্তলতাটঘড়াঘাটকে পূর্ব্বে সত্রকাধি গ্রামসীমা. দক্ষিণে শাঙ্করবসা গোবিন্দবনান্তঃভূ সীমা পশ্চিমে পঞ্চকাপাগাদাগহ্বয় সঃ গ্রাম সীমা উত্তরে বাগুলীঝিগাতা তুচ্ছমানভূঃ সীমা ইত্থং যথাপ্রসিদ্ধস্বসীমাবচ্ছিন্না বৃহন্নৃপতিচরণৈঃ শুভবর্ষবৃদ্ধৌ দীর্ঘায়ুষ্টকামনয়া সমুৎসর্গিতা সচ্ছায়োৎপত্তিকা সাচ ভূমিঃ সসাদা বিবিধবাসগর্ত্তে ৗবরা সজলস্থলাখিল পলাশগুবাক নারিকেললতা চণ্ড-ভণ্ডা প্রবেশা তির্যস্তা আচন্দ্রার্ক ক্ষিতি সমকালং যাবদ্দিনং তৎ সজলনানাপুষ্করিণ্যাদিকং কারয়িত্বা

বিষয়ে উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া "শঙ্করগৌড়েশ্বর" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। শত্রুকুল ধ্বংসকারী প্রশংসনীয় শঙ্করগৌড়েশ্বর শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন, তৎ পিতা বল্লাল সেনের পদযুগল চিন্তা করিতেন। সর্ব্বপ্রকার প্রশংসাযুক্ত অশ্বপতি গজপতি, নরপতি, এই ত্রিবিধ নৃপতিপতি, সেনকুলকমলবিকাশভাস্কর, সোমবংশ প্রদীপ, কর্ণ সদৃশ দাতা, ভীষ্মের ন্যায় সত্যব্রত, শরণাগতরক্ষক, অত্যন্ত ধনবান, মহাবীর, রাজাধিরাজ, অরিকুলনিহন্তা, শঙ্করগৌড়েশ্বর, শ্রীমৎ কেশব সেন, তৎপিতা লক্ষ্মণ সেন দেবের পদযুগল নিয়ত চিন্তা করিতেন। এই রাজাধিরাজ কেশব সেন, সমীপবর্ত্তী রাজন্যবর্গ, রাজ্ঞী, রাণক, রাজপুত্র, রাজমন্ত্রী, রাজ পুরোহিত প্রধান বিচারপতি, সন্ধি এবং বিগ্রহবিভাগের কর্ম্মচারী, প্রধান সেনাপতি, মন্ত্র, গুপ্তচর, নৌবল, হস্তী, অশ্ব, ও মহিষ-পালকগণ, বস্ত্রাদি রক্ষকগণ, উদ্যানরক্ষকগণ

গুবাক নারিকেলাদিকং লগ্‌গায়িত্বা পুত্রপৌত্রাদিসন্ততিক্রমেণ সচ্ছন্দোপভোগেনউপভোক্তুং ॥ বাৎস্য সগোত্রস্য ভার্গবচ্যবন আপ্নুবৎ ঔর্ব্ব্য জামদগ্ন্য পঞ্চপ্রাবর পরাশর দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় বাৎস্য সগোত্রস্য তথা পঞ্চপ্রবরস্য গর্ভেশ্বর দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় বাৎস্য সগোত্রস্য তথা পঞ্চ প্রবরস্য বনমালিদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় বাৎস্য সগোত্রায়ভার্গব চ্যবন আপ্নুবৎ ঔর্ব্ব্য জামদগ্ন্য পঞ্চপ্রবরায় শ্রুতিপাঠকায় শ্রীঈশ্বর দেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় সদাশিব মুদ্রয়া মুদ্রয়িত্বা তৃতীয়াকীয় জ্যৈষ্ঠাদিনা ভূচ্ছিদ্রন্যায়েন চণ্ড-ভণ্ড দণ্ড্য তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তা যত্র চঃতুসীমাবচ্ছিন্ন শাসন ভূমির্হি (৩০০) যদ্‌ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানু মন্তব্যং ভাবিভির্নৃপতিরপি হরণে নরকপাতভয়াৎ পালনে ধর্ম্মগৌরবাৎ পালনীয়ং ভবন্তি চত্রা ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ—

আস্ফোটয়ন্তি পিতরো বল্‌গয়ন্তি পিতামহাঃ।
ভূমিদোঽস্মৎকুলে জাতঃ, স নস্ত্রাতা ভবিষ্যতি ॥

রাজ্যের তত্ত্বাবধারক, ও তাহাদের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণ, চট্টভট্টগণ, ব্রাহ্মণদিগকে যথোপযুক্তরূপ জ্ঞাপন করিয়া নিম্নলিখিত আদেশ প্রদান করিতেছেন; আপনারা সকলে বিদিত হউন :—পৌণ্ড বর্দ্ধন অন্তঃপাতী বঙ্গদেশে, বিক্রমপুর প্রদেশে,পূর্ব্বসীমা সত্রকাধি গ্রাম, দক্ষিণসীমা শঙ্করবাদাগ্রামের বনান্তভূমি, পশ্চিম সীমা গঞ্চকা পাদাম্বয় সরগ্রাম, উত্তরে বাগুলী, এই সীমাবর্ত্তী লতা এবং টগড়াঘাট ভূমিখণ্ড, নৃপতির শুভ বর্ষ বৃদ্ধি দিবসে দীর্ঘায়ুঃ নিমিত্ত ব্রাহ্মণকে উৎসর্গীকৃত করা হইল। সুনির্ম্মল জলপূর্ণ সরসী, গৃহ, সজলস্থল, পলাশ, গুবাক, নারিকেল বৃক্ষে এবং চণ্ড-ভণ্ড জাতির বসতি স্থল এই ভূমিখণ্ড সূর্য্যচন্দ্রের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত জলাশয় প্রভৃতি খনন করিয়া, নারিকেল ও গুবাক বৃক্ষ সমূহ রোপণ করিয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ করিবার জন্য বাৎস্য গোত্রোৎপন্ন, ঔর্ব্ব্য চ্যবণ, জামদগ্ন্য প্রভৃতি পঞ্চ প্রবর.যুক্ত পরাশর দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, বাৎস্য গোত্র এবং উক্ত পঞ্চপ্রবরযুক্ত গর্ভেশ্বর দেবশর্ম্মার পৌত্র, বাৎস্য গোত্র এবং উক্ত পঞ্চপ্রবরযুক্ত বনমালী দেবশর্ম্মার পুত্র, বাৎস্য গোত্র, ভার্গব, চ্যবণ, আপ্নুবৎ, ঔর্ব্ব্য, জামদগ্ন্য পঞ্চপ্রবরযুক্ত শ্রুতিপাঠ শ্রীঈশ্বর চন্দ্র দেবশর্ম্মাকে জ্যৈষ্ঠাদির সম্পূর্ণ দাবি হইতে মুক্তি দিয়া চণ্ড-ভণ্ডদিগের সম্পূর্ণ শাসনভার প্রদান করতঃ সদাশিব মুদ্রা (মোহর) দ্বারা মুদ্রাঙ্কণ পূর্ব্বক এই তাম্রশাসন দ্বারা দান করা হইল। ইহার চতুঃসীমান্তর্গত ভূমির পরিমাণ ৩০০ ॥ আমার এই আদেশ সকলে প্রতিপালন করিবে। ভাবী নৃপতিগণ দত্তাপহারির পাপ জন্য এই অনুজ্ঞা পালন করিবে।

ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্লাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ॥
বহুভির্ব্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ।
যস্য যস্য যদা ভূমি স্তস্য তস্য তদা ফলং॥
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত্তু বসুন্ধরাং।
স বিষ্ঠায়াং কৃমিভূর্ত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥
ষষ্টিবর্ষসহস্রানি স্বর্গে তিষ্ঠন্তি ভূমিদাঃ।
আক্ষেপ্তা চাবমন্তাচ তান্যেব নরকে বসেৎ॥
সর্ব্বেষামেব দানানাং একজন্মানুগং ফলং।
ইতি কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ।
সকলমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা নহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ॥

সচিবশতমৌলিলালিতপদাম্বুজস্যানুশাসনভূতঃ শ্রীযুতদত্তোদ্ভবগৌড় মহাভট্টকঃ খ্যাতঃ শ্রীমন্মহাসাকরণনি শ্রীমহামদনক করণনি শ্রীমৎ করণনি সং তিন জ্যৈষ্ঠ দিনে। * * (অস্পষ্টং)

এই তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার সম্বন্ধে যদিও কিঞ্চিৎ গোলযোগ দেখা যায় তথাপি মূল ঠিকই রহিয়াছে। ইহাতে মহারাজ বিজয় সেন হইতে কেশব সেন পর্য্যন্ত বংশ তালিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই তাম্রশাসন পাঠে বোধ হয় যে মাধব সেন জ্যেষ্ঠ এবং কেশব সেন কনিষ্ঠ ছিলেন; মাধব সেনই প্রথম রাজত্ব করেন; সম্ভবতঃ অত্যল্প কালের মধ্যেই তাঁহার

বংশে ভূমিদাতা জন্মগ্রহণ করিলে, পিতৃগণ পূর্ব্বপুরুষের উদ্ধার সাধন হইবে বলিয়া গৌরব প্রকাশ করেন। ভূমিদাতা ও ভূমি গ্রহণকারী উভয়ই পুণ্যবান এবং নিয়ত স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন। সগর প্রভৃতি নৃপতিগণ এই পৃথিবী ভোগ করিয়াছিলেন। স্বদত্ত অথবা পরদত্ত ভূমি হরণ করিলে পিতৃপুরুষগণের সহিত বিষ্ঠামধ্যে কৃমিজন্ম লাভ হয়। ভূমিদাতা ষাটি হাজার বৎসর স্বর্গে বাস করেন এবং ভূমি অপহরণ করিয়া ঐ কাল পর্য্যন্ত নরকে বাস করিয়া থাকেন। সকল দান কার্য্যেরই এক জন্ম পর্য্যন্ত ফলপ্রাপ্তি ঘটে। নলিনী দলগত জল বিন্দুবৎ ধন জন জীবন ক্ষণস্থায়ী জ্ঞান করিয়া জ্ঞানীগণ পরকীয় কীর্ত্তি লোপ করিবেন না।

সহস্র মন্ত্রী-চুম্বিতপাদ মহারাজ গৌড়েশ্বরের এই তাম্রশাসনপত্র তদীয় মহাভট্ট কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইল।

জীবন লীলা শেষ হয়; তৎকনিষ্ঠ কেশব সেনও বেশীদিন রাজত্ব করেন নাই। ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কেহ কেহ এতদুভয়ের রাজত্বকাল খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাতেও অনেকের মতদ্বৈধ দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষস্থিত প্রাচীন হিন্দু রাজগণের রাজত্বকাল নির্ণয় সম্বন্ধে বড়ই গোলযোগ; অনেকের অনেক প্রকার মত দেখিতে পাই, তবে প্রাচীন তাম্রশাসন অথবা প্রস্তর-ফলক প্রভৃতি অবলম্বনে যেগুলি নির্ণীত হইয়াছে তাহাই অধিকাংশ সত্য বলিয়া বোধ হয়। ইদিলপুরস্থিত বাগুতি ও বেতগাতা নামক যে গ্রামদ্বয় মহারাজ কেশব সেন ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছেন বহু অনুসন্ধান করিয়াও বর্ত্তমানে তাহার ঠিকানা পাই নাই। সম্ভবতঃ এখন অন্যনামে এই গ্রামদ্বয় পরিচিত। ১১৯৪ খৃঃ অব্দে * যখন পাঠান সেনাপতি বক্তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু স্বাধীনতা ধ্বংস হয় তখন রাজা লক্ষ্মণ সেন † নবদ্বীপে রাজত্ব করিতেন। আমরা মিনহাজউদ্দিনের ইতিহাসে দেখিতে পাই যে বক্তিয়ারের নবদ্বীপ আক্রমণের সময় রাজা লক্ষ্মণ সেনের বয়স অশীতি বৎসর ছিল; পাঠানগণ অতর্কিত রূপে নগর ও রাজপুরী আক্রমণ করিলে মন্ত্রিবর্গের কৌশলেই হউক অথবা সৈন্য সেনাপতিগণের শিথিলতা বশতঃই হউক এক প্রকার বিনা যুদ্ধেই বক্তিয়ার খিলিজি নবদ্বীপ অধিকার করিলেন। বৃদ্ধ রাজা রাণীর সহিত অন্তঃপুরস্থ গুপ্তদ্বার দিয়া পলায়ন করতঃ সমতট (পূর্ব্ববঙ্গ) স্থিত বিক্রমপুরে প্রস্থান করিলেন। রাজ-পরিবারবর্গ, মন্ত্রী ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারিগণ যে যে দিকে পারিলেন পলায়ন করিলেন, আর যাহারা অবশিষ্ট ছিলেন তাঁহারা নির্দ্দয় পাঠান হস্তে নিতান্ত নৃশংসরূপে নিহত হইলেন। এই যবন বিপ্লব হইতে আত্মরক্ষা করিতে রাজবংশীয় তরুণ সেন, অরুণ সেন, হরি সেন, বিজয় সেন প্রভৃতি রাজন্যগণ এবং অন্যতম সভাপণ্ডিত গোবর্দ্ধনাচার্য্য ‡ বাকলায় পলায়ন করিয়া কতকটা স্বাধীনতা এবং মান সম্ভ্রম রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

* কেহ কেহ বলেন ১২০৩ খৃঃ অব্দ; কিন্তু Major Raverty "তাবকত-ই-নাসিরি"র অনুবাদে ৫৯০ হিঃ অর্থাৎ ১১৯৪ খৃঃ অব্দ বক্তিয়ার কর্ত্তৃক নবদ্বীপ বিজয়ের কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

† মতান্তরে তৎপুত্র কেশব সেন। হরিমিশ্রের কারিকা দ্রষ্টব্য।

‡ ইহার বংশধরগণ এখনও গৌরনদী থানার অন্তর্গত বাবরাইল গ্রামে বসতি করিতেছেন।

সেন রাজগণের অধিকৃত সাম্রাজ্যে বহুতর সমৃদ্ধিশালী নগর এবং জনপদ ছিল, তন্মধ্যে সুবর্ণগ্রাম (সোণার গাঁ) এবং বাকলা উল্লেখযোগ্য। এই উভয় স্থান নবদ্বীপ ধ্বংসের পরও প্রায় একশত বৎসর স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। *

বাকলায় তখন কে রাজত্ব করিতেন তাহা জানা যায় নাই; সম্ভবতঃ সেনরাজগণের অধীনস্থ কোন করদ মিত্র হিন্দু ভূপতি তৎকালে রাজত্ব করিতেন। ইদিলপুরের তাম্রশাসনে বোধ হয় যে তখন এই প্রদেশ, সেন রাজগণের সম্পূর্ণ অধীনে কোন সীমান্ত করদ ভূপতি দ্বারা শাসিত হইত।

স্বনাম প্রসিদ্ধ নিদানপ্রণেতা মাধব করের † অন্য পরিচয় দিতে হইবে না, ইনি বৈদ্যবংশ সম্ভূত, বাকলায় ইহার জন্মভূমি; ইহার জ্ঞাতিগণ অদ্যাপি গৌরনদী থানার অন্তর্গত নলচিড়া গ্রামে বসতি করিতেছেন। "মাধব করের ভিটা" বলিয়া একখানা প্রাচীন বাড়ী এখনও তথায় বর্ত্তমান।

"জাতিতত্ত্ব বারিধি" নামক গভীর গবেষণাপূর্ণ পুস্তকে দেখিতে পাই যে, মাধব কর এবং চক্রাপাণি দত্ত উভয়ই সমসাময়িক। শেষোক্ত মহাপুরুষ পালবংশীয় ‡ রাজা নয়পাল দেবের চিকিৎসক ছিলেন।

এখন দেখা যা'ক, এই নয়পালের রাজত্বকাল খৃষ্টীয় কোন শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিল। সেনবংশের পূর্ব্বে এবং সমকালে যে পালবংশ গৌড়ে রাজত্ব করিতেন তাহা আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই; কিন্তু এই বংশের

---

* রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গলার ইতিহাস।

অধ্যাপক ব্লকম্যান লিখিয়াছেন :—"The Bengal territory, conquered in 1203-4 by the Mahomedans, did not comprise the Eastern District. The *Bangadesh* was still under Ballal's descendents till the end of the 13th century, when *Sonargaon* was occupied by the second son of the Emperor Bulban."—Blochman's History and Geography of Bengal.

† মাধব কর—ইনি স্বনাম প্রসিদ্ধ নিদান গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা; ঋষি প্রণীত চরক ও সুশ্রুতের পর এরূপ উচ্চ শ্রেণীর গ্রন্থ কেহ প্রণয়ন করেন নাই। * * * ইনি মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্তের সমসাময়িক। জাতিতত্ত্ব বারিধি, ২২৪ পৃষ্ঠা।

‡ নয়পালাদি নরপতিগণ প্রকৃতপক্ষে কোন বংশোদ্ভূত ছিলেন, তাহা নির্ণীত হয় নাই। ঐতিহাসিকগণ ইহাদিগকে পালবংশীয় বলিয়াছেন, কিন্তু গোপাল, মহীপাল, নয়পাল প্রভৃতির পাল শব্দ নামৈকদেশ মাত্র,—বংশোপাধি নহে। কারণ শুধু 'গো' 'মহী' 'নয়' কাহারও নাম হইতে পারে না।

ধারাবাহিক নাম এবং রাজত্ব নির্ণয় লইয়া বড় গোলযোগ চলিতেছে। ইংরাজ লেখকগণ প্রণীত যে কয়েকখান বঙ্গ-ইতিহাস আছে, তাহাতে অনেকটা অনৈক্য দেখা যায়; কেহ কেহ বলেন যে নয়পাল ১০৩৫ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন, আবার কেহ কেহ সেই মত খণ্ডন করিয়া নিজ নিজ মত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, পাল রাজাদের প্রস্তর-লিপি এবং তাম্রশাসন প্রভৃতি হইতে যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে রাজা নয়পাল ১০৪০ খৃঃ অব্দ হইতে ১০৬০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। বাকলা নিবাসী মাধব করেরও অভ্যুদয়কাল উল্লিখিত খৃষ্টাব্দ অবধারণা করা যাইতে পারে।* ইহাতেও প্রতীয়মান হয় যে, বাকলা জনপদ ইহার পূর্ব্বেও ধনধান্য বিদ্বন্মণ্ডলীপূর্ণ বিস্তীর্ণ রাজ্য ছিল।

বিক্রমপুর, বাকলা, নবদ্বীপ, এই তিনটীস্থান সমস্ত বঙ্গভূমে পণ্ডিত এবং কুলসমাজ বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। বিশেষ অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে এই তিনটী স্থানের মধ্যে বাকলাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং বিদ্বন্মণ্ডলী পরিপূর্ণ ছিল। যে সময় নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে মানব সমাগম বিরল ছিল, তখনও বাকলা বহু জনাকীর্ণ ছিল।† তথা হইতে বহু ছাত্র, কাশী, মিথিলা, দ্রাবিড়, কান্যকুব্জ প্রভৃতি স্থানে ন্যায়, দর্শন, মীমাংসা, স্মৃতি, বেদান্ত প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রাভ্যাস করিতে যাইতেন। আবার দিগ্‌দেশীয় ছাত্র-বৃন্দ সেইরূপ বাকলায় আসিয়া অধ্যয়ন করিতেন। রাজপ্রদত্ত বৃত্তি ভোগ করিয়া বাকলার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তখন অনন্যমনে শাস্ত্র চিন্তা করিতেন। তৎকালে ৺কাশীধামের পূর্ব্বদিকে বাকলা যে প্রকার পণ্ডিতসমাজ ছিল, বঙ্গদেশে আর কোথাও সেইরূপ ছিল না।‡

ন্যায় শাস্ত্র পূর্ব্বে অস্মদ্দেশে প্রচলিত ছিল না; মৈথিলি পণ্ডিতগণ স্বস্থানে বসিয়া অধ্যাপনা করাইতেন। তাঁহারা ন্যায়শাস্ত্রগ্রন্থ শিষ্যগণকে দিতেন না। কেহ কোন প্রকার নকল করিয়াও আনিতে না পারে এই জন্য

---

* দিনাজপুর ও সুন্দরবনের তাম্রফলক পাঠে জানা যায় যে, বৈদ্যকুলভূষণ মহাত্মা চক্রপাণির পিতা নারায়ণ দত্ত, এবং জ্যেষ্ঠ সহোদর ভানু দত্ত বৈদ্যান্তরঙ্গ "গৌড়াধিনাথ" মহারাজ লক্ষ্মণসেনের অমাত্য ও সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। তাহা হইলে মাধব কর লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে অর্থাৎ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

† বাচস্পত্যাভিধানের ভূমিকা।

‡ H. Beveridge's History of Bakarganj, Page 27.

অধ্যাপকগণ বিশেষ সতর্ক থাকিতেন। কালে নবদ্বীপ নিবাসী বাসুদেব সার্ব্বভৌম চতুষ্পাঠীতে যাহা অধ্যয়ন করিতেন, অবিকল তাহাই তাঁহার বাসগৃহে আসিয়া লিখিয়া রাখিতেন। এইরূপ ক্রমাগত ন্যায়শাস্ত্রের যাবতীয় গ্রন্থ তিনি লিখিয়া রাখিলেন। পরে পাঠ সমাপ্ত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ন্যায়শাস্ত্র প্রচার করেন। তদবধি নবদ্বীপই প্রাধান্য লাভ করিল। এই প্রবাদের সত্যাসত্য সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধান করিয়াও প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারি নাই।

গৌড়েশ্বর মহারাজ লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে নবদ্বীপের উল্লেখ কোন ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। নবদ্বীপের নূতনত্ব সম্বন্ধে আরও প্রমাণ আছে; ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ মৃত্তিকা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে ঐস্থান গঙ্গার পার্শ্বনিক্ষিপ্ত চর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।* সম্ভবতঃ রাজা লক্ষ্মণ সেন তখন ঐ ভূমির উর্ব্বরতা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে তথায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে যেমন নবদ্বীপ হইতে ছাত্রগণ পাঠ সমাপ্ত করিয়া উপাধি গ্রহণ করেন, বহু পূর্ব্বে বাকলায় এই উপাধি দান করা হইত।

এই সম্বন্ধে আর একটী জনরব প্রচলিত আছে। মহারাজ আদিশূর যখন কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া যজ্ঞ করেন, তখন এই বঙ্গদেশের উপর বাকলার তৎকালীন সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিতকে "অর্ঘ্য" এবং সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন। এই জনশ্রুতির বিশেষ কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু অনেক প্রাচীন পণ্ডিত এবং ঘটকের মুখে এই কথা শুনিয়াছি। বহু অনুসন্ধান দ্বারা বাকলার কয়েকজন প্রাচীন পণ্ডিতের নাম পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহারা কে, এবং কোন সময়ের লোক, তাহা কিছুই জানা যায় নাই। এই সমস্ত মহাপুরুষদিগের মধ্যে কয়েক জনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মধুসূদন সরস্বতী।—ইনি শ্রীশ্রীমদ্ভগবদগীতার অতি বিশুদ্ধ এবং প্রাঞ্জল টীকা প্রস্তুত করেন।

---

* Physical Geography by Dr. Rajendra Lal Mittra.

গৌরীনাথ।—ইনি “গৌরীনাথী-কূট” বলিয়া প্রসিদ্ধ। গৌরনদী থানান্তর্গত নলচিড়া গ্রামে ইহার বাসস্থান ছিল। শাস্ত্রে ইনি সাক্ষাৎ গৌতমের ন্যায় পণ্ডিত ছিলেন। অদ্যাপি ইহার “কূট” মীমাংসিত হয় নাই। প্রবাদ যে ইনি দৈবীবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন, এবং ব্রহ্মশাপে ইহার মৃত্যু হইয়াছিল।

হরিনাথ।—ইহারও “কূট” আছে। ইনিও ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত।

আলোক, গোলক, রুদ্র, মঙ্গল। —এই চারিজনও নৈয়ায়িক, ইহারাও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন।

মধুসূদন সরস্বতী ভিন্ন আর কাহারও ঐপ্রকার গ্রন্থ কিংবা ভাষ্য আছে কি না তাহা জানা যায় না; থাকিলেও তাহা বিরল এবং দুষ্প্রাপ্য।

কদাচিৎ দুই একজন প্রাচীন পণ্ডিত ব্যতীত অন্য কেহ নাম ধাম আত্ম-পরিচয় দেন নাই। ইহা দ্বারা বোধ হয় যে তৎকালীন পণ্ডিতগণ বিদ্যা-ভিমানী এবং গর্ব্বিত ছিলেন না। আমাদের দেশে যে সমস্ত মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া মধ্যাহ্ন-তপন-কিরণবৎ জ্ঞানালোকে জগৎ বিমোহিত করিয়া-ছিলেন, আজ তাঁহাদের স্মৃতি পর্য্যন্ত রক্ষা করিবার উপায় নাই। আমরা বিদেশী লোকের প্রতিভায় আত্মহারা হই, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ একবার নিজের ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করি না।

১৪২৬ খৃষ্টাব্দ হইতে অনুমান ১৪৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যখন পাঠান নৃপতি নাসিরুদ্দিন মহম্মদ সাহ ও তৎবংশধরগণ পূর্ব্ববঙ্গে সোনারগাঁয়ে (সুবর্ণ গ্রাম) রাজত্ব করিতেন; তখন প্রাচীন বাকলার পূর্ব্ব অংশ ফতিয়াবাদ বলিয়া অভিহিত হইত। আমরা এই সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি। এই সময় হইতে প্রাচীন বাকলা শ্রীহীন হইতে থাকে। মুসলমানাগমনে বাকলার রাজা ক্রমশঃ হীনবল হইতে লাগিলেন, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে রাজ্যস্থিত অনেক ভূখণ্ড পাঠানগণের আয়ত্তাধীনে আসিতে লাগিল। এই সময় হইতেই, ভারতবর্ষের অনেক স্থানের হিন্দু নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া মুসলমান প্রদত্ত নাম রক্ষিত হইল।

সাধকপ্রবর মহাকবি বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গল অথবা পদ্মপুরাণে ফতিয়াবাদের উল্লেখ দেখিতে পাই। কবি-কর্ণপুর নিজ নামধামের পরিচয় সময় লিখিয়াছেন ঃ—

"রাজার পালনে প্রজা সুখে ভুঞ্জে নিত,
মুল্লুক ফতিয়াবাদ বাঙ্গরোড়া তক্‌সিম।"

বাঙ্গরোড়া এই জিলার মধ্যে একটী বৃহৎ পরগণা। উল্লিখিত কবিতায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে বাঙ্গরোড়া ফতিয়াবাদ রাজ্যের অংশ মাত্র।

এই মনসা-মঙ্গল গ্রন্থে আমরা বাকলার প্রাচীনত্ব, গৌরব এবং বিদ্বন্মণ্ডলীর পরিচয় পাই। কবি লিখিয়াছেন ঃ—

"যেন মতে পদ্মাবতী করিলা সন্নিধান,
তেন মতে করে বিজয় গীতের নির্ম্মাণ।
ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক, *
সুলতান হোসেন সাহ নৃপতি তিলক।
সংগ্রামে অর্জ্জুন রাজা, প্রভাবেতে রবি,
নিজ বাহু বলে রাজা শাসিল পৃথিবী।
রাজার পালনে প্রজা সুখে ভুঞ্জে নিত,
মুল্লুক ফতিয়াবাদ বাঙ্গরোড়া তক্সিম।
পশ্চিমে ঘাঘর নদী, পূবে ঘণ্ডেশ্বর,
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর।
চারি বেদধারী তথা ব্রাহ্মণ সকল,
বৈদ্যজাতি বসে নিজ শাস্ত্রেতে কুশল।
কায়স্থ জাতি বসে তথা লিখনের সুর,
অন্য জাতি বসে নিজ শাস্ত্রে সুচতুর।
স্থান গুণে যেই জন্মে সেই গুণময়,
হেন ফুল্লশ্রী গ্রামে বসতি বিজয়।"

গৌড় নগরে যখন সুলতান হোসেন সাহ রাজত্ব করিতেন, তখন "ঋতু-শূন্য-বেদ-শশী" শকে এই গ্রন্থ রচনা আরম্ভ হয়। ইহা দ্বারা ১৪০৬ শক † হইল (১৪৮৪ খৃঃ অব্দ)। বঙ্গীয় ইতিহাসে দেখিতে পাই যে

* স্থানীয় অনুসন্ধান দ্বারা জানা গিয়াছে যে বঙ্গীয় ৮৯১ সনে শ্রাবণ মাসে সোমবারে শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে এই গ্রন্থ রচনা আরম্ভ হয়।

† অঙ্কস্য বামাগতি।

সুলতান হোসেন সাহ ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন *। যতজন পাঠান নৃপতি অস্মদ্দেশে রাজত্ব করিয়াছেন, তন্মধ্যে হোসেন সাহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইনি যেরূপ ধার্ম্মিক, তদ্রূপ বীর, ন্যায়দর্শী এবং তেজস্বী ভূপতি ছিলেন, তাই কবিবর লিখিয়াছেন ঃ—

"সংগ্রামে অর্জ্জুন রাজা, প্রভাবেতে রবি,
নিজ বাহু বলে রাজা শাসিল পৃথিবী।"

অদ্য হইতে প্রায় ৪০০ বৎসরের কথা, সেই সময় এবং তাহারও অনেক পূর্ব্বে বাকলা অতীব সমৃদ্ধিশালী জনপদ এবং পণ্ডিত সমাজ ছিল। অস্মদ্দেশে জনপ্রবাদ যে চন্দ্রপতি (চাঁদ বেণে) সওদাগর প্রভৃতি বণিকগণ বাণিজ্য করিতে যাইবার সময়, বর্ত্তমান গৈলাফুল্লশ্রীর নিকটে একস্থানে পূজা দিয়া যাইতেন। এই স্থানের নাম জাহাজঘাটা, ইহা এখনও বর্ত্তমান।

ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, শেষ পাঠান সম্রাট দাউদখাঁর পিতা সুলেমানকিরাণীর রাজত্ব সময়ে, তদীয় সেনাপতি হিন্দু-বিগ্রহ-ধ্বংসকারী ব্রাহ্মণ-কুলসম্ভূত দুর্ব্বৃত্ত কালাপাহাড়, বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যায় অনেক প্রসিদ্ধ দেবমূর্ত্তি চূর্ণীকৃত করিয়াছিল। কয়েক বৎসর অতীত হইল গৌরনদী থানার অন্তর্গত আটক গ্রামে পুষ্করিণী খননকালে মানবাকার পরিমিত পাষাণময় মহাবিষ্ণু মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। † ঐ মূর্ত্তি এখন লক্ষ্মণকাঠী গ্রামে বর্ত্তমান। ইহা দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে কালাপাহাড়ের ভয়ে ঐ মূর্ত্তি তখন তথাকার অধিবাসী কর্ত্তৃক লুক্কাইত হইয়াছিল।

পাঠান রাজত্ব সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশে যে কয়েকজন ভূপতি শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সুলতান হোসেন সাহের রাজত্বকাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরূপ প্রবাদ আছে যে, তৎকালে বঙ্গদেশীয় সমৃদ্ধিশালী অধিবাসিগণ স্বর্ণপাত্র ব্যবহার করিতেন ; চৌর ভয় এক প্রকার ছিল না। রাজা পরমানন্দ তখন সমগ্র বাকলার অধীশ্বর ছিলেন।

---

* ষ্টুয়াট সাহেব হোসেনের সিংহাসনারোহণ কাল ১৪৯৯ খৃঃ অব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিজয় গুপ্তের মতে তিনি ইহার পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কবি-কর্ণপুর হোসেনের সমকালীন বলিয়া তাঁহার কথাই যথার্থ মনে হয়।

† নলচিড়া গ্রামে বড় ভট্টাচার্য্য বাটীর পুষ্করিণী খননকালেও এক নাসিকাহীন বাসুদেব মূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, পাঠান রাজগণ কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গস্থ বিক্রমপুর এবং বাকলা স্বাধীন ছিল। মুসলমান অত্যাচার প্রপীড়িত বহু সংখ্যক স্বধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুসন্তান, এই সকল স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন; এখনও তাঁহাদের বংশধরগণ এই সকল স্থানে বাস করিতেছেন। ইহা দ্বারা অবশ্যই প্রতীয়মান হইতেছে যে, তৎকালে অস্মদ্দেশ হিন্দু নরপতির অধীনে ছিল।

সেই সময়ে এই সমগ্র বঙ্গদেশে, বাকলায়ই অতি বিশুদ্ধরূপে দিনপঞ্জিকা প্রস্তুত হইত। সেন রাজগণ, সন্তুষ্টচিত্তে এই পঞ্জিকাকারগণকে যথেষ্ট পরিমাণ ভূমি বৃত্তি প্রদান করিতেন। এই পঞ্জিকানুসারে তখন বঙ্গের সমস্ত হিন্দুসন্তান, দেব এবং পিতৃকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।* আমার স্বর্গগত পূর্ব্বপুরুষপ্রদত্ত ব্রহ্মোত্তরভোগী জনৈক দৈবজ্ঞ প্রতিবৎসর তালপাতায় লিখিত একখানি পঞ্জিকা দিয়া থাকেন। কোটালীপাড়া নিবাসী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রামনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন মহাশয় ঐরূপ একখানি প্রাচীন পঞ্জিকা দেখিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে আমরা বাকলা এবং ফতিয়াবাদের উল্লেখ দেখিতে পাই। প্রকৃতপক্ষে ধরিতে গেলে, আইন-ই-আকবরিই মুসলমান রাজত্বের প্রকৃত ইতিহাস। ইহার পূর্ব্বে আমাদের দেশের কোন ভাল ইতিহাস ছিল কিনা জানা যায় না। জগদ্বিখ্যাত সম্রাট আকবরের রাজত্ব সময় তদীয় প্রধানামাত্য পণ্ডিতপ্রবর আবুল ফজেল কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ রচিত হয়। ইহাতে রাজত্বের যাবতীয় বিষয়, এবং হিন্দুস্থানের প্রাচীন ইতিহাস প্রভৃতি সমস্তই সঙ্কলিত হইয়াছে। সম্রাট আকবর ১৫৪২ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন, এবং সার্দ্ধ শতাব্দী কাল অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্য শাসন করিয়া ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহারই অনুজ্ঞাক্রমে আইন-ই-আকবরি গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে সরকার বাকলা ও ফতিয়াবাদের পরগণা বিভাগ এবং রাজস্ব বিশদরূপে বর্ণিত আছে। কিন্তু ফতিয়াবাদ সম্বন্ধে আমরা তদন্তর্গত কতকগুলি মহালের নাম দেখিতে পাই; এই নামগুলির অধিকাংশই যাবনিক, দুই একটী ব্যতীত বুঝিবার সাধ্য নাই।

* Mr. Taylor's Topography of Dacca.

সরকার ফতিয়াবাদ ৩১ মহালে বিভক্ত; ইহার রাজস্ব ৭,৯৬৯,৫৭৬ ডাম অর্থাৎ প্রায় ১৯৯,২৩৯ টাকা। মহালগুলির নাম এবং রাজস্ব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১।	জয় শির আচার্য্য ...	৩৪,৩০৪ ডাম
২।	ফুলবানি	৩৮৪,৪৫২ ”
৩।	বেলন	১২৪,৮৭২ ”
৪।	ভাগলপুর	৬,১১৫ ”
৫।	বদ্ধদিয়া	১,৪৪২ ”
৬।	তৈলহাটী	৩৭৭,২৯০ ”
৭।	চিরেন লক্কি	৩৫,৬৪৫ ”
৮।	চর হাই	৩০,২০০ ”
৯।	হাবেলী ফতিয়াবাদ ...	৯০২,৬৬১ ”
১০।	হাসিল নিমক (লবণ মহাল)	২৭৭,৭৫৮ ”
১১।	হজরৎপুর	১১,৬৪০ ”
১২।	হাট মহাল	১১,৪৬৭ ”
১৩।	রসুলপুর	১০৩,৭৬৭ ”
১৪।	সন্দ্বীপ	১,১৮২,৪৫০ ”
১৫।	সির হরগরল	৭৮৮,৪৩০ ”
১৬।	সিরসানি	১৭৩,২২৭ ”
১৭।	সিরওয়া	৫৩,৮৮২ ”
১৮।	সুধেওয়া	৩৭,১৬৭ ”
১৯।	জালালপুর	১,৮৫৭,২৩০ ”
২০।	সাহাবাজপুর	৭৩২,১৭২ ”
২১।	খেরগপুর	১১৮,১৩৫ ”
২২।	কুশ্‌দিয়া	১২,৪০৫ ”
২৩।	কৌশা	৬৮,৩৫০ ”
২৪।	মকরগঞ্জ	৩,১৫৭ ”
২৫।	মুস্‌নেদ্‌গুড়	৫৫,৩১২ ”
২৬।	মিরাণপুর	২২,১৭২ ”

২৭।	ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুক	...	১২৩,৩৬৫	ডাম
২৮।	লুকুট্লিসা ...	...	৪৯,৪১২	”
২৯।	স্যামৎপুর ...	...	২০,৯৬০	”
৩০।	হেজারহাটী ...	...	২১,৫৯৭	”
৩১।	ইসবপুর ...	...	২৫৮,১২৫	”

এই সরকারের রাজকীয় ব্যবহারের জন্য আবশ্যকানুসারে ৯০০ অশ্বারোহী সৈন্য, এবং ৫০,৭০০ পদাতিক সৈন্য যোগাইতে হইত। এই মহালগুলির মধ্যে সন্দীপ, সাহাবাজপুর, স্যামৎপুর এবং রসুলপুরের পূর্ব্ব নাম এখনও প্রচলিত আছে বলিয়া ইহাদের চিনা যাইতেছে। অনেকগুলি বর্ত্তমান সময়ে ভিন্ন জিলাভুক্ত হওয়াতে তাহাদের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; সুতরাং জানিবার সাধ্য নাই।

আশ্চর্য্যের বিষয় আইন-ই-আকবরিতে জেলালাবাদের কোন উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পাঠান রাজত্ব সময়ে নিম্নবঙ্গ জেলালাবাদ ও ফতিয়াবাদ নামে দুই ভাগে বিভক্ত হয়।

১৫৫৬ খৃঃ অব্দে মহামতি আকবর সিংহাসনারোহণ করেন, এবং তাঁহার রাজত্বের প্রায় পঞ্চদশ বর্ষে টোডরমল্ল সমস্ত ভারতবর্ষের রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন। পাঠানগণ তাহাদের রাজত্ব সময়ে যে যে মহাল জেলালাবাদভুক্ত করেন, আমরা সরকার সোণারগাঁ মধ্যে তাহার অনেকগুলি মহাল দেখিতে পাই। ইহা দ্বারা বোধ হয় যে মোগল রাজত্বের প্রারম্ভে জেলালাবাদ নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া পূর্ব্ব নাম সোণারগাঁ অথবা সুবর্ণগ্রাম রাখা হইয়াছিল। এই সরকারটী ৫২ মহালে বিভক্ত এবং রাজস্ব ১০,৩৩১,৩৩৩ ডাম, অর্থাৎ প্রায় ২৫৮,২৮৩ টাকা। এই সরকারকেও ১৫০০ অশ্বারোহী, ২০০ গজারোহী এবং ৪৬০০০ পদাতিক সৈন্য যোগাইতে হইত।

আবুল ফজেল সরকার বাকলা সম্বন্ধে আইন-ই-আকবরিতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। *

* Sarcar Bakla is upon the bank of the Sea. The fort is situated amongst trees. On the first day of the moon, the water begins to rise, and continues increasing till the fourteenth, from which time to the end of the month it decreases gradually every day. Gladwin's Translation, Page. 304.

[সরকার বাকলা সমুদ্রের তীরে স্থিত এবং দুর্গটী চতুর্দ্দিক বৃক্ষ দ্বারা বেষ্টিত। প্রতিপদ তিথিতে জলবৃদ্ধি আরম্ভ হইয়া ১৪ দিন পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়, তৎপর ক্রমান্বয় কমিতে থাকে।]

বর্ত্তমান পটুয়াখালী মহকুমার অধীনে তেতুলিয়া নদীর তীরস্থিত কচুয়া নামক স্থানে পূর্ব্বে বাকলার রাজধানী ছিল। এখন উহা ভগ্নাবশেষ মাত্র; কতকগুলি ইষ্টকস্তূপ এবং জঙ্গলাকীর্ণ কয়েকটা পতনোন্মুখ ইষ্টক প্রাচীর অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। স্থানের অবস্থা দেখিলে বোধ হয় যে ইহার অধিকাংশই নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। এই স্থান হইতে বঙ্গোপসাগর অধিক দূরবর্ত্তী নহে; নিশীথ সময় এখানে ইহার ভৈরব জলকল্লোল শুনা যায়। স্থানীয় অধিবাসিগণ বলেন যে, এক প্রহর কি তদূর্দ্ধকাল ভাটায় নৌকা বাহিলেই সমুদ্র পাওয়া যায়; এই স্থানের ধীবরগণের মধ্যে কেহ কেহ সাগরতীর পর্য্যন্তও মৎস্য ধরিবার জন্য গমন করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা, অনুমিত হয় যে এই স্থান সমুদ্রের তীরে ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে স্রোতজল ভূমির হ্রাসবৃদ্ধির কারণ, কিন্তু সমুদ্র হইতে স্বভাবতঃ ভূমি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আবুল ফজেল যে সময়ের কথা লিখিয়াছেন, সেই হইতে প্রায় ৩১৮ বৎসর গত হইয়াছে; সুতরাং সমুদ্রের এত দূরে অপসারিত হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক।

আকবরের রাজত্বের ঊনত্রিংশদ্বর্ষে (অধ্যাপক ব্লক্‌ম্যানের মতে ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে) যে ভীষণ জলপ্লাবন হয়, তাহাতে রাজধানীস্থ বহুলোক এবং রাজধানীর বহু স্থান ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সেই জল প্লাবনের পর হইতে বরিশাল নগরের আট মাইল পশ্চিমে মাধবপাশা নামক স্থানে রাজধানী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখনও তথায় রাজবংশধরগণ বসতি করিতেছেন। মহাত্মা বেভারিজ তাঁহার অমরকীর্ত্তি স্বরূপ বাখরগঞ্জের ইতিহাসে লিখিয়াছেন—"The Bacola has entirely disappeared, and it is only a conjecture, which identifies it Kachua, the ancient seat of the Chandradwip Rajas" [বাকলার একেবারে চিহ্ন নাই, তবে কচুয়া দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে যে এই স্থানে চন্দ্রদ্বীপের রাজধানী ছিল।] ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে বেভারিজ সাহেব

স্বয়ং কচুয়া দেখিয়া আসিয়াছিলেন।* সরকার বাকলা চারি মহালে বিভক্ত, ইহার রাজস্ব ৭১৩০৬৪৫ ডাম অর্থাৎ প্রায় ১,৭৮,২৬৬ টাকা। এই সরকারকেও ৩২০ অশ্বারোহী সৈন্য এবং ১৫,০০০ পদাতিক সৈন্য যোগাইতে হইত।

সরকার বাকলা নিম্নলিখিত রূপে বিভক্ত ছিল।

১।	বাকলা অথবা ইস্মাইলপুর	...	৪,৩৪৭,৯৬০ ডাম
২।	শ্রীরামপুর	... ...	২৫২,০০০ "
৩।	সাহাজাদপুর	... ...	৯৭৭,২৪৫ "
৪।	ইদিলপুর	... ...	১,৫৫৩,৪৪০ "

এই গ্রন্থে আমরা ইস্মাইলপুর বলিয়া বাকলার আর একটী নাম দেখিতে পাই, কিন্তু এই নামের আর কোথাও উল্লেখ আছে কিনা জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ বাদসাহী দপ্তরখানার জন্য এই নাম প্রস্তুত হইয়াছিল।

এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, মুসলমান রাজত্ব সময় বাকলা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, যথা—ফতিয়াবাদ এবং ইস্মাইলপুর (বাকলা)। এই দুই বিভাগের সমীকরণ করিলে দেখা যায় যে, এই স্থল অতীব সমৃদ্ধিশালী ছিল; এবং ইহাদের সমষ্টিতে প্রায় ৩৭৭৫০৫ টাকা রাজস্ব, ১২২০ অশ্বারোহী এবং ৬৫৭০০ পদাতিক সৈন্য সম্রাটের আবশ্যকানুসারে যোগাইতে হইত।

বঙ্গে মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে এদেশীয় রাজগণের স্থপতি-বিদ্যার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল কিনা তাহা লক্ষ্য করা যায় না। কেননা পাঠান রাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে, হিন্দু রাজগণ প্রতিষ্ঠিত কোন অট্টালিকা অথবা উচ্চ দেবমন্দির দেখা যায় না। পটুয়াখালী মহকুমার অধীনে গুলিসাখালী

---

* I visited kachua in the end of 1874, and found that the only remains of old building were a lonely and deserted temple standing on a high mound overlooking the river, and a series of vaulted chambers of very strong masonary, which are said to have been the *Rajbaree* or palace. The temple is conical in shape and is double storied, which is, I believe, not commonly the case in modern Hindu temples. It is evidently of considerable age, for there is a large tree (*a pakoor*) growing on the top, which is so branching as almost to conceal the temple underneath. The *Rajbaree* is a little farther inland, and is surrounded with jungle.—H. Beveridge's History of Bakarganj, Page 73

থানার অন্তর্গত মস্‌জিদবাড়ী গ্রামে ইষ্টক নির্ম্মিত একটী সুবৃহৎ মস্‌জিদ দৃষ্ট হয়। এই মস্‌জিদটী জঙ্গলাকীর্ণ ছিল; ভূতপূর্ব্ব সুন্দরবন বিভাগের কমিশনর স্বর্গগত প্রত্নতত্ত্ববিৎ রেইলী সাহেব প্রথম উহা আবিষ্কার করেন। তিনি এই জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া মস্‌জিদটী সংস্কার করেন। ঐ মস্‌জিদটীর সম্মুখ ভাগে একখানি প্রস্তর লিপি ছিল; গবর্ণমেণ্ট সেইখানি বহু যত্নে এসিয়াটীক সোসাইটীতে রাখিয়া দিয়াছেন। উৎকৃষ্ট পারস্য ভাষায় ঐ প্রস্তর লিপি লিখিত; তাহার সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

[ধর্ম্মপ্রচারক (ঈশ্বরতুল্য) মহম্মদের জয় হউক। যে ব্যক্তি একটী ধর্ম্মমন্দির প্রস্তুত করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন, ঈশ্বর তাঁহার জন্য সত্তরটী রাজ-প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবেন। ধর্ম্ম এবং রাজ্যের সুদৃঢ় স্তম্ভস্বরূপ সুলতান মহম্মদ সাহের পুত্র প্রবল প্রতাপান্বিত সুলতান আবুয়াল মোজাফর বারবাক সাহের রাজত্ব সময় তদীয় অনুজ্ঞাক্রমে হিজরা ৮৭০ (১৪৬৫ খৃঃ অঃ) মোয়াজ্জেম ওয়াজীল্‌ খান কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইল।]

ইতিহাসে আমরা সুলতান মহম্মদের পুত্র আবুয়ালের নাম দেখিতে পাই না। ষ্টুয়ার্ট সাহেব বলেন যে সুলতান বারবাক, নাসির সাহের পুত্র। তিনি ১৪২৬ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসনারোহণ করেন এবং ১৪৫৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র বারবাক সাহ সিংহাসনারোহণ করিয়া সপ্তদশবর্ষ অতীব সুখ্যাতি এবং সমৃদ্ধির সহিত রাজত্ব করিয়া ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন, আইন-ই-আকবরিও এই কথার সত্যতা প্রমাণ করিতেছে। মুসলমান রাজন্যবর্গ যে স্বীয় নামের সঙ্গে, তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচারকের নাম যোগ করিয়া, ধর্ম্মপ্রাণ এবং ভক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সম্ভবতঃ বারবাক সাহের জনক নাসির সাহ, সুলতান মহম্মদ নাসির সাহ হইবেন, অথবা নাসির সাহের "মহম্মদ সাহ" বলিয়া অন্য আর একটী নাম থাকাও আশ্চর্য্য নহে।

এই মস্‌জিদের মধ্যে কয়েকজন মুসলমান ফকির বাস করেন, পর্ব্বো-পলক্ষে বহু মুসলমান এখানে আগমনপূর্ব্বক ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

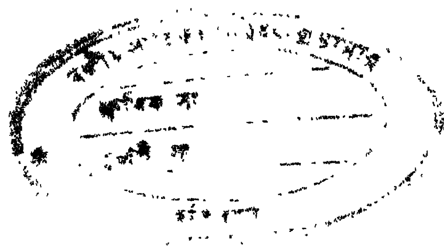
এই মস্‌জিদনির্ম্মাতা মোয়াজ্জেম ওয়াজীল খাঁ কে, স্থানীয় অনুসন্ধান

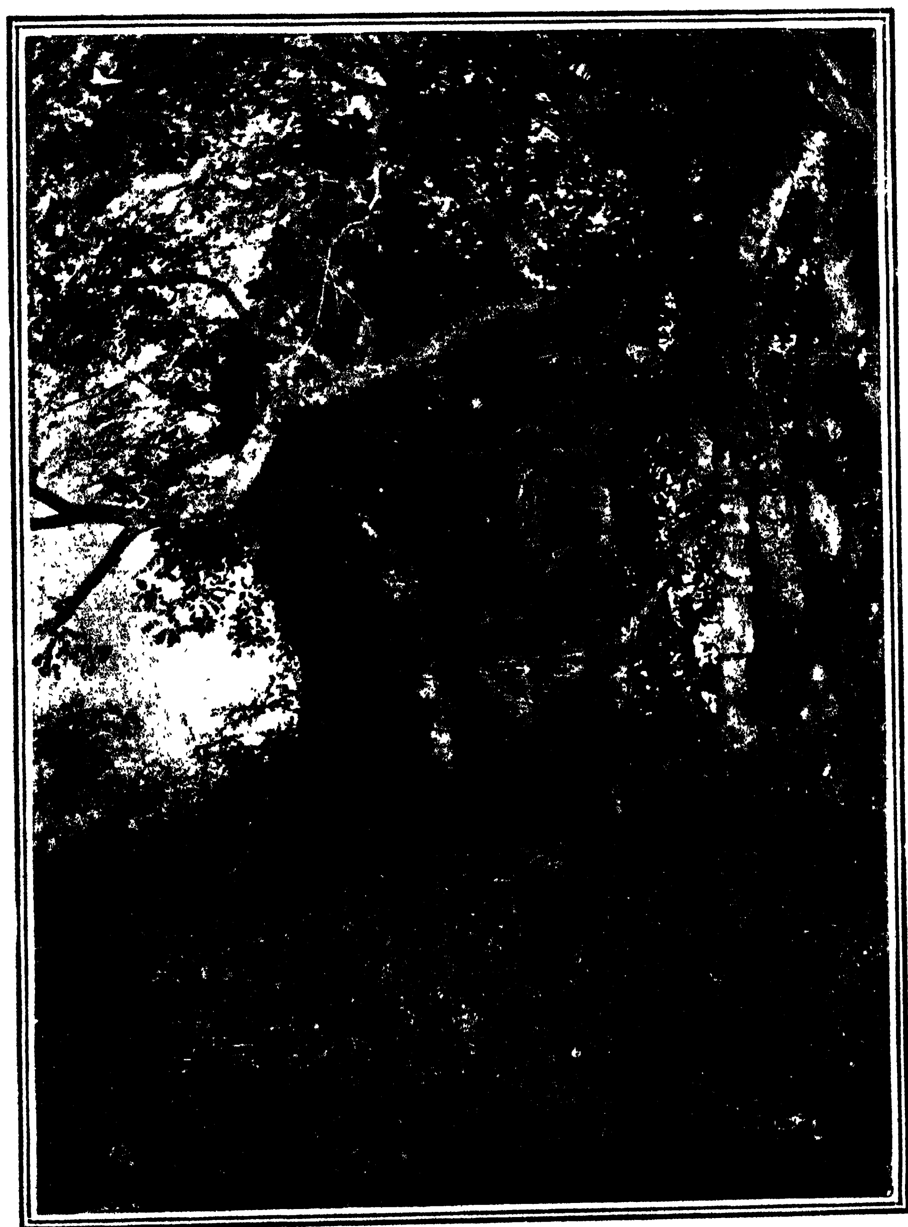
দ্বারাও তাহা অবগত হইতে পারি নাই। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি বাদসাহের কর্ম্মচারী ছিলেন, এবং তাঁহারই অনুজ্ঞায় রাজধানী হইতে আসিয়া এই মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

বাখরগঞ্জ থানার অধীন সিয়ালগুণী গ্রামে আর একটী ইষ্টক নির্ম্মিত মস্‌জিদ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এই মস্‌জিদটী স্থানে স্থানে ভগ্নপ্রায় হইয়াছে। প্রবাদ যে, নসরৎ গাজী নামক একজন ধনাঢ্য মুসলমান ঐ মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাতে কোন স্মৃতিলিপি নাই; স্থানীয় অধিবাসিগণ বলেন যে, মস্‌জিদের দ্বারদেশে একখানি বৃহৎ প্রস্তর লিপি ছিল, ভূমিকম্পে পতিত হইয়া উহা শত সহস্রখণ্ডে চূর্ণীকৃত হইয়াছে।

নসরৎ সাহ নামক একজন পাঠান নৃপতি ১৫২১ খৃষ্টাব্দে গৌড়ে রাজত্ব করিতেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ হোসেন সাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র, এবং সর্ব্বরূপে পিতৃগুণে বিভূষিত ছিলেন; ইনি বহুযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া অনেক রাজ্য জয় এবং প্রনষ্ট গৌরব উদ্ধার করিয়াছিলেন। "গাজী" শব্দ জয় উপাধি-বাচক, অনেক মুসলমান নৃপতি বিজয়সূচক গাজী উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন; সম্ভবতঃ নসরৎ সাহও এই গৌরব বিস্মৃত হন নাই। ইহাঁর রাজত্ব সময় গৌড়ে একটী সুবর্ণ মস্‌জিদ ও বহু ধর্ম্মভবন প্রস্তুত হইয়াছিল। সিয়ালগুণী গ্রামের মস্‌জিদও নসরৎ সাহ অথবা নসরৎ গাজী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। এই ভগ্নাবশেষ মস্‌জিদে নানা প্রকার কৃত্রিম ফুল, লতা প্রভৃতি অঙ্কিত; এখনও যাহা আছে, তাহাতে প্রাচীন স্থপতি-বিদ্যার যথেষ্ট পরিচয় দিতেছে। সিয়ালগুণীর নিকট পিলখানা বলিয়া আর একটী গ্রাম আছে; স্থানীয় প্রবাদ যে এই স্থানে হস্তিশালা ছিল, সম্ভবতঃ সেই সময় হইতে এই গ্রামের নাম "পিলখানা" হইয়া থাকিবে।

ন্যামতী পুলিশ আউটপোষ্টর অধীনে বিবি চিনি গ্রামে ও গৌরনদী ষ্টেশনের অন্তর্গত রামসিদ্ধি গ্রামে দুইটী মস্‌জিদ আছে। প্রথমোক্ত মস্‌-জিদটী ন্যামৎ খাঁর ভগ্নী "বিবি চিনি" কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং তাহার নামানুসারে গ্রামের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ন্যামৎ খাঁও ন্যামৎপুরের স্থাপয়িতা বলিয়া প্রবাদ। শেষোক্ত মস্‌জিদ স্বনামখ্যাত মহম্মদ ছবি খাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, এই মহাপুরুষ যে কত সৎকার্য্য করিয়াছেন, তাহার নির্ণয় করা অসাধ্য। অসংখ্য বর্ত্ম, দিঘী এবং বহুসংখ্যক মস্‌জিদ তাঁহার





মঠবাড়ী—(রূণ্‌সী)

অক্ষয় কীর্ত্তির চিরসাক্ষ্যস্বরূপ এখনও অনেক গ্রামে বর্ত্তমান আছে। এই মস্‌জিদটী কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত, এবং প্রথমোক্ত মস্‌জিদ অপেক্ষা দেখিতে মনোজ্ঞ। বহুসংখ্যক মুসলমান পর্ব্বোপলক্ষে এই স্থানে সমবেত হইয়া থাকে। এই মস্‌জিদের স্তম্ভগুলিকে ভক্ত মুসলমানগণ আলিঙ্গন করিয়া থাকেন; তাঁহাদের বিশ্বাস যে ইহাতে তাহাদের কামনা সিদ্ধ হয়।

বর্ত্তমান "ডালবাজারের" সংলগ্ন আর একটী মস্‌জিদ দেখিতে পাওয়া যায়। উহার উপর একখানি স্মৃতিলিপি পারস্য ভাষায় কৃষ্ণ প্রস্তরোপরি খোদিত রহিয়াছে। ইহার নির্ম্মাণ কৌশলও বড় বিচিত্র।

ঝালকাঠীর অধীন এবং বর্ত্তমান গুরুধামের নিকট স্তুতালড়ী নামক গ্রামে একটী অতি প্রাচীন মঠ বর্ত্তমান আছে। ইহার উচ্চতা এখনও ১৫০ ফিটের উর্দ্ধ বলিয়া বোধ হয়, বিগত ১২৮৩ সালের মহা ঝড়ে ইহার চূড়াটা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ইহাতে কোন স্মৃতিফলক দেখিলাম না। বর্ত্তমান অবস্থা এবং নির্ম্মাণ কৌশল দেখিলে বোধ হয় যে, ইহা প্রায় তিন চারি শত বৎসরের পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রবাদ যে ভাগ্যমন্ত রায় নামক জনৈক সাহা জাতীয় ধনাঢ্য বণিক, তাহার মাতৃ সমাধিস্থলে ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শিব প্রতিষ্ঠা করেন। সে আজ প্রায় চারিশত বৎসরের কথা; তখন এই বাকলা হিন্দু রাজার ন্যায়দণ্ডে পরিচালিত হইত। উক্ত বণিককৃত আরও কয়েকটী ভগ্ন অট্টালিকা, দীঘি ও ছোট ছোট কয়েকটী মঠ এবং একটী বৃহৎ নবরত্ন জঙ্গলাবৃত অবস্থায় আছে। এখনও উক্ত সাহার বংশধরগণ এই স্থানে অতি দীনভাবে বসতি করিতেছেন।

ঝালকাঠী থানার অন্তর্গত রুনসী গ্রামে "মঠবাড়ী" নামক স্থানে একটি অতি প্রাচীন মঠ আছে; ইহার মধ্যে ভগবান সদাশিবের লিঙ্গমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল।* ইহাতেও কোন স্মৃতিলিপি নাই; কিন্তু দেখিলে বোধ হয় যে ইহাও অতি-প্রাচীন কালের; মঠের উপরিভাগ ক্ষুদ্র বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষে

---

* এই মূর্ত্তি এখনও উক্ত গ্রামে রায়দের বাটী বর্ত্তমান আছে এবং সেই স্থানেই ইঁহার দৈনিক পূজা হইয়া থাকে। কোনরূপ আপদ বিপদ অথবা মারীভয় উপস্থিত হইলে এই মূর্ত্তি অতিদূর গ্রামান্তরেও নীত হয় এবং গ্রামবাসীরা ইঁহার অভিষেক ও সস্ত্যয়নাদি করিয়া শান্তি কামনা করে। ইঁহার নিত্য পূজা প্রভৃতির জন্য অতি পূর্ব্বকাল হইতে পূজরী ব্রাহ্ম. মন্দিরের সেবক ও বাদক প্রভৃতির বংশধরগণ এখনও রাজ প্রদত্ত বৃত্তিভোগ করিতেছে।

পরিপূর্ণ এবং নিকটে শৈবালাদি পূর্ণ একটি প্রাচীন দীঘি অবস্থিত। স্থানটী জঙ্গলাকীর্ণ। এখনও চৈত্র মাসে চড়ক পূজোপলক্ষে এখানে বহু লোক সমাগম হইয়া থাকে। এই মঠ এবং শিবলিঙ্গ কে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা সঠিক জানা যায় না। স্থানীয় প্রাচীনদিগের মুখে শুনিতে পাই যে রায়েরকাঠীর রাজবংশোদ্ভব শত্রাজিৎ রায় কর্ত্তৃক এই দেবমন্দির ও লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং স্থানীয় লোকের জলকষ্ট নিবারণার্থ উক্ত দীঘি খনন করা হইয়াছিল। *

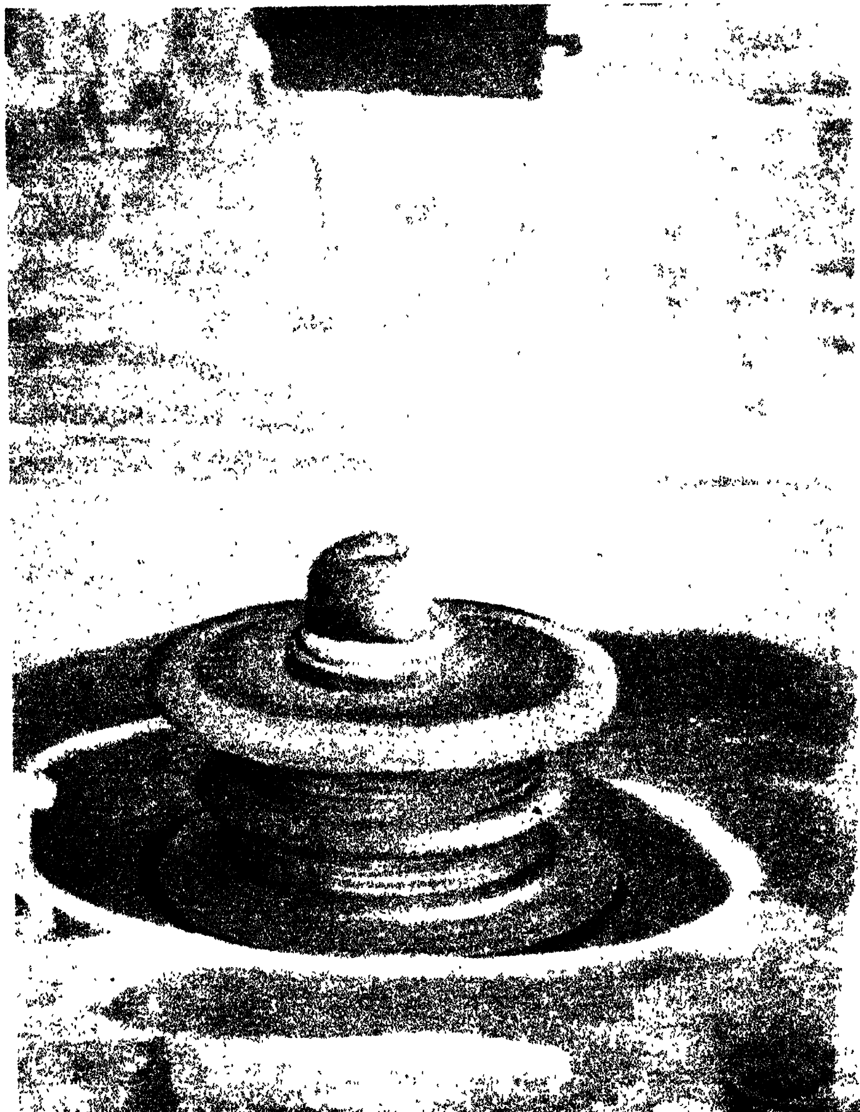
উত্তর সাহাবাজপুরে গোবিন্দপুর গ্রামে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত অতি সুন্দর বাসুদেব মূর্ত্তি প্রাচীন কালাবধি বর্ত্তমান আছে। স্বনামপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী মহাত্মা চাঁদরায় এই বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই বাটীতে ৮০ হস্ত উচ্চ, বহু কারুকার্য্যখচিত একটী সুন্দর মঠ আছে। এই মঠটী অতি প্রাচীন, স্থানে স্থানে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে; তবুও অদ্ভুত স্থপতি-বিদ্যা ও শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

গৌরনদী থানার অন্তর্গত মাহিলাড়া গ্রামে দক্ষিণ পার্শ্বে একটী প্রাচীন মঠ দৃষ্ট হয়। যখন এখানে সরকারবংশ অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ও পরাক্রান্ত ছিলেন, তখন এই বংশসম্ভূত রূপরাম সরকার শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার জন্য উক্ত মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি এই অভ্রভেদী মঠ মাহিলাড়ার অতীত গৌরবের সাক্ষ্য স্বরূপ বিরাজমান।

গৌরনদী থানার নিকট "দেউলভিটা" নামক একটী স্থান আছে। প্রবাদ যে প্রাচীনকালে এই গ্রামস্থ জনৈক ব্রাহ্মণ তাহার মাতার মৃত্যুর পর একটী নাতিবৃহৎ দেউল নির্ম্মাণ করিয়া মাতৃঋণ হইতে অব্যাহতিকল্পে তাঁহার নামে উৎসর্গ করেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ দেউলটী ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়। তদবধি ঐ স্থান "দেউলভিটা" বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই স্থানের নীচে অনেক পুরাতন ইষ্টক পাওয়া গিয়াছে।

---

* প্রবাদ যে উক্ত দীঘি খননকালেই এই শিবমূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং ভূস্বামীর অনুমতিক্রমে স্থানীয় লোকেরা ঐ স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে এই মূর্ত্তি স্থাপিত করেন; এবং প্রত্যহ রীতিমত অর্চ্চনা করিতে থাকেন। পরে কালক্রমে মন্দির অর্দ্ধভগ্ন হইলে কোন কারণবশতঃ উহার পুনঃসংস্কার করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহারা ঐ মূর্ত্তি গ্রামাভ্যন্তরে আনয়ন করেন।



ত্র্যম্বক ভৈরব—(পোনাবালিয়া)।

"সুগন্ধায়াং নাসিকামে দেবস্ত্র্যম্বক ভৈরবঃ।
সুন্দরী সা মহাদেবী সুনন্দা তত্র দেবতা ॥"

শব্দকল্পদ্রুম ৩৫৬ পৃঃ

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি সিদ্ধিস্থানানি যানিতু, যস্মিন্নারাধিতাদেবী ক্ষিপ্রং ভবতি সিদ্ধিদা-
বেত্রবত্যাস্তটে রম্যে হরিশ্চন্দ্রে তথা প্রিয়ে, সরস্বতীতটে পুণ্যে সুগন্ধায় তনেহপিবা ॥
ইতি দেবীপুরাণে কুণ্ড প্রবেশ নামাধ্যায়ঃ।

পোনাবালিয়া গ্রামের উপকণ্ঠস্থিত শ্যামরাইলের শিববাড়ী অতি প্রসিদ্ধ স্থান; এই স্থানও ঝালকাঠী ষ্টেশনের অন্তর্গত, এবং ভারতবর্ষের একটী তীর্থস্থান বলিয়া বিখ্যাত। পর্ব্বোপলক্ষে এখানে অনেক সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হয়। এই স্থানের শিবলিঙ্গ "ত্র্যম্বকেশ্বর শিব" বলিয়া প্রসিদ্ধ। পুরাকালে ইহারই পার্শ্ব বিধৌত করিয়া সরিদ্বরা সুগন্ধা * প্রবাহিতা ছিল। এই নদীর অপর তীরস্থিত শিকারপুর গ্রামে এই শিবের শক্তি উগ্রতারা (সুনন্দা) অধিষ্ঠিতা। ইহাও পীঠস্থান বলিয়া বিখ্যাত। এই শিব এবং শক্তির আবির্ভাব সম্বন্ধে কোন কাল নির্ণয় করা অসাধ্য। প্রবাদ যে দেবীর নাসিকা এইস্থানে পতিত হইবার পর হইতে এই উভয় স্থানই পীঠস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

এই ত্র্যম্বকেশ্বর শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে অস্মদ্দেশে একটি জনরব আছে। যেস্থানে শিবলিঙ্গ এখন বর্ত্তমান, অতি পূর্ব্বকালে ঐ স্থান নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। হিংস্র জন্তুগণ তন্মধ্যে নিরাপদে বাস করিত। ইহার অদূরবর্ত্তী লোকালয়ে অনেক নীচ জাতীয় লোকের বসতি ছিল। রাখালগণ দিবাভাগে গাভীর পাল লইয়া ঐ জঙ্গলের একটু দূরে চরাইত, কিন্তু অপরাহ্নে দোহন সময়ে দুগ্ধ পাওয়া যাইত না। এইরূপ অনেকদিন গত হইল; গো-স্বামিগণ ভাবিলেন যে রাখালগণই দুগ্ধ পান করে, অথবা দোহন করিয়া অন্য কোথাও বিক্রয় করে; তজ্জন্য রাখালগণ যৎপরো-নাস্তি তিরস্কৃত হইল। রাখালগণও বিনা কারণে এই প্রকার লাঞ্ছিত হইয়া প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। একদিন তাহারা দেখিল যে কতিপয় পয়ঃস্বিনী গাভী জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। রাখালগণও তৎপশ্চাৎ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে একটা বৃহৎ বিল্ববৃক্ষ মূলে গাভীগণ চারিদিকে ঘেরিয়া বৃত্তাকারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং তাহাদের স্তন (বান) হইতে অজস্র দুগ্ধধারা পতিত হইতেছে। রাখালগণ অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া নিকটে আগমন পূর্ব্বক দেখিল যে, কতকগুলি ক্ষুদ্র বৃক্ষ পরিপূর্ণ একটা বল্মীকের উপর সেই ক্ষীরধারা পতিত হইতেছে। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বালস্বভাব রাখালগণ, ঐ বল্মীকের চতুষ্পার্শ্বে শুষ্ক

* দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বৃক্ষপত্র ও বৃক্ষশাখা প্রভৃতি সাজাইয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিল। অচিরাৎ ধু ধু করিয়া আগুণ জ্বলিয়া উঠিল। রাখাল বালকগণ কিছু দূরে দাঁড়াইয়া এই রঙ্গ দেখিতেছিল; অকস্মাৎ সেই প্রজ্বলিত অনল হইতে একটী খর্ব্বাকৃতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কৃষ্ণবর্ণা নারীমূর্ত্তি * নির্গতা হইয়া অতি বেগে নিকটবর্ত্তী শৈবাল পরিপূর্ণ পুষ্করিণী মধ্যে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক অন্তর্হিতা হইলেন। রাখাল বালকগণ এই অস্বাভাবিক ব্যাপার দর্শনে ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল।

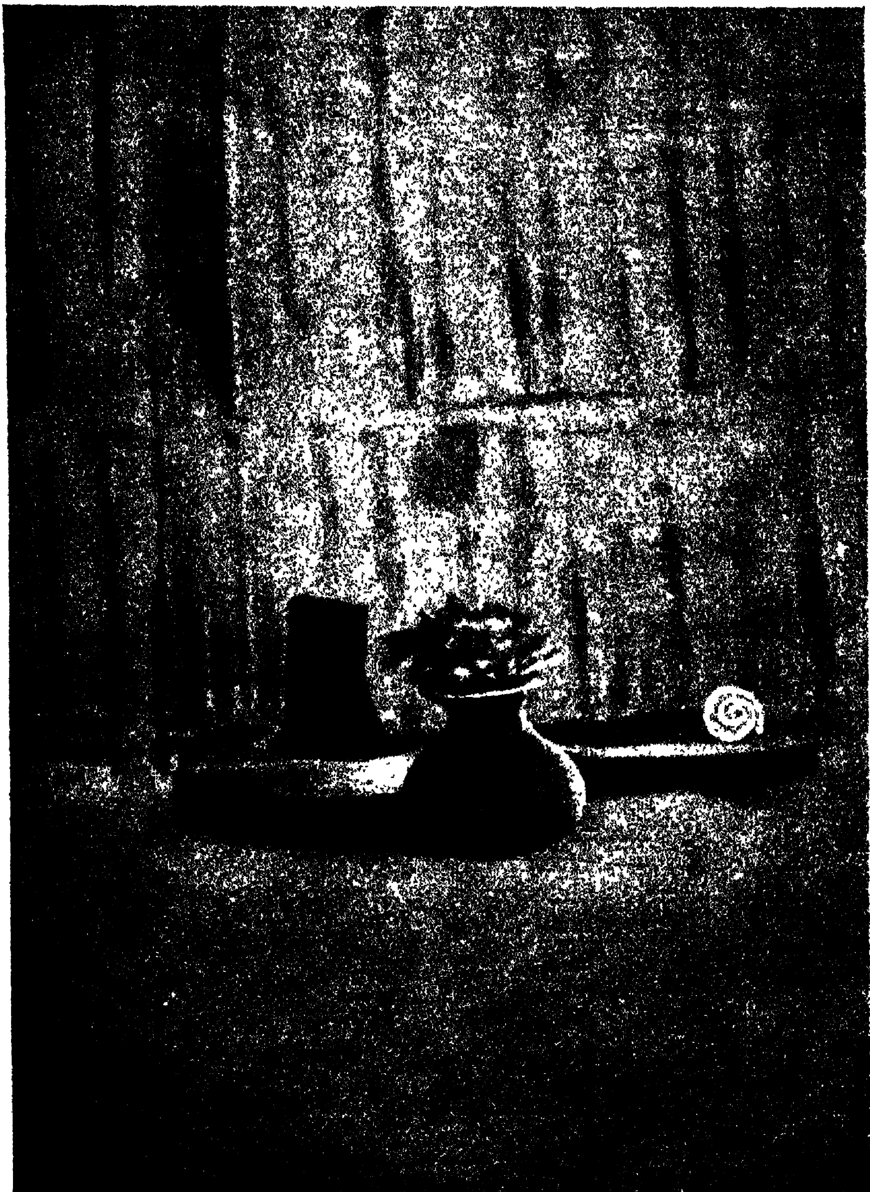
নিশীথ সময়ে ভূস্বামী শ্রীরামরায় † স্বপ্ন দেখিলেন যে, শুভ্রকান্তি, দীর্ঘ জটাবিলম্বিত, ত্রিলোচন, নগেন্দ্রতুল্য দীর্ঘ অবয়ব, ত্রিশূলধারী জনৈক মহাপুরুষ আসিয়া বলিতেছেন যে তিনি শ্যামরাইলের জঙ্গলে বল্মীকের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন; রাখালগণ ঐ জঙ্গলে অগ্নি প্রদান করায়, তাঁহার অঙ্গ স্থানে স্থানে ফাটিয়া গিয়াছে; তিনি (রায় মহাশয়) তাঁহাকে উদ্ধার করুন।

তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল; বাকী নিশি জাগিয়া কাটাইলেন। প্রত্যূষে এই স্বপ্নবৃত্তান্ত সকলকে অবগত করাইয়া; বহু লোক সমভি-ব্যাহারে স্বপ্নকথিত স্থানে উপস্থিত হইলেন। রাখাল বালকগণ প্রদত্ত অগ্নিতে বল্মীকের উপরিভাগ ও পার্শ্বস্থ জঙ্গল দগ্ধ হওয়ায় ভৃত্যগণ সেই বল্মীক খনন করিতে লাগিল; অকস্মাৎ খননাস্ত্রে কোন কঠিন পদার্থের স্পর্শ-শব্দ অনুভূত হইল। তখন সকলে অতি ধীরে ধীরে সেই মৃত্তিকা সরাইয়া দেখিল যে ভগবান দেবাদিদেবের এক লিঙ্গ মূর্ত্তি অবস্থিত রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ সেই লিঙ্গব্যাপী মৃত্তিকা অপসারিত হইলে মূর্ত্তি বাহির হইল। তখন সকলে একত্রিত হইয়া সেই লিঙ্গ স্থানান্তরে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্থানান্তরিত করা দূরে থাক, সামান্য রূপ নাড়াইতেও পারিলেন না। রাত্রিতে পুনরায় স্বপ্নাদেশ হইল যে, এই লিঙ্গ পর্ব্বতবৎ অচল, কোন প্রকারেই ইহা স্থানান্তরিত করিবার সম্ভব নাই। এই স্থানেই দেবালয় নির্ম্মিত হইয়া পূজা হ'ক; কিন্তু শিবলিঙ্গের মস্তকোপরি যেন কোন আবরণ না থাকে।

---

* জনশ্রুতি যে ইনিই ত্র্যম্বকেশ্বর-শক্তি সুনন্দাদেবী।

† ইনি পোনাবালিয়া চৌধুরী বংশের আদিপুরুষ।



তারাবাড়ী—(শিকারপুর)

SEYNE PRESS.

আদেশানুসারে অতি অল্প সময় মধ্যেই তথায় একটী দেবালয় স্থাপিত হইল, কিন্তু শিবলিঙ্গের ঠিক মস্তকোপরি স্থানে আবরণ হইল না। সেই বৃহচ্ছিদ্র দ্বারা শিবের মস্তকোপরি সর্ব্বদাই শিশির অথবা বৃষ্টিপাত হইত। উত্তরকালে শিবপ্রসাদ রায় মহাশয়ের কন্যা প্রাতঃস্মরণীয়া চাঁদমণি দেবী ত্র্যম্বকেশ্বরের নিমিত্ত একটী সুরম্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

পোনাবালিয়া চৌধুরীবংশের এখন আর পূর্ব্ব সৌভাগ্য নাই। তাঁহাদের বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তির অধিকাংশ বর্ত্তমান সময়ে ঢাকার নবাব বাহাদুর খরিদ করিয়াছেন। উক্ত নবাব বাহাদুর মুসলমান হইলেও চৌধুরী মহাশয়গণ-প্রদত্ত এই দেবোত্তর ভূমি খাস করেন নাই; বরং পূর্ব্ব মন্দির ভগ্ন হইলে তিনি আর একটী নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া হিন্দুগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

শিকারপুর গ্রামের দেবীমূর্ত্তি সম্বন্ধেও দেশ বিখ্যাত একটি জন-প্রবাদ আছে। * পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী নামক একজন ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ একদা নিশীথ সময়ে স্বপ্ন দেখিলেন যে, ভগবতী কালিকা দেবী তাঁহার সম্মুখে আবি-র্ভূতা হইয়া সুগন্ধাগর্ভ হইতে তাঁহার পাষাণময়ী মূর্ত্তি উদ্ধার করিয়া স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করিতে আদেশ করিতেছেন। রাত্রি প্রভাত হইলে স্বপ্নাদিষ্ট ভক্ত ব্রাহ্মণ সুগন্ধাগর্ভে অবতরণ পূর্ব্বক প্রথমবার কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত সুন্দর তারামূর্ত্তি উঠাইলেন; পুনর্ব্বার জল মগ্ন হইয়া প্রস্তর নির্ম্মিত বৃষভারূঢ় মহাদেব মূর্ত্তি উঠাইলেন। ভক্তি গদ্গদচিত্তে ব্রাহ্মণ স্বয়ং সেই মূর্ত্তি বহন করিয়া স্থাপিত করিলেন, এবং যথাসাধ্য অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। প্রবাদ যে, বাকলার তদানীন্তন রাজা † এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তথায় আগমন পূর্ব্বক মহা সমারোহে মহামায়ার পূজা করিলেন; এবং দেবীর সেবার জন্য "তারাবৃত্তি" নামে এক দেবোত্তর সম্পত্তি প্রদান করিয়া একটী ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। পঞ্চাননের বংশধরগণ এখনও সেই বৃত্তি ভোগ করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এখন দুরবস্থাপন্ন, কেহ কেহ বংশহীন হইয়াছেন। রাজ-

---

* শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ মহাকাব্য (সংস্কৃত) প্রণেতা পণ্ডিত প্রবর কালীকান্ত শিরোমণি মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই সংগ্রহ করিয়াছেন।

† কেহ কেহ বলেন, ইনিই রাজবংশের স্থাপয়িতা রামনাথ দনুজমর্দ্দনের পুত্র।

প্রদত্ত মন্দিরটী এখন ভগ্ন প্রায়। দেবীমূর্ত্তি কয়েক বৎসর অতীত হইল এক দুষ্ট যবন কর্ত্তৃক চূর্ণীকৃত হইয়া সেই অবস্থায় মন্দিরমধ্যেই রহিয়াছে। সেই হইতে ঘটের উপর দেবীর পূজা হয়। শিবমূর্ত্তি অভগ্নাবস্থায় আছে, তাহারও নিত্য পূজা হইয়া থাকে।

এই তারাবাড়ীও পীঠস্থান বলিয়া বিখ্যাত; পর্ব্বোপলক্ষে এস্থানে বহু সাধুসন্ন্যাসীর সমাগম হয়। স্থানটী দেখিতে যেমন মনোরম তদ্রূপ ভক্তিব্যঞ্জক।

যে সকল বিদেশী ভ্রমণকারী অস্মদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সর্ব্ব প্রথম রল্‌ফ্‌দিচ্ নামা জনৈক ইয়ুরোপীয় পরিব্রাজকের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে বাকলায় ভ্রমণ করিতে আসেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে বাকলা সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

[বঙ্গদেশান্তর্গত চাটিগাঁও (চট্টগ্রাম) হইতে বাকলা আসিলাম; এই স্থানের রাজা হিন্দু এবং তাহার স্বভাব খুব ভাল। * ইনি বন্দুক ব্যবহার করিতে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেন। ইহার রাজ্য বিস্তীর্ণ এবং ভূমি শস্যশালিনী; এই স্থানে বহু পরিমাণ রেশম নির্ম্মিত ও সূত্র নির্ম্মিত বস্ত্র এবং অনেক শস্যপরিপূর্ণ গোলা দেখিলাম। বাসগৃহগুলি দেখিতে সুন্দর, উচ্চ রাজপথ, বর্ত্মগুলি প্রশস্ত এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অধিবাসিগণের কটিদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত বস্ত্রাবৃত, অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনাবৃত। স্ত্রীলোকদিগের আকৃতি সুন্দর, তাহারা গলদেশে, নাকে, কাণে, হাতে, পায় প্রায় সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণ রৌপ্য নির্ম্মিত; নানা প্রকার অলঙ্কার পরিধান করিয়া থাকে; আমি কয়েকজনের পরিধানে হস্তীদন্ত নির্ম্মিত মূল্যবান অলঙ্কার দেখিলাম।]

এসিয়াটীক জরনেলে আরও কয়েকজন ভ্রমণকারী এবং খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ১৫৯৮ এবং ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ ধর্ম্মপ্রচারক, ফ্রান্সিস্ ফারনেন্‌ডেজ্ (Francis Farnandaz) ডোমিনিক্ ডাসোসা, (Dominic dasosa) এবং এন্‌ড্রু বাউস্ (Andrew Bows) প্রভৃতি বাকলায় অবস্থান করিয়াছিলেন। তাহারা বাকলা

* রাজা কন্দর্পনারায়ণ।

সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন যে তাহাদের আগমনে বাকলাধিবাসী খৃষ্ঠানগণ ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণের জন্য রাজাকে বলিয়া কতিপয় মাস তাহাদিগকে বহু যত্নে তথায় রাখিয়াছিল। রাজাও তাহাদের বিশেষ সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, এবং ধর্ম্মপ্রচারার্থ অনুমতিপত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে মেলকয়র ফন্‌সিক (Melchoir Fonseca) নামক জনৈক খৃষ্টধর্ম্মযাযক বাকলায় আসিয়াছিলেন; তিনি রাজা এবং রাজসভা সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ নিম্নে লিখিত হইল।

* * *

[আমি তথায় (বাকলার রাজধানীতে) পৌঁছিলে, রাজা আমাকে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য জনৈক দূত প্রেরণ করিলেন, এবং বলিয়া দিলেন যে, আমার সমভিব্যাহারী পর্ত্তুগীজগণও আমার সঙ্গে রাজদর্শন করিতে যাইতে পারিবে। আমি আমার সঙ্গীয় অনুচরবর্গসহ সভাগৃহে প্রবেশ করিলাম। সভাগৃহ দীর্ঘ এবং প্রশস্ত; নানা প্রকার স্বর্ণরৌপ্যাদি জড়িত বস্ত্র দ্বারা সজ্জিত; সুদৃশ্য এবং মূল্যবান বস্ত্র দ্বারা সমস্ত গৃহভিত্তি মণ্ডিত। ঠিক মধ্যস্থলে এক বিচিত্র উচ্চাসনে রাজা বসিয়াছিলেন; তাঁহার বয়স আট নয় বৎসরের বেশী বোধ হইল না *। আমি প্রবেশ করিলে, সভাসদ, সর্দ্দার এবং উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে রাজার পার্শ্বে স্বতন্ত্রাসনে উপবেশন করাইলেন। নানা প্রকার শিষ্টালাপের পর রাজা আমাকে কোথায় যাইব জিজ্ঞাসা করিলে, আমি বলিলাম যে আমি "চণ্ডীকানে" † মহারাজের ভাবী শ্বশুর মহাশয়ের রাজ্যে গমন করিব। ঈশ্বরের কৃপায় মহারাজের রাজধানী দিয়া যাইবার সময় আপনার সন্দর্শন-লাভ করিতে আসিয়াছি। রাজা আমার আলাপে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন যে তিনি পূর্ব্বেই তাঁহার রাজ্যস্থিত ফিরিঙ্গি (পর্ত্তুগীজ) গণের প্রমুখাৎ আমার অনেক সদ্‌গুণের কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছেন;

* রাজা রামচন্দ্র রায়, (কন্দর্প নারায়ণের পুত্র)।

† যশোহরের যাবনিক নাম, রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজধানী। প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য এবং খুল্লতাত বসন্ত রায়, চাঁদখান নামক জনৈক পাঠান ওমরাহের নামানুসারে, সুন্দরবন প্রদেশে রাজধানী স্থাপন করেন; পরে প্রতাপাদিত্য স্বাধীন হইয়া উহা যশোহর নামে অভিহিত করেন।

এখন তাঁহার দ্বারা আমার কোন উপকার হইলে, তিনি সন্তুষ্টচিত্তে তাহা করিতে প্রস্তুত আছেন। আমি তখন রাজার নিকট খৃষ্টানদের জন্য একটী মন্দির নির্ম্মাণ এবং তাঁহার রাজ্যমধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের অনুমতি প্রার্থনা করিলাম; রাজা সন্তুষ্ট চিত্তে তৎক্ষণাৎ অনুমতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক আমাকে তৎসূচক অনুজ্ঞালিপি প্রদান করিলেন। রাজা বয়সে বালক হইলেও তাঁহার আলাপ, ব্যবহার প্রভৃতি শিষ্টতাপূর্ণ, বিজ্ঞ এবং প্রবীণ জনোচিত। আমি এই দেশে (ভারতবর্ষে) আসিয়া এরূপ অভ্যর্থনা ও সদ্ব্যবহার আর কোথাও পাই নাই।]

আমরা যে সময়ের ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করিতেছি, সেই সময়ে সন্দ্বীপ বাকলা রাজত্বের অধীনে ছিল। ইহার সঙ্গে আমাদের বাকলার যে টুকু সম্বন্ধ আছে, তাহাই বর্ণনা করিতে হইবে।

পাঠান অভ্যুদয়ের পর হইতেই বঙ্গদেশের স্বাধীন নৃপতিগণের ক্ষমতা অল্প বিস্তর হ্রাস হইতে লাগিল; এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে বিদেশী দস্যুগণ সময়ে সময়ে নিম্নবঙ্গে এবং সমুদ্রোপকূলস্থিত রাজ্যে লুণ্ঠনাদি করিত। এই দস্যুদিগের মধ্যে মগ এবং পর্ত্তুগীজ দ্বারা এই দেশের যত ক্ষতি হইয়াছে, অন্যান্য জাতি কর্ত্তৃক তাহার শতাংশের একাংশও হয় নাই। এই দুই জাতি কখনও বা একত্র, কখনও বা বিভিন্ন ভাবে আক্রমণ করিয়া নগর ও গ্রাম প্রভৃতি উৎসাদিত করিত। রাজা তাহাদের সম্যক-রূপে দমন করিতে পারিতেন না, কখন কখনও দস্যুগণ কর্ত্তৃক রাজসৈন্য পরাজিত ও বিনষ্ট হইত। এই সময়ে মোগল রাজত্বের সূত্রপাত হইল। দেশমধ্যে অরাজক উপস্থিত হইল; এই সুযোগে মগ এবং পর্ত্তুগীজগণও বাকলায় স্থানে স্থানে এরূপ নৃশংসভাবে লুঠ, হত্যা, প্রভৃতি নারকীয় কার্য্য করিতে লাগিল যে, তাহাতে হতাবশিষ্ট অধিবাসী অথবা তৎপর্শ্বস্থ গ্রামবাসি-গণ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। এই সময় হইতে বাকলার দক্ষিণ সীমাস্থিত সমুদ্রোপকূলে যতগুলি দেশ ছিল, তাহা একেবারে জনশূন্য হইয়া কালে সুন্দরবনে পরিণত হইল। আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান বাখরগঞ্জের দক্ষিণ সীমাস্থিত সুন্দর বনে অনেক ইষ্টক নির্ম্মিত বাস-ভবন, বৃহৎ পুষ্করিণী, রাস্তা প্রভৃতি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সন্দ্বীপ তৎকালে অতীব শস্যশালী এবং ধনজনপূর্ণ জনপদ ছিল।

এই স্থানে যে লবণ প্রস্তুত হইত, সমগ্র বঙ্গদেশে সেই লবণ ব্যবহৃত হইত। উল্লিখিত অরাজকতা এবং দস্যুভীতির সময় শ্রীপুর নিবাসী দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক, চাঁদরায় ও কেদার রায় * এই স্থান হস্তগত করেন; তাঁহারাও ইহা অনেক দিন ভোগ করিতে পারেন নাই। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে অথবা তৎপর বৎসর আরাকান নিবাসী মগ এবং পর্ত্তুগীজ দস্যুগণের সঙ্গে সন্দ্বীপ উপলক্ষে তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। পাপীষ্ঠ আরাকানবাসিগণ ক্রীত দাসদাসীর জন্য সন্দ্বীপ এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের প্রতি অত্যাচার করিত; এবং পর্ত্তুগীজদের মধ্যে কয়েক জনকে এইরূপ কৃতদাসরূপে আরাকানে প্রেরণ করিয়াছিল, ইহাই বিবাদের কারণ। এই যুদ্ধে পর্ত্তুগীজগণ পরাজিত হইয়া শ্রীপুর, চণ্ডীকান এবং বাকলায় বাস করিতে লাগিল। এই সকল পরাজিত পর্ত্তুগীজগণের মধ্যে সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

এই সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালের জীবনের সঙ্গে সন্দ্বীপের ইতিহাস জড়িত; তাই আবশ্যক বোধে তাহাঁর জীবনী উল্লেখ করিতে হইল।

সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালে পর্টুগাল রাজ্যের রাজধানী লিসবন নগরের নিকট সেণ্ট এণ্টলিটোরজেল নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করে। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে পৌছিয়া বঙ্গদেশে সৈনিক শ্রেণীভুক্ত হয়। তারপর কিছুদিন পরে সৈনিক বৃত্তি ত্যাগ পূর্ব্বক সন্দ্বীপে আসিয়া লবণের ব্যবসায় ব্রতী হইল। কিছু দিন পরে তাহার লবণের ব্যবসায় লাভ হওয়ায় সে নৌকা যোগে লবণ এবং অন্যান্য বাণিজ্য দ্রব্য ব্রহ্মদেশান্তর্গত আরাকান রাজ্যে চালান দিতে লাগিল। ব্যবসা দ্বারা ধন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যলিপ্সা তাহার হৃদয় অধিকার করিল।

এই সময়ে আরাকানরাজ সন্দ্বীপ আক্রমণ করিয়া তথাকার অনেক পর্ত্তুগীজকে হতাহত করেন, এবং কতককে ক্রীতদাস করেন। সিবাষ্টিয়ান প্রভৃতি কয়েকজন পর্ত্তুগীজ তখন বাকলায় আসিয়া রাজা রামচন্দ্রের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং তথায় বাস করিতে থাকে। পরে রাজার সঙ্গে এইরূপ বন্দোবস্ত হয় যে, তিনি যদি সন্দ্বীপ জয়ের জন্য তাহার সাহায্য

---

* ইহাদের বংশধরগণের মধ্যে কেহ কেহ এখনও সাহাবাজপুর বাস করিতেছেন।

করেন, আর যদি কার্য্যোদ্ধার হয়, তবে সিবাষ্টিয়ান তাঁহাকে (রাজাকে) সন্দ্বীপের অর্দ্ধেক আয় প্রদান করিবে। তদনুসারে রাজা তাহাকে কয়েকখানি সৈন্যপূর্ণ জাহাজ এবং বহুসংখ্যক অশ্বারোহী প্রদান করেন। সিবাষ্টিয়ান এইভাবে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ১৬০৯ খৃঃ অব্দে সন্দ্বীপ জয় করে। ক্রমে ক্রমে তাহার ক্ষমতা এত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে অতি অল্পদিনের মধ্যেই সে সমস্ত সন্দ্বীপের অধীশ্বর হইল। তাহার সৈন্য সংখ্যাও দেখিতে দেখিতে বর্দ্ধিত হইল। সহস্রাধিক পর্ত্তুগীজ সৈন্য, দ্বি সহস্র দেশী সৈন্য, দুইশত অশ্বারোহী এবং অশীতি রণতরী সর্ব্বদাই তাহার আদেশার্থে প্রস্তুত থাকিত।

জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া গঞ্জালে নিকটবর্ত্তী ভূম্যধিকারিগণের প্রতি বড় অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সম্পত্তি নিজ রাজ্যান্তর্গত করিতে লাগিল।

নিকটবর্ত্তী অন্যান্য রাজা এবং ভূম্যধিকারিগণ, অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া গঞ্জালের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহার ঔদ্ধত্য এবং রাজ্যলিপ্সা হ্রাস পাইল না। যে বাকলারাজ দুর্দ্দিনে এবং অসময়ে তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহাকে সন্দ্বীপের অর্দ্ধেক রাজকর দেওয়া দূরে থাক, বিশ্বাসঘাতক গঞ্জালে বাকলান্তর্গত সাহাবাজপুর জয় করিয়া নিজ রাজ্যভুক্ত করিল।

সাহাবাজপুর সন্দ্বীপ অপেক্ষা অনেক বৃহৎ; এই রাজ্য সিবিষ্টিয়ানের করায়ত্ত হইলে, তাহার ধন এবং জনবল উভয়ই বর্দ্ধিত হইল। এই সময়ে গৃহ বিবাদোপলক্ষে আরাকানরাজ তদীয় ভ্রাতাকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিলে, রাজভ্রাতা অনরগোরম সপরিবারে সন্দ্বীপে আগমন পূর্ব্বক গঞ্জালের আশ্রয় গ্রহণ করেন; এবং গঞ্জালের বিশ্বাস স্থাপন জন্য তদীয় ভগ্নীকে তাহার নিকট বিবাহ দিলেন। বিশ্বাসঘাতক পাপাত্মা সিবাষ্টিয়ান কৌশলক্রমে অনরগোরমকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিয়া তাঁহার বিধবা পত্নী এবং সকল ধন হস্তগত করতঃ নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা এণ্টোনিটিবুর সহিত বিধবাকে বিবাহ দিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু রাজরাণী বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না।

এই প্রকার লোমহর্ষণ নারকীয় কার্য্যে সকলে এতদূর বিরক্ত হইল যে, অনেকে গোপনে রাজ্যত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে লাগিল, কিন্তু কেহ সাহস করিয়া কথাটীও বলিতে পারিল না। কেহ কোন প্রকার অসন্তোষ জনক ভাব প্রকাশ করিলে, সিবাষ্টিয়ান তৎক্ষণাৎ তাহাকে এরূপ নৃশংস-ভাবে কঠোর শাস্তি প্রদান করিত যে ভয়ে রাজ্যস্থ লোক সর্ব্বদা কম্পান্বিত থাকিত।

ইহার অল্পদিন পরেই সিবাষ্টিয়ান পূর্ব্ব শত্রুতা শোধের জন্য আরাকান-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিল। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হইল। এবার ভাগ্যলক্ষ্মী পর্ত্তুগীজরাজের অঙ্কশায়িনী হইলেন। সিবাষ্টিয়ান, আরাকান প্রদেশের প্রধান বাণিজ্য স্থান লুণ্ঠন করিবার পর সন্ধি সংস্থাপিত হইল।

এদিকে মোগল-সূর্য্য ভারতাকাশে উদিত হইয়া ধীরে ধীরে রশ্মিজাল বিস্তার করিতেছিলেন। সিবাষ্টিয়ান এবং আরাকানরাজ উভয়ই একযোগে মোগলদিগকে তাড়াইয়া দিবেন, সন্ধিপত্রে এরূপ একটী চুক্তিও থাকিল। প্রতিভূ স্বরূপ সিবাষ্টিয়ানের ভ্রাতুষ্পুত্র আরাকানরাজের নিকট রহিল।

ক্রমে আরাকানরাজের সহিত মোগলদিগের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল; এই যুদ্ধে মোগলগণ পরাজিত হইলেন। সিবাষ্টিয়ান বিনা বাক্য ব্যয়ে পথ ছাড়িয়া দিয়া পরাজিত মোগল সৈন্যদিগকে নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিতে দিল, এবং পুরস্কার স্বরূপ মোগল সেনাপতির নিকট প্রভূত অর্থ প্রাপ্ত হইল। পশ্চাদ্ধাবিত মগ সৈন্যগণ এবং তাহাদের যুদ্ধজাহাজ সমূহ তাহার নিকটবর্ত্তী হইলে, গঙ্গাগালে হঠাৎ তাহাদের আক্রমণ করতঃ প্রায় সকলকেই নিহত করিয়া জাহাজগুলি হস্তগত করিল।

এই মিত্রদ্রোহিতা এবং কৃতঘ্নতায় তাহার পক্ষের অনেক লোক নিতান্ত বিরক্ত হইয়া ধীরে ধীরে অপসারিত হইতে লাগিল। এই প্রকার বিশ্বাস-ঘাতকতার আচরণ, আরাকানরাজের কর্ণগোচর হইলে তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া সিবাষ্টিয়ানের প্রতিভু স্বরূপ রক্ষিত ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিধন পূর্ব্বক, তাহার শবদেহ সমুদ্রতীরে একটা উচ্চ লৌহ শলাকায় বিদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেন। নিজ রাজ্যে প্রত্যাগমনকালে দুরাত্মা সিবাষ্টিয়ান তাঁহার সুকীর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিল, মনে কোনরূপ অনুতাপ হইল কিনা ভগবান্ জানেন।

আরাকানপতি প্রতিহিংসা লইবার জন্য তুমুল আয়োজন করিলেন। বহুসংখ্যক সৈন্য, যুদ্ধ জাহাজ, কামান প্রভৃতি লইয়া তিনি সন্দ্বীপ আক্রমণ করেন, সিবাষ্টিয়ানের পক্ষের অনেক লোক তাহার ঘৃণিত আচরণে পূর্ব্বেই পক্ষ ত্যাগ করিয়াছিল। তথাপিও দীর্ঘকালব্যাপী তুমুল সংগ্রামের পর আরাকানরাজ, সিবাষ্টিয়ানের মুণ্ড ছেদন পূর্ব্বক স্বরাজ্যে লইয়া গেলেন। পর্ত্তুগীজদিগের সন্দ্বীপে কোন চিহ্ন রাখিলেন না, কতকগুলি কৃতদাসরূপে আরাকানে নীত হইল, কতকগুলি পলায়ন করিল, অবশিষ্ট গুলি, তরবারি অথবা বন্দুকের গুলিতে প্রাণ হারাইল। এইরূপে সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালের রাজত্ব ধ্বংস হইল; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সন্দ্বীপ হইতে পর্ত্তুগীজের নাম লোপ হইল।

জয়োল্লাসোন্মত্ত আরাকানপতি তৎপর বাকলা আক্রমণ করিয়া অনেক স্থান বিধ্বস্ত করিলেন। তৎকালে রাজা রাজধানীতে ছিলেন না, রাজ্যস্থিত অন্যান্য লোক তখন অসম সাহসে মগদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল।

পলায়িত পর্ত্তুগীজদিগের মধ্যে অনেকে শ্রীপুর, চট্টগ্রাম, ভুলুয়া, বাকলা প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিল। তাহাদের বংশধরগণ মধ্যে অনেকে, এই জিলার অন্তর্গত বাখরগঞ্জ থানার অধীনে পাদ্রী-শিবপুর এবং নলছিটী থানার অধীনে রাজাবাড়িয়া প্রভৃতি স্থানে বসতি করিতেছে। পাদ্রী-শিবপুরের পর্ত্তুগীজদের মধ্যে অনেকেই সমৃদ্ধিশালী; তন্মধ্যে ডি, সিলভা পরিবারগণ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

পর্ত্তুগীজদের ন্যায় মগ জাতিও অস্মদ্দেশে যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল, তাহার চিহ্ন এখনও অনেক স্থানে বর্ত্তমান আছে। তাহাদের উপর তখন অস্মদ্দেশীয় লোকের এরূপ একটা ঘৃণা এবং ভয় ছিল যে, প্রাণান্তেও কেহ তাহাদের নিকটে যাইত না। দৈবাৎ কোথাও দেখা হইলে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিত। কোন মগ, কোন হিন্দুর বাড়ীর উপর দিয়া চলিয়া গেলে, তৎক্ষণাৎ তাহার জাতি নষ্ট হইত। এরূপ অনেক "মগে-ব্রাহ্মণ" "মগে-শূদ্র" "মগে-নাপিত" ইত্যাদি সাহাবাজপুর প্রভৃতি স্থানে বর্ত্তমান আছে। সমাজে এখনও কেহ তাহাদের জল স্পর্শ করে না। স্বজাতীর মধ্যে তাহাদের সমাজ পর্য্যন্ত বদ্ধ।

দেশ বিখ্যাত পণ্ডিত প্রতাপ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় এসিয়াটীক সোসাইটীর

সভায় "সন্দ্বীপ" সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি সন্দ্বীপকে প্রাচীন সোমদ্বীপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা মহাভারতে এক সোমদ্বীপের কথা দেখিতে পাই। মহাবীর পক্ষীন্দ্র গরুড়, স্বীয় বিমাতৃতনয় নাগদিগকে পৃষ্ঠে লইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। যে সকল দ্বীপ, উপদ্বীপে পক্ষীরাজ গমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রমণীয়ক, এবং সোমদ্বীপের নাম উল্লেখ আছে। * উল্লিখিত পণ্ডিতপ্রবর, বর্ত্তমান আরাকানকে পুরাকালের রমণীয়ক, এবং সন্দ্বীপকে সোমদ্বীপ স্থির করিয়াছেন। † মিঃ বেভারিজ্‌ও সন্দ্বীপকে সোমদ্বীপ অথবা সোমের দ্বীপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ‡

সাহাবাজ খাঁ নামে জনৈক মুসলমান সেনাপতি ¶ এদেশে আগমন করিয়া মগ এবং পর্ত্তুগীজ দস্যুদের উৎপাত অনেকটা দমন করেন। তাঁহারই নামানুসারে সাহাবাজপুর নাম হইয়াছে। তিনি এই স্থানে গড়-বন্দী করিয়া বহু সৈন্য সহ অনেক দিন পর্য্যন্ত ছিলেন। অদ্যাপি সাহাবাজপুরের স্থানে স্থানে সেই চিহ্ন দেখা যায়। দস্যুদমন হইলে, সাহাবাজ খাঁ স্থানীয় রাজা ও অন্যান্য ভূম্যধিকারিগণের প্রতি শান্তি স্থাপনের ভার দিয়া রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন।

সেই সময় হইতে কয়েক বৎসর বাকলার রাজা এবং শ্রীপুরের রাজা, উভয়ই মগ দস্যুগণকে দূরীভূত করিয়াছিলেন। মোগলকুল-গৌরব-রবি সম্রাট আকবরের রাজত্বের শেষ সময়ে, শ্রীপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়, যশোহরের প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি ভৌমিকগণ বিদ্রোহী হ'ন। তাঁহাদের দমনার্থ সম্রাট জাহাঙ্গীর, অম্বরাধিপ মহারাজ মানসিংহকে বহু সৈন্য সহ বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন; ফলে ভৌমিকগণ সমূলে নির্ম্মূল হইলেন।

* মহাভারত-আদিপর্ব্ব, আস্তীক পর্ব্বাধ্যায়। (মূল)

† Asiatic Society's Proceedings, 1868.

‡ H. Beveridge's History of Bakarganj, Page 38.

¶ এই সাহাবাজ খাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক বিরোধ দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন যে তিনি আকবরের সেনাপতি, আবার কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, তিনি আকবরের পূর্ব্বের লোক। আইন-ই-আকবরিতে কিন্তু সাহাবাজ খাঁর নাম নাই; অথচ সাহাবাজপুর মহাল আছে। ইহা দ্বারা অনেকে অনুমান করেন যে সাহাবাজ খাঁ, সম্রাট আকবরের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে। এই বিষয়ে স্থানান্তরে আলোচনা করা যাইবে।

তখন বাকলারাজ রাজা রামচন্দ্র বড় বিপন্ন ছিলেন; আমরা সে কথা পরে বলিব।

এই সময়ে সুযোগ পাইয়া মগগণ অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়া উঠিল; দলে দলে বিভক্ত হইয়া, স্থানে স্থানে গৃহদাহ ও গৃহস্থের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন প্রভৃতি অমানুষিক অত্যাচার করিতে লাগিল। এমন কি তাহারা বর্ত্তমান খুলনা জিলায়ও যে সমস্ত অত্যাচার করিয়াছে, কোন কোন স্থানে তাহার চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। কখন বা নৌকারোহণে, কখন বা দলবদ্ধ হইয়া পদব্রজে গ্রামের মধ্যে অত্যাচার করিত। বর্ত্তমান চন্দ্রদ্বীপ পরগণায়ই এই অত্যাচার অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল; এমন কি বর্ত্তমান ঝালকাঠী থানার নিকটবর্ত্তী প্রভৃতি স্থানেও অদ্যাপি তাহাদের পূর্ব্ব অত্যাচারের চিহ্ন সকল পরিলক্ষিত হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে বারভূঁইয়ার মধ্যে মহারাজ প্রতাপাদিত্য এবং চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের ধ্বংস হইতেই বাকলার রাজার ক্ষমতা এবং রাজ্য অনেক পরিমাণে হ্রস্বতা প্রাপ্ত হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহার মগ দস্যুদের অত্যাচার নিবারণ করিবার ক্ষমতা ছিল না। এই জন্য বাদসাহের সাহায্য লইতে হইত। সম্রাট জাহাঙ্গীর তখন ভারত-সিংহাসনে সমাসীন। সময় সময় সম্রাট কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বঙ্গদেশীয় রাজ প্রতিনিধি কদাচিৎ এই দস্যু দমন করিতেন; কিন্তু সৈন্য সামন্ত প্রত্যাগত হইলে, দৌরাত্ম্য পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইত। এই কারণে বাকলার দক্ষিণ প্রান্তস্থিত অনেক গ্রাম একেবারে উৎসন্ন হইয়া বর্ত্তমানে নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের দেহাবসানের পর তদীয় পুত্র সাহজাহান ভারত সিংহাসনারোহণ করেন। তাহার মধ্যম পুত্র সুলতান সুজা ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া রাজমহলে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন।

মগ দস্যুগণ, তখন বর্ত্তমান নলছিটী এবং তন্নিকটবর্ত্তী অনেক স্থান অধিকার পূর্ব্বক দলবদ্ধ হইয়া একত্র বাস করিতেছিল। বর্ত্তমান বাখরগঞ্জের পশ্চিম, খুলনা জিলান্তর্গত বাগেরহাট, পূর্ব্বে সাহাবাজপুর, দক্ষিণে গলাচিপা এবং উত্তরে গৌরনদী পর্য্যন্ত তাহাদের অত্যাচার, লুণ্ঠন প্রভৃতি অবাধে সম্পন্ন হইত। অধিবাসিগণ, তাহাদের আগমন বার্ত্তা শুনিলে,

দ্রব্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ত্রীপুত্রপরিবারাদি লইয়া জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিত।

বর্ত্তমান নলছিটী নদীর উভয় তীরে তখন মগগণ রীতিমত গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। তখন এই স্থান নদীর চর ছিল, তাহাদের উপনিবেশ স্থান বলিয়া "মগের গড়" নাম হইয়াছিল। এখন এই স্থান "মগর" নামে অভিহিত; এখানে অনেক সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ সন্তান বাস করিতেছেন। মগদিগের এই প্রকার অমানুষিক অত্যাচার রাজ প্রতিনিধির কর্ণগোচর হইলে, সুলতান সুজা মহতী সেনা সঙ্গে লইয়া স্বয়ং তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন এবং মগোপনিবেশের সন্নিকটেই গড়বন্দী করিয়া শিবির সংস্থাপন করেন। নলছিটী নদীর উত্তর কূলে উক্ত গড়ের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। যদিও তাহার অধিকাংশ নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে, কোন ইষ্টকালয়ের চিহ্নও বর্ত্তমান নাই; তথাপি মৃত্তিকা নির্ম্মিত উচ্চ প্রাচীর, দুইটী সুবৃহৎ জলাশয়, এখনও তাহার কীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। সুজা কর্ত্তৃক শিবির সংস্থাপন হেতু তাঁহারই নামানুসারে ইহার নাম "সুজাবাদ" হইয়াছে।

মগদিগের সঙ্গে সুলতান সৈন্যের দুই দিবসব্যাপী ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, মগগণ এই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া অনেকে হতাহত হইল; কতকগুলি পলায়ন করিল, কতকগুলি বন্দী হইল। এই যুদ্ধেই মগগণ এরূপ ভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছিল যে, তাহারা একেবারে হীনতেজ হইয়া অনেকে এ দেশ হইতে পলায়ন করিল। সুলতান সুজা, তাঁহার অধীনস্থ যে সমস্ত সৈন্য এই যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদের পরিবারগণকে মগাধিকৃত ভূমি জায়গীর স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। বরিশালের কালেক্টরীতে, বিগত ১৮৪৫ সালে উল্লিখিত মর্ম্মে এক দরখাস্ত প্রদত্ত হইয়াছিল।

আসমান সিংহ নামক জনৈক লোক, ঐ স্থানে বাস করিত; সুলতান প্রদত্ত ঐ জায়গীর তাহারই ভোগ দখলে ছিল; তাঁহার মৃত্যুর পর এখন অন্যের সম্পত্তিভুক্ত হইয়াছে।

এই আসমান সিংহের মৃত্যু সম্বন্ধে ঐ দেশে একটী গল্প আছে। আসমানের স্ত্রী কুলটা ছিল; একটা মুসলমান তাহার উপপতি, আসমান তাহা জানিতে পারিয়া উন্মুক্ত তরবারি হস্তে তাহার শয়ন কক্ষের রুদ্ধ দ্বারে

উপস্থিত হইল। মুসলমান, আসমানের উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে ঐরূপ রুদ্র মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া পশ্চাদ্বার দিয়া পলায়ন করিল। দ্বার উদ্‌ঘাটনে বিলম্ব দেখিয়া আসমান সিংহ পদাঘাতে দ্বার ভগ্ন করতঃ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার স্ত্রীর ক্রোড়ে ছোট একটী শিশু সন্তান ছিল; ক্রোধান্ধ আসমান সিংহ, স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া তরবারির আঘাত করিল; কিন্তু দৈবাৎ সেই আঘাত পাপীয়সী রমণীর উপর না পড়িয়া নিরপরাধী শিশুর শরীর দ্বিখণ্ড করিল। কুলকলঙ্কিনী মৃত সন্তান ফেলিয়া পলায়ন পূর্ব্বক ঘৃণিত জীবন রক্ষা করিল।

হত্যাপরাধে আসমান সিংহের প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা হইলে, তদীয় ভ্রাতা প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া কলিকাতা আপীল করিল। ফলে, বিচারক তাহাকে মুক্তি দিলেন। এই সংবাদ লইয়া তদীয় ভ্রাতা অতি দ্রুতগামী অশ্বারোহণে রওনা হইল। সে যে সময় আসিয়া পৌছিল, তাহার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে আসমান সিংহের ফাঁসি হইয়াছে। তাহার প্রাণহীন দেহ ফাঁসিকাষ্ঠে দুলিতেছে।

এই শোচনীয় ঘটনা সম্বন্ধে অতি সুন্দর কয়েকটী কবিতা আছে। আসমান সিংহের বাড়ীর চিহ্ন এখন আর নাই, সমস্তই নদী গর্ভে বিলীন হইয়াছে।

ঝালকাঠীর নিকটবর্ত্তী রূপসিয়া এবং রাজাপুর আউট পোষ্টের অন্তর্গত আরও দুইটী মৃত্তিকানির্ম্মিত গড়ের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। ইহাও মগ দস্যুদের দমনার্থ সৈন্য সমাবেশ করিতে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। এই উভয় গড়েরই অধিকাংশ নদী গর্ভে বিলীন হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও যাহা আছে, তাহাতে উহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

রেনেল সাহেব কৃত বাখরগঞ্জের প্রাচীন মানচিত্রে গলাচিপার নিকট মৃত্তিকা নির্ম্মিত দুর্গের চিহ্ন দেখা যায়। কিন্তু সেই স্থানও নদী গর্ভে বিলীন হওয়াতে এখন উক্ত দুর্গের অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। এই দুর্গ কাহার দ্বারা কোন সময় নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে মগ অথবা পর্ত্তুগীজ দস্যুদিগকে দমন করিবার জন্য যে এই দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল এরূপই সম্ভব।

বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকদের মধ্যে প্রতাপাদিত্য ও ইসা খাঁ ব্যতীত

অন্য কোন নৃপতির রাজ্যে অথবা রাজধানীতে কোন দুর্গ নির্ম্মাণের কথা শুনা যায় না। বাকলার রাজধানী কচুয়া হইতে মাধবপাশা স্থানান্তরিত হইলে তথায়ও কোন দুর্গ অথবা পরিখা দেখা যায় নাই। কেবল রাজধানীর দক্ষিণপশ্চিমপ্রান্ত-বেষ্টিত "রাজার বেড়" নামক একটি ক্ষুদ্র নদী দৃষ্ট হয়। বঙ্গীয় ভূপতিদিগের মধ্যে বাকলাধিপতি রাজ্য রক্ষা সম্বন্ধে কতকটা অসাবধান ছিলেন ; তাই বিদেশী মগ এবং পর্ত্তুগীজ দস্যুগণ অন্যান্য রাজ্যাপেক্ষা তাঁহার রাজত্ব মধ্যে অধিকতর অত্যাচার করিয়াছে।

যবন নরপতিগণের অভ্যুদয়, তৎসঙ্গে সঙ্গে দস্যুৎপীড়ন, এবং সর্ব্বাপেক্ষা রাজ্যরক্ষার শিথিলতাই বাকলা রাজ্য ধ্বংসের কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। তাঁহার রাজত্ব মধ্যে অসংখ্য পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন বটে কিন্তু কোন অস্ত্রশস্ত্রবিৎ যোদ্ধৃপুরুষ অথবা কোন উপযুক্ত সেনাপতি যুদ্ধস্থলে সৈন্য পরিচালনা করিয়া বিপক্ষদমন করিয়াছিলেন বলিয়া কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। বঙ্গীয় ভৌমিকগণের স্বতন্ত্র ইতিহাসে অনেকেরই উপযুক্ত সৈন্য এবং সেনাপতির পরিচয় পাওয়া যায়, কেবল দুর্ভাগা বাকলার বিষয়ে ইতিহাস সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। রণচণ্ডীর উলঙ্গ কৃপাণ করে তাণ্ডব নৃত্য অপেক্ষা, বোধ হয় বীণাপাণির বীণাঝঙ্কার বাকলাধিপতির অধিক মনোজ্ঞ ছিল ; এবং এই জন্যই অত্যল্পকাল মধ্যে বাকলার অধঃপতন হইয়াছিল। প্রাচীন দ্বাদশ ভৌমিকগণের মধ্যে চারি পাঁচ জন ব্যতীত আর সকলের অস্তিত্ব এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে ; অভাগিনী বাকলা দীনা কাঙ্গালিনীর মত অনেক দিন হইল কালের বিশ্বব্যাপী চিত্রপটে মিলিত হইয়াছে।

১৭২৪ হইতে ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে ব্রোক সাহেব বাখরগঞ্জের যে ম্যাপ প্রস্তুত করেন তাহাতে সমুদ্রের উপকূল প্রান্তে বাকলা দ্বীপ বলিয়া উল্লেখ আছে। মিঃ বেভারিজ সাহেব এই স্থানকে মাধবপাশার রাজগণের প্রাচীন রাজধানী কচুয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই মানচিত্রাঙ্কিত বাকলার চিহ্ন এখন বর্ত্তমান নাই, কেবল কচুয়াস্থিত ভূতপূর্ব্ব রাজধানীর কতক চিহ্ন দেখা যায় মাত্র।

বাস্তবিক বাকলার স্থিতি সম্বন্ধে বিশেষ গোল দেখা যায় ; কিন্তু কোন ঐতিহাসিকই বাকলার রাজধানীর স্থিতি স্থির নিশ্চয় করিতে পারেন নাই। আইন-ই-আকবরিতে আবুল ফজেল লিখিয়াছেন "সরকার বাকলা সমুদ্র-

কূলে অবস্থিত" কিন্তু ইহা আরাকান রাজ্যে না বঙ্গ রাজ্যে, তাহা কিছুই স্থির করেন নাই। আবার পর্ত্তুগীজ ভ্রমণকারী জেরিক্ সাহেব বলেন, "আরাকান এবং সন্দ্বীপ রাজ্যের মধ্যে বাকলা রাজ্য অবস্থিত" ; ইহাতেও কোন স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় না। তবে যত দূর স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, যে বাকলার তদানীন্তন রাজধানী সমুদ্রতীরবর্ত্তী কচুয়া নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান সময় হইতে পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে সমুদ্র যে কচুয়ার প্রান্তে অবস্থিত ছিল তাহা এক প্রকার নিঃসন্দেহ। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন, তাঁহার প্রণীত প্রথিত নামা "সৈয়র-অল-মুতক্ষরীণ" গ্রন্থে বাকলা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা অতীব বিস্ময়কর। আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে বাকলা সম্বন্ধে যতটুকু উল্লেখ আছে, মুতক্ষরীণেও প্রায় ততটা আছে। কিন্তু বাকলা নাম স্থলে গোলাম হোসেন "হোগলা" লিখিয়াছেন।* বাকলা, কি প্রকারে "হোগলা" হইল বুঝিতে পারিলাম না ; উক্ত গ্রন্থকার, নিম্ন বঙ্গের প্রায় সমস্ত অংশটাকেই "সরকার হোগলা" বলিয়া গিয়াছেন। এই সম্বন্ধে বিখ্যাত ঐতিহাসিক মিঃ ব্লকম্যান সাহেব বলেন যে, গোলাম হোসেন "ব" স্থানে ভুল বশতঃ "হ" ব্যবহার করিয়া থাকিবেন ; অথবা তৎকালে নিম্ন বঙ্গে প্রভূত পরিমাণে হোগল জন্মিত, হয়ত সেই কারণবশতঃই মুতক্ষরীণ প্রণেতা, ঐরূপ নাম পরিবর্ত্তন করিয়া থাকিবেন। বিশেষতঃ আইন-ই-আকবরি গ্রন্থ প্রায় সার্দ্ধ দ্বিশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে, এবং মুতক্ষরীণ তাহারই অবিকল অনুবাদ ; সুতরাং ব্লকম্যান সাহেব আইন-ই-আকবরিতেই অধিকতর বিশ্বাস করিয়াছেন।†

---

* The Sarkar of Bakla (is termed) in the Siyar-ul-Mutaakhirin, Hugla and said to be called so from the well-known grass of that name (Typha elephantina) which here abounds.—Colonel Jarrett's Ain-i-Akbari, Vol. II P. 123. (foot note)

† There is a difficulty connected with the name Bakla. The manuscripts of the Ayin-i-Akbari in my hands give a "B" as the first letter of the name. But the author of the Siyar-ul-Mutaakhirin, who copies the above record of the Cyclone from the Ayin-i-Akbari has "*Hogla*" instead of Bakla and distinctly asserts that the coast of the lower Bengal was thus called from "*Hogla*" a weed used for thatching house. I have, therefore very little faith on him as he wrote two hundred years after Abul Fazel in 1788.—Asiatic Society's Proceedings, 1868 (Paper read by Mr. Blochman).

মুতক্ষরীণ গ্রন্থে বাকলা সম্বন্ধে বেশী কিছু উল্লেখ না থাকার একটী কারণ অনুমিত হইতেছে। যে সময়ে উক্ত গ্রন্থ শেষ হইয়াছিল, তখন বাকলার অস্তিত্ব লোপ হইয়া "চন্দ্রদ্বীপ" নামকরণ হইয়াছে। ইহার অনেক পূর্ব্বেই কচুয়া হইতে রাজধানী, বর্ত্তমান মাধবপাশা গ্রামে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ মুতক্ষরীণে রাষ্ট্রবিপ্লব সময়েরই অধিকতর ঘটনা লিপিবদ্ধ; তাই বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিহাসসম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

বৃদ্ধ সম্রাট সাহজাহানকে কারারুদ্ধ করিয়া মোগলকুলপাংশুল ঔরঙ্গজেব ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ, দিল্লীর সিংহাসন লইয়া যখন পরস্পরের হৃদয়-শোণিত পানে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে সুযোগ পাইয়া বিতাড়িত মগ এবং পর্ত্তুগীজ দস্যুগণ পুনরায় দলবদ্ধ হইল এবং সাহাবাজপুর ও মেঘনা নদীর তীরবর্ত্তী অন্যান্য স্থানে অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করিল। কি উপায়ে ঔরঙ্গজেব অন্যান্য ভ্রাতৃবর্গকে পরাস্ত করিয়া সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন;—দারা, সুজা মোরাদ প্রভৃতির কি দশা হইয়াছিল—ইতিহাসজ্ঞ পাঠক তাহা অবগত আছেন।*

সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ঔরঙ্গজেব ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সিংহাসনে আরোহণ করিলেন; তাঁহার ন্যায় কর্ম্মঠ, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান এবং রাজকার্য্যে পারদর্শী সম্রাট আকবরের পর আর কেহ সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। এই সমস্ত রাজোচিত গুণ থাকিলে কি হয়; তাঁহার ন্যায় মিত্রদ্রোহী, সর্ব্বজনে অবিশ্বাসী, কুটীল, স্বার্থপর নরপতি মার্ক এণ্টনির (Mark Antony) পর আর কেহ এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। ঔরঙ্গজেবের এই সমস্ত দোষ না থাকিলে, তাঁহার ন্যায় ভূপতি কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সম্রাট ঔরঙ্গজেব তখন উক্ত দস্যু দমনার্থ বৈদ্যবীর সংগ্রাম সাহকে বহুসৈন্যসমভিব্যাহারে পূর্ব্ববঙ্গে প্রেরণ করেন। তিনি সাহাবাজপুরে

* Berner's Travels in India নামক ইংরাজী গ্রন্থে ঔরঙ্গজেবের রাজ্যলাভ, এবং তৎকর্ত্তৃক নৃশংসভাবে জ্যেষ্ঠ সহোদর দারা ও তৎপুত্রের নিধন, সুলতান সুজার দুর্গতি এবং অবশেষে আরাকান-রাজ কর্ত্তৃক তাঁহার ও তৎপরিবারবর্গের নিধন, বৃদ্ধ সম্রাটের লাঞ্ছনা প্রভৃতি অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা এই গ্রন্থ পাঠ করিতে পাঠককে অনুরোধ করি।

উপস্থিত হইয়া নূতন গড়বন্দী করিলেন, এবং পুরাতন গড় সংস্কার পূর্ব্বক দস্যুদলনে প্রবৃত্ত হইলেন। বহু দিন পর্য্যন্ত "সংগ্রামের-কেল্লা" বলিয়া তাঁহার নির্ম্মিত দুর্গ সাধারণের নিকট পরিচিত ছিল। বর্ত্তমানে এই প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তি মেঘনার বিশাল গর্ভে বিলীন হইয়াছে। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের দৈনন্দিন স্মৃতিলিপিতে সংগ্রামের এই গড়ের বিষয় উল্লেখ আছে। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে এই দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মেহেন্দিগঞ্জ থানার অন্তর্গত এবং ঝালকাঠী থানার অন্তর্গত রূপসিয়ার নিকট দুইটী দুর্গের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। প্রফেসার ব্লকম্যান সাহেব এই দুইটীকেও সংগ্রাম সাহ কর্ত্তৃক প্রস্তুত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।* এই প্রবন্ধে প্রফেসার সাহেব, বাকলা সম্বন্ধেও উল্লেখ করিয়াছেন; তিনি বাকলাকে একটী দ্বীপ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। উল্লিখিত দুর্গ ব্যতীত সংগ্রাম সাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত যে সমস্ত প্রাচীন কীর্ত্তি এদেশে এখনও বিরাজিত আছে, তন্মধ্যে সংগ্রামসাহের স্বনাম প্রতিষ্ঠিত, ঝালকাঠী থানান্তর্গত একটী গ্রাম, এবং তৎসংলগ্ন একটী ক্ষুদ্র খাল অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে।† এই উভয় স্থান, "সংগ্রামনীল" এবং "সংগ্রামনীলের খাল" বলিয়া সর্ব্বসাধারণে পরিচিত, বর্ত্তমানে এই গ্রাম এবং খাল আমাদের স্বত্বাধীনে রহিয়াছে।

বরিশাল যাইবার পথে গৌরীপাশা এবং কুমারখালী হাটের মধ্যে আরও একটী মৃত্তিকা নির্ম্মিত দুর্গের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। আমি যে কয়েকটী মৃদ্দুর্গ দেখিয়াছি, এক সুজাবাদ ব্যতীত, এইটীকেই বৃহত্তর বলিয়া বোধ হইল। ইহার অনেকাংশ এখন নদীগর্ভে বিলীন, তবুও যাহা আছে, তাহা দেখিলে বোধ হয় যে এই দুর্গ নিতান্ত সাধারণ ছিল না। একটী জলাশয়ের চিহ্ন এবং উত্তর-পশ্চিম-প্রান্তে কতকগুলি ইষ্টকস্তূপ গত পূর্ব্ব বৎসর দেখিয়াছিলাম।

এই দুর্গ কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক কোন সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। স্থানীয় প্রবাদ যে, ঐ স্থানে একজন

---

* Calcutta Review (Fringhees in Chattigang) Vol. LIII, Page 73.

† বৈদ্যকুলপ্রদীপ মহারাজ রাজবল্লভের অন্যতম বংশধর আনন্দ নাথ রায় মহাশয় বিগত ১৩০৯ সনের শ্রাবণ মাসের "প্রদীপে" 'সংগ্রামসাহ' শীর্ষক গভীর গবেষণাপূর্ণ এক প্রবন্ধ লিখিয়া সাধারণের নিকট কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন।

প্রতাপশালী হিন্দু ভূস্বামী বাস করিতেন। এই মৃত্তিকা নির্ম্মিত দুর্গ তাঁহারই বসতিস্থান। দুরাচার মগ দস্যুগণ, তাঁহার বাড়ী আক্রমণ করিলে, তিনি যুদ্ধে পতিত হন; তাঁহার পরিবারস্থ রমণীগণ মগদের হস্ত হইতে সতীত্ব রক্ষা করিবার জন্য পুষ্করিণীতে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করেন। স্থানীয় একজন প্রাচীন গৃহস্থ, আমাকে এই গল্প বলিয়া, সেই পুষ্করিণী দেখাইয়া দিলেন। পুষ্করিণীর চিহ্ন আছে বটে, কিন্তু তাহার চতুষ্পার্শে এত জঙ্গল এবং কাঁটা বন যে, তথায় যাইতে সাহসী হইলাম না।

মির জুম্লা, সায়েস্তা খাঁ প্রভৃতি মোগল স্থবেদারগণের সময়ে বাকলা সম্বন্ধে কোন ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তদানীন্তন রাজা অত্যন্ত হীনপ্রভ হইয়াছিলেন, রাজ্য শাসন সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ কোন ক্ষমতা ছিল না; কেন না, রাজ্য সম্বন্ধীয় কোন গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইলেই স্থবেদার কর্ত্তৃক মীমাংসিত হইত। তখন মোগল স্থবেদারের মন যোগাইয়া রাজত্ব রক্ষা করিতে হইত। একবার ষড়যন্ত্রে পড়িয়া নবাবের কোপানলে চন্দ্রদ্বীপের রাজা উদয়নারায়ণ রাজত্ব হারাইয়াছিলেন; আমরা এই সম্বন্ধে পরে বলিব।

নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ যখন বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তখন আগাবাখর নামক জনৈক মুসলমান রাজপুরুষ, সেলিমাবাদ পরগণার সাড়ে এগার আনী এবং বোজরগউমেদপুরের সম্পূর্ণ অধিকার করেন। এই আগাবাখরে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন, কেন না তাঁহারই নামানুসারে সমস্ত জিলার নাম হইয়াছে। *

এখন এই আগাবাখর কে, তাহা একবার জানিতে চেষ্টা করা যাক্। টাইলর সাহেব বলেন যে, আগাবাখর বাখরগঞ্জের জনৈক প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী; উক্ত সাহেব প্রণীত স্থপ্রসিদ্ধ ঢাকার ইতিহাসে (Topography of Dacca) এই সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।

[নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর জামাতা নিবাইস মহম্মদ খাঁ, সরফরাজ খাঁর স্থলে দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইংরাজ

* The District of Bakarganj derives its name from one Aga Bakar, who was a servant of the Nawab of Murshidabad.—H. Beveridge's History of Bakarganj, Page. 13.

রাজত্বের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রসিদ্ধ হোসেন-কুলী খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হোসেনউদ্দিন খাঁ নামক জনৈক রাজপুরুষকে তিনি ঢাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। এই সময়ে বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ সিরাজদ্দৌলাকে ভাবী উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন, তখন মস্‌নদ লইয়া সিরাজদ্দৌলা ও সমৎজঙ্গ (সকৎজঙ্গ) প্রভৃতির সঙ্গে বিষম মনোমালিন্য উপস্থিত হইল। ফলে সমৎজঙ্গের পক্ষীয় হোসেনকুলী খাঁ ও তৎভ্রাতুষ্পুত্র হোসেনউদ্দিন, সিরাজ কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। হোসেনউদ্দিনকে হত্যা করিবার জন্য সিরাজ, আগাসাদক নামে জনৈক মুসলমানকে নিযুক্ত করিলেন; এই আগাসাদক আগাবাখরের পুত্র। আগাবাখর খাঁ তখন বোজরগউমেদপুরে বাসস্থান স্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সর্ব্বদাই ঢাকার শাসনকর্ত্তা হোসেনউদ্দিনের নিকট বাস করিতেন। আগা সাদক ঢাকায় পৌঁছিয়া ভাবী নবাব সিরাজদ্দৌলার আদেশ, এবং তৎকর্ত্তৃক ঢাকার শাসনকর্ত্তৃত্বপদ লাভ প্রভৃতি প্রলোভনসূচক বাক্য পিতার নিকট বলিলেন। পিতাপুত্র উভয়েই এই লোমহর্ষক পরামর্শ স্থির করিয়া নিশীথ সময়ে কয়েক জন সৈনিক সহ নিদ্রিত হোসেনউদ্দিনের অন্তঃপুরে প্রবেশ পুর্ব্বক তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন। প্রভাতে এই পৈশাচিক কার্য্য সাধারণে ব্যক্ত হইলে, অধিবাসিগণ যারপরনাই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তখন আগাবাখর এবং আগাসাদক, সিরাজদ্দৌলার আদেশে এই কার্য্য করিয়াছেন, এবং হোসেনউদ্দিনের পরিবর্ত্তে আগাবাখরই শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছেন, এরূপ বলিলেন। অধিবাসিগণ গতপ্রাণ হোসেনউদ্দিনকে নিরতিশয় শ্রদ্ধা করিত; কেন না, তিনি ন্যায়, ধর্ম্ম এবং দয়ার সহিত শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাহারা তখন আগাবাখরের নিকট বৃদ্ধ নবাব অথবা প্রধান মন্ত্রী নিবাইস মহম্মদের সহী-মোহরযুক্ত পরওয়ানা দেখিতে চাহিল। হত্যাকারিগণ তখন চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন, পাপীষ্ঠের পাপ প্রলোভনে ভুলিয়া যে একজন নির্দ্দোষের প্রাণহত্যা করিয়া চির নরকের পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন, তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন। ক্রোধান্ধ অধিবাসিগণ উত্তেজিত কণ্ঠে পুনঃ পুনঃ সহী-মোহরযুক্ত পরওয়ানা দেখিতে চাহিল। কোথায় পরওয়ানা,—কে দেখাইবে? তখন সকলে উলঙ্গ কৃপাণকরে সেই হত্যাকারিদ্বয়কে

আক্রমণ করিল। দুরাত্মা আগাবাখর তখনই নিপতিত হইলেন, কিন্তু তৎপুত্র আগাসাদক আহত হইয়া কোন মতে পলায়ন পূর্ব্বক ঘৃণিত জীবন রক্ষা করিলেন।] *

স্ক্রাফ্‌টন সাহেবের সঙ্গে টাইলর সাহেবের ইহাতে সামান্য অনৈক্য দেখা যায়। তিনি বলেন যে, আগাবাখর চট্টগ্রাম বিভাগের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। রাজস্ব বাকী পড়ার জন্য, আগাবাখরের পুত্র আগাসাদক, নিবাইস মহম্মদের আদেশানুসারে ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে নীত হন। উক্ত আগাসাদক ঘোরতর মদ্যপায়ী এবং তদ্ধেতু সামান্য পরিমাণ বিকৃতমস্তিষ্ক ছিলেন। সিরাজদ্দৌলার প্রলোভনে সহজেই আগাসাদক উক্ত পাপকার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন, এবং সিরাজও তদনুসারে তাঁহাকে পলায়ন করিতে দিলেন। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর আগাসাদক ঢাকায় পৌছিয়া পিতার সঙ্গে পরামর্শ পূর্ব্বক দ্বাদশজন সৈনিক সহ রাত্রিতে হোসেনউদ্দিনকে বিনাশ করিলেন, এবং প্রকাশ করিলেন যে সিরাজদ্দৌলার আদেশ তাহারা প্রতিপালন করিয়াছে মাত্র। এদিকে নিবাইস মহম্মদ খাঁ, আগাসাদকের পলায়ন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহাকে ধৃত করিবার জন্য ঢাকায় লোক প্রেরণ করিলেন। এই লোক তথায় পৌঁছিলে, সমস্ত রহস্য প্রকাশিত হইল; অধিবাসিগণ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া তখনই তাঁহাদের আক্রমণ করিল। এই যুদ্ধে আগাবাখর নিহত হইলেন, কিন্তু আগা সাদক পলায়ন পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। †

সুপ্রসিদ্ধ গোলাম হোসেন খাঁ, সৈয়র-অল-মুতক্ষীরণে আগাবাখর খাঁকে ঢাকা বিভাগের একজন ধনাঢ্য জমিদার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি হোসেনউদ্দিনের হত্যা সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, টাইলর ও স্ক্রাফ্‌টন সাহেবও প্রায় তাহাই বলিয়াছেন; প্রভেদ এই একটু যে, আগাবাখর স্বয়ং এই হত্যা কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন না। ‡ কোন ঐতিহাসিকই আগা বাখর

---

* Dr. Taylor's Topography of Dacca, Page 83.

† Scrafton's reflections on the Government of Hindustan, Page 40.

‡ Making no distinction between vice and virtue, and paying no regard to the nearest relations, carried defilement, wherever he (Sheerajddaullah) went. In a little time he became so detested as Pharas. People on meeting him by chance, used to say "God, save us from him" ! And his insolence and pride growing to a height by impunity he set at naught, the important services rendered to his

খাঁর পরিচয় দিতেছেন না। কেহ কেহ মাত্র বলেন যে আগাবাখর আফগান নাম, সম্ভবতঃ ইনি পাঠানজাতীয় মুসলমান হইবেন। তিনি যে চট্টগ্রাম প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তাহাই সত্য বলিয়া অনুমিত হয়; এবং বোজরগউমেদপুরে নিজ নামে "গঞ্জ" স্থাপন করিয়া সেলিমাবাদের সাড়ে এগার আনী অংশ যে বলপূর্ব্বক দখল করিয়াছিলেন, তাহাও প্রকৃত। পরে তাঁহারই নামানুসারে সমস্ত জিলার নাম প্রসিদ্ধি লাভ করিল; কিন্তু ইতিহাসে এই আগাবাখর খাঁর, এমন কোন সৎকার্য্যের অথবা প্রসিদ্ধ ঘটনার উল্লেখ দেখিলাম না, যাহাতে তাঁহারই নামানুসারে এই সমগ্র ভূখণ্ডের নামকরণ হইয়াছে। যতটুকু চরিত্র, ইতিহাসে বর্ণিত আছে, তাহাতে আগাবাখর খাঁকে, নরকের কীট অপেক্ষাও জঘন্য বলিয়া বোধ হয়। মিঃ বেভারিজ্ এবং সার হাণ্টার প্রভৃতি মহোদয়গণ ইহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই।

সুপ্রসিদ্ধ এসিয়াটীক রিসার্চ্চে আমরা এক আগাবাখরের উল্লেখ দেখিতে পাই, কিন্তু তাঁহাকে ঢাকার নবাব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

---

uncle and family by both Hossain Cooly Khan and his brother, Hayderali Khan, and he undertook to put them both to death. This was his "*Coup-dessay*"; and to insure success to his design, he made use of some art to gain the heart of a young man, who having had mighty disputes with the officers employed by Hossain Cooly Khan, Deputy Governor of the Province of Dacca, had come over to Murshidabad to complain of them, and had found means to lay his case before Nowaiz Mahamed Khan, who concerned himself in his behalf. His name was Aga Sadak, and his title Sadak at Mahamed Khan, son to Aga Bakar, a considerable zeminder of those parts. Sheerajddaulha engaged him to return to Dacca in order to kill Hossinuddin Khan, nephew to Hossain Cooli Khan and the latter's, Deputy at Dacca, a young man who for some reasons had fallen into a melancholy, that has disordered his senses. The man did exactly as he was bid. Such a murder, committed so bluntly, struck a terror and consternation in the mind of all the inhabitants of that great city, who concluded that an action of that high nature would have never been perpitrated, had not some person of the first rank afforded its countenance. So that everyone remained silent, and thoughtful, until it became known that the perpetrator had no order, and no voucher in his hand. He was therefore set upon by the inhabitants and the friends of Hossain Cooli Khan, who missed the murderer, by mistake, killed his father Aga Bakar. The son having escaped so great a danger, fled to Murshidabad, and by such a step threw away both his peace of mind and the safety of his person.—Siyar-ul-Mutaakhirin, Page 122—123.

অন্যান্য ঐতিহাসিক গ্রন্থে, কিন্তু তদ্বিপরীত পরিলক্ষিত হয়। এই আগা-বাখর ও আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত আগাবাখর একব্যক্তি কি না, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। *

বাখরকাঠী নামক একটী গ্রাম সাহেবগঞ্জ থানায় এখনও পরিলক্ষিত হয়; ইহা আগাবাখরের নামানুসারে হইয়াছে বলিয়া সম্ভব।

কেহ কোন দাম্ভিকতা অথবা ক্রোধের পরিচয় দিলে, অস্মদ্দেশে তাহাকে আগাবাখরের সঙ্গে উপমা দিয়া থাকে। ইতিহাস আগাবাখর খাঁ সম্বন্ধে যাহাই কেন বলুক না, এদেশে কিন্তু তিনি অন্যরূপে পরিচিত। আবাল-বৃদ্ধবনিতা, তাঁহাকে পাপিষ্ঠ, অত্যাচারী, পরস্বাপহারক, দাম্ভিক বলিয়া থাকেন। তৎসম্বন্ধে এই জিলার স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রবাদ প্রচলিত, কিন্তু তিনি যে দুর্বৃত্ত ছিলেন, তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত। আবশ্যকবোধে একটী জনপ্রবাদ উল্লেখ করা গেল।

বোজরগউমেদপুর ও সেলিমাবাদের সাড়ে এগার আনী অধিকার পূর্ব্বক খাঁ সাহেব স্বনামে "গঞ্জ" স্থাপন করিয়া সপরিবারে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অধিকারস্থিত অধিবাসিগণ, কি ভদ্র, অভদ্র, ধনী, নির্ধন আবশ্যকবোধে সকলকেই শারীরিক বা আর্থিক সাহায্য করিতে হইত। প্রজাবর্গের মধ্যে কাহারও গৃহে সুন্দরী যুবতী দেখিলে, তাঁহার আদেশক্রমে কর্ম্মচারিগণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক রাজান্তঃ-পুরে প্রেরণ করিত। কেহ কোন আপত্তি অথবা বাধা বিঘ্ন উপস্থিত করিলে, তাহার দুর্গতির সীমা থাকিত না; ফৌজ আসিয়া গৃহস্থের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত, এবং কাহাকেও বা ধরিয়া লইয়া "নিমকের জ্বালে" চালান দিত।

ইহা অপেক্ষাও অমানুষিক অত্যাচারের কথা স্থানে স্থানে এখনও শুনা যায়। নবাব সিরাজদ্দৌলা যে প্রকার পৈশাচিককাণ্ডের অভিনয় দেখাইয়া ভারতকে চমকিত করিয়া গিয়াছেন,—আগাবাখর তদপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলে কি হয়; তিনিও অত্যাচারে নবাব অপেক্ষা বড় কম ছিলেন না। এই সমগ্র ভূখণ্ড "বাখরগঞ্জ" নামে অভিহিত হইবার ইহাও একটী কারণ অনুমিত হয়।

* See Asiatic Researches—"Arracan."

আগাবাখর, বোজরগউমেদপুরেই প্রথমতঃ স্বনামে "গঞ্জ" স্থাপন করায়, ঐ স্থানটুকু মাত্র তাঁহার নামানুসারে "বাখরগঞ্জ" নামে অভিহিত হইত। পলাশীর যুদ্ধান্তে ব্রিটিস রাজ্য পত্তন হইলে, প্রথমতঃ স্থানীয় রাজধানী পূর্ব্বোক্ত বাখরগঞ্জে স্থাপিত হইয়া শাসনকার্য্য সম্পন্ন হইতে থাকে; অনেক বৎসর পরে কর্ত্তৃপক্ষগণ অনেক অসুবিধা দেখিয়া বর্ত্তমান বরিশাল নামক স্থানে স্থানীয় রাজধানী পরিবর্ত্তন করেন। সেই অবধিই বাখরগঞ্জ বলিয়া পরিচিত হওয়ায়, অদ্যাপি সর্ব্বস্থানে ঐ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। স্থানান্তরে আমাদের এই সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা আছে।

আগাবাখরের নিধনের অল্প পরেই এই দেশে আর একজন মুসলমানের নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে; ইঁহার নাম মহম্মদ ছবিখাঁ। আগাবাখর কুকার্য্য এবং পাপাভিনয়ের দ্বারা এদেশবাসিদের যে প্রকার জ্বালাতন করিয়াছিলেন, ছবিখাঁ ততোধিক উপকার করিয়াছেন। এই জিলায় অনেক স্থানে তিনি প্রশস্ত বর্ত্ম, ইষ্টক নির্ম্মিত সেতু, নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন; কেবল এ জিলায় কেন, যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে তাঁহার নির্ম্মিত বর্ত্ম এবং সেতু অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা "ছবিখাঁর জাঙ্গাল বলিয়া প্রসিদ্ধ, অনেক স্থানে এই সমস্ত বর্ত্ম এখন আর পূর্ব্বরূপ উন্নত অবস্থায় না থাকিলেও, যাহা আছে, তাহা যেরূপ প্রশস্ত এবং উন্নত, বর্ত্তমান সময়ের ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের প্রথম শ্রেণীর রাস্তা গুলিও ততদূর প্রশস্ত এবং উন্নত নহে। এই মহাপুরুষ যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, কালে তাহার লোপ হইলেও লোকে তাঁহাকে সহজে বিস্মৃত হইতে পারিবেনা। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এই মহা পুরুষের কীর্ত্তি ক্রমশঃই লোপ হইতেছে। সরকারি কাগজে যে যে স্থানে ছবিখাঁর জাঙ্গালের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, বর্ত্তমানে এখন অনেক স্থানে তদ্বিপরীত পরিলক্ষিত হইতেছে। স্বার্থ সিদ্ধির মানসে অনেকে ইচ্ছা পূর্ব্বকই এই প্রাচীন কীর্ত্তি লোপ করিতেছেন।

এই মহাপুরুষ যে কোন সময় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না; এমন কি তিনি যে কে, কোথায় আবাস ভূমি, এই দেশের সঙ্গে তাঁহার কি সম্বন্ধ, তাহাও জানা সুকঠিন। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সৈয়দ গোলাম হোসেন, তাঁহার জগদ্বিখ্যাত ইতিহাস সৈয়র-অল-মুতক্ষরীণে এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেন নাই। এক সেউকি খাঁর কথা আছে বটে, কিন্তু

তিনি পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা; বঙ্গদেশে অথবা অন্য কোন স্থানে তৎকর্ত্তৃক কোন সাধারণ হিতকর কার্য্যের কোন উল্লেখই দেখিতে পাইলাম না। মেহেন্দিগঞ্জে একটী মস্‌জিদ আছে, তাহার উপরিস্থিত প্রস্তর-ফলকে লিখা আছে যে, ছবিখাঁ কর্ত্তৃক এই মস্‌জিদ বাঙ্গলা ১১৬১ সালে নির্ম্মিত হইয়াছে। কোটালীপাড়ায় তৎকর্ত্তৃক নির্ম্মিত আরও একটী মসজিদ দেখা যায়, তাহাতেও ছবিখাঁর নাম ব্যতীত অন্য বিশেষ কিছু জানা যায় না।

এই মহাত্মার পরিচয় সম্বন্ধে দেশ প্রবাদ ব্যতীত, অন্য কিছুই জানিবার উপায় নাই; কিন্তু তাহাও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

কেহ কেহ বলেন যে, ছবিখাঁ আলিবর্দ্দিখাঁর পূর্ব্বের লোক; সরফরাজ খাঁ যখন বঙ্গ-বিহারের সুবেদার, তখন এই ছবিখাঁ, পূর্ত্ত বিভাগের জনৈক প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। একদিন নবাব সরফরাজখাঁ, ছবিখাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কোন্ কার্য্য করিলে সর্ব্বসাধারণের চিরস্মরণীয় হওয়া যায়; ছবিখাঁ বলিলেন যে, যদি সর্ব্ব সাধারণের উপকারার্থ, অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া স্থানে স্থানে প্রশস্ত বর্ত্ম, দীঘি, সেতু প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা যায়, তবে যেরূপ অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হয়, তদ্রূপ সর্ব্বসাধারণের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া অক্ষয় কীর্ত্তিবান্ হওয়া যায়। নবাব সহাস্য বদনে বলিলেন যে যদি ছবিখাঁ স্বয়ং এই কার্য্যভার গ্রহণ করেন ও সুসম্পন্ন করিতে সম্মত হন, তবে তিনি অবশ্যই এই প্রকার অর্থ ব্যয় করিতে স্বীকৃত আছেন। ছবিখাঁ স্বীকৃত হইয়া বলিলেন যে, টাকা নবাবের, কিন্তু যশঃ তাঁহারই হইবে। নবাব সেই কথায় কোনও উত্তর প্রদান করিলেন না। নবাব প্রদত্ত অর্থ লইয়া মহম্মদ ছবিখাঁ, নিম্ন বঙ্গে আগমন পূর্ব্বক, নানা স্থানে নানাপ্রকার দীঘি, পুষ্করিণী, প্রশস্ত বর্ত্ম, ধর্ম্মমন্দির, পান্থশালা নির্ম্মাণ প্রভৃতি লোক হিতকর কার্য্য সমূহের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। অচিরাৎ চতুর্দ্দিকে তাঁহার নির্ম্মল যশঃ ঘোষণা করিয়া নরনারীগণ ঊর্দ্ধ বাহুতে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। নবাবের কর্ণে এই সুখ্যাতি পৌঁছিল, তিনি ছবিখাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, লোকে এই শুভানুষ্ঠানের জন্য নবাবের সুযশ বিঘোষিত না করিয়া, তাঁহার (ছবিখাঁর) সুখ্যাতি করে কেন? ছবিখাঁ বলিলেন যে, তিনি যখন এই

কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া গমন করেন, তখন বলিয়াছিলেন যে, টাকা নবাবের, যশঃ তাঁহার, কার্য্যেও তাহাই হইয়াছে। নবাব এই প্রকার স্পষ্টোক্তিতে ক্রুদ্ধ হইয়া ছবিখাঁকে কারারুদ্ধ করিলেন।

ইহাতে নবাব যে কেন নির্দ্দোষী ছবিখাঁকে কারারুদ্ধ করিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না, তবে নবাবী চাল-চলতি আইনকানুন সকলই স্বতন্ত্র; কেননা মুসলমান নবাবদের মুখের কথাই আইন, এবং তাহাই প্রজাগণের বিনাবাক্যব্যয়ে শিরোধার্য্য।

মহাত্মা বেভারিজ্ সাহেব, ছবিখাঁ সম্বন্ধে একটী লোমহর্ষণ বিস্ময়কর প্রবাদ উল্লেখ করিয়াছেন। পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণ জন্য তাহার বঙ্গানুবাদ লিপিবদ্ধ করা গেল।

[ছবিখাঁ পশ্চিম দেশবাসী একজন ধনাঢ্য মুসলমান বণিকের সন্তান। শৈশবে একদা তিনি মাতৃক্রোড় হইতে অপহৃত হন। তৎকালে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যায় ছেলেধরার ভয়ে সকলেই শশব্যস্ত ছিলেন। চৌরগণ তাঁহাকে জনৈক নিঃসন্তান ধনবান মুসলমানের নিকট বিক্রয় করে। কয়েক বৎসর পরে একদা প্রাপ্ত বয়স্ক ছবিখাঁ বহু লোক সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় বহির্গত হইলেন। অনেক দূর ভ্রমণ করিতে করিতে গভীর অরণ্য মধ্যে বৃক্ষমূলে এক পরমা সুন্দরী প্রৌঢ়া রমণী দেখিয়া, ছবিখাঁর অনুচরবর্গ নিকটে আগমন পূর্ব্বক, তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রমণী বলিলেন যে, তিনি ধনাঢ্য লোকের স্ত্রী, এবং সম্ভ্রান্ত বংশের কুলবধূ; দস্যুগণ তাহাদের বাড়ীঘর লুণ্ঠন পূর্ব্বক, তাহার স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয়গণকে বিনাশ করায়, তিনি মানসম্ভ্রম রক্ষার্থ অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। ছবিখাঁ ঐ রমণীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন। এইরূপ কিয়ৎকাল গত হইলে একদা ঐ রমণী ছবিখাঁর পদতলে কোন একটী বিশেষ চিহ্ন অবলোকন করিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ চিত্তে ছবিখাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ছবিখাঁ বলিলেন যে বাল্যকালে তাঁহাকে তাঁহার মাতৃ ক্রোড় হইতে ছেলেধরার দল অপহরণ করিয়া আনিয়া এই স্থানে বিক্রয় করিয়াছে। যাহাকে তিনি পিতৃ সম্বোধন করিতেন, তিনি তাঁহার জনক নহেন,—পালক পিতা মাত্র। প্রকৃত জনক জননীর নাম তিনি অবগত নহেন। এই কথা

শ্রবণ মাত্র উক্ত রমণী শিরে করাঘাত পূর্ব্বক বাত্যাহত কদলী বৃক্ষবৎ মূর্চ্ছিতা হইলেন। বহু শুশ্রূষায় তাহার চৈতন্যোৎপাদন হইলে, ছবিখাঁ তাহার এই প্রকার আকস্মিক অসুস্থতার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে রমণী বলিলেন যে, সর্ব্বনাশের কথা তিনি আর কি বলিবেন, বাল্যকালে যে জননীর অঙ্ক হইতে তিনি (ছবিখাঁ) অপহৃত হইয়াছেন, তিনিই তাঁহার সেই পাপিয়সী জননী, ভ্রমান্ধে পতিত হইয়া তাঁহারা যে মহাপাপ করিয়াছেন, কখনও তাহা হইতে মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। এই প্রকার লোমহর্ষণ ও ভীষণ সংবাদ অবগত হইয়া ছবিখাঁর নিদারুণ মর্ম্মবেদনা এবং অনুশোচনা উপস্থিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন এবং একজন ধার্ম্মিক মুসলমান ফকিরের নিকট সমস্ত বিষয় ব্যক্ত করিয়া এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান জিজ্ঞাসা করিলেন। ফকির বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন যে যদিও অজ্ঞাতে তিনি এই মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তথাপি ইহার প্রায়শ্চিত্ত নাই; তবে ঈশ্বরোপাসনা এবং সাধারণের হিতকল্পে সর্ব্বস্ব ব্যয় প্রভৃতি পুণ্য কার্য্য করিলে, কতক পাপ লাঘব হইতে পারে মাত্র। ফকিরের উপদেশানুসারে, ছবিখাঁ তখন তাঁহার বিপুল অর্থ সাধারণের হিতকর কার্য্যে ব্যয় করিতে আরম্ভ করিলেন; স্থানে স্থানে জলাশয়, পান্থনিবাস, ধর্ম্মমন্দির এবং প্রশস্ত বর্ত্ম প্রভৃতি তাঁহারই অর্থে নির্ম্মিত হইতে লাগিল। এই প্রকার তাঁহার সমস্ত অর্থ নিঃশেষিত হইলে তিনি ফকিরী গ্রহণপূর্ব্বক মক্কায় গমন করিয়া, ঈশ্বরোপাসনায় জীবনের অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করিলেন।]

কেহ কেহ বলেন যে, ছবিখাঁ মুরসিদাবাদের নবাবসরকারে কোটাল (শান্তিরক্ষক) ছিলেন। তাঁহার উপর এই প্রদেশের শান্তি রক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল। বর্ত্তমান কোটালীপাড়া পরগণায় তাঁহার আবাসস্থান ছিল; তাঁহারই পদানুযায়ী এই স্থানের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া "কোটালপাড়া" বর্ত্তমান কোটালিপাড়া হইয়াছে।

উপরে যাহা যাহা লিখিত হইল, সমস্তই কিম্বদন্তী মূলক। ছবিখাঁ যিনিই হউন না তিনি যে ধার্ম্মিক এবং পরোপকারী ছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আমাদের বর্ত্তমান ইতিহাস লেখকগণ অনেক আবর্জ্জনায় গ্রন্থের কলেবরপুষ্টি করেন, কিন্তু দেশহিতৈষী

মহাত্মাগণের জীবনী সঙ্কলনে তাদৃশ যত্নবান হন না। বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণের মধ্যে হয়ত অনেকে ছবিখাঁর নাম পর্য্যন্তও শুনেন নাই। রত্নপ্রসূ ভারত ভূমে যে কত স্থানে কত মহার্ঘ্য রত্ন শোচনাতীত স্থানে পঙ্কিলাবস্থায় পড়িয়া আছে, কয়জনে তাহার খোঁজ করে ?

পর্ত্তুগীজ এবং মগদিগের উৎপীড়নে অস্মদ্দেশ যে প্রকার ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিল, তদপেক্ষা আরও এক দুর্দ্ধর্ষ জাতি কর্ত্তৃক বঙ্গদেশের আবাল-বৃদ্ধবনিতা যার পর নাই উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। ইহারা মহারাষ্ট্রি-জাতি ; ইহাদের অত্যাচার বাঙ্গলায় "বর্গীর-হাঙ্গামা" বলিয়া অভিহিত। আজও ঘরে ঘরে বর্গীর হাঙ্গামার কথা শুনা যায়, জননী, ক্রোড়স্থিত শিশুকে ঘুম পাড়াইবার সময়ে বর্গীর হাঙ্গামার ছড়া আবৃত্তি করেন।—

"খোকা ঘুমাল, পাড়া জুড়াল, বর্গী এল দেশে;
বুলবুলিতে ধান খেয়ে যায়, খাজানা দিব কিসে।"

পারস্যাধিপতি নাদীর সাহের ভারতাক্রমণ ও দিল্লী নগরী লুণ্ঠন এবং অধিবাসিগণের নৃশংসরূপে হত হইবার পর হইতে মোগল সম্রাটদিগের ক্ষমতা যার পর নাই হ্রাস হইয়াছিল। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যবাসী মহা-রাষ্ট্রীয়গণ * যার পর নাই পরাক্রমশালী এবং দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। সুবিখ্যাত পেশোয়া বাজীরাও বল্লালের পুত্র বালাজী বাজীরাও এবং বেরারের অধীশ্বর রঘুজী ভোঁসল্লা তাহাদের নায়ক। তাহারা দলে দলে ভারতবর্ষের নানা স্থান আক্রমণ করিয়া যার পর নাই অত্যাচার করতঃ লুণ্ঠনাদি করিতে লাগিল। মহম্মদসাহ তখন দিল্লীর সম্রাট, তিনি কিছুতেই এই দুর্দ্ধর্ষ

---

* মহারাষ্ট্রীয়গণ হিন্দু, তাহাদিগের বাসভূমি বর্ত্তমান বোম্বাই এবং বেরার প্রদেশ। বিক্ষিপ্ত মহারাষ্ট্র-শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া দাক্ষিণাত্যে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মহারাষ্ট্রবীর শিবাজীর আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি সহ্যাদ্রির উত্তুঙ্গ শিখর হইতে কতিপয় অনুচর মাত্র সমভিব্যাহারে অবতীর্ণ হইয়া অত্যাচারী মোগলের বিরুদ্ধে যে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। ঔরঙ্গজেব মহারাষ্ট্র-বিজয়ে অসমর্থ হইয়া ভগ্ন হৃদয়ে দাক্ষিণাত্যে প্রাণত্যাগ করেন। শিবাজীর তিরোধানের পর রাজারাম, বালাজী বিশ্বনাথ এবং বাজীরাও বল্লালের সাধনাবলে মহারাষ্ট্রশক্তি ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিল, কিন্তু বাজীরাও বল্লালের মৃত্যুর পর হইতেই মহারাষ্ট্র সর্দ্দারগণ অতিশয় যথেচ্ছাচারী এবং প্রজাপীড়ক হইয়া উঠিলেন। অবশেষে তৃতীয় পানিপথের মহাযুদ্ধে মহারাষ্ট্র-শক্তি বিধ্বস্ত হইয়া গেল।

জাতির সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না, তাহারা দিল্লী নগরীর তিন মাইল দূরবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত আক্রমণ পূর্ব্বক করায়ত্ব করিয়াছিল।

সম্রাট্ অবশেষে মহারাষ্ট্র নায়কদিগকে "চৌথ" অর্থাৎ রাজস্বের এক চতুর্থাংশ দিতে স্বীকৃত হইয়া সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। সম্রাট্‌কে হীনবল দেখিয়া, মহারাষ্ট্রীয়গণ সাম্রাজ্যের সকল স্থানেই চৌথ আদায় করিতে প্রবৃত্ত হইল, প্রায় সমস্ত সুবেদারই এই চৌথ আদায় করিলেন।

বঙ্গদেশ হইতে চৌথ আদায় করিবার জন্য রঘুজী, ভাস্কর পণ্ডিত নামা জনৈক সেনাপতির অধীনে বহু সহস্র সৈন্যসহ তাহাকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন। তখন নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার রাজপ্রতিনিধি; তিনি এই বিপদে দিল্লীশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কেহ সাহায্যার্থ আসিল না, কারণ তখন সম্রাট নিজেই মহারাষ্ট্র-ভয়ে ভীত। বহুদিন ব্যাপিয়া নানাস্থানে যুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু ভাস্কর পণ্ডিত অবশেষে বিফল মনোরথ হইয়া বেরারে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

পরবৎসর দ্বিগুণ সৈন্য সহ পুনরায় ভাস্কর পণ্ডিত বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ এবার অনেক ভাগে বিভক্ত হইয়া বঙ্গদেশের নানা স্থানে নিরীহ প্রজাপুঞ্জের যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে লাগিল। মুরসিদাবাদের পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত তাঁহাদের দৌরাত্ম্যে অনেক গৃহস্থের যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়াছিল। বর্গীগণের দুর্ব্বিসহ অত্যাচার-কাহিনী প্রখ্যাতনামা মেকলে Macaulay) জ্বলন্ত ভাষায় বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। "Wherever their kettle drums were heard, the peasant through his bag of rice on his shoulder, hid his small savings in his girdle, and fled with his wife and children to the mountains or the jungles, to the milder neighbourhood of the hyaena and the tiger * * *. Even the European factors trembled for their magazines. Less than a hundred years ago it was thought necessary to fortify Calcutta against the horsemen of Berar and the name of the Mahratta Ditch still preserves the memory of the Danger. *

* See Macaulay's Essay on Lord Clive.

আমাদের এই জিলায়, রায়ের কাঠী, মহদিপুর, পোনাবালিয়া, হোসেনপুর প্রভৃতি গ্রাম, এই দস্যুদের অত্যাচারে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই দস্যুভয়ে এতদূর ভীত ছিল যে, "বর্গী আসিতেছে" বলিলে, সকলে বাড়ী ঘর পরিত্যাগ করিয়া পরিবারবর্গ সহ অরণ্য মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিত। চন্দ্রদ্বীপের রাজগণের তখন যে অবস্থা, তাহাতে তাঁহাদের আত্মরক্ষা করাই কষ্টসাধ্য, সুতরাং রাজ্য রক্ষা অসম্ভব। স্থানীয় ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে কেবল পোনাবালিয়া নিবাসী রামভদ্র রায় মহারাষ্ট্রিয়গণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করতঃ সোন্দারকূল হইতে দূরীভূত করিয়াছিলেন। * কেহ কেহ বলেন হোসেনপুরের বক্সিগণও বর্গীদের সঙ্গে লড়াই করিয়াছিলেন।

পিরোজপুর সব্‌ডিবিসনের অন্তঃর্গত বলেশ্বর নদের পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত, নন্দীপাড়া, পোরগোলা প্রভৃতি স্থানগুলি বর্গীদিগের দৌরাত্ম্যে একেবারে জনহীন হইয়াছিল, তথায় এই দস্যুগণ সমবেত হইয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি বিভাগ করিত। তাহারা এই দেশ হইতে দূরীভূত হইবার অনেক পরে সেখানে লোকের বসতি হয়; নন্দীপাড়া গ্রামের পশ্চিমাংশে একখানি পতিত ভিটা আছে, লোকে তাহাকে 'বর্গীর ভিটা' বলে। ইহার অধিকাংশ এখন বলেশ্বরের কবলগত হইয়াছে।

এই দস্যুদিগকে বঙ্গদেশ হইতে দূরীভূত করিতে নবাব আলীবর্দ্দিখাঁর যে প্রকার কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, ইতিহাস পাঠকের নিকট তাহা অবিদিত নাই। দুরাচারগণ এই দেশে আরও কিছুকাল অত্যাচার করিতে পারিলে দেশবাসীর ভাগ্যে যে কি হইত, তাহা কে বলিতে পারে?

সাক্ষাৎ প্রেমের অবতার মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের অস্মদ্দেশে পদার্পণ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ১৫২৭ হইতে ১৫২৮ খৃঃ অব্দে কতিপয় শিষ্য এবং স্বীয় মাতুল সমভিব্যাহারে ইনি পৈত্রিক জন্মভূমি দর্শন মানসে তট পথে গমন করেন। কোটালীপাড়ার অন্তঃর্গত মুখ-

---

* The City of Dacca was much alarmed on account of the approach of the Mahrattas, who were coming by the *Sundarbans*, and had advanced as far as *Sundarkul*—(Long's Selections, 1748 A. D.)

Rambhadra Rai is said to have fought with the Mahrattas or Bargis, and to have defeated them near Ponabalia.—*H.* Beveridge's History of Bakarganj, P. 412.

ডোবা নামক স্থানে তাঁহার শ্রীহস্ত প্রতিষ্ঠিত পাষাণময় বাসুদেব বিগ্রহ অদ্যাপি বিরাজমান আছে; মহাপ্রভু স্বয়ং এই মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মুখডোবার অধিকারী বৈদিক ব্রাহ্মণগণ, এবং বাসুদেব বিগ্রহের সেবাইতগণ, চৈতন্য দেবের মাতুল বংশীয় বলিয়া সগৌরবে আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন।

এই সম্বন্ধে একটী কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, মহাপ্রভুর মাতুল তাঁহার নিকট সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে প্রার্থনা করিলে, তিনি তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া এই দুরূহ ব্রত গ্রহণ করিতে ক্ষান্ত হইতে বলিলেন, কিন্তু বিরত হওয়া দূরে থাক্, ইনি ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিলেন না। চৈতন্যদেব, পিতৃভূমি দর্শনার্থ যখন শ্রীহট্টাভিমুখে প্রস্থান করেন, তখন একদা মধুমতী নদীর তীরস্থ এক বট মূলে, নিদাঘ তাপে তাপিত ও ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হইয়া সঙ্গীয় সেবকগণের নিকট আহার্য্য সামগ্রী যাচ্ঞা করিলেন। শিষ্যগণ অবিলম্বে নিকটবর্ত্তী গ্রামে ভিক্ষা করিয়া তণ্ডুল আনয়ন পূর্ব্বক রন্ধন করতঃ তাঁহাকে আহার করাইলেন। পরে আহারাদি সমাপন হইলে, মহাপ্রভু শিষ্যদের নিকট মুখশুদ্ধি চাহিলেন। শিষ্যগণ বলিলেন যে, তাঁহাদের নিকট সঞ্চিত কোন দ্রব্যই নাই, অনুমতি হইলে গ্রাম হইতে ভিক্ষা করিয়া আনিতে পারে। মহাপ্রভু মাতুল মহাশয়ের নিকট মুখশুদ্ধি প্রার্থনা করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার পূর্ব্বদিনের সঞ্চিত অর্দ্ধেক পরিমাণ হরিতকী বস্ত্রমধ্য হইতে বাহির করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। চৈতন্যদেব ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আপনার যখন হৃদয় মধ্যে এখনও বিষয় বাসনা জাগরূক রহিয়াছে, তখন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণে আপনি এখনও অধিকারী হন নাই।" তাঁহার মাতুল মহাশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন যে, তিনি সমস্ত বিষয় বাসনা, ভোগ-লালসা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র কৌপীন গ্রহণে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন, তথাপি তাঁহার বিষয় বাসনা কোথা হইতে আসিল? চৈতন্যদেব বলিলেন যে, অর্দ্ধখণ্ড হরিতকীই তাহার বিশেষ পরিচয়। অন্য দিনের জন্য যখন তিনি এই সামান্য হরিতকীখণ্ড পরিত্যাগ না করিয়া সঞ্চিত রাখিয়াছেন, তখন তাহার হৃদয় হইতে সঞ্চয়-বুদ্ধি এখনও তিরোহিত হয় নাই সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে, সুখ, দুঃখ, আহার, বিহার, জীবন, মরণ,

সমস্তই সেই ভগবচ্চরণে ন্যস্ত করিতে হইবে। যতদিন না তাঁহার হৃদয় হইতে সঞ্চয়-বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। কিন্তু মাতুল মহাশয় কোন ক্রমেই তাঁহার সঙ্গত্যাগ করিবেন না বলিয়া সঙ্কল্প প্রকাশ করায় মহাপ্রভু ঈষদ্ধাস্য সহকারে ধীরে ধীরে মধুমতীতে অবগাহনপূর্ব্বক প্রস্তর নির্ম্মিত এক বাসুদেব বিগ্রহ মাতুলের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, "আমি আপনার ও আপনার সন্তানসন্ততির হিতকল্পে এই মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিব, আপনি এই স্থানে থাকিয়া ইহার অর্চ্চনা করুন। সময় উপস্থিত হইলে, সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন।"

উপযুক্ত স্থানে বিগ্রহ স্থাপন পূর্ব্বক এই ভাবে মাতুলকে সেবার জন্য রাখিয়া তিনি অন্যান্য শিষ্যসেবক সহ গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিলেন।

বাকলার তদানীন্তন রাজা পরমানন্দ রায় এই সংবাদ অবগত হইয়া স্বয়ং দেবদর্শনমানসে মুখডোবায় আগমন করেন, এবং মহাসমারোহে দেবপূজা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক, বিগ্রহ সেবার্থ একখণ্ড দেবোত্তর ভূমি প্রদান করেন। কালের পরিবর্ত্তনে বর্ত্তমান সময়ে সেই দেবোত্তর সম্পত্তি অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে, এখনও অতীতের স্মৃতিস্বরূপ সামান্য কতকাংশ বর্ত্তমান রহিয়াছে। আগাবাখরখাঁ ও তৎপুত্র আগাসাদকের মৃত্যুর পর, এই জিলাস্থ বোজরগউমেদপুরের সম্পূর্ণ অংশ এবং সেলিমাবাদের সাড়ে এগার আনা অংশ রাজা রাজবল্লভের হস্তগত হয়। তিনি এই বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তি রাজনগরের অন্তর্ভূত করিয়া যথাক্রমে স্থাপিত দুর্গা এবং লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহদ্বয়ের নামানুসারে দেবোত্তর প্রদান করেন। *

মহারাজ রাজবল্লভ যদিও এই জিলার অধিবাসী নহেন, তথাপি এই মহাপুরুষের জীবনীর সহিত এদেশের যে টুকু সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা স্থানান্তরে তাহা বর্ণনা করিতে বিশেষ চেষ্টা করিব।

---

* Lakshmi Narayan is a name of Vishnu and was the name under which Raja Raj Ballav recorded his Zemindery of Rajnagor and Buzrug-umedpur. Raja Raj Ballav managed to retain possession of 11½ annas (Silemabad) up to 1168 B. S. etc.—H. Berveridge's History of Bakarganj. page. 108—109.

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রাচীন সমাজ।

বহুশত বৎসর পূর্ব্বে বলেশ্বর ও মেঘনার মধ্যবর্ত্তী বৃহৎ জনপদ, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী হিন্দুনরপতিদের শাসনাধীন ছিল। তখন এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ বাকলা নামে অভিহিত হইত। *

তৎকালে ভারতমাতার সর্ব্ব বিষয়িনী প্রতিভায় সমগ্র পৃথিবী মুগ্ধ ছিল। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন সেনবংশীয় রাজগণ অপ্রতিহত প্রভাবে গৌড়ে অথবা নবদ্বীপে রাজত্ব করিতেন। বাকলা তখন পৃথক এবং স্বতন্ত্রভাবে বঙ্গেশ্বরের মিত্ররাজ্য অথবা স্বাধীন রাজ্য ছিল কিনা, তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে অস্মদ্দেশে যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, এই বাকলা রাজ্য তৎকালে বঙ্গেশ্বর সেনরাজগণের অধীন ছিল।

সেই প্রাচীন কালের আচার, ব্যবহার, সমাজ প্রভৃতি বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হইলে, আরও প্রাচীনকালের কথা উল্লেখ করিতে হয়; কারণ, প্রাচীন হিন্দুগণ, তাঁহাদের ইতিহাস অথবা বিশেষ কোন স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া যান নাই। তৎকালীন ধর্ম্ম ও সামাজিক অবস্থা আমরা কেবল ঋষিপ্রণীত ধর্ম্মগ্রন্থ, পুরাণ, এবং কাব্যাদিতে দেখিতে পাই। এই সমস্ত গ্রন্থ, আবার বিভিন্ন সময়ে প্রণীত হইয়াছে।

এই সকল আলোচনা করিলে, স্বাধীন হিন্দুরাজগণের নৈতিক ও সামাজিক অবস্থা, এবং চাতুর্ব্বর্ণ্যের বিধান প্রভৃতি কতক কতক অবগত হওয়া যাইতে পারে। সেনরাজগণ, হিন্দু এবং বঙ্গের সার্ব্বভৌম অধীশ্বর, বাকলা তাঁহাদেরই অধীনস্থ হিন্দুরাজ্য; সুতরাং বঙ্গেশ্বরের যে প্রকার সামাজিক পদ্ধতি ছিল, বাকলা রাজের কতকটা তাহারই মত ছিল, তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে সেনরাজগণের

---

* প্রথম অধ্যায় দেখ।

সময়েরও এই সম্বন্ধে কোন গ্রন্থাদি পাওয়া যাইতেছে না। বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন প্রভৃতি পণ্ডিত ছিলেন, এবং তাঁহাদের সভা তখন পণ্ডিত-গণের বাসভবন ছিল। বল্লালসেন স্বয়ং একজন প্রতিভাশালী কবি এবং "দানসাগর" গ্রন্থের রচয়িতা; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ অংশ কোথাও পাওয়া যাইতেছে না। যতটুকু পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সেনরাজগণের পরিচয় এবং রাজ্য সম্বন্ধীয় দুই একটী কথা ব্যতীত বিশেষ কিছুই দেখা যায় না। বঙ্গের শেষ রাজা লক্ষ্মণসেন যখন নবদ্বীপে রাজত্ব করিতেন, তখন তাঁহার সভায় যে কয়েকজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন তাঁহাদের নাম এবং কাহার কাহারও প্রণীত গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পশুপতি প্রণীত "ব্যবস্থা", হলায়ুধ প্রণীত "ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব", গোবর্দ্ধনাচার্য্য প্রণীত "আর্য্যসপ্তসতী" এবং জয়দেব গোস্বামী প্রণীত "গীত-গোবিন্দ" গ্রন্থ এখনও বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বো-ল্লিখিত পুস্তকগুলি ব্যবস্থাগ্রন্থ, এবং শেষোক্ত গ্রন্থখানি রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমগীতি। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে সামাজিক কোন কথাই দেখা যায় না। তবে কি এই সকল বিষয় জানিবার উপায় নাই? সেন-রাজগণের কি কোন ধর্ম্মচর্চ্চা, সমাজ, রাজনীতি ছিল না? এই সকলের আলোচনা করিতে হইলেই, প্রাচীনকালের সমাজ, ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। পাঠকদিগের মধ্যে হয়ত কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, আমাদের এই ক্ষুদ্র বাকলার ইতিহাসে অত আড়ম্বরের প্রয়োজন কি? তদুত্তরে আমরা এই কথা বলিতে পারি যে, প্রাচীন হিন্দুগণের আচার ব্যবহার প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের এই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

বর্ত্তমান কালের হিন্দুসমাজেরও কোন কোন আচার ব্যবহার, রীতি নীতির প্রতি একটু বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে, প্রাচীন রীতি নীতির সামান্য আভাষ পাওয়া যায়। তাই আমরা প্রাচীন কালের কথা বলিতে চেষ্টা করিব। অভিজ্ঞ পাঠক ইচ্ছা হইলে ত্যাগ করিতে পারেন।

আর্য্য মুনিঋষিগণ, কাল এবং যুগানুসারে মানব ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। তৎকালীন মানব হৃদয়ের ধর্ম্মাধর্ম্ম, লোভালোভের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সামাজিক নিয়ম প্রভৃতি গঠিত হইয়াছে। অতি পুরাকালে পঞ্চনদতীরে যখন প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ সামগানে জগৎ বিমোহিত

করিতেন, তখন ভারতে কোন সমাজ বন্ধন, বর্ণ, অথবা জাতিভেদ ছিল না। * তখন সর্ব্বত্র সরলতা, ন্যায়, পরায়ণতা, পবিত্রতা প্রভৃতি বিরাজ করিত। তারপর যখন প্রজা বৃদ্ধি হইয়া ব্রহ্মাবর্ত্ত অতিক্রম করিয়া আর্য্যাবর্ত্ত প্রভৃতি স্থানে আর্য্যগণ উপনিবেশ স্থাপন করিতে লাগিলেন তখন সেই সরলতার রাজ্যে পাপপুরুষ তীব্র কটাক্ষপাত করিতে লাগিল। মহামনস্বী আর্য্য ঋষিগণ, তখন সমাজ বন্ধনের আবশ্যকতা বুঝিলেন। কাজেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র জাতি পৃথক করা হইল। সেই সময় হইতেই জাতি-ভেদের সূচনা আরম্ভ হইয়া ক্রমে তাহা সমাজে বদ্ধমূল হইল। প্রকৃতপক্ষে পদ্মযোনি ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, এবং চরণ হইতে শূদ্র সৃষ্টি হইয়াছে, একথা বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় বিশ্বাস করিতে বড় রাজী হন না। তাঁহারা এই শাস্ত্রোক্তিকে রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ইহা রূপক অথবা প্রকৃত কিনা, এস্থলে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; তবে আমাদের পৌরাণিক শাস্ত্রাদিতে ত্রেতা যুগের সময় হইতেই জাতি বিভাগের উল্লেখ দেখা যায়। যুগভেদে মানবচরিত্রের ব্যতিক্রম ঘটিতে আরম্ভ করিল; আর্য্য ঋষিগণও তদনুযায়ী সামাজিক নিয়ম, ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি বিধিবদ্ধ করিলেন। যাঁহারা জপ, তপ প্রভৃতি দ্বারা ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি রোধ পূর্ব্বক ঈশ্বরোপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ হইলেন। বহিঃশত্রু হইতে রাজ্যরক্ষা করিতে যাঁহারা নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়; শস্যোৎপাদন এবং বাণিজ্য ব্যবসায়িগণ বৈশ্য এবং এই তিন জাতির সেবার জন্য যাঁহারা রহিলেন তাঁহারা শূদ্র নামে অভিহিত হইলেন। ক্রমে ক্রমে এই বর্ণ চতুষ্টয়ের ধর্ম্ম, সমাজ, ব্যবহার, রীতিনীতি সম্বন্ধে ব্রাহ্মণগণ যে সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ না হইলেও কতক কতক বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে এখনও প্রচলিত রহিয়াছে।

মন্বত্রি প্রভৃতি বিংশতি ঋষি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা। এই মুনিগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হইয়া তৎকালীন সমাজানুসারে করণীয় কার্য্য প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সত্যযুগের আচরণ যাহা ছিল, ত্রেতায় তাহার আংশিক পরিবর্ত্তন হইল। তদ্রূপ দ্বাপর এবং কলিযুগেও পরিবর্ত্তন

* ঋগ্বেদীয় পুরুষ-সূক্ত দেখ।

ঘটিল। কারণ এই বিরাট বিশ্বসংসার নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল ; ব্রহ্মাণ্ডস্থিত অণুপ্রমাণ পদার্থেরও নিত্য পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে ; ইহা স্বাভাবিক, এবং ইহাই বিশ্বস্রষ্টার অলঙ্ঘ্য নিয়ম। যখন সকলই পরিবর্ত্তনশীল, তখন সমাজের পরিবর্ত্তন কেন হইবে না ? তাই জগতের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের কয়েকটী উদাহরণ দেখাইতে চেষ্টা করিব। বৈদিক যুগে বিবাহের কোন নামোল্লেখ, অথবা নিয়মের কথা দেখিতে পাই না। কিন্তু যখন ইহাতে সমাজের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল, তখন বিবাহ-ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হইল। পূর্ব্বে আর্য্য সন্তানগণ মদ্য * এবং গোমাংস † ভক্ষণ করিতেন। পরবর্ত্তী ঋষিগণ যখন ইহার অপকারিতা বুঝিতে পারিলেন, তখন ইহার ভূয়ো ভূয়ো দোষোল্লেখ করিয়া এই প্রথা সমাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করিয়া দিলেন। কলিযুগের প্রারম্ভেও পুরাণাদিতে আমরা ব্রাহ্মণকে অন্য বর্ণের কন্যা গ্রহণ করিতে দেখিতে পাই। পরে ইহাতে স্বেচ্ছাচারিতা নিবন্ধন যে দোষ ঘটিতে আরম্ভ করিল তাহা দেখিয়া শাস্ত্রকারগণ তাহাও বন্ধ করিয়া দিলেন। এইরূপ ভূরি ভূরি উদাহরণ বিভিন্ন সময়ের শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। অধিক বলিতে কি, কলিযুগের প্রারম্ভে চতুর্ব্বর্ণের যে সমস্ত আচার ব্যবহার, সামাজিক রীতি নীতি ছিল, তাহারও কোন কোন অংশ কাল সহকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। একটু গবেষণা করিয়া দেখিলে বোধ হয় প্রতীয়মান হইবে যে ইংরাজ অভ্যুদয়ের প্রথম অবস্থায় আমাদের সমাজ বন্ধন যেরূপ ছিল, বর্ত্তমান সময়ে তাহা শিথিল হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমাদের এই বাঙ্গলা রাজ্য বঙ্গেশ্বর সেনরাজগণের অধীন ছিল। তাই গৌড়েশ্বরের সামাজিক রীতি নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বাঙ্গলার কতকটা বুঝিতে পারা যাইতে পারে। সাড়ে সাতশত বৎসরের সমাজনীতি পরিশুদ্ধ ভাবে সঙ্কলন করাও দুরূহ ; তবে, তৎকালীন যে কয়েকখানি ব্যবস্থা গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের উপর মূল ভিত্তি স্থাপন করিয়া যতদূর সম্ভব বুঝাইতে চেষ্টা করিব। ব্রাহ্মণ লইয়াই আমাদের হিন্দুসমাজ, এবং সাধু ব্রাহ্মণই

* মহাভারতের মৌষলিক পর্ব্বাধ্যায়।

† অতিথির একনাম "গোঘ্ন"। শব্দকল্পদ্রুমের গো শব্দ দেখ।

আমাদের সমাজের অস্থিমজ্জা। এই ব্রাহ্মণগণকে আচারভ্রষ্ট দেখিয়া অম্বষ্ঠকুলপ্রদীপ সম্ভূত মহারাজ আদিশূর * ৯৯৯ সম্বৎ অর্থাৎ ৯৪২ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জ হইতে আগ্নিক পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন পূর্ব্বক আরব্ধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে যে এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমনের পূর্ব্বে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ নিতান্ত বিশৃঙ্খল ভাবাপন্ন ছিল। মহারাজ আদিশূর হিন্দুসমাজ পুনঃ গঠনের অভিপ্রায় এই ব্রাহ্মণগণের সহিত অস্মদ্দেশীয় শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ কন্যাগণের পরিণয় সম্পাদন করিয়া, তাঁহাদের বঙ্গদেশে স্থাপিত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কুলীন ব্রাহ্মণগণ, তাঁহাদেরই বংশোদ্ভূত। কিন্তু এত চেষ্টা করিয়াও মহারাজ আদিশূর পূর্ব্বে যেমনটী ছিল, তেমনটী করিতে পারিলেন না। মহারাজ আদিশূরের তিরোধানের পর তদ্বংশীয় কন্যাগর্ভজাত মহারাজ বল্লালসেন আদিম ব্রাহ্মণ এবং কান্যকুব্জজাত ব্রাহ্মণগণের সন্তান সন্ততিগণের আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম প্রভৃতির পরীক্ষা করিয়া যাঁহারা সদাচারী তাঁহাদের কুলমর্য্যাদা প্রদান করিলেন; আর যাঁহারা হীনাচারী, তাঁহারা মর্য্যাদা হইতে বঞ্চিত হইলেন। এই সময় হইতেই কুলীন ব্রাহ্মণগণের সৃষ্টি হইল। বল্লালসেন যে, কেবল ব্রাহ্মণগণের কুলমর্য্যাদা প্রদান করিলেন, তাহা নহে, বৈদ্যকায়স্থাদি অন্যান্য প্রায় সমস্ত জাতিকে এই প্রকার পরীক্ষা করিয়া আচারানুসারে যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদান করিলেন। † সেনরাজগণ কর্ত্তৃক এই

---

* ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কেহ কেহ আদিশূর, ভূশূর প্রভৃতি নরপতিগণকে শূরবংশীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু "আদি" ও "ভূ" কাহারও নাম হওয়া অসম্ভব। বস্তুতঃ আদিশূরাদির নামের শূরভাগ শৌর্য্যব্যঞ্জক নামৈকদেশ মাত্র,—বংশোপাধি নহে। মহারাজ আদিশূর অম্বষ্ঠ অর্থাৎ বৈদ্য বংশীয় ছিলেন যথা:—

অম্বষ্ঠ কুলসম্ভূত আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ।
রাঢ় গৌড় বরেন্দ্রাশ্চ বঙ্গদেশস্তথৈবচ।
এতেষাং নৃপতিশ্চৈব সর্ব্বভূমীশ্বরো যথা॥
(শব্দকল্পদ্রুমধৃত দেবীবর ঘটক বাক্য।)

† পুরা বৈদ্যকুলোদ্ভূত বল্লালসেন মহীভূজা।
ব্যবস্থাপি চ কৌলীন্যং হুহিসেনাদি বংশজে॥
(কবিকণ্ঠহার সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা ২ পৃষ্ঠা।)
অথ বল্লাল ভূপস্ত অম্বষ্ঠ কুলনন্দনঃ।
কুরুতে ইতি প্রযত্নেন কুলশাস্ত্র নিরূপনং।
(রামানন্দ শর্ম্মাকৃত কায়স্থকুল দীপিকা।)

প্রকার সমাজ গঠিত হইবার পর হইতেই ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য জাতি সমূহ সদাচারী হইতে যত্নবান হইলেন। ব্রাহ্মণ সন্তানগণ বেদমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াই গুরুগৃহে অধ্যয়ন করিতে যাইতেন; কিন্তু বৈদিক যুগের মত তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন; তবে পাঠ সমাপন না করিয়া কেহই বিবাহ করিতেন না। বেদাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে কেহ কেহ বা ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। পাঠ সমাপ্ত করিয়া গুরুদেবের অনুমতি-ক্রমে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক যথাশাস্ত্র বিবাহিত হইয়া পাঠোপযোগী ব্যবসা করিতেন। নিতান্ত অর্থাভাব না হইলে কেহ ব্রাহ্মণেতর ব্যবসা গ্রহণ করিতেন না।*

শাস্ত্র পারদর্শী সুযোগ্য ব্রাহ্মণ রাজার নিকট হইতে ভূমিবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চিত মনে বিদ্যালোচনা করিয়া অধ্যাপনা করিতেন। একটু পরিণত বয়সে কোন কোন ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতেন। ইহাই তৎকালীন ব্রাহ্মণদিগের সামাজিক নিয়ম, এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মণ সন্তানের অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। অন্যথা তাঁহারা সমাজে পতিত হইতেন এবং অন্য কোন ব্রাহ্মণ তাঁহাদের অন্নস্পর্শ করিতেন না। কিন্তু সকল ব্রাহ্মণই যে সাধু, বিদ্বান এবং সত্যব্রত ছিলেন, তাহা নহে, তবে বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ সন্তান যে প্রকার নবালোকে আলোকিত হইতেছেন, তৎকালে সেরূপ ছিল না। কদাচিৎ কেহ আচারভ্রষ্ট হইলে তাহাকে সামাজিক বিচারালয়ে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইত। বর্ত্তমান সভ্যসমাজে সেন রাজগণের জাতি বিচার লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। 'সেন' উপাধি হেতু বৈদ্যসন্তানগণ, সেনরাজগণকে বৈদ্য বলিতেছেন, এবং মিশ্রী-গ্রন্থ, কুলপঞ্জিকা, অম্বষ্ঠকুলচন্দ্রিকা প্রভৃতি হইতে নানাবিধ শ্লোক বা অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাদের সত্যতা প্রমাণ করিতেছেন। কায়স্থ-গণও সেন রাজগণকে তাঁহাদের দলে আনিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

বিশ্বকোষ প্রণেতা শ্রদ্ধেয় বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু, তাঁহার 'বিশ্বকোষ' মধ্যে সেনরাজগণকে স্পষ্টই কায়স্থ বলিয়াছেন। অধিকন্তু, তিনি বাকলার

---

* বৃদ্ধপিতামাতরৌ চ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ
অপকার্য্য শতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ।
(মনুসংহিতা।)

কায়স্থ রাজ্যস্থাপয়িতা রামনাথ দনুজ মর্দ্দন দেকে গৌড়েশ্বর লক্ষণসেনের প্রপৌত্র বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।*

চন্দ্রদ্বীপের স্থাপয়িতা রামনাথ দনুজমর্দ্দনদের সহিত রাজা লক্ষ্মণ সেনের কোন সম্বন্ধ আছে কি না আমরা এই সম্বন্ধে যতটুকু প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা চন্দ্রদ্বীপ পরগণার ইতিবৃত্তে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

সেনরাজগণ প্রদত্ত যে কয়েকখানি তাম্রশাসন দেখা যায়, তাহাতে তাঁহাদের "সোমবংশপ্রদীপ" "ওষধিনামবংশ" বলিয়া উল্লেখ দেখিতে পাই। ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যেই সূর্য্য এবং চন্দ্রবংশের উল্লেখ আছে। অন্য কোন জাতিতে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই নিমিত্ত ঐতিহাসিকগণ বল্লালাদি নৃপবৃন্দকে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিতে অভিলাষী। কিন্তু দেবীবরের সমকালীন চট্টোপাধ্যায় মুলোপঞ্চানন আপন গোষ্ঠী কথায় লিখিয়া গিয়াছেন ঃ—

একদিন রাজা (বল্লাল) জিজ্ঞাসিল পঞ্চ গোত্রীয়ে।
মহাবংশ কুলীন আর সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ে॥
কহ সভাসদ আছ যতেক পণ্ডিত।
কি হেতু ত্যজিলে বৈদ্যে ছিলে পুরোহিত॥
উত্তরিল মহেশাদি যতেক সুকৃতী।
নিত্য যাজ্যে রত নহি নৈমিত্তিকে ব্রতী॥
অজ্ঞ হল দশকর্ম্মা, শ্রাদ্ধে পিণ্ডভোজী।
দ্বিজের স্থণ্ডিলে ঋত্বিক, নহি শূদ্রযাজী॥
আদিশূর রাজা বৈদ্য বৈশ্যে তার জাতি।
একচ্ছত্রী রাজা ছিল ক্ষত্রবৎ ভাতি॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন বৌদ্ধ রাজা জগন্নাথে কীর্ত্তি।
সাম্যবাদী তবু বলায় ক্ষত্রিয় বৃত্তি॥
রাজা হলে রাজন্য সে না ভাবে অন্যথা।
পতিত কাম্বোজাদি গৌড়ে ক্ষত্র যথা॥

---

* বিশ্বকোষের চন্দ্রদ্বীপ শব্দ দেখ।

ভূপাল, অনঙ্গপাল, আর মহীপাল।
জাতিভ্রষ্ট ক্ষত্র নহে, রাজন্য প্রবল॥
তারাও বিভা করিত তিন জাতি মেয়ে।
ব্রাহ্মণ পুরোধা সাত শতী দেখ চেয়ে॥
তাই তারা ক্রিয়া কাণ্ডে বেদ জ্ঞানহীন।
যাজক, পিণ্ডভোজী, প্রথা ত অপ্রাচীন॥
বল্লাল লয় যবে পদ্মিনী জাতিহীনা।
লক্ষ্মণ কহে দ্বিজে এ প্রথা ত দেখিনা॥
তাই বল্লাল ত্যজে কুপুত্র বলি সুতে।
লক্ষ্মণ ত্যজে পৈতা বৈদ্যকুল রক্ষিতে॥
ইথে উভয় পক্ষের বৈদ্য পতিত ব্রাত্য।
ক্রমশঃ বৃষলেগণ্য অত্রত্য তত্রত্য॥
তাই কান্যকুব্জ বৈদ্য যাজন না করে।
পূর্ব্বেও ত অগ্ন্যাধানে স্বধামাত্র ধরে॥

* * *

নিবেদিল রাজা মম পূর্ব্ব পিতমহে।
বৈদ্য হলেও রাজন্য আচরণে রহে॥

* * *

বৈদ্য রাজা আদিশূর ক্ষত্রিয় আচার।
বেদে ব্রহ্মবৎ কার্য্যে মাতৃ ব্যবহার॥

এখন দেখা যাক্ এই প্রবাদের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা। মহারাজ লক্ষ্মণসেনের যতগুলি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে তপনদীঘি, সুন্দরবন এবং আনুলিয়ার শাসনে তিনি "রাজন্য ধর্ম্মাশ্রয়" বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। যথা—

সম্ভুক্তান্যদিগঙ্গনাগণগুণা ভোগপ্রলোভাদ্দিশা,
মীশৈরংশ সমর্পণেন ঘটিতস্তৎতৎ প্রভাবস্ফুটৈঃ।
দোরুষ্মক্ষপিতরি সঙ্গররসো রাজন্য ধর্ম্মাশ্রয়ঃ,
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন ভূপতিরতঃ সৌজন্যসীমাঽজনি॥

বল্লালসেন নিজগ্রন্থ মধ্যে আত্মপরিচয়দানস্থলে, "ক্ষত্রচারিত্রচর্য্যা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। * তাঁহারা জাতিতে রাজন্য বা ক্ষত্রিয় হইলে "রাজন্য ধর্ম্মাশ্রয়" এবং "ক্ষত্রচারিত্রচর্য্যা" কেন বলিতে যাইবেন। ইাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে তাঁহারা বস্তুতঃ রাজন্য বা ক্ষত্রিয় ছিলেন না, কিন্তু রাজন্যধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন অর্থাৎ জাতিতে ক্ষত্রিয় না হইলেও রাজ্যশাসনাদি ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতেন। তাম্রশাসনগুলিতে তাঁহারা পুনঃ পুনঃ আপনাদিগকে সেনবংশপ্রভব বলিয়া প্রখ্যাত করিয়াছেন যথা, "তস্মিন্ সেনান্ববায়ে" "সুজ্জেহি সেনান্বয়ঃ" "সেনকুলকমলবিকাশভাস্কর"। বঙ্গদেশে বৈদ্য, কায়স্থ. নবশায়ক প্রভৃতি ক্ষত্রিয়েতর জাতি সমূহের মধ্যেই "সেন" উপাধি পরিদৃষ্ট হয়।

সেনরাজগণ আদিশূরবংশীয় অম্বষ্ঠ নরপতিগণের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইতেন, ইহার যথেষ্ঠ প্রমাণ আছে। মহারাজ বল্লালসেনের জননী অম্বষ্ঠকন্যা ছিলেন। লঘু ভারতকার লিখিয়াছেন :—

আদিশূরাৎ কুলেজাতা পুরুষাৎ সপ্তমাৎ পরে।
কন্যকা সুন্দরী সাধ্বী নাম্না শ্রীশ্রীরিবগুভা ॥
বেদোহি তদ্বচঃ শ্রুত্বা তাং কন্যাং স উদূরবান্
কালে তদ্গর্ভতো জাতো বল্লালসেন ভূপতিঃ ॥

আমরা মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিক কৃত চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থেও দেখিতে পাই যে, সেনরাজগণ বৈদ্যজাতির সহিত বৈবাহিক ক্রিয়াদি নির্ব্বাহ করিতেন যথা :—

ধরাধরসুতো জাতো নিত্যানন্দ ইতি স্মৃতঃ।
বল্লালসেনদৌহিত্রঃ সেনভূপস্য সন্ততৌ ॥—১৮৯ পৃঃ, চন্দ্রপ্রভা।
সুতৌ জাতরিসেনস্য জজ্ঞাতে বিনয়ান্বিতৌ।
সূর্য্যসেনস্তদীয়াদ্যঃ কনিষ্ঠো বিজয়াহ্বয়ঃ ॥

---

* ছন্দোভিশ্চৈকবন্দ্যো শ্রুতিনিয়মগুরু ক্ষত্রচারিত্রচর্য্যা
মর্য্যাদাগোত্রশৈলঃ কলিচকিতসদাচারসঞ্চারসীমা।
সদ্‌বৃত্তস্বচ্ছবংশোজ্জ্বলপুরুষগুণাচ্ছিন্নসন্তানধারা
বংশৈর্মুক্তাবয়ন্ত্রী নিরপমদমলেন্দুর্নপঃ সেনবংশঃ ॥— দানসাগর আরম্ভ বাক্য।

রাজ্ঞঃ কেশবসেনস্য তনয়াগর্ভসম্ভবৌ ॥—২২২ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা।
ত্রয়ো মণ্ডলদাশস্য পুত্রা উদ্ধরণোঽগ্রজঃ।
বল্লালসেননৃপতে স্তনুজাগর্ভসম্ভবঃ ॥—৩১৯ পৃঃ „
সুতৌ মন্মথদাশস্যাচ্যুত শ্রীমন্তদাশকৌ।
সেনভূপকুলোদ্ভূত সেনলক্ষ্মণসূনুজৌ ॥—৩৬৪ পৃঃ „
শ্রীপতেস্তনয়া জাতা জ্যেষ্ঠো গদাধরঃ কৃতী।
সাগরো ভগিগুপ্তোঽমী ভূপকেশব সূনুজাঃ ॥—৪৪২ পৃঃ „

অতএব বল্লালাদি নরপতিবৃন্দ বৈদ্যবংশাবতংস বলিয়া বঙ্গদেশে পাঠান যুগ হইতে ব্রাহ্মণ * বৈদ্য † কায়স্থ ‡ এবং সুবর্ণ বণিক সমাজে § যে প্রাচীন কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহা নিতান্ত অমূলক বলিয়া মনে হয় না।

তবে সেনরাজগণ ক্ষত্রিয়, বৈদ্য অথবা যে জাতিই হউন না কেন, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই, কিন্তু তাঁহারা যে ক্ষত্রজনোচিত সমস্তকার্য্য, রাজ্যশাসন প্রভৃতি করিতেন, তাম্রশাসন লিখিত কবিতাগুলিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বাকলার কায়স্থ রাজগণের মধ্যে অনেকের বীরত্ব-কাহিনী শুনা যায়; মহারাজ কন্দর্পনারায়ণ, রামচন্দ্র, উদয়নারায়ণ প্রভৃতির বাহুবল, শস্ত্রবিদ্যা বিশেষ প্রশংসার্হ। বঙ্গের সেনরাজগণের অধীনে যতগুলি জনপদ ছিল, সমস্তই গৌড়েশ্বরের আচার এবং নিয়মাদিতে পরিচালিত হইত।

বঙ্গদেশের হিন্দুরাজত্ব সময় হইতেই এইদেশে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য জাতির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। দুই একজন থাকিলে তাহাও

---

* ততো বহুতিথেকালে গৌড়ে বৈদ্যকুলোদ্বহঃ। বল্লালসেন নৃপতিরজায়ত গুণোত্তরঃ॥
(বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুলপঞ্জী।)

† পুরাবৈদ্যকুলোদ্ভূত বল্লালেন মহীভুজা। ব্যবস্থাপি চ কৌলীন্যং দুহিসেনাদি বংশজে॥
(কবিকণ্ঠহার, সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা।)

‡ অথ বল্লালভূপশ্চ অম্বষ্ঠকুলনন্দনঃ। কুরুতেঽতি প্রযত্নেন কুলশাস্ত্রনিরূপণং॥
(কায়স্থঘটক রামানন্দ শর্ম্মকৃত কায়স্থকুলদীপিকা।)

বল্লালসেন নৃপতি হইল পশ্চাৎ। অম্বষ্ঠবংশেতে জন্ম, ব্রহ্মপুত্রজাত॥
(চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রাজা পরমানন্দ রায়ের সমকালীন হস্তলিখিত কায়স্থঘটককারিকা।)

§ বৈদ্যবংশাবতংসোয়ং বল্লালোনৃপপুঙ্গবঃ। তদাজ্ঞয়া কৃতমিদং বল্লালচরিতং শুভং॥
(গোপালভট্ট বিরচিত বল্লালচরিত, উত্তরখণ্ড।)

বিরল। প্রাচীন বাকলায় বঙ্গজ যে সমস্ত জাতি ছিলেন, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থই প্রধান। নবশায়ক এবং অন্যান্য জাতিও যথেষ্ট ছিল। এই সমস্ত জাতির মধ্যে প্রত্যেক জাতির শাস্ত্রানুমোদিত সমাজ গঠিত ছিল, এবং যিনি প্রধান তিনিই সমাজপতি ছিলেন। সর্ব্বোপরি রাজা নেতা ছিলেন। কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে রাজা তাহার সুবিচার করিয়া দিতেন। রাজ্য শাসন সম্বন্ধে কায়স্থ রাজাকেও ক্ষত্রিয়বৎ আচার ব্যবহার করিতে হইত। ব্রাহ্মণগণ বহুকাল পর্য্যন্ত যথাচারী ছিলেন। রাজকার্য্যেও তাঁহাদের উপদেশ শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবস্থা বলিয়া পরিগৃহীত হইত।

বঙ্গীয় লেখককুল চূড়ামণি স্বর্গীয় রায় বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর যথার্থই লিখিয়াছেন যে বঙ্গীয় কুলললনাগণ রমণীরত্ন। প্রাচীনকালের হিন্দুললনাগণের আচার, ব্যবহার, গৃহকার্য্য প্রভৃতির সঙ্গে বর্ত্তমান সময়ের পর্য্যালোচনা করিলে হৃদয়ে যুগপৎ হর্ষ এবং বিষাদ উপস্থিত হয়। এখনও যাহা আছে, তাহা অন্যত্র দুর্লভ। হিন্দুসমাজে পরগৃহ অলঙ্কৃত এবং পরের সঙ্গে দেহপ্রাণ মিশাইয়া অক্ষয় ধর্ম্ম এবং কীর্ত্তি উপার্জ্জন করিতেই যেন নারী জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। তাই জননী, শৈশব হইতেই দুহিতাকে সেইরূপ শিক্ষা দিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ এই সমস্ত শিক্ষা লাভের জন্যই কুমারী অবস্থায় নারীজাতির কতগুলি ব্রত নিয়ম পালনের প্রথা হইয়াছে। অতি প্রত্যূষে গ্রীষ্ম, শীত, বর্ষা প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়া বালিকা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করে, এবং নিজেই সমবয়স্কাসহ মিলিতা হইয়া এই সমস্ত ব্রতাদি নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। একটু বড় হইলে জননী তখন গৃহকার্য্যশিক্ষা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালোপযোগী আর কয়েকটী ব্রতে ব্রতী করিয়া থাকেন। এই সমস্ত ব্রত, শ্বশুর, শাশুড়ী, ভাসুর, দেবর প্রভৃতির প্রতি ভক্তি, স্নেহ প্রভৃতি নানাবিধ শিক্ষাপোযোগী সুন্দর উদাহরণপূর্ণ গল্পে পরিপূর্ণ। * বাল্যকাল হইতেই এইরূপ সৎশিক্ষায় সুশিক্ষিতা হইয়া, কুমারী যখন বিবাহিতা হয় তখন গৃহকার্য্য সম্বন্ধে তাহার অন্য কোন শিক্ষার বিশেষ দরকার হয় না। এই প্রকার নববধূর আগমনে সেই গৃহ, সুখশান্তি এবং ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ হয়।

* মাঘমণ্ডল, সেঁজুতি, যমপুকুর প্রভৃতি ব্রত কুমারীদের মধ্যে এখনও প্রচলিত।

হিন্দু রমণীদিগের স্বামীই সর্ব্বস্ব; ইহকাল পরকালের একমাত্র নিয়ন্তা। তাই তাঁহারা বিবাহের দিন হইতেই অতি গোপনে, মনে মনে তাঁহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পন করিয়া থাকেন। স্বামী যদি রুগ্ন, কদাকার, দরিদ্র, অথবা কটুভাষী হন, হিন্দুরমণীর পক্ষে তথাপি তিনি জীবন সর্ব্বস্ব; * স্ত্রী কায়মনোবাক্যে তাহারই পদ সেবাকারিণী দাসী। আজকাল যেমন আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা সকল সময়ে যথেচ্ছভাবে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ এবং আলাপ করিয়া থাকেন, আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি সে সময়ে তাহা ছিল না। দিবাভাগে স্বামী কদাচিৎ স্ত্রীর দর্শন পাইতেন। তৎকালে স্ত্রীলোকের এরূপ একটা ধারণা ছিল যে, স্বামী, দিবাভাগে স্ত্রীমুখ দেখিলে, উভয়ই ভাগ্যহীন হয়। তাই, স্ত্রী পুরুষ উভয়ই সতর্ক থাকিতেন। যাবতীয় গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া রমণী, শ্বশুর, শাশুড়ী ও ভাসুর প্রভৃতিকে আহার করাইতেন; তৎপর স্বামীর আহার হইলে সেই উৎসৃষ্ট পাত্রে আপনি ভোজন করিতেন। কিন্তু সকলের আহারের পূর্ব্বে অতিথি, ব্রাহ্মণ, রুগ্ন এবং বালক বালিকাগণকে আহার প্রদান এবং সেবা শুশ্রূষা করিতে হইত। প্রাচীন হিন্দুগণ জানিতেন যে অতিথি দেবতা স্বরূপ। হিন্দুগণ, স্বয়ং উপবাসী থাকিয়াও অতিথিসেবা পরম ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। †
রাত্রিতে সকল গৃহকার্য্য সমাপ্ত করিয়া, স্ত্রী স্বামী সন্দর্শনে যাইতেন। স্বামী শয্যায় শয়ান থাকিলে, স্ত্রী তাহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া শয্যায় গমন করিতেন। স্বামীর সুষুপ্তি না হইলে স্ত্রী কখনও নিদ্রিতা হইতেন না। বর্ত্তমান কালের বঙ্গকুলললনাদের, গৃহকার্য্য, পরিবারবর্গের সেবা, স্বামীর প্রতি প্রেম প্রভৃতির সঙ্গে পূর্ব্ব সময়ের তুলনা করিলে আকাশ পাতাল প্রভেদ জ্ঞান হয়। এখন যে আদর্শ বঙ্গরমণী নাই তাহা নহে; তবে পূর্ব্বকালের ন্যায় পাওয়া দুরূহ। এখনকার অনেক রমণী পাশ্চাত্যধরণের শিক্ষিতা, গৃহকার্য্য, রন্ধন, সন্তান প্রতিপালন প্রভৃতির বড় ধার ধারেন না।

* দরিদ্রং ব্যাধিতং মূর্খং ভর্ত্তারং যা ন মন্যতে।
সা মৃতাং জায়তে ব্যালী বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ॥
(পরাশর সংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়, ৩৭ শ্লোক।)

† ন পৃচ্ছেদ্ গোত্রচরণং ন স্বাধ্যায় ব্রতানিচ
হৃদয়ং কল্পয়ে তস্মিন সর্ব্বদেব ময়োহ্তিথিঃ।
(পরাশর সংহিতা, ১ম অধ্যায়, ৪১ শ্লোক।)

যাঁহাদের আর্থিক অবস্থা ভাল, তাঁহারা চাকর চাকরাণী অথবা পরিবারস্থ বৃদ্ধাগণের প্রতি গৃহকার্য্য, সন্তানরক্ষা প্রভৃতির ভারার্পণ করিয়া নাটক, উপন্যাস, অথবা উলপ্যাটার্ণ লইয়া বসেন; কখন কখনও বা, পাঁচজন মিলিয়া তাস অথবা অন্যান্য অকিঞ্চিৎকর খেলা খেলিয়া, অথবা মিথ্যা গল্প-গুজব করিয়া সময়াতিবাহিত করেন। বর্ত্তমান সময়ের পাশ্চাত্য শিক্ষিতা বঙ্গমহিলার মধ্যে কেহ কেহ হয়ত স্বামীকে উপন্যাসের নায়কের ন্যায় জ্ঞান করিয়া 'তিলোত্তমা' 'কুন্দ' 'মৃণালিনী' প্রভৃতির ন্যায় ভালবাসিয়া থাকেন। স্বামীর প্রতি এরূপ ভালবাসা যদি ভক্তি মিশ্রিত হয় তবে তাহা অপার্থিব; কিন্তু পুরাকালের রমণীর পতি-প্রেম, অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় হৃদয়াভ্যন্তরীণ অস্থিপঞ্জরে স্বামীর পবিত্র মূর্ত্তির সহিত দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল থাকিত। তৎকালে 'হে প্রাণনাথ' 'হে জীবন সর্ব্বস্ব' এই সকল সম্বোধন খুব বিরল ছিল। স্ত্রী নীরবে হৃদয়ের গুপ্তমন্দিরমধ্যে স্বামীর মূর্ত্তি অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দ্বারা সর্ব্বদা অর্চ্চনা করিতেন। কিন্তু সকলেই যে তৎকালে সতী সাবিত্রী ছিলেন তাহা নহে। সুগন্ধ পুষ্পোদ্যানে দুই একটী কণ্টকী বৃক্ষও দৃষ্ট হয়। কুলটা, অপ্রিয়ভাষিণীও যে না মিলিত তাহা নহে; তবে, তৎকালীন সমাজের কঠোর শাসনভয়েই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক এরূপ স্ত্রীলোকের সংখ্যা খুব অল্পই দেখা যাইত। দৈবাৎ কোন পরিবারে এইরূপ কোন কুলটা রমণী দৃষ্ট হইলে, তাঁহাদের চিরদিনের তরে সমাজ অথবা জাতিচ্যুত হইয়া থাকিতে হইত। বিধবা-বিবাহ কোন কোন শাস্ত্রানুমোদিত * হইলেও তৎকালীন সমাজে তাহা প্রচলিত ছিল না; পরন্তু ইহা অতীব ঘৃণার সহিত উপেক্ষিত হইত। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং ভদ্রকায়স্থ জাতির বিধবাগণ, যথাশাস্ত্র ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করিতেন। কিন্তু শূদ্রাদি অন্ত্যজ জাতি, বেশভূষা সম্বন্ধে বৈধ আচরণ করিলেও আহারাদি সম্বন্ধে সধবার ন্যায় আচরণ করিত। বর্ত্তমান সময়েও ইতর-হিন্দুজাতির মধ্যে এই নিয়ম বিদ্যমান আছে। পুরাকালে, অস্মদ্দেশে ইতর জাতির মধ্যে দুই একটা বিধবা বিবাহের কথা শুনা যায়;

---

* নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥
(পরাশর সংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়, ২৭ শ্লোক।)

কিন্তু তাহারও কোন প্রমাণ নাই। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ, তাঁহাদের প্রণীত অনেক ধর্ম্মগ্রন্থে বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে বহুতর যুক্তি প্রদান করিয়াছেন। ঋগ্বেদে ইহার প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাই। মৃত স্বামীর পার্শ্ববর্ত্তিনী রোরুদ্যমানা রমণীকে কোন আত্মীয় হস্ত ধারণ পূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া বলিবে যে, হে রমণি! তুমি মৃতের জন্য আর শোক করিওনা, যিনি এখন তোমাকে স্ত্রীত্বে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তুমি শোক পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে পতিত্বে বরণ কর এবং সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া সুখভোগ কর। *

বিষ্ণুসংহিতায় সন্তানবতী বিধবার পত্যন্তরগ্রহণে নিষেধ আছে, কিন্তু বালবিধবার পুনঃপত্যন্তর গ্রহণ বিশেষভাবে উল্লেখ দেখা যায়। পরাশর-সংহিতায় বিধবা বিবাহের অনুকূলে একটী মাত্র বচন দেখিতে পাই। সম্ভবতঃ সমাজের বিশৃঙ্খলা অর্থাৎ সন্তানের পিতৃনির্ণয়, উত্তরাধিকারীত্ব সম্বন্ধে গোলযোগ প্রভৃতি উপস্থিত দেখিয়া বিধবা বিবাহ সমাজ হইতে দূরীভূত হইয়াছে। এই নিয়ম রহিত হওয়াতে বর্ত্তমান সমাজের কোন কোন বিষয়ে যেমন সুবিধা হইয়াছে, তেমন অন্যপক্ষে ঘোরতর পাপস্রোতও বৃদ্ধি হইতেছে। ইতরজাতির এবং ভিন্নদেশের বিবাহ বন্ধন ঐহিক সুখ-সম্পদপ্রদ বলিয়া বোধ হয়; কেননা বর্ত্তমান সভ্যসমাজে এবং বিচার আদালতে আমরা "বিবাহের চুক্তিভঙ্গ" সূচক মোকদ্দমা (Divorce Suit) অনেক দেখিতে পাই। হিন্দুজাতি, বর্ত্তমান সময়ে হীন, দুর্ব্বল এবং পরপদ-লেহী হইলেও, তাঁহাদের সমাজবন্ধন, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি এখনও এত দৃঢ় এবং একতাবদ্ধ যে তাহা শীঘ্র ছিন্ন হইবার সম্ভব নাই। তাহাদের বৈবাহিক ধর্ম্ম এবং তন্নিবন্ধন আচার সম্বন্ধে বিদেশীর অনেক বিষয় লিখিবার আছে। হিন্দুগণ বিবাহকে ঐহিক সুখপ্রদ মনে করেন না, পরন্তু ইহাকে অক্ষয় ধর্ম্মোপার্জ্জনের পথ বলিয়া মনে করিয়াছেন। স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ জীবনে মরণে তুল্য ভাবেই বর্ত্তমান থাকে। উভয়ের দেহ ভিন্ন হইলেও আত্মা এক হইয়া যায়; তাই হিন্দুগণ স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। একবৃন্তে দুইটীফুলের মত, তাহারা এই সংসারোদ্যানে ফুটিয়া থাকে।

---

* উদীর্ষ নার্য্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপশেষএহি।
হস্ত গ্রাভস্য দিধিষোস্ত বেদং পত্যুর্জ নিত্বমভিসংবভূথ ॥ —ঋগ্বেদ.

বিশাল সহকার বেষ্টিত, ক্ষুদ্রবল্লরীর ন্যায়, হিন্দুরমণী স্বামীকে বেষ্টন করিয়া, তদাশ্রয়েই বাঁচিয়া থাকেন। ভীষণ প্রবাহে মহামহীরুহ ধরাশয়ী হইলে, ক্ষুদ্রাব্রততী যেরূপ আপনা হইতেই নীরবে শুকাইয়া যায়; স্বামীর চিরবিরহে, সতীর পক্ষে জীবন ধারণও তদ্রূপ একান্ত অসহনীয়; তাই বোধহয় প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ সহমরণের ব্যবস্থা করিয়া থাকিবেন। * হিন্দুরমণী বিধবা হইলে তিনি শত পুত্রবতী এবং জগতের সম্রাজ্ঞী হইলেও হতভাগিনী। প্রতিদিন তিল তিল পরিমাণে তাহার শরীর ক্ষয় হইতে থাকে। স্বামীর স্বর্গগমন হইতেই সতীর আত্মা তৎসহ গমন করে; অস্থিমাংসাবশেষ দেহমাত্র পড়িয়া থাকে। সহমরণ, রমণীগণের পরম ধর্ম্ম; কারণ ইহকালে এবং পরকালে তিনি স্বামীর সেবাকারিণী দাসী; স্বামী যেখানে যাইবেন তিনিও সেইখানে ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী হইবেন, ইহাই শাস্ত্রোক্তি এবং ইহাই তাঁহাদের পরম বিশ্বাস। তাই সতীনারী সহাস্যবদনে স্বামী সহগামিনী হইতেন।

লর্ড বেন্টিঙ্ক কর্ত্তৃক সতীদাহ আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ জিলাস্থ অনেক ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং ভদ্র কায়স্থ সতীগণ সহমরণ গিয়াছেন; তৎকালে বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে ভদ্র পরিবারের সীমন্তিনীগণ মধ্যে অনেকেই স্বামী সহগামিনী হইতেন।

বর্ত্তমান সময়ে যেমন বিবাহ সম্বন্ধে বর কন্যার বয়স এবং কালাকাল বিচার নাই, আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি সেই সময় তজ্জন্য বিশেষ বিধান ছিল। পুরুষ ত্রিংশ এবং স্ত্রীলোক দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম না করিলে, বিবাহিত হইতেন না। † তাই উপযুক্ত বয়সে সন্তান হইলে, সেই সন্তান নীরোগ এবং দীর্ঘজীবী হইত। সেই নিয়ম এখন প্রচলিত থাকিলে, বাঙ্গালী এরূপ দুর্ব্বল, ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইত না।

---

* তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধ কোটীচ যানি রোমাণি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥
(পরাশর সংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়, ২৯ শ্লোক।)

† ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ ভার্য্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশ বার্ষিকীং।
ত্র্যষ্ট-বর্ষোঽষ্টবর্ষাম্বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥
(মনুসংহিতা)

অতি কুক্ষণেই আমাদের দেশে বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। আমরা শাস্ত্রার্থ ভিন্নভাবে বুঝিয়া, "গৌরী" "রোহিণী" দান করিতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া থাকি। এখন বালকের ষোড়শ অথবা কিঞ্চিদধিক বয়স হইলেই পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন একটী "গৌরী" অথবা "রোহিণী" আনিয়া তাঁহাকে উদ্বাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতঃ চিরকালের তরে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির পথে কণ্টকবৃক্ষ রোপণ করিয়া থাকেন। এই উদ্বাহ বৃক্ষে যে বিষময় ফল প্রসূত হইতেছে, বর্ত্তমান সমাজই তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ।

আজকাল যেমন পুত্রকন্যার উদ্বাহ ক্রিয়া লইয়া যুগ প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে, তৎকালে তাহা ছিল না। অনেক ব্রাহ্মণ সন্তান এখন কন্যা বিক্রয় করিয়া থাকেন; কেহ কেহ বা এই প্রকার বিবাহের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন; প্রাচীনকালে এদেশে এরূপ রীতির কথা শুনা যায় না। "শুক্র বিক্রয়" মহা পাপ; যে করে তাহার চতুর্দ্দশ পুরুষ নরকস্থ হয়। *

এই মহাপাপজনক কার্য্য অতি কুক্ষণেই আমাদের সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। তৎকালে যাঁহার যেরূপ সাধ্য তিনি সেইভাবে যথাশাস্ত্র কন্যা সম্প্রদান করিতেন। কৌলীন্য প্রথা এই দেশে প্রচলিত হইবার পর হইতেই এই জঘন্য প্রথা প্রবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে কন্যা বিক্রয় যত অধিক দেখা যায়, অন্যান্য জাতি তত্তুলনায় অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়। ইদানীং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সম্মতি আইন (age of consent act) বিধিবদ্ধ করিয়া অস্মদ্দেশের মহোপকার করিয়াছেন, তদ্রূপ উল্লিখিত কুপ্রথা রহিতের কোন নিয়ম অবধারিত করিলে, বর্ত্তমান সমাজের মহদুপকার সাধিত হইত।

---

* ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্ণীয়াঃ শুল্ক মণ্বপি,
গৃহ্নন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোঽপত্য বিক্রয়ী।
(মনুসংহিতা।)

শুল্কে ন যে প্রযচ্ছন্তি স্ব সুতাং লোভমোহিতাঃ
আত্মবিক্রয়িণঃ পাপাঃ মহাকিল্বিষকারিণঃ
তদ্দেশং পতিতং মন্যে নরান্তে শুক্রবিক্রয়ী।
(স্মৃতি সংগ্রহ।)

তৎকালে বহুবিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল; কিন্তু তা বলিয়া কেহ ইচ্ছা পূর্ব্বক একের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতেন না। স্ত্রী রুগ্না, গৃহকার্য্যে অশক্তা, কিম্বা বন্ধ্যা হইলে স্ত্রীর অনুমত্যনুসারে অন্য পত্নী গ্রহণ করিতেন। ব্রাহ্মণ সমাজে 'মেলবন্দী' হইলে অনেক ব্রাহ্মণের বাধ্য হইয়া বহু বিবাহ করিতে হইত। এই কুপ্রথা বশতঃ ব্রাহ্মণ সমাজে অহরহঃ যে কত কুকাণ্ডের অভিনয় হইতেছে তাহা বর্ণনা করা দূরে থাক, স্মরণ করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

অস্মদ্দেশীয় হিন্দুসমাজ তৎকালে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। এক সম্প্রদায় শক্ত্যুপাসক ও অপর বৈষ্ণব ছিলেন।* এই বৈষ্ণব সম্প্রদায় বর্ত্তমান "বৈরাগী" নহেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহু শত বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সময় হইতেই পুরাণোক্ত বৈষ্ণব ধর্ম্ম অস্মদ্দেশে প্রচলিত ছিল: এবং বহু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি এই পবিত্র ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তন্ত্রোক্ত সাধনকার্য্যে এবং "পঞ্চমকারে" অস্মদ্দেশীয় শাক্তগণ বিশেষ তৎপর ছিলেন। অনেকে এই উপায়ে সিদ্ধ হইয়াছিলেন এরূপ প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে।

বিকৃত মস্তিষ্ক এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণগণের হাতে পড়িয়া পরম পবিত্র তন্ত্রশাস্ত্র বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়াছে। তাই অনেকে ইহাকে অশ্লীল বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। বাস্তবিক সদ্‌গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ করিলে এই ভ্রম সহজেই অপনীত হইয়া থাকে।

তন্ত্রোক্ত সাধন প্রণালী সাধকের নিকট বড় অল্পায়াস সিদ্ধ; ইন্দ্রিয় দমন পূর্ব্বক কি প্রকার শুচি হইয়া ভগবচ্চিন্তা করিতে হয়, তন্ত্র তাহার পথ অতি সহজ করিয়া দিয়াছে। মুসলমানাক্রমণের পূর্ব্বে হিন্দু এবং বৌদ্ধ ব্যতীত, অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীর পরিচয় পাওয়া যায় না।

ব্রাহ্মণগণ যেমন যজন, যাজন, এবং অধ্যাপনা করিতেন, সেইরূপ তদিতর জাতি সমূহও স্বীয় স্বীয় জাতীয় ব্যবসা করিতেন। বৈদ্যগণ, চিকিৎসা এবং আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্র অধ্যাপনা, লিপিবৃত্তি এবং অন্যান্য অসবর্ণ জাতি আপন আপন জাতীয় ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন।

---

* মহারাজ আদিশূরের পূর্ব্বে বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং আদি সেননৃপতিগণের রাজত্ব সময়ে অর্দ্ধনারীশ্বরের উপাসনা বঙ্গদেশে প্রবল ছিল।

মুসলমানাক্রমণের বহুশত বৎসর পর পর্য্যন্তও এই নিয়ম এদেশে প্রচলিত ছিল। মহাকবি বিজয় গুপ্ত তাঁহার পদ্মপুরাণে এই সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

চারি বেদধারী তথা ব্রাহ্মণ সকল।
বৈদ্য জাতি বসে নিজ শাস্ত্রেতে কুশল॥
কায়স্থ জাতি বসে তথা লিখনের সুর।
অন্য জাতি বসে নিজ শাস্ত্রে সুচতুর॥

আজকাল যেমন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ এবং অন্যান্য জাতি সমূহ, ইচ্ছানুসারে জাতীয় ব্যবসা ত্যাগ করিতেছেন, তৎকালে তাহা ছিল না; কেহ নিতান্ত দায় না পড়িলে, অন্য ব্যবসা অবলম্বন করিতেন না। কার্য্যোপলক্ষে অথবা ইচ্ছানুসারে কোন উচ্চ জাতীয় ব্যক্তি তদিতর জাতীয় কাহারও বাটীতে গমন করিলে, তিনি স্বীয় মর্য্যাদানুসারে অভ্যর্থিত হইতেন; সেইরূপ নীচ জাতিরও উচ্চ জাতিদের নিকট উপযুক্ত আদর লাভ হইত।

বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে নারী জাতির গার্হস্থ জীবনের প্রধান গুণ ভাসিয়া গিয়াছে। একটু বর্ষীয়ান পাঠককে বোধ হয় ইহা বলিতে হইবে না যে এই প্রধান গুণের নাম রন্ধন। তৎকালে রাণীতুল্যা রমণীকেও মধ্যে মধ্যে পাকশালার কার্য্য করিতে হইত। শত সহস্র কিঙ্করকিঙ্করীসেবিতা হিন্দুরমণীও অন্ততঃ পক্ষে স্বামী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পরিজনবর্গের জন্য স্বহস্তে রন্ধন করিতেন। আজকাল যেমন "পাকপ্রণালী" "পাকরাজেশ্বর" না হইলে আমাদের কুললক্ষ্মীগণ সামান্য ডাল, সুক্তা প্রভৃতি পাক করিতে পারেন না, পাকা উনানে 'হিট্‌গজ' (heat gauze) না হইলে জ্বাল বুঝিতে পারেন না, তৎকালে এ সকল কিছুই ছিল না। সুক্তা হইতে মাংস, পিষ্টক, পরমান্ন প্রভৃতি আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী রমণীগণ, বিনা ক্লেশে বিনা উপদেশে স্বহস্তে অপূর্ব্ব রন্ধন করিতেন। কোন গ্রামে কোন বৃহৎ নিমন্ত্রণ উপস্থিত হইলে, দুই তিনজন স্ত্রীলোক রন্ধনশালার যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, একটু বর্ষীয়সী হইলে নিজেরাই পরিবেশন করিতেন। ইহাতে তাঁহাদের ক্ষমতা এবং গুণানুসারে প্রশংসা হইত। তাঁহারাও অদম্য উৎসাহে প্রাণভরা আহ্লাদে

এই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেন। কারণ হিন্দুরমণী জানিতেন যে পর্য্যাপ্ত ভোজন করাইয়া কাহাকেও তৃপ্ত করিতে পারিলে দেবতা পূজার ফল লাভ হয়। বর্ত্তমান সময়ে দুই তিন গ্রাম তন্ন তন্ন করিয়াও এই প্রকার দুই একটী রমণী পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

ভূম্যধিকারিগণ যে স্থানে বাস করিতেন, তাহার চতুষ্পার্শ্বে ব্রাহ্মণ, নাপিত, ধোপা প্রভৃতি নিত্যাবশ্যকীয় জাতি বাস করিত এবং সকলেই সেই ভূম্যধিকারীর আশ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইত। এইরূপ বসতিস্থান "খানাবাড়ী" বলিয়া অভিহিত হইত। এখনও অস্মদ্দেশে বহু পুরাণ ভূম্যধিকারিগণের বসতবাড়ীর চতুষ্পার্শ্বেই এরূপ খানাবাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের দ্বারা নিত্য নৈমিত্তিক দেবার্চ্চনা এবং অন্যান্য যাবতীয় গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ হইত; তাহারা পুরুষানুক্রমে কেবলমাত্র ভূমিবৃত্তি ভোগ করিত।

বৈষ্ণব এবং শাক্তদিগের যতগুলি দেবার্চ্চনা প্রথা এবং পার্ব্বণ আছে, তাহার প্রায় সকলই বহুকাল হইতে এই দেশে প্রচলিত ছিল। অস্মদ্দেশে শাক্তদিগের সংখ্যা অনেক বেশী, তাই বহুপূর্ব্বেও বর্ত্তমান সময়ের মত শক্তি পূজা মহাসমারোহে নির্ব্বাহ হইত। শ্রীশ্রী৺শারদীয়া মহাপূজা, শ্যামা, লক্ষ্মী, বাসন্তী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি পূজোপলক্ষে সম্পন্ন শাক্তগৃহস্থ বিপুল অর্থ ব্যয় করিতেন। বিজয়ার দিনে হিন্দুসন্তান সমস্ত শত্রুতা বিস্মৃত হইয়া পরমশত্রুকেও সাদরে আলিঙ্গন করতঃ বয়োজ্যেষ্ঠগণ ধান্য দুর্ব্বাদ্বারা এইভাবে আশীর্ব্বাদ করিতেন যে, এই উভয় দ্রব্যের ন্যায় তুমি অক্ষয় হও। এই শুভদিনে সকলে একত্র হইয়া নানা প্রকার আমোদ আহ্লাদ করিতেন, এখনও উক্ত প্রথা সকল এই দেশে সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান আছে।

বর্ত্তমান সময়ে এইদেশে "নবান্ন" যে প্রকার প্রসিদ্ধ এবং গৃহে গৃহে প্রচলিত, পূর্ব্বেও এই প্রকার ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। এই উপলক্ষে প্রত্যেক হিন্দু সন্তানকে "পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ" করিতে হয়। সম্ভবতঃ শস্য-প্রধান দেশ বলিয়াই নবান্নোপলক্ষে আমাদের দেশে অন্যান্য দেশাপেক্ষা অধিকতর আড়ম্বর হইয়া থাকে।

নবান্ন-শ্রাদ্ধের ন্যায় আরও দুইটী পার্ব্বণ বহুপূর্ব্ব হইতে এই দেশে প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে একটী শ্রীশ্রী৺মনসা পূজা ও অপরটী পৌষপার্ব্বণ।

এই উভয় ক্রিয়াই অস্মদ্দেশে প্রায় ঘরে ঘরে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। মনসা পঞ্চমী তিথিতে জগন্মাতা মনসা দেবীর ঘটসম্মুখে, বহুপূর্ব্বে নানাস্থান হইতে গুণী মালবৈদ্যগণ একত্রিত হইয়া সাক্ষাৎ কৃতান্ত স্বরূপ বিষধর সর্পসমূহ লইয়া ক্রীড়া করিত। প্রত্যেক হিন্দুসন্তান তখন ভক্তিভরে সপুষ্পাঞ্জলি নাগমাতার অর্চ্চনা করিতেন; এমন কি অনেক মুসলমান সন্তানও দেবীকে নানা প্রকার ফল পুষ্প প্রভৃতি প্রদান করিতেন। প্রাচীন বাকলায় "মানসী" নগর * তখন এই সমস্ত কার্য্যের লীলানিকেতন ছিল। সাধকপ্রবর মহাত্মা বিজয় গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত ভগবতী মনসাদেবীর সম্মুখে তখন লোকারণ্য হইত। ত্রিপুরা, আসাম, চট্টগ্রাম, যশোহর প্রভৃতি স্থান হইতে বহুসংখ্যক বিষবিশারদ মালবৈদ্য একত্রিত হইয়া স্বীয় স্বীয় গুণগ্রাম প্রকাশ করতঃ যথাসাধ্য উপচারে দেবীপূজা করিতেন। এখন আর এইদেশে কোথাও কোন মালবৈদ্য দেখা যায়না। এই দেশে এখন অনেক বিষ-বৈদ্যের কথা শুনা যায় যে তাহারা সাতদিনের সর্পদষ্ট মৃতবৎ রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। এই সমস্ত মালবৈদ্যগণ কাহারও নিকট হইতে অর্দ্ধ পয়সাও গ্রহণ করিতেন না; জনশ্রুতিতে কোথাও সর্পাঘাতের কথা শুনিলে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া রোগীর চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করিতেন। মানসী নগরে মনসা পঞ্চমীর উৎসব সম্বন্ধে টাইলর সাহেবের মিনিটে কতক আভাস পাওয়া যায়। † উক্ত সাহেব বাহাদুর সম্ভবতঃ মালবৈদ্যগণের বিদ্যায়

* বর্ত্তমান পৈলা ফুলশ্রী।

† I stood just outside the temple. There was a huge concourse of people of both the sexes. On a dozen of *Bamboo Machans* half naked men and women were heard to utter something quite incomprehensible to others. Soon after one of the men drew out a black snake from an earthen pot, which soon expanding its hood, bit the man twice or thrice on his arms. After a few minutes the man fell down and I was horor stricken to find that he shewed all the symptoms venomous snake poisoning * * *. A woman, an ugly looking creature of the same *Machan*, coming up to prostrate man uttered some mystic words, and with her hands made some mesmeric motions over the face of the patient. Soon after, the dying man opened his eyes, which at the first glance looked blood shot. Several handful of cold water was then sprinkled over his face and eyes and within quarter of an hour the man was all right, as if nothing had happened to him—I personally saw the snake which was indeed of venomous type.—Ext. From Mr. Taylor's Minutes, August 28th, 1790.

ততটা বিশ্বাস করেন নাই। তিনি স্বয়ং বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের গুণপণায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে মালবৈদ্যগণের চিকিৎসা অপেক্ষাও জগন্মাতা মনসাদেবীর প্রতি অবিচলিত ভক্তিই অধিক। হিন্দু-সন্তানকে বোধ হয় আর অধিক কিছু বলিতে হইবে না : ঐশী শক্তির সহিত বিজ্ঞানের আকাশ পাতাল প্রভেদ।

অন্যান্য স্থানের পৌষ পার্ব্বণ অপেক্ষা এই দেশে একটু প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক ভূম্যধিকারী স্ব স্ব অধিকৃত স্থানে পৌষ সংক্রান্তির দিন পূজা দিয়া থাকেন। বহুপূর্ব্ব হইতেই, এই পূজা প্রচলিত। বিচার আদালতে ইহাই দখলের অন্যতম প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ইহার একটু বিশেষত্ব এই যে, শস্যক্ষেত্র এবং অনাবৃত স্থানেই এই পূজা হয় বটে, কিন্তু কাফিলা গাছ না হইলেই চলে না : তাই অনেক ক্ষেত্র মধ্যে কৃষকগণ একটী কাফিলাগাছ যত্ন পূর্ব্বক রোপণ করে। যে ক্ষেত্রে উক্ত বৃক্ষ নাই, কৃষকগণ সেখানেও পূজার দিনে, অন্যস্থান হইতে উহার একটা ডাল আনিয়া রোপণ করে, পরে তৎসম্মুখে ঘটস্থাপন পূর্ব্বক পূজা দিয়া থাকে। অন্যান্য পূজোপকরণের সঙ্গে মৃত্তিকা নির্ম্মিত একটা প্রকাণ্ড কুম্ভীর প্রস্তুত করিতে হয় ; কোন কোন স্থানে ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুরও মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়া থাকে। বাস্তু ভূমির অধিষ্ঠাত্রী রণচণ্ডী দেবীর পূজা হয় বলিয়া এই দেশে ইহা 'বাস্তুপূজা' নামে অভিহিত ; কুম্ভীর, ব্যাঘ্র প্রভৃতি দেবীরই পরিবার বলিয়া ধ্যানমন্ত্রে উল্লেখ আছে। কোন কোন স্থানে ইহার পরিবর্ত্তে কালী মূর্ত্তির পূজা হইতেও দেখা যায়। ইহাতে অনেকে অনুমান করেন যে অতিপূর্ব্বে এই সমস্ত স্থান জঙ্গলাকীর্ণ ছিল ; কাঠুরিয়াগণ, হিংস্র জন্তুর উপদ্রব হইতে প্রাণ রক্ষার জন্য এইরূপ অর্চ্চনা করিত, সেই হইতে এই নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে। কৃষকগণ এই দিনে স্ব স্ব গবাদিকে নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্যাদি প্রদান করে, এবং নানাবর্ণে তাহাদের দেহ রঞ্জিত করিয়া থাকে।

তৎকালে স্থানীয় ভূম্যধিকারিগণ এক প্রকার স্বাধীন ছিলেন, তাঁহাদের অধিকারস্থ প্রজাবর্গের ফৌজদারী আদালত প্রভৃতি যাবতীয় বিচার কার্য্য তাঁহারাই নির্ব্বাহ করিতেন। প্রত্যেকের বহু সংখ্যক লাঠিয়াল, তীরন্দাজ এবং ঢাল সড়কীওয়ালা থাকিত ; এই সমস্ত লোক দ্বারা

ভূম্যধিকারী, প্রজাপুঞ্জের নিকট হইতে যেমন প্রাপ্য কর আদায় করাইতেন, সেই প্রকার দস্যুভীতি অথবা পরের আক্রমণ হইতেও আত্মরক্ষা করিতেন। তৎকালে লাঠিখেলা, তরবারিচালনা প্রভৃতি পুরুষোচিত কার্য্য অল্প বিস্তর প্রত্যেকেরই জানা ছিল।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে বাকলা পণ্ডিতপ্রধান স্থান। এই স্থানে অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আবির্ভূত হইয়া বীণাপাণির অর্চ্চনা দ্বারা অমর হইয়াছেন। নানা দিগ্দেশ হইতে বহু সংখ্যক ছাত্র এই স্থানে অধ্যয়নার্থ আগমন করিতেন। নলচিড়া, উজিরপুর, মানপাশা, শিকারপুর, কীর্ত্তিপাশা প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতগণ একদা সমগ্র বঙ্গদেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এই সকল স্থানের চতুষ্পাঠীতে ন্যায়, স্মৃতি, বেদান্ত, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইত। বিদেশ হইতে আগত ছাত্রবৃন্দ অধ্যাপকের গৃহে আহার করিতেন এবং তাঁহারই পরিজন মধ্যে গণ্য হইতেন; পাঠ সমাপনান্তে ছাত্রেরা অধ্যাপকের অনুমতি গ্রহণ করিয়া দেশে গমন করিতেন। কোন কোন অধ্যাপক "গুরুদক্ষিণা" স্বরূপ কদাচিৎ যৎসামান্য অর্থ গ্রহণ করিতেন, আর কেহ কেহবা তাহাও লইতেন না। হিন্দু সন্তানের নিকট বিদ্যাদান, অন্নদান প্রভৃতি এখনও পরম পুণ্যময় কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। অনুসন্ধান করিলে এই জিলায় বর্ত্তমান সময়েও এইরূপ দুই একটী চতুষ্পাঠী পাওয়া যায়। এই সকল চতুষ্পাঠীতে ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্য সন্তানগণ ব্যতীত অন্য কোন জাতিকে গ্রহণ করা হইত না। মুসলমানাক্রমণের অনেক পরে দুই একটী কায়স্থ সন্তানের প্রবেশাধিকারের জনশ্রুতি শুনা যায়। প্রত্যেক হিন্দুই পঞ্চমবর্ষীয় পুত্রের বিদ্যারম্ভ করাইতেন; তদুপলক্ষে দেবার্চ্চনা হইত; গুরু অথবা পুরোহিত প্রথম একখণ্ড খড়ি দিয়া কৃষ্ণপ্রস্তরে বালককে বর্ণমালা শিখাইতেন; ইহাই 'হাতেখড়ি' বলিয়া অভিহিত। অন্যান্য জাতির শিক্ষা দেওয়ারও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। আমরা সেকালের গুরু মহাশয়েরও অনেক গল্প শুনিয়াছি; প্রকৃত পক্ষে তৎকালে, গ্রামস্থ কোন বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ অথবা বৈদ্য সন্তান, "চৌপাড়ি" * স্থাপন করিয়া বালকদিগকে শিক্ষা দিতেন। পঞ্চমবর্ষীয়

* বোধ হয় চতুষ্পাঠীর অপভ্রংশ।

বালক হইতে বিংশ বর্ষীয় যুবক পর্য্যন্ত এই চৌপাড়িতে লেখাপড়া অভ্যাস করিত। এইস্থানে বাঙ্গলাভাষা, গণিত, এবং সংস্কৃতাভিজ্ঞ শিক্ষক, ব্যাকরণ ও কাব্যাদি শিক্ষা দিতেন; বালকেরাও যৎকিঞ্চিৎ অর্থ, অথবা দ্রব্যসামগ্রী, গুরুমহাশয়কে উপঢৌকন দিত। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির জন্য বর্ত্তমান ছাত্রগণের অভিভাবকগণ যেরূপ-ভাবে কষ্টার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিয়াও সময় সময় বিফল মনোরথ হইয়া থাকেন, তৎকালে সেরূপ ছিল না। চৌপাড়ির ছাত্রদের মধ্যে যাহারা উপযুক্ত শিক্ষক কর্ত্তৃক উপদেশ পাইত, তাহারা অনেকেই বিজ্ঞতা লাভ করিত। আজকাল যেমন বিদ্যাশিক্ষার গৌরব এবং আবশ্যকতা পঞ্চম বর্ষীয় বালকও উপলব্ধি করিতে পারিতেছে, তৎকালে শিক্ষাসম্বন্ধে সকলের ততটা প্রবৃত্তি ছিল না। ব্রাহ্মণ বৈদ্য এবং সম্ভ্রান্ত কায়স্থদিগের বাধ্য হইয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে হইত, কিন্তু তদিতর জাতির মধ্যে সহজে কেহ লেখাপড়া অভ্যাস করিত না। স্ত্রীজাতির বিদ্যাভ্যাস, তৎকালে সমাজে নিতান্ত গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইত। কোন কোন প্রতিভাময়ী রমণী গোপনে পিতা অথবা স্বামীর নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন।

মুসলমানগণ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ বিজিত হইবার পর হইতেই আমাদের পূর্ব্ব-কালীন সমাজবন্ধন, রীতিনীতি প্রভৃতি যে প্রকার ক্রমশঃই শিথিল হইতে আরম্ভ করিল, তদ্রূপ আমাদের অন্যান্য আচরণও ধীরে ধীরে নানাভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে যাবনিক আচার এবং কতকগুলি যাবনিক শব্দ আমরা অতর্কিতরূপে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলাম। বর্ত্তমান বঙ্গীয় সমাজের অনেক রীতিনীতির প্রতি একটু লক্ষ্য করিলে ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মোগল রাজত্বের পূর্ব্ব হইতেই ইহা ঘটিয়াছে, আমরা তৎপূর্ব্বের যে সকল বঙ্গীয় কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিয়াছি তাহাতে অনেকগুলি বৈদেশিক শব্দ উল্লেখ আছে। এমন কি আমরা এখন সাধুভাষায় অনেকগুলি যাবনিক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। তন্মধ্যে দোয়াত, কলম, তক্‌সিম্, পরগণা, ওলদে, এতমাম্, সাকিম, ফুরছি, আবাদ, জঙ্গল, কাগজ, সেরেস্তা, নাজির, কানুনগু, বাহাদুর, নবাব, খাজানা, খানা প্রভৃতি শব্দ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান রাজকীয় কাগজে এখনও এইরূপ যাবনিক শব্দ বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যখন দেশের

রাজা মুসলমান, তখন বাধ্য হইয়া দেশবাসীর রাজভাষা শিক্ষা করিতে হইত। তাই সম্ভ্রান্ত এবং রাজসম্ভ্রমাভিলাষিগণ মৌলবী রাখিয়া বালকগণকে পার্সী ও আরবী ভাষা শিক্ষা দিতেন। আজকাল যেমন ইংরাজী না শিখিলে, "পাদমেকং ন গচ্ছতি", তদ্রূপ তৎকালে পার্সী অথবা আরবী না শিখিলে চলিত না। বিশেষতঃ রাজকীয় যাবতীয় কার্য্য যাবনিক ভাষায় নির্ব্বাহ হইত, সুতরাং দেশীয় সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারীকে দায় পড়িয়া উহা শিখিতে হইত।

মুসলমান রাজগণ হিন্দুদিগের প্রতি যে সকল অত্যাচার করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত; তন্মধ্যে দুইটী অত্যাচার হিন্দুজাতির মধ্যে যে পর্য্যন্ত একজনও জীবিত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইবে না। ইহাদের প্রথম অত্যাচার স্ত্রীজাতির উপর। এই পশুপ্রকৃতি নরপতিগণের অত্যাচারে সুন্দরী হিন্দুললনাগণ যে কতদূর উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, ইতিহাসই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। সুন্দরী কন্যা, সুন্দরী স্ত্রী কিম্বা সুন্দরী ভগ্নী লইয়া কাহারও সংসার করিবার সাধ্য ছিল না। দৈবাৎ নবাবের কানে এই কথা পৌঁছিলে, তখনই তাহার সর্ব্বনাশ হইত। দুরাত্মাগণ ছলে বলে অথবা কৌশলে স্বীয় স্বীয় পাপাভীষ্ট পূরণ করিত। এইরূপে যে কত সোণার সংসার ছারখার হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। সম্ভবতঃ এই অত্যাচার হইতে মানসম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্যই দূরদর্শী হিন্দুগণ, নারীজাতির অবগুণ্ঠনের প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন। সেই হইতেই অবরোধ প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। * ইহার পূর্ব্বে সম্ভ্রান্ত হিন্দুকুলললনা আবশ্যক হইলে সঙ্গিনী লইয়া গৃহের বাহির হইতেন, অতিথি এবং আগন্তুককে যথারীতি অভ্যর্থনাও করিতেন। বর্ত্তমান সময়ের কুলবতীগণের ন্যায় তাঁহারা গৃহপিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিতেন না। আসাম এবং মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও অনেকটা পূর্ব্বভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মুসলমানদিগের আর একটী অত্যাচার, হিন্দু সন্তানগণের ধর্ম্মনাশ। হিন্দুদ্বেষী মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব এই কার্য্যের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার এই দুর্নীতিতে উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশে এবং দাক্ষিণাত্যে যে ভীষণ

* It is supposed that the 'purdanashin system' was introduced after the Mahamadan conquest. Ex. from the essay on female emancipation by Rev. W. Early.

সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহাতেই বিশাল এবং সুপ্রতিষ্ঠিত মোগল সাম্রাজ্য, শতাব্দীর মধ্যে ভস্মে পরিণত হইয়াছিল। আমাদের এই ক্ষুদ্র দেশও উক্ত অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পায় নাই।

অস্মদ্দেশে বর্ত্তমান সময়ে যে সমস্ত নীচজাতীয় মুসলমান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের প্রায় অনেকেই পূর্ব্বে হিন্দু ছিল। ব্রাহ্মণ হইতে নীচ চণ্ডাল পর্য্যন্তও জাতিভ্রষ্ট হইয়াছে। কখন বা তোষামোদ, কখন বা ভয় প্রদর্শন, আবার কখন বা জোরপূর্ব্বক কার্য্য উদ্ধার করা হইত। পটুয়াখালী সব্‌ডিভিসনের অন্তর্গত শ্রীরামপুরস্থ মিঞাগণের যে বংশতালিকা পাইয়াছি, তাহাতে দেখা যায় যে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। শিবানন্দ মজুমদারকে নবাব জোরপূর্ব্বক মুসলমান করায়, তিনি "শিবানখাঁ" নামে পরিচিত হন। ঝালকাঠী থানার অন্তর্গত, রুণসীর "রাজা"দের এবং শিরজুগের খাঁ বংশের সম্বন্ধেও এরূপ শুনা যায়।

পূর্ব্বকালে অস্মদ্দেশীয় যুবকগণ প্রায় সকলেই রীতিমত মল্লবিদ্যা, অস্ত্রশস্ত্রপরিচালন করিতে শিক্ষা করিতেন। পর্ব্বোপলক্ষে, সকলে একত্রিত হইয়া নানাপ্রকার মল্লক্রীড়া এবং অস্ত্রবিদ্যা প্রদর্শন করিতেন। যাঁহারা জয়লাভ করিতেন, তাঁহারা রাজা অথবা ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক সসম্মানে পুরস্কৃত হইতেন। তাঁহাদের শরীর সবল, মাংসপেশীগুলি দৃঢ় ছিল। গ্রামের মধ্যে কোথাও কোন হিংস্র জন্তুর উপদ্রব হইলে, নিজেরাই অস্ত্রশস্ত্র লইয়া তাহা নিবারণ করিতেন। এমন অনেকের পরিচয় পাওয়া যায় যে তাঁহারা একমাত্র বংশদণ্ড অবলম্বন করিয়া, তৎসাহায্যে সময়ে সময়ে অসম সাহসিক কার্য্য উদ্ধার করিতেন; কেহ কেহ বা রিক্তহস্তেই শূকর এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র প্রভৃতি শীকার করিতেন। এমন দিন গিয়াছে যখন এই ভীরু বাঙ্গালী জাতির সিংহনাদে দিগন্ত কম্পিত হইত; তাঁহাদের স্বদেশপ্রিয়তা, একতা, বীরত্ব এবং রণকৌশলে একদিন ভারতের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত সিংহল দ্বীপ পর্য্যন্তও কম্পিত হইয়াছিল।* বর্ত্তমান সময়ে হয়তঃ অনেকেই একথা বিশ্বাস করিবেন না; কারণ বর্ত্তমান সময়ের বাঙ্গালীগণের শারীরিক বল, সাহস প্রভৃতি দেখিলে বিশ্বাস না হইবারই কথা। আমাদের শারীরিক দৈর্ঘ্য দিন দিন যেরূপ

* বিজয় সিংহ কর্ত্তৃক সিংহলবিজয় দেখ।

হ্রস্ব হইতেছে, এবং তৎসহ শরীরের মাংসপেশী যে প্রকার স্ত্রীলোকের শরীর হইতেও কোমল হইতেছে, তাহাতে এক শতাব্দী অন্তে আমাদের বংশাবলীর যে কি প্রকার অবস্থা হইবে, ভাবিয়া পাওয়া যায় না। সামান্য একটু আঘাতে আমরা মুর্চ্ছিত হই, কুকুরের চীৎকারে আমাদের প্রাণে ভয় উপস্থিত হয়; কিন্তু এমন একদিন গিয়াছে যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ রণোন্মত্ত হইয়া উন্মুক্ত কৃপাণ করে, শত্রুব্যূহে প্রবেশ পূর্ব্বক অকুতোভয়ে অরাতি দলন করিয়া চরমে বীর গতি লাভ করিয়াছেন। আজ সেই সমস্ত কাহিনী মনে হইলেও, কেমন একটা অশ্রুতপূর্ব্ব আনন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়। * তখন বৃদ্ধগণ নিশ্চিন্ত মনে ধর্ম্মালোচনা করিতেন। সংসারে তখন অর্থাভাব, অথবা অন্যপ্রকার অশান্তি প্রায়ই পরিলক্ষিত হইত না; কারণ তখন গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ, ও বাগানভরা তরকারী ছিল। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তখন কাহারও বড় একটা পরিশ্রম করিতে হইত না। তখন মেঞ্চেষ্টর, মার্কিন, সিফিল্ড প্রভৃতির অস্তিত্ব ছিল কিনা সন্দেহ। দেশীয় বস্ত্রে এবং অস্ত্রে আমাদের মানসম্ভ্রম ও প্রাণ রক্ষা হইত। উজিরপুর, মাধবপাশা; গাবখান প্রভৃতি স্থানে তখন অত্যুৎকৃষ্ট মূল্যবান বস্ত্র এবং ইস্পাত নির্ম্মিত শাণিত অস্ত্রশস্ত্র সমূহ প্রস্তুত হইত; সুদূর আরাকান, মণিপুর, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে এই সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে বাণিজ্যার্থে প্রেরিত হইত। বর্ত্তমান সময়ে এই সকল ব্যবসায়ী দিগের অস্তিত্ব নাই; কারণ ইহাদের কৃত অস্ত্র আর আমরা খরিদ করিনা, এখন সমস্তই বিদেশী বণিকের 'এক চেটিয়া' হইয়া গিয়াছে। তৎকালে কাহারও বিশেষ একটা অভাব পরিলক্ষিত হইত না; কেননা তখন দেশের টাকা দেশেই থাকিত; দেশে দুর্ভিক্ষ, অথবা সাধারণের কোন হিতকর কার্য্য উপস্থিত হইলে দেশবাসিগণ বদ্ধপরিকর হইয়া স্বীয় স্বীয় উপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিতেন।

এখন আমরা বাণিজ্য, অথবা প্রধান প্রধান রাজকার্য্য দ্বারা প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতেছি; তথাপি আমাদের অভাব দূর হইতেছে না। পঞ্চম বর্ষীয় শিশু হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত অর্থের জন্য লালায়িত। আমাদের যথেষ্ট অর্থাগম হইতেছে, ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন

* মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবন চরিত দ্রষ্টব্য।

হইতেছে, তথাপি আমাদের অভাব ঘুচিতেছে না; বরং ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি হইতেছে। যাঁহার আছে তিনিও 'হা অর্থ, যো অর্থ' করিতেছেন; আর যাহার নাই, তাহারত কথাই নাই। হায়! কি পাপে যে ভগবান আমাদের জাতির প্রতি এই কঠিন দণ্ড প্রদান করিয়াছেন তাহা কে বলিবে?

প্রাচীন হিন্দুরাজগণের রাজস্বগ্রহণ, ভূমির করনিরূপণ প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থে কতক কতক উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তৎসমুদয় ভিন্ন ভিন্ন সময়ের প্রণীত বলিয়া করগ্রহণ ও করধার্য্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দেখা যায়। মন্বাদি প্রাচীন স্মৃতিতে দেখা যায় যে, ভূম্যধিপতি উৎপন্ন শস্যের একষষ্ঠাংশ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার একভাগ ব্রাহ্মণ ও অতিথি সেবার জন্য রক্ষা করিয়া, অবশিষ্টাংশ নিজে গ্রহণ করিবেন। অন্যান্য শাস্ত্রকারগণ, কেহবা এক পঞ্চমাংশ, আবার কেহ বা এক চতুর্থাংশ উৎপন্ন দ্রব্য কর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা বোধ হয় প্রতীয়মান হইবে যে, প্রাচীন হিন্দু রাজগণ অবস্থানুসারে উৎপন্ন শস্য রাজকর স্বরূপ গ্রহণ করিতেন। রামায়ণে ইহার কতক আভাষ পাওয়া যায়; ইক্ষাকুবংশের রাজধানী, রাজ্যশাসন প্রভৃতি বর্ণনাসময়ে মহর্ষি বাল্মীকি রাজকরগ্রহণ সম্বন্ধে অতি সামান্য আভাষ প্রদান করিয়াছেন।*

মহাভারতে ইহার কতক বিকাশ দেখিতে পাই। মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালীন যে সমস্ত বিজিত নৃপতি যজ্ঞস্থলে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই যথাযোগ্য 'রাজকর' প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাতে দাস, দাসী, মণি, মুক্তা, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতির উল্লেখ সময়ে দুই একস্থানে মুদ্রা শব্দেরও প্রয়োগ দেখিতে পাই। বর্ত্তমান রাজস্ব আদায়ের নিয়ম পূর্ব্বকালে এইভাবে প্রচলিত ছিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু প্রাচীন রাজগণ যে ভূমি পরিমাণ করিয়া তৎসংখ্যা নির্দ্দেশ করতঃ রাজকর ধার্য্য করিতেন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই; কারণ আমাদের শাস্ত্রে মাণপরিমাণ (Measure) স্পষ্ট উল্লেখ আছে। আমরা তাহার আর্য্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

---

* রাজার এক দাম ষষ্ঠ ভাগ।

"অষ্টমুষ্টির্ভবেৎ কুঞ্চিঃ কুঞ্চয়োহষ্টৌ চ পুস্কলং।
পুস্কলানিচ চত্বারি আঢ়কঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
চতুরাঢ়কঃ ভবেদ্দ্রোণ খাড়ি দ্রোণ চতুষ্টয়ঃ॥"

৮ মুষ্টি	...	...	১ কুঞ্চি।
৮ কুঞ্চি	...	...	১ পুস্কল।
৪ পুস্কল	...	...	১ আঢ়ক।
৪ আঢ়ক	...	...	১ দ্রোণ।
৪ দ্রোণ	...	...	১ খাড়ি।

"পলমেব সমং মুষ্টিঃ কুরবস্তচ্চতুষ্টয়ং
চত্বারঃ কুরবা প্রস্থশ্চতুপ্রস্থ মমাঢ়কম্।
দ্বারাঢ়কৌ ভবেদ্দ্রোণঃ দ্বিদ্রোণঃ স্থূর্প উচ্যতে
সার্দ্ধ স্থূর্পো ভবেৎখাড়িদ্বে খার্য্যো গৌন্যুদাহৃতা।"

১ পল	...	...	১ মুষ্টি।
৪ মুষ্টি	...	...	১ কুরব।
৪ কুরব	...	...	১ প্রস্থ।
৪ প্রস্থ	...	...	১ আঢ়ক।
২ আঢ়ক	...	...	১ দ্রোণ।
২ দ্রোণ	...	...	১ স্থূর্প।
১½ স্থূর্প	...	...	১ খাড়ি।
২ খাড়ি	...	...	১ গৌণী।

ইহা ব্যতীত আয়ুর্ব্বেদে ঔষধাদি পরিমাণ সম্বন্ধে অনেকগুলি মাণ-পরিমাণের বচন দেখিতে পাওয়া যায়। উল্লিখিত ভূমির মাণপরিমাণের সংজ্ঞাসূচক দুই একটী প্রাচীন শব্দ এখনও আমাদের দেশে অতি অপভ্রংশ ভাবে প্রচলিত আছে। প্রাচীন কুরব এবং দ্রোণ শব্দ আমাদের দেশে চলিত ভাষায় কুড়া এবং দরুণ নামে প্রচলিত। ভূমির উৎপন্ন শস্য রাজকর গ্রহণ এখনও এদেশে বহুল প্রচলিত আছে।

আমাদের এই জিলায় যে প্রকার প্রভূত পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হয়, বঙ্গদেশে আর কোন স্থানে সে প্রকার হয় না। তাই পূর্ব্বের ভূম্যধি-

কারিগণ প্রজার নিকট হইতে কর স্বরূপ মুদ্রা গ্রহণ না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে অবস্থানুসারে কোথাও উৎপন্ন শস্যের চতুর্থাংশ অথবা ষষ্ঠাংশ আদায় করিতেন। ইহাই "ধান কড়ারি জমি" নামে প্রসিদ্ধ। দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, বৃত্তি, জায়গীর প্রভৃতি সম্পত্তির খাজানা এই নিয়মে এখনও প্রায় অনেক স্থানে আদায় হইতেছে। ইহা ব্যতীত কোন কোন প্রাচীন ভূম্যধিকারীর ঘরে, আম, কাঠাল, নারিকেল, গুবাক, শশা, কুমড়া, ইক্ষু, কদলী প্রভৃতিও কর স্বরূপ গৃহীত হইয়া থাকে। বিগত ১৮৮৫ সালের "প্রজা ভূম্যধিকারী বিষয়ক আইনের" অনুগ্রহে এই সকল আর অনেক দিন ভোগ করিতে হইবেনা।

এই প্রকার কর সংগ্রহার্থ পূর্ব্বকালে গ্রামে গ্রামে যে সমস্ত রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিলেন, তাহারা 'মণ্ডল' নামে অভিহিত হইতেন। দশ, বিশ, পঞ্চাশ, শত, সহস্র গ্রামের উপর যোগ্যতানুসারে মণ্ডল থাকিতেন; এবং সংগৃহীত রাজকরসমূহ, এই সমস্ত মণ্ডল দ্বারা রাজসদনে প্রেরিত হইত। প্রজাপুঞ্জ মধ্যে ভূমিসংক্রান্ত বিবাদ, অথবা কোন প্রকার অশান্তি উপস্থিত হইলে, মণ্ডলেরাই তাহার বিচার-নিষ্পত্তি করিতেন। প্রজাগণ ইহাতে অসন্তুষ্ট থাকিলে, রাজার নিকট সুবিচার প্রাপ্ত হইত। শত এবং সহস্র গ্রামের উপর যে মণ্ডল থাকিতেন, তাঁহার ক্ষমতা বড় কম ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে যে সমস্ত করদ রাজা বাস করেন, তাঁহাদের সহিত তুলনায়, তৎকালীন মণ্ডলগণ বড় ন্যূন ছিলেন না। কোন মণ্ডলের দেহান্তর ঘটিলে, তৎপুত্র তৎস্থলাভিষিক্ত হইয়া কার্য্য করিতেন; কেবল রাজার অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত মাত্র। কেহ নিঃসন্তান থাকিলে, গ্রামস্থ প্রকৃতিপুঞ্জ, একজনকে মনোনীত করিয়া ঐ ক্ষমতা প্রদান করিত। তৎকালীন ইহাই প্রথা ছিল এবং এই নিয়মানুসারেই সকলকে চলিতে হইত। এই সমস্ত মণ্ডলগণ বহিঃশত্রু আক্রমণ হইতে নগর রক্ষা করিবার জন্য, দুর্গ প্রাকার, পরিখা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইতেন, প্রাণপাত করিয়াও স্বদেশ রক্ষা করিতেন।*

---

* His (King's) internal administration is to be conducted, by a chain of civil officers, consisting of Lords of single townships or villages, Lords of 10 towns, Lords of 100 and Lords of 1000 towns.—Elphinstone's History of India, p. 22.

Each township conducts its own internal affairs. It levies on its members the

রাজা যে প্রকার ভূমির ষষ্ঠাংশ উৎপন্নদ্রব্য রাজকর গ্রহণ করিতেন, তদ্রূপ পণ্যদ্রব্য ও বাণিজ্যশুল্কও প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু ইহার একটা বড় বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না; লাভের দশাংশ, বিশাংশ, কখনও বা তন্নূনও গ্রহণ করিতেন। উত্তরাধিকারী বিহীন স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি রাজকোষে পর্য্যবসিত হইবার পূর্ব্বে রাজত্ব মধ্যে ঘোষণা করা হইত। কোন উত্তরাধিকারী তিন বৎসরের মধ্যে উপযুক্ত হইবে এরূপ প্রমাণ পাইলে, রাজা তাহাকে ঐ সমস্ত সম্পত্তি বুঝাইয়া দিতেন। প্রাচীন রাজগণের রাজ্যশাসন, মন্বাদি স্মৃতির নিয়মানুসারে চালিত হইত। রাজা রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থ, সদ্বংশজাত, বিশ্বাসী, স্পষ্টবক্তা, সাহসী, এবং ধার্ম্মিক সপ্তজন সদস্য নিযুক্ত করিতেন। এই কয়েকজনের মধ্যে সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ একজন ব্রাহ্মণ থাকিতেন, এবং এই ব্রাহ্মণকে তিনি অবিচলিতভাবে বিশ্বাস করিতেন। আবার এই সাতজনের মধ্যে একজন প্রধান মন্ত্রী অথবা অমাত্য থাকিতেন, রাজা এই সমস্ত কর্ম্মচারীর সহিত মন্ত্রণা করিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ, সৈন্যগণকে উপযুক্ত শিক্ষিত করিয়াছেন কিনা এবং তাহারা রীতিমত বেতন পাইতেছে কিনা, প্রত্যহ রাজকার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে রাজা স্বয়ং তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তৎপর সিংহাসনারোহন করিয়া, নিত্যনৈমিত্তিক রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতেন।

রাজা অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক উল্লিখিত প্রকার রাজকার্য্য নির্ব্বাহান্তে, গূঢ়মন্ত্রণা থাকিলে, বিশ্বস্ত মন্ত্রীবর্গ পরিবৃত হইয়া, স্তম্ভ, গবাক্ষ, স্ত্রী এবং শুকপক্ষী বিহীন স্থানে, অভিভাবিত মন্ত্রণা নির্ব্বাহ করিতেন।* এই সমস্ত রাজকার্য্য সম্পন্ন করিয়া, রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া স্নানাহার নির্ব্বাহ করতঃ অন্তপুর পরিদর্শন-

---

revenue due to the estate; and is collectively responsible for the payment of the full amount. It manages its police, and is answerable for any property plundered within its limits. It administers justice to its own members as far as punishing small offences, and deciding disputes in the first instance. It taxes itself to provide funds for its internal expenses; such as repairs of the wall and temple and the cost of public sacrifices and charities, as well as of some ceremonies on festivals.—Elphinstone's History of India. Page 68.

* নিশান্তে নির্গবাক্ষে চ প্রাসাদাগ্রে হৃত্যারণ্যেবা
শিখিশূন্যং সমারোহ্য মন্ত্রয়েৎ অভিভাবিত। (শিশুপাল বধ।)

পূর্ব্বক যথাবিধি ব্যবস্থা করিতেন। অপরাহ্নে পুরুষজনোচিত মল্লক্রীড়া ইত্যাদি নির্ব্বাহান্তে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিতেন; তৎপরে কিয়ৎকাল বিশুদ্ধ এবং নির্ম্মল বায়ু সেবনান্তর, সায়ংসন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন পূর্ব্বক গুপ্তচরপ্রমুখাৎ রাজ্যসম্বন্ধীয়, অথবা শত্রু পক্ষের সংবাদ গ্রহণ করিতেন। তারপর অন্তঃপুরে গমনপূর্ব্বক মহিষীসহ সুখাসীন হইয়া, সুরতানলয় বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট সঙ্গীত শ্রবণ, এবং নৃত্যাদি দর্শন করিতেন; পরে সার্দ্ধ-প্রহর মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্র ভোজন করিয়া নিদ্রা যাইতেন। প্রজাদিগের মূলধনের কোন প্রকার অনিষ্ট সংঘটিত না হয়, এরূপ ভাবে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক রাজা কর ধার্য্য করিতেন, এবং বাণিজ্য দ্রব্যের মূল্য, রক্ষণা-বেক্ষণের ব্যয় ও পাথেয় প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শুল্ক গ্রহণ করিতেন। পশু এবং সুবর্ণ সম্বন্ধীয় বাণিজ্যের লাভের এক পঞ্চমাংশ গ্রহণ করিতেন। কিন্তু ধান্যাদি শস্যের কর, ক্ষেত্রের অবস্থা এবং কৃষকের পরিশ্রমের ন্যূনাধিক্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ষষ্ঠাংশ, অষ্টমাংশ, অথবা দ্বাদশাংশের একাংশ রাজা গ্রহণ করিতেন। ন্যায়, ধর্ম্ম এবং অপরাধের তারতম্য অনুসারে সূক্ষ্ম বিচার করিতেন। নিজের পুত্র অপরাধী হইলে, রাজা তাঁহাকেও সমুচিত দণ্ড বিধান করিতেন। ব্যাধি বশতঃ অথবা অন্য কোন কারণে স্বয়ং রাজকার্য্য করিতে অসমর্থ হইলে, অমাত্য প্রভৃতি বিশ্বাসী কর্ম্মচারীর উপর সকল ভার অর্পণ করিতেন। *

বর্ত্তমান সময়ে যেমন এই দেশে ভূমি সম্বন্ধে বহু প্রকার স্বত্ব অবধারিত আছে, বহু পূর্ব্বেও ইহার কতক আভাষ পাওয়া যায়। আমরা দুই প্রকার প্রজা সাধারণের স্বত্বের উল্লেখ দেখিতে পাই; যথা স্থায়ী, এবং অস্থায়ী প্রজা। রাজার নিকট হইতে যে ভূমি বন্দোবস্ত করিয়া আনা হইত, সেই প্রকার স্বত্ব পুরুষানুক্রমে স্থায়ী হইত। আর যাহারা মণ্ডল মধ্যে ভূমি ভোগ করিত, তাহারা অস্থায়ী প্রজা বলিয়া গণ্য হইত। গ্রামপতি (মণ্ডল) ইচ্ছানুসারে তাহা কাড়িয়া লইতে পারিতেন। আবার যে সমস্ত প্রজা চিরকাল পুরুষানুক্রমে স্বগ্রামে বসতি করিয়া ভূমি চাষ রোপণ করিত, তাহারাও স্থায়ী প্রজা বলিয়া গণ্য হইত। ভিন্ন গ্রামবাসী কোন প্রজা

---

* মনুসংহিতা, সপ্তম অধ্যায়,—৫৪, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬২, ৬৯, ১০২, ১০৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৫১, ২১৬, ২১৭, ২২১, ২২৩, ২২৪, ২২৫, শ্লোক দ্রষ্টব্য।

অন্যস্থানে অর্থাৎ ভিন্ন গ্রামে ভূমি চাষরোপণ করিলে, তাহাকে অস্থায়ী প্রজা বলা যাইত। ইহা ব্যতীত যে সমস্ত লোক উচ্চজাতিসম্ভূত, স্বহস্তে হলচালনা করিতে পারেন না, অথবা তাঁহাদের স্ত্রীলোকগণ, সাধারণ লোকের সম্মুখবর্ত্তী হইতে অক্ষম, তাঁহারাও অন্যান্য প্রজাগণের ন্যায় অপেক্ষাকৃত কম খাজানায় ভূমির বন্দোবস্ত গ্রহণ করিতেন। এই প্রজাগণ, অন্য লোক নিযুক্ত করিয়া চাষ রোপণ করিতেন। *

উল্লিখিত প্রকার স্বত্ব বর্ত্তমান সময়েও কতকাংশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অনেক ভদ্রলোক, বর্ত্তমান সময়েও গবর্ণমেণ্ট অথবা স্থানীয় ভূম্যধিকারীর মধ্যে জমি রাখিয়া স্বীয় স্বীয় তত্ত্বাবধানে, লোক দ্বারা চাষ আবাদ করাইয়া থাকেন। ইংরাজ রাজত্ব আরম্ভের পরও প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত বাখরগঞ্জে, বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় নানা প্রকার জটিল প্রজা-স্বত্ব অথবা হকিয়ত সমূহের উল্লেখ দেখা যায় না। যখন প্রাচীন হিন্দু রাজগণ শাস্ত্রানুসারে রাজ্যরক্ষা এবং প্রজাপালন করিতেন, তখন বঙ্গের হিন্দুরাজগণ অবশ্যই অন্যরূপ আচরণ করিতেন না; তাঁহাদের কৃত গ্রন্থাদি এবং তাম্রশাসন গুলিই তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ। প্রাচীন বাকলা অবশ্যই তৎকালীন এই প্রকার শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে মহারাজ কেশব সেন প্রদত্ত তাম্রশাসনের মূল এবং ব্যাখ্যা যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে অবশ্যই প্রতীয়মান হইবে যে, তৎকালীন রাজ্যশাসন, ভূমি রক্ষা, এবং

---

* In all villages there are two descriptions of tenants, who, rent the lands of the village-land holders (where there are such), and those of the government, where there is no such intermediate class. The tenants are commonly called *Rayats*, and are divided into two classes; permanent, and temporary. The permanent *Rayats* are those, who cultivate the lands of the village, where they reside, retain them during their lives, and transmit them to their children.* * * The temporary tenant cultivates the lands of a village different from that to which he belongs, holding them by an annual lease, written or understood. * * * There is another sort of tenant who deserves to be mentioned, though of much less importance than either of the other two. These are persons whose cast or condition in life prevents their engaging in manual labour, or their women from taking part in any employment, that requires their appearing before men. In consideration of these disadvantages they are allowed to hold land at a favourable rate, so as to admit of their availing themselves of their skill or capital by the helps of hired labourers.—Elphinstone's History of India, Page 73–75.

কর নির্দ্ধারণ ও গ্রহণ সম্বন্ধে যথাবিধ নিয়ম দৃঢ়ভাবে প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে হতভাগ্য ভারত সন্তান দেবতুল্য পূর্ব্ব পুরুষগণের মহিয়সী শক্তি, অসাধারণ দিধীতি, লোকবিশ্রুত ধর্ম্ম এবং ন্যায়পরতা ধীরে ধীরে বিস্মৃত হইতেছে।

পূর্ব্বকালে বিচার ও ভূমির বন্দোবস্ত প্রভৃতি, প্রজা এবং ভূমির অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, ন্যায় এবং ধর্ম্মানুসারে নির্ব্বাহিত হইত। তখন আইনের কুটার্থ ছিল না; এখনকার মত তখন রামের বিত্ত শ্যামের হইত না। এখন আইনও যেমন কুট হইয়াছে, প্রজারাও তেমনটী হইতে শিখিতেছে। সেই জন্যই এখন বিচার আদালতের নথিতে এত গলদ, সঙ্গে সঙ্গে জাল জুয়াচুরিরও এত ছড়াছড়ি। আইন আরও কুট হউক, মোকদ্দমার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হউক, জাল জুয়াচুরির সংখ্যাও তৎ সঙ্গে সঙ্গে বাড়িবে; ইহাই বর্ত্তমান সময়স্রোতের অবশ্যম্ভাবী গতি। সদ্য কলেজ প্রত্যাগত, ভ্রমর কৃষ্ণ নবীন গুম্ফশ্মশ্রু বিভূষিত, চশমাধারী, চোগা চাপকান পরিহিত মহাশয়গণের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইবে। বর্ত্তমানে ইহাদের সংখ্যা এত অধিক যে, অনেক স্থানের আহার্য্য দুর্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে,—আদালত গৃহে কদাচিৎ কোন দর্শক উপস্থিত হইলে, প্রায় কালীঘাটের কাণ্ড উপস্থিত হইয়া থাকে। এই প্রকার দুই একজন নবাগত নিজের নাম জাহির করিতে সময়ে সময়ে কত যে জঘন্য উপায় অবলম্বন করেন, তাহা স্মরণ করিতেও মনে ঘৃণার উদয় হয়। অনেক স্থলে এরূপ দেখা গিয়াছে যে ব্যবহারজীবিগণের কুটার্থে, মোকদ্দমা-কারিগণের মধ্যে উভয় পক্ষই হৃতসর্ব্বস্ব এবং হতমান হইয়াছেন।

কেন এরূপ হয়? অনেকে রাজাকে অথবা আইন বিধিবদ্ধকারিগণকে নিন্দা করেন; আমরা কিন্তু এই কথার সম্পূর্ণ বিরোধী। রাজা, প্রজাদের পিতৃতুল্য, এবং সর্ব্বদা ন্যায় ধর্ম্মানুসারে প্রজা রক্ষা করিতে ঈশ্বরের নিকট দায়ী; প্রজাগণের সর্ব্বস্ব হরণ, কখনই তাঁহার করণীয় নহে। তবে আমরা এরূপ আত্মহত্যা করিতেছি কেন? বাখরগঞ্জের লোক বড় মোকদ্দমা এবং কলহপ্রিয় বলিয়া সর্ব্বস্থানে প্রচলিত; এমন কি গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত এই জন্য বিরক্ত। ইহার যে কতকাংশ সত্য, তাহার সন্দেহ নাই। তবে ঢাকা বিভাগের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে ময়মনসিংহ, এবং খুলনা

জিলান্তর্গত বাগেরহাট এবং মোরলগঞ্জ প্রভৃতি স্থান, ২৪ পরগণারও কোন কোন স্থানে এই বিষয়ে বাখরগঞ্জকে পরাস্ত করিয়াছে; ইহার সত্যাসত্য বিগত দশ বৎসরের সরকারি রিপোর্টেই প্রকাশ পাইবে। একটু গবেষণা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, আমাদের জিলায় যত প্রকার ফৌজদারী মোকদ্দমা, তাহার প্রায় অধিকাংশই নীচজাতীয়দিগের মধ্যে ঘটিতেছে। কারণ এই সমস্ত লোক যে প্রকার অশিক্ষিত, তদ্রূপ উদ্ধত; সুতরাং অতি সামান্য কারণেও উত্তেজিত হইলে আর হিতাহিত কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।

দেওয়ানী ঘটিত যতপ্রকার কুট মোকদ্দমা এদেশে সচরাচর ঘটিতেছে, তাহার অধিকাংশই বিদেশী ভূম্যধিকারী এবং এই দেশবাসিগণের মধ্যে দেখা যায়। ইহার ফলে, অনেক প্রাচীন ঘর নিঃস্ব হইতেছে। একদিন যাঁহাদের অন্নে শত শত লোক প্রতিপালিত হইত, যাঁহাদের ধর্ম্মার্থ কার্য্যের যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইত, আজ হয়ত সেই সমস্ত ক্ষণজন্মা পুরুষের বংশধরগণ, মলিন মুখে দারুণ মনস্তাপ ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিবৎ হৃদয়ে ধরিয়া দাসত্বে ব্রতী হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে কালস্রোতের যে প্রকার আবর্ত্তময়ী তীব্রগতি, তাহাতে আরও কি হয় বলা যায় না। যেমনটী যায় তেমমটী কি আর হয়? এদেশে অনেকে বড় মানুষ হইতেছেন, অনেক ক্রীড়া কর্ম্ম, দান ধ্যান করিতেছেন, কিন্তু পূর্ব্বে যেমন ছিল সেইরূপ কি হইতেছে? সেই স্থল অবশ্যই পূর্ণ হইয়াছে, কেননা যিনি সর্ব্ব গুণের আধার, সর্ব্বাংশে পূর্ণ, তাহার সৃষ্ট পদার্থ অবশ্যই অঙ্গহীন নহে। কিন্তু কই আমরাত তাহা বুঝিয়াও বুঝিনা, সময়ে সময়ে যেন মনে হয় যে, কোন মহাপাপে জগদীশ্বর এই বাখরগঞ্জকে অভিশপ্ত করিয়াছেন? প্রতিদিন তিল তিল করিয়া আমরা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছি আমাদের শাস্ত্রে আছে, যে ধর্ম্মই মানব জীবনের সারবস্তু। আমাদের কি সেই সারবস্তুর দিকে লক্ষ্য আছে? আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের ধর্ম্মে যে প্রকার অবিচলিত বিশ্বাস এবং দৃঢ়ভক্তি ছিল, আমাদের কি ততটা আছে? একটু স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে যাহার সামান্য জ্ঞানও আছে, তিনি অবশ্যই নিজের নিকট নিজে লজ্জিত হইবেন। আমরা কেবল মুখে 'হিন্দু' 'হিন্দু' বলিয়া যতই বড়াই কেন করি না, আমাদের কি ধর্ম্ম এবং শাস্ত্রের প্রতি তাদৃশ

আস্থা আছে? হিন্দুজাতি একদা যেমন জগতের শীর্ষস্থানে ছিল, আজ আবার তেমনই অধঃপাতে গিয়াছে। মুসলমান, পার্শী, খৃষ্টান, শিখ, বৌদ্ধ প্রভৃতি হইতে কয়জন ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেছে? বর্ত্তমান সময়ের পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিকৃতমস্তিষ্ক অনেক হিন্দুসন্তান, স্বেচ্ছাক্রমে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেছেন; কারণ ধর্ম্মান্তরে তাহাদের উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তিসমূহ বিনা বাধায় নরকের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে। বাখরগঞ্জে পূর্ব্বে ইহা ছিল না; চব্বিশ পরগণা, যশোহর, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি হইতে এই ধর্ম্মসংহারক মহামারীর বীজাণু এদেশে আমদানী হইয়াছে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তেজস্বী, কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতার ন্যায় হিন্দুসমাজ এই সমস্ত কুপুত্রগণকে চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। বিধর্ম্মী পাষণ্ডগণের অত্যাচারে যাবনিক খাদ্য পর্য্যন্তও দুস্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। পৈত্রিক শালগ্রাম ঠাকুর, গোসেবা, অতিথি সেবা উঠিয়া গিয়াছে; আরও কত কি হইতেছে, তাহা লিখিয়া লেখনী কলঙ্কিত করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

প্রাচীনকালে আমাদের ভারতবর্ষে কোন ক্রয় বিক্রয়ের মুদ্রা প্রচলিত ছিল কিনা, তৎসম্বন্ধে অনেক গোলযোগ চলিতেছে। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি মহামনস্বী প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের গ্রন্থমধ্যে কিছুই মীমাংসা করেন নাই। মিঃ ওয়েবর, উইলসন্, টড্, হাণ্টার, এলফিনষ্টোন প্রভৃতি পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে গ্রীক আক্রমণের পূর্ব্বে এদেশে কোনপ্রকার মুদ্রা (Coin of Standered Value) প্রচলিত ছিল না। সেকেন্দর সা, (Alexander) সেলিউকাস প্রভৃতি মাসিদনীয় বীরগণের প্রচলিত স্মুবর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রাও অনেক স্থানে পাওয়া গিয়াছে। ইয়ুরোপীয় ঐতিহাসিকগণ প্রাচীন ভারত-সম্রাটগণের প্রচলিত মুদ্রাগুলির লিপি, গ্রীক ও সংস্কৃত মিশ্রিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। * গ্রীকাধিকৃত ক্ষুদ্র ব্যাকট্রিয়া (Bactria)

---

* Besides the immense number of bilingual coins, there are also some inscriptions in a similar character on vases etc., found on topes. These letters have been hitherto but imperfectly deciphered, but the earlier series of coins presents few difficulties and the value of the letters has been clearly determined. The language of the coins during the existence of the Greek Princes and their immediate successors, was a vernacular dialect of Sanskrit to all the varieties of which

রাজ্য, মুদ্রা নির্ম্মাণের জন্যই প্রসিদ্ধ। ভারতাক্রমণকারী গ্রীক রাজগণের সঙ্গে ব্যাক্‌ট্রিয়াবাসিগণ থাকিতেন এবং তাঁহাদের দ্বারাই মুদ্রা নির্ম্মিত হইত। প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হুয়েনসাঙ তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ভারতে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র প্রভৃতি নির্ম্মিত কোন মুদ্রাই প্রচলিত ছিল না; বাণিজ্য প্রভৃতি বিনিময় দ্বারা নির্ব্বাহ হইত।

বঙ্গের সুসন্তান, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ সর্ব্বদা সাধারণ কার্য্যের জন্য (মুদ্রা প্রচলিত থাকিলেও) ব্যবহৃত হইত না। *

পূর্ব্বোল্লিখিত মহামহোপাধ্যায়গণ যাহাই কেন বলুন না, আমাদের শাস্ত্রে এবং পুরাণে, ক্রয়বিক্রয় এবং বিনিময়ের জন্য মুদ্রা প্রচলনের উল্লেখ দেখিতে পাই। ভগবান মনুর সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যখন অবাধ বাণিজ্য (Free Trade) আছে, তখন যে কোন প্রকার মুদ্রা প্রচলন ছিল না, ইহা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। এক পণ্য বস্তুর পরিবর্ত্তে অন্য বস্তু গ্রহণ যেমন বাণিজ্যের পক্ষে অসুবিধা, তেমন ব্যবসা চালাইবার পক্ষেও নিতান্ত অপ্রীতিকর। প্রাচীনকালের রাজন্যবর্গ অসভ্য ছিলেন না, কোন কোন বাণিজ্য দ্রব্যে রাজা কি প্রকার শুল্ক গ্রহণ করিবেন, তাহাও আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। অন্যান্য বস্তু যথা—ধান্য, নারিকেল, অন্যান্য ফল, এবং অন্যান্য খাদ্য বস্তু, বিনিময়ে চলিতে পারে, কিন্তু অশ্ব, হস্তী, যান, দাস, দাসী প্রভৃতির শুল্ক, রাজা এক পঞ্চমাংশ গ্রহণ করিতেন। অবশ্য এই সমস্ত বিক্রয়ের দ্বারা যে লাভ হইত, রাজা শুল্কস্বরূপ তাহার পঞ্চমাংশ কর লইতেন, কোন কোন শাস্ত্রকার বলেন যে বাণিজ্য বস্তু আগত হইলে, বিক্রয়ের পূর্ব্বে রাজকর্ম্মচারিগণ যথাযোগ্য শুল্ক আদায় করিয়া

---

the appellation *Prakrit* is applicable. With the Indo-Scythian Kings, words borrowed from Turks or other Asiatic dialects may possibly have been intermixed with those of Indian currency, and we have in the inscriptions on the vases possibly a different dialect, sparingly intermingled with words of Sanskrit origin. —Foot Note of Elphinstone's History of India, page 268.

* Commercial transactions were carried on by barter, goods being exchanged for other goods. Hwen Tsang even says that no gold or silver coins were known. It is probable that none were generally used for ordinary transactions.—R. C. Dutt's Ancient India, Vol IV, P 145.

পরে বিক্রয়ের অনুমতি দিতেন। ইহা দ্বারাও কতকটা বোধ হইবে যে, বিক্রেয় বস্তুর মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া পরে শুল্ক গ্রহণ করা হইত, এই মূল্যই তৎকালীন প্রচলিত সুবর্ণ অথবা রৌপ্য মুদ্রা।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইক্ষ্বাকু বংশের ইতিহাসের সঙ্গে আমরা ভারতবর্ষের প্রথম ঐতিহাসিক তত্ত্ব কতক দেখিতে পাই। সেই সময় হইতেই চতুর্ব্বর্ণের বিধান. রাজধর্ম্ম, রাজ্য শাসন প্রভৃতির সুচারু নিয়মাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। এই রামায়ণেই উল্লেখ আছে যে, ভগবান রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণসহ পিতৃবাক্য পালনার্থ অরণ্য গমনের পূর্ব্বে মহর্ষি বশিষ্ঠপুত্র সুযজ্ঞকে বহু ধনরত্ন দান করিয়াছিলেন। এইস্থলে সুবর্ণ মুদ্রা দক্ষিণা প্রদানের উল্লেখও দেখিতে পাই। *

টীকাকার শেষ দুইটী পংক্তির যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে কোন গোলই থাকে না, আমরা তাহাও উদ্ধৃত করিলাম।

"শত্রুঞ্জয়ো নাম তথা প্রসিদ্ধং যং গজং মাতুল মম দদৌ তং গজং তে দদামি নিষ্ক সহস্রেণ স্বনামাঙ্কিত নিষ্ক (সুবর্ণ মুদ্রা) সহস্র দক্ষিণয়া।"

স্বর্গীয় কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক অনূদিত রামায়ণে বর্ণিত আছে ঃ—

* * * * *

"শত্রুঞ্জয় নামে হস্তী মাতুলের কাছে
পাইয়াছি আমি যাহা মম গৃহে আছে,
দক্ষিণা সহস্র নিষ্ক † সহিত এখন
সে করী তোমার করে কৈনু সমর্পণ।"

টীকাকার কিন্তু স্পষ্টই বলিতেছেন, যে "স্বনামাঙ্কিত নিষ্ক" দক্ষিণা স্বরূপ দান করা হইল। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে তৎকালে, বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় রাজার নামাঙ্কিত মুদ্রা সর্ব্বসাধারণে প্রচলিত ছিল।

আমরা মহাভারতেও সুবর্ণ মুদ্রার উল্লেখ পাইয়াছি, শকুনির সহিত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন কপট পাশাক্রীড়ায় সর্ব্বস্বান্ত হ'ন তখন তাঁহার পণ্য দ্রব্যের মধ্যে আমরা প্রথমই "নিষ্ক" সহ "ভাণ্ডিন্যে" উল্লেখ দেখিতে পাই। ‡

* মূল রামায়ণ - অযোধ্যাকাণ্ড, দ্বাত্রিংশ স্বর্গ, ৬—১০ম কবিতা।

† দ্বাত্রিংশ রতি স্বর্ণনির্ম্মিত মুদ্রা।

‡ মূল মহাভারত—সভাপর্ব্ব, একষষ্টিতম অধ্যায়।

কতিপয় বৎসর অতীত হইল, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের নিয়োগানুসারে ধ্বংসশীল প্রাচীন কীর্ত্তিরক্ষার্থে কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল। বঙ্গের গৌরবান্বিত হিন্দু রাজধানী গৌড়নগর এখন ভগ্নস্তূপে পরিণত; যে সমস্ত অভ্রভেদী অট্টালিকাচূড়া, শরৎকালীন শুভ্রমেঘমালাকে তিরস্কার করিত, আজ তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। যে রাজধানী জনকোলাহলে সংক্ষুব্ধ ছিল, এখন তাহা শ্মশানাপেক্ষাও নীরব। কেবলমাত্র অট্টালিকা সমূহের ভগ্নস্তূপ, শৈবালাদি আচ্ছাদিত প্রকাণ্ড দীর্ঘিকাগুলি অতীতের সাক্ষ্যস্বরূপ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

যে স্থানে রাজপ্রাসাদ ছিল, তাহার কোন কোন ভগ্নস্তূপ হইতে কতকগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত দ্রব্যের ভগ্নাবশেষ, কতিপয় স্বর্ণরৌপ্য নির্ম্মিত দেবপ্রতিমা এবং কতকগুলি স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। মুদ্রাগুলি বিভিন্ন আকারের, কতকগুলি গোল, কতকগুলি চতুষ্কোণ। লিপিগুলির এখন পর্য্যন্তও ভালরূপ পাঠোদ্ধার হয় নাই। পণ্ডিতগণ বলেন যে, এই বিভিন্ন জাতীয় মুদ্রা সেনরাজা এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী পালরাজগণের নামাঙ্কিত হইবার সম্ভব। ইহা ব্যতীত সুবর্ণগ্রামের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ মধ্যে কতকগুলি তাম্রখণ্ড পাওয়া গিয়াছে; সেইগুলিতে কোন লিপির চিহ্ন নাই, পণ্ডিতগণ তাহাও হিন্দুরাজগণের প্রচলিত বলিয়া অনুমান করেন।

হিন্দু স্বাধীনতা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে পাঠান নৃপতিগণ বাহুবলে সমগ্র ভারতবর্ষ করায়ত্ব করিতে অগ্রসর হইলেন। যে পর্য্যন্ত মোগলকুল-গৌরব-রবি মহাপ্রাজ্ঞ আকবর আবির্ভূত হ'ন নাই, সেই পর্য্যন্ত পাঠান রাজন্যবর্গ অপ্রতিহত প্রভাবে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। পাঠান নরপতিগণের মধ্যে সেরসাহ সর্ব্বপ্রথম রাজস্ব বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অতি অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার পরমায়ু শেষ হওয়ায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নিয়ম রহিত হইল। মহামতি আকবর, সেরসাহ প্রচলিত রাজস্ব বন্দোবস্ত এবং তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য কার্য্য দৃঢ়ভাবে প্রচলিত করেন, ইহাই বর্ত্তমান ইতিহাসে প্রথম রাজস্ব বন্দোবস্ত। *

* Akbar's revenue system, though so celebrated for the benefits it conferred on India presented no new invention. It only carried the previous system into effict with greater precision and correctness; it was in fact, only a continuation of a plan commended by Sher Shah, whose short reign did not admit of his extending it to all parts of his kingdom.—Elphinstone's History of India, Page 541.

১৫৮২ খৃষ্টাব্দে এই রাজস্ব বন্দোবস্ত হয়, মহামনস্বী টোডরমল্ল রাজস্ব-সচিব ছিলেন; সম্রাটের আজ্ঞানুসারে, তিনিই ভারতের মোগলাধিকৃত যাবতীয় রাজ্যের রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন। এই বন্দোবস্তে "খালিসা" অর্থাৎ খাসের সম্পত্তি ১৯টী সরকার এবং ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত করা হয়, মোগলাধিকৃত বাকলা তখন সুবর্ণগ্রামের অন্তর্ভূত হইয়া ৫২ পরগণায় বিভক্ত ছিল। *

আইন-ই-আকবরি পাঠে আরও জানা যায় যে, সমগ্র বঙ্গদেশ যে ভাবে পরিমাপ করতঃ কর ধার্য্য করা হইয়াছিল, বাকলাও তদ্রূপ নিয়মান্তর্গত ছিল; তবে এই দেশ ধান্য উৎপত্তির প্রধান স্থান, তজ্জন্য ফুলসী জমিতে ডাম এবং ধান্য কোন কোনস্থানে অবস্থানুরূপ আদায় হইত। বাকলার পূর্ব্বসীমাবর্ত্তী দক্ষিণ সাহাবাজপুর তখন সরকার ফতিয়াবাদের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু সেলিমাবাদ পরগণা প্রভৃতি বাকলারই অন্তর্ভূত ছিল। কেহ কেহ বলেন যে এই পরগণা তখন সরকার বাজুহার † অন্তর্গত ছিল, উক্ত বন্দোবস্ত হইবার পর বোজরগউমেদপুর নামকরণ হইয়াছে। ‡ ইহা দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে বর্ত্তমান বোজরগউমেদপুর পরগণা তখন ঘোরতর জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, এবং তদুৎপন্ন বৃহৎ বৃহৎ কাষ্ঠফলক দ্বারা নৌযান এবং কড়ি বর্গা প্রভৃতি নির্ম্মিত হইত।

সম্রাট সাহজাহানের পুত্র, সাহজাদা সুজা যখন বঙ্গের সুবেদার ছিলেন, তৎকালে তিনি বঙ্গদেশের দ্বিতীয়বার রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে এই বন্দোবস্ত শেষ হয়। বাখরগঞ্জের দক্ষিণ সীমাব্যাপী বিস্তীর্ণ সুন্দরবন, "মুরদখানা" নামে এই দেশান্তর্ভূত হয়। পটুয়াখালী মহকুমার অন্তর্গত মুরদিয়া গ্রাম, এই মুরদখানা নামের পরিচয় দিতেছে। প্রকৃতপক্ষে পটুয়াখালীর অন্তঃর্গত অনেক স্থান যে অল্প

---

* This settlement was made in 1582. The *khalisa* or State Lands were divided into 19 Sarkars, which included 682 *Parganas.* Bakarganj (Bakala) was no doubt included in the Sarkar of Sonargang which comprised 52 parganas * . * .*
—Sir W. W. Hunter's S. A. of Bengal, Vol V, Page 221.

† Sarkar Bozooha,—The forests of this Sarkar supply timbers fit for building boats and for the beams of houses and here is an iron mine.—Gladwin's Ain-i-Akbari, Page 304.

‡ H. Beveridge's History of Bakarganj, Page 51.

দিন হইল বসবাসের উপযুক্ত হইয়াছে, তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আকবর সাহ বাকলার যে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, সাহ সুজা তাহা হইতে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন কিনা, তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু এই বন্দোবস্তে সমগ্র বঙ্গদেশ ৩৪টী সরকার এবং ১৩৫০টী পরগণায় বিভক্ত করা হয়। সম্রাট আকবর যে প্রণালীতে রাজস্ব আদায় করিতেন, তাহার কোন কোন অংশে তাহার সামান্য পরিবর্ত্তন ব্যতীত উল্লেখ যোগ্য কিছুই দেখা যায় না।

সম্রাট বাহাদুর সাহের রাজত্ব সময়ে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের রাজধানী, ঢাকা (জাহাঙ্গীর নগর) হইতে মুর্শিদাবাদে পরিবর্ত্তিত হয়। ইহার চতুর্দ্দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭২১ খৃষ্টাব্দে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ পুনরায় সমগ্র বঙ্গদেশের বন্দোবস্ত করেন। এই বন্দোবস্তে বঙ্গদেশ ১৩টী চাক্‌লা এবং ১৬০০ পরগণায় বিভক্ত হয়। বাকলা, তখন জাহাঙ্গীর নগর (ঢাকা) চাক্‌লার অন্তর্গত হইয়া ২৩৬টী পরগণায় বিভক্ত হয়। বোজরগউমেদপুর (মুরদখানা) তখন অনেকটা আবাদ হইয়া জনগণের বসতি, এবং শস্য শালিনী ভূমিখণ্ডে পরিণত হওয়ায় বাকলার সঙ্গে একত্রীভূত হয়।

বঙ্গের শেষ মুসলমান নৃপতি নবাব কাসেম আলি খাঁ ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পুনরায় বন্দোবস্ত করেন। তিনি মুর্শিদকুলি খাঁ কৃত বন্দোবস্তের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন করেন নাই বটে; তবে খাসের ভূমির কতক কতক অংশ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইহাতে চাক্‌লা, জাহাঙ্গীর নগরের নাম উল্লেখ আছে, কিন্তু নূতন কোন প্রকার বন্দোবস্ত দেখা যায় না।

ইহাই মুসলমান রাজাদের শেষ বন্দোবস্ত; কারণ তাহার কিছুদিন পরেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সনন্দ গ্রহণ করিয়া বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ান হইলেন। প্রকৃতপক্ষে সেই হইতেই ইংরাজ রাজত্ব রীতিমত আরম্ভ হয়। বোর্ড অব্ রেভিনিউর আদেশানুসারে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে হইতে দশশালা বন্দোবস্ত আইন (Decennial Settlement) প্রচলিত হয়। কিন্তু দশশালা বন্দোবস্ত ততটা কার্য্যে পরিণত না হওয়ায়, ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিধিবদ্ধ হয়। ইহাতে প্রজাপক্ষের যে প্রকার উপকার হইয়াছে, তদ্রূপ গবর্ণমেণ্টও অনেকটা ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অনেক পরে কেবল জমিদারগণের উপর আর একটী কর ধার্য্য হয়। ইহা "জমিদারী ডাক-ছেছ" নামে অভিহিত। রাজকীয় ডাকের যাবতীয় ব্যয় এই কর হইতে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

লর্ড নর্থব্রুক মহোদয়ের সময়ে বিগত ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে পথকর ও পাবলিক কর নামক দুইটী কর পূর্ত্তবিভাগের উন্নতিকল্পে ধার্য্য হইবার প্রস্তাব হয়। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে উহা আইনরূপে পরিণত হইয়া, রাজকীয় কর এবং উপস্বত্বের প্রতি টাকায় দুই পয়সা হিসাবে মোট চারি পয়সা আদায়ের আজ্ঞা প্রচারিত হইল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে মেজিষ্ট্রেট মিঃ বার্টন সাহেবের সময়ে বরিশাল জিলায় উক্ত কর প্রথম আদায় হইতে আরম্ভ হয়; কিন্তু পরবর্ত্তী বৎসর (১২৮৩ সালে) ভীষণ ঝটিকায় এই জিলাস্থ আপামর সাধারণ সকলেই ক্ষতি-গ্রস্ত হওয়ায় অনেকস্থান হইতে জমীদারগণ স্বীয় স্বীয় দেয় খাজানা পর্য্যন্ত আদায় করিতে পারেন নাই। দয়াদ্রহৃদয় মিঃ বার্টন, প্রকৃতিপুঞ্জের এই দুরবস্থা গবর্ণমেণ্ট সন্নিধানে জ্ঞাপন করাইয়া উল্লিখিত উভয় কর চারি পয়সা স্থলে দুই পয়সা ধার্য্য করেন। তদবধি ঐ নিয়ম চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু দরিদ্র অধিবাসীদের এই যৎসামান্য স্বচ্ছলতা কতিপয় দেশদ্রোহীর সহ্য হইল না। তাঁহারা গবর্ণমেণ্ট হইতে রাজসম্মান পাইবার আশায় পুনরায় উভয় কর আদায় করিতে গবর্ণমেণ্টকে উত্তেজিত করেন। পরদুঃখকাতর শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ কয়েকজন দেশহিতৈষী এই সম্বন্ধে তুমুল প্রতিবাদ ও বাগবিতণ্ডা করিয়াছিলেন, কিন্তু ফলে কিছুই হইল না। কতিপয় স্বার্থান্ধ ব্যক্তির ষড়যন্ত্রে পুনরায় চারি পয়সাই ধার্য্য হইল। সেই হইতে রিভ্যালুএসন (Re-valuation) অনুসারে ভূম্যধিকারিগণের আয়ের প্রতি টাকায় দশ পয়সা হিসাবে মিলকিয়াতি জমার উপর এই কর ধার্য্য হইয়া এযাবৎ আদায় হইয়া আসিতেছে। একেত নানা কারণে এই দেশের ভূম্যধিকারিগণ অন্তঃসারশূন্য; তদুপরি এই প্রকার করভারে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী হৃতসর্ব্বস্ব হইতেছেন।

পথকর ও পাবলিককর ধার্য্য হইবার কিছু পূর্ব্বে আয়কর (Income Tax) নামক আর একটী কর ধার্য্য হয়; কিন্তু কয়েক বৎসর পরে ইহা উঠিয়া যাইয়া লর্ড ডফ্‌রিনের সময়ে পুনরায় প্রবর্ত্তিত হয়। বার্ষিক ৫০০৲

টাকা আয়ের উপর এই কর আদায় হইতে থাকে। গত ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ভারতসম্রাটের রাজ্যাভিষেকের সময়ে উহা সহস্রাধিক টাকা আয়ের উপর ধার্য্য হইয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তও আদায় হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এই কর ভূমির রাজস্ব অনুসারে নহে, তেজারতি, চাকুরী এবং বাজে আয়ের উপর আদায় হইতেছে। ইহা ব্যতীত গ্রামে চৌকীদারী ট্যাক্স, জিলা ও মহকুমা প্রভৃতি স্থানে মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স, আবগারি বিভাগের ট্যাক্স প্রভৃতি কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর আদায় হইতেছে।

সদাশয় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আমাদের নিকট হইতে যতগুলি ট্যাক্স আদায় করিতেছেন, তন্মধ্যে দুই চারিটী বাদে, বাকীগুলির আয়ের দ্বারা দেশের প্রচুর মঙ্গল সাধিত হইতেছে। পথকর, পাবলিককর দ্বারা দেশে দেশে উৎকৃষ্ট রাস্তা, জলাশয়, দাতব্য ঔষধালয় প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া প্রকৃতিপুঞ্জের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। মুসলমান রাজত্বের সময়ে যে আমাদের দেশে কোন ট্যাক্স ছিল না, তাহা নহে; বর্ত্তমানে তবু আমাদের টাকা আমরা খরচ করিয়া দেশের কার্য্য করিতে পারি, কিন্তু মুসলমান রাজত্বে সে সুবিধাও ছিল না। যে সমস্ত ট্যাক্স আদায় হইত, তাহা রাজকোষে মজুত হইয়া রাজার ইচ্ছানুরূপ খরচ হইত। আইন-ই-আকবরি, সৈয়র-অল-মুতক্ষরীণ প্রভৃতি মুসলমান ইতিহাসে আমরা কয়েকটী বাজেকর অর্থাৎ ট্যাক্স আদায়ের উল্লেখ দেখিতে পাই। যথা :—

১। মোল্লা-সেলামী।—এই ট্যাক্স মোল্লাগণের উপাসনা, রোজা, নমাজ প্রভৃতি নির্ব্বাহার্থ আদায় হইত।

২। গাজর।—বস্ত্র ধোলাইকারক অর্থাৎ রজকগণের এই কর দিতে হইত।

৩। বাজন্ত্রী।—বাদ্য ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে এই কর আদায় হইত।

৪। ধুমধারী।—যাহারা বাজীকর, বেদে, এবং ব্যাধবৃত্তি অবলম্বন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহাদের এই কর দিতে হইত।

৫। মছাই।—মৎস্যজীবিগণের এই কর দিতে হইত।

৬। চাপ্পা জমাদানি।—কার্পাস এবং বস্ত্র ব্যবসায়িগণের এই কর দিতে হইত।

৭। স্থাধ চলন্তর।—নৌ ব্যবসায়িগণের বাণিজ্যদ্রব্য এক স্থান হইতে অন্যস্থানে বিক্রয় করিতে হইলে তাহাদের এই কর দিতে হইত।

৮। চরমুকুন্দিয়া।—তরকারী বিক্রেতৃগণের নিকট এই কর গ্রহণ করা হইত।

৯। নগদ হাসিল।—নারিকেল-সুপারি ব্যবসায়িগণের এই কর দিতে হইত।

১০। বাজুহিয়া।—কাষ্ঠ ব্যবসায়িগণের এই কর দিতে হইত।

১১। জিজিয়া—মুসলমান ব্যতীত, যে কোন জাতিমাত্রকেই এই কর প্রদান করিতে হইত। ধর্ম্মভীরু, শান্তিপ্রিয় হিন্দুগণ এই করভারে যারপর-নাই প্রপীড়িত হইয়াছিলেন।

'জিজিয়া' মুসলমান শাসনের দুরপনেয় কলঙ্ক, মুসলমান ভূপতিগণের অনুদারতা এবং অদূরদর্শিতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বাদসাহগণের মধ্যে কেবল মাত্র সম্রাট্ আকবরসাহ এইরূপ অনুদার নীতির বিষময় ফল সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিচক্ষণ সম্রাট্ এই করের দোষ আলোচনাপূর্ব্বক সুবিশাল মোগলরাজ্যের সর্ব্বত্র ইহা রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর ও সাহজাহান মহামতি আকবরের সকল কার্য্যের অনুমোদন না করিলেও, এই উদার নীতি পরিবর্জ্জন করিতে অভিলাষী অথবা সাহসী হ'ন নাই। কিন্তু হিন্দুদ্বেষী, ক্রূরচরিত্র ঔরঙ্গজেবের ইহা সহ্য হইল না। তিনি 'জিজিয়া' কর পুনরায় প্রবর্ত্তিত করিয়া হিন্দুজাতির প্রতি অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করেন। ইহাই মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতনের অন্যতম কারণ। যে মহাজাতির অসাধারণ বীর্য্য প্রভাবে সুদূর কাবুল হইতে যশোহর পর্য্যন্ত মোগলের বিজয়রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই রাজপুতগণ এই ঘৃণিত আচরণে মোগলের পরম শত্রু হইয়া উঠিলেন। রাজপুত কেন, ভারতের যাবতীয় হিন্দুসন্তান এই অন্যায় করভারে যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তৎকালীন যবন অত্যাচার-প্রপীড়িত হিন্দুদের অবস্থার সম্যক্ বিবরণী পাঠ করিলে মনে এক অনির্ব্বচনীয় ক্রোধ ও ক্ষোভ উপস্থিত হয়।

আমরা ইন্‌কম্-ট্যাক্স প্রভৃতির বিরুদ্ধে খবরের কাগজে, অথবা সভা-

সমিতিতে আন্দোলন করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট মেমোরিয়াল পাঠাই, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে উপকার পাইতেছি, তজ্জন্য কয়জন মুক্তকণ্ঠে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া থাকেন ?

মুসলমান শাসন সময়ে যে লোকহিতকর কার্য্য হইত না, তাহা নহে। তবে বর্ত্তমানে যেরূপ করগুলি কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য সংগৃহীত হইয়া সেই কার্য্যেই ব্যয়িত হইয়া থাকে, মুসলমানদের সময়ে এইরূপ কোন বিধান ছিল না। রাজস্ব ব্যয় বিষয়ে মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ যথেচ্ছাচারী ছিলেন। প্রজার নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থ অনেক সময়ে তাঁহাদের আত্মসুখের জন্য ব্যয়িত হইত ; তবে কেহ কেহ সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া রাজপথ নির্ম্মাণ, দীর্ঘিকাখনন প্রভৃতি লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ পাঠান সম্রাট্ সেরসাহ এই সকল কার্য্যের নিমিত্ত বিশেষ প্রসিদ্ধ। মহামতি ছবিখাঁ উল্লিখিত বহুবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা অস্মদ্দেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।



পঞ্চম অধ্যায়।

পরগণা।

বর্ত্তমান সময়ে এই জিলা প্রায় ৪৭টী পরগণায় বিভক্ত; কিন্তু হিন্দু, পাঠান এবং মোগল রাজত্বের প্রারম্ভ পর্য্যন্তও কোথাও কোন পরগণার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। হিন্দুরাজত্ব সময়ে কেবল মাত্র বাকলা নামে এই সমগ্র ভূখণ্ড অভিহিত হইত। পাঠানরাজত্ব সময়ে ঢাকা বিভাগের যাবতীয় স্থান খলিফাবাদ ও ফতিয়াবাদ নামে বিখ্যাত ছিল। সম্রাট্ আকবরের সময়েও পরগণার নাম নাই; তখন সরকার শব্দ ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায়। তখনও রাজস্ব হিসাবে সরকার বাকলা বলিয়া এই দেশ পরিচিত ছিল।

পরগণা বৈদেশিক শব্দ, পারস্য ভাষা হইতে উৎপন্ন; কিন্তু কোন মুসলমান নৃপতি, এই সমগ্র ভূখণ্ড পরগণায় বিভক্ত করেন, তাহা জানা যায় না। মহাত্মা বেভারিজ্, হাণ্টার, টাইলর প্রভৃতি মনীষিগণও তাঁহাদের গ্রন্থ মধ্যে ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই। এই বিভাগ যে মুসলমান রাজত্ব সময়ে হইয়াছে, তাহার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ অধিকাংশ পরগণাগুলির নাম যাবনিক, অধিকন্তু পরগণার অন্তর্গত উপ-পরগণাগুলিও যাবনিক নামের হস্ত হইতে অব্যাহতি পায় নাই; যথা—"তপ্পে" "তরফ" "গ্রেদ" ইত্যাদি।

পার্সি ভাষায় পরগণা শব্দে কতকগুলি গ্রামের সমষ্টি বুঝায়; এলফিন্‌ষ্টোন সাহেব লিখিয়াছেন যে ১০০টী গ্রামের সমবায়ে গঠিত রাষ্ট্রকে পরগণা বলে।* এই দেশস্থ পরগণাগুলির মধ্যে উল্লিখিত প্রকারের দুই চারিটী যে না আছে তাহা নহে; কিন্তু কোন কোন স্থানে ১০০।১৫০ গ্রাম অথবা

---

* * * * * But the only one which remains entire is called *Pargana* which answers to the lordship of 100 Towns.—Elphinstone's History of India, page 67.

ততোধিক গ্রামেরও সংখ্যা পাওয়া যায়। উপপরগণাগুলির অধীনে, ২০।২৫ হইতে ৫০।৬০টী গ্রামের বেশী নাই। আবার কোন কোন পরগণা বর্ত্তমান সময়ে অন্য জিলার অধীন হইলেও তন্নিম্নস্থ তালুকের রাজস্ব বরিশালের কলেক্টরীতে দাখিল হয়। সর্ব্বসমেত ৪৭টী পরগণার মধ্যে ১০টী পরগণা উল্লিখিত প্রকারের, বাকী ৩৭টী পরগণার মধ্যেও আবার কতকগুলি ক্ষুদ্র, এবং উপপরগণা ; তাই বরিশালের ভূতপূর্ব্ব মেজিষ্ট্রেট-কলেক্টর বেভারিজ্ সাহেব, বর্ত্তমান সময়ে বাখরগঞ্জ, পরগণা সমূহের দ্বারা নিম্নলিখিত রূপে বিভাগ করিয়াছেন।

উত্তরে বাঙ্গরোড়া, বীরমোহন, ইদ্রাকপুর, এবং চন্দ্রদ্বীপ ; পূর্ব্বে উত্তর এবং দক্ষিণ সাহাবাজপুর, ইদিলপুর, সুলতানাবাদ, নাজিরপুর, এবং রতন্দি-কালিকাপুর ; মধ্যভাগে চন্দ্রদ্বীপ, সেলিমাবাদ, বোজরগউমেদপুর এবং অরঙ্গপুর ; পশ্চিমে সেলিমাবাদ এবং সৈদপুর ; দক্ষিণভাগে সমুদ্রতীর-ব্যাপী সুন্দরবন। * সুন্দরবন কোনও পরগণাভুক্ত হয় নাই ; কিন্তু ইহা সরকার "বাজুহা"র অন্তর্গত ছিল।

বর্ত্তমান বাখরগঞ্জের প্রত্যেক ভূমিখণ্ড কোন না কোন পরগণার অধীন, এবং প্রায় প্রত্যেক স্থানই সরকারি কাগজে দেখা যায় ; সুতরাং প্রত্যেক পরগণার রাজস্ব, এবং তৎসংশ্লিষ্ট ইতিহাস লিখিতে হইলে সরকারি কাগজ পত্রের সাহায্য ব্যতীত অন্য উপায় নাই। মহাত্মা বেভারিজ্ সাহেব, এই জিলার প্রধান রাজপুরুষ ছিলেন ; তিনি এই জিলার ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া পরগণা বিভাগ এবং রাজস্ব যে প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই যথার্থ। আমরা তাহাই অবলম্বন করিলাম।

পরগণাগুলির মধ্যে কয়েকটী ব্যতীত অন্যগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক তত্ত্ব জটিল। সুন্দরবন আবাদ হইয়া যে সমস্ত স্থান লোকালয়ে পরিণত

---

* Speaking generally, it may be said that the north of the district belongs to Bangrora, Birmohan, Idrakpur and Chandradwip ; the eastern portion to North and South Shahbazpur, Idilpur, Sultanabad, Nazerpur and Ratandi-Kolikapur ; the central portion to Chandradwip, Selimabad, Buzrgomedpur and Arangpur ; and the western portion to Selimabad and Syedpur. The south of the district belongs for the most part to the Sundarban and is not included in any pargana. —H, Beveridge's History of Bakarganj. Page 67.

হইয়াছে, তন্মধ্যে কতকগুলি প্রাচীন তত্ত্বের আভাষ পাওয়া যায়। আমরা যতদূর সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি; তাহা ক্রমান্বয়ে বলিতে চেষ্টা করিব।

পরগণাগুলির নাম।
ও
সরকারি রাজস্ব।

	নাম।		সরকারি রাজস্ব
১।	চন্দ্রদ্বীপ ...	...	৮২,৫৬২ টাকা ৸৶৪৷৹
২।	গ্রেদ বন্দর * ...	...	...
৩।	বোজরগউমেদপুর	...	৩৪,৫৪৬৷৷১১৸৹
৪।	সেলিমাবাদ ...	...	৯৮, ২১৭৻১
৫।	তপ্পে হাবিলী সেলিমাবাদ	...	১১,০৫৫৷৶৫
৬।	তপ্পে হাবিলী ...	...	৬৪৪৷৷১০
৭।	ইদিলপুর ...	...	৬৫,৯০৪।১১
৮।	তপ্পে নাজিরপুর ...	...	২৮,৭৮৩/৪৷৹
৯।	রতনদি কালিকাপুর	...	২৫,২৩৭৷৶৪
১০।	উত্তর সাহাবাজপুর	...	৭,৬৭৫৸৯৷৷
১১।	দক্ষিণ সাহাবাজপুর	...	৭৪,৪১৩৸৶৫
১২।	কৃষ্ণদেবপুর ...	...	৮১৬৲
১৩।	আলিনগর ...	...	১,৫৭৮।/৫
১৪।	রামনগর ...	...	৫,১৮৭।৵৬
১৫।	রামহরি চর ...	...	...
১৬।	কল্‌মি চর ...	...	...
১৭।	সুলতানাবাদ ...	...	২১,১২৮৸/৫
১৮।	কাশীমনগর জোয়ার দাসপাড়া	...	১,৬৩৩৷৷/১১
১৯।	খাঞ্জা বাহাদুর নগর	...	৬৪৷৷৬৷৷
২০।	শ্রীরামপুর ...	...	৪১১।১৷৹
২১।	তপ্পে আবদুল্লাপুর	...	৩,৫৫১৷৶৬

* চন্দ্রদ্বীপের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ; বর্ত্তমান বরিশাল নগর লইয়াই এই পরগণার সৃষ্টি।

২২।	তপ্পে কাদিরাবাদ …	…	৯৬২৸৶১০॥
২৩।	" আজিমপুর …	…	২৭৪৯।৶৮॥
২৪।	জাহাপুর …	…	৮৫৩॥৶১০
২৫।	ইদ্রাকপুর …	…	৩,২৭৮॥৶১০
২৬।	রসুলপুর …	…	…
২৭।	বাঙ্গরোড়া …	…	৩৬৫।৶৯॥
২৮।	বীরমোহন …	…	…
২৯।	তপ্পেবীরমোহন …	…	১৩।/৪
৩০।	হবিবপুর …	…	৮৭৮৸৶১১॥
৩১।	মৈজরদি …	…	৩৪৫৲৬
৩২।	জালালপুর …	…	৩৬৫।৶৪৸
৩৩।	সায়েস্তাবাদ …	…	১,০৪০৸৶০৲॥
৩৪।	সায়েস্তানগর …	…	১,৫৩৭/৬
৩৫।	সাহাজাদপুর …	…	৬,৮৯৭৶৩॥
৩৬।	তপ্পে বাহাদুরপুর …	…	৪৯১৩/১
৩৭।	অরঙ্গপুর …	…	১৪,৩৬৪।৶৬
৩৮।	সৈদপুর …	…	৬৫৭০৸/৯
৩৯।	বৈকুণ্ঠপুর …	…	…
৪০।	তপ্পে লক্ষ্মীরদিয়া …	…	…
৪১।	রাজনগর …	…	…
৪২।	তপ্পে সফিপুর কোপা	…	…
৪৩।	আমিরাবাদ …	…	…
৪৪।	বিক্রমপুর …	…	…
৪৫।	গোপাল নগর …	…	…
৪৬।	দুর্গাপুর …	…	…
৪৭।	কাসিমপুর সেলাপড়ি	…	… *

* H. Beveridge's History of Bakarganj, page 69.

(শেষের পরগণা কয়টীর অধিকাংশ ঢাকা ও ফরিদপুর জিলা ভুক্ত হইলেও তদন্তর্গত কতকগুলি তালুকের রাজস্ব বরিশালের কালেক্টরীতে দাখিল হয়। এই নিমিত্ত উক্ত পরগণাগুলির নামও এই স্থানে সন্নিবিষ্ট হইল।)

ইহাই বর্ত্তমান সময়ের পরগণা। কিন্তু সরকারি কাগজপত্রে বাকলা শব্দের কোন উল্লেখ নাই। আগাবাখরের নামানুসারে সমগ্রদেশ অভিহিত হইবার পর হইতেই, বাকলা শব্দের অস্তিত্ব লোপ হইয়া গিয়াছে। আইন-ই-আকবরিতেও ইস্‌মাইলপুর বলিয়া বাকলার আর একটী যাবনিক নামের উল্লেখ আছে; কিন্তু তৎসময়ে বাকলা নামই প্রচারিত ছিল। বেভারিজ্ সাহেব বলেন যে বাকলা এবং চন্দ্রদ্বীপ একই পরগণা। *

আমাদের দেশের অধ্যাপকমণ্ডলী—সমগ্র জিলাকে পাঁচটী পরগণায় বিভক্ত করেন। যথা—বাকলা, বাঙ্গরোড়া, সোন্দারকূল, অরঙ্গপুর ও সায়েস্তানগর। অদ্য পর্য্যন্তও এই নিয়মে উল্লিখিত পরগণাবাসী অধ্যাপকগণ নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। নবদ্বীপ, মিথিলা, কাশী, দ্রাবিড় প্রভৃতিস্থানে অদ্যাপি বাকলা বলিয়া এই দেশ পরিচিত; বাখরগঞ্জ অথবা বরিশাল বলিলে, অনেকে চিনিতে পারেন না।

আইন-ই-আকবরিতে সরকার বাকলার সহিত যে চারিটী সরকারের নামোল্লেখ আছে, বর্ত্তমান পরগণা বিভাগেও সেই গুলি দেখিতে পাওয়া যায়; তবে বাকলা, চন্দ্রদ্বীপ পরগণায় পরিণত হইয়াছে, এইমাত্র প্রভেদ। বেভারিজ্ সাহেব ২২টী পরগণা নির্দ্দেশ করেন; যথা:—

১। বোজরগউমেদপুর।
২। বাঙ্গরোড়া।
৩। খাঞ্জা বাহাদুর নগর।
৪। অরঙ্গপুর।
৫। সায়েস্তা নগর।
৬। বাহাদুরপুর।
৭। ফেদাইনগর।
৮। উত্তর সাহাবাজপুর।
৯। আজিমপুর।
১০। রামনগর।
১১। ইদ্রাক পুর।
১২। খোর্দ্দ সফিপুর।
১৩। সাহাজাদপুর।
১৪। কাশিমপুর সেলাপট্টি।
১৫। রসুলপুর।
১৬। সায়েস্তাবাদ।
১৭। ফরোক্কাবাদ।
১৮। তপ্পে বীরমোহন।
১৯। নাজিরপুর।
২০। সুলতানাবাদ।
২১। সফিরপুর কোলা।
২২। বীরমোহন।

* I suppose that Bakla was identical with Chandradwip.—H. Bevridge's History of Bakarganj, page 50.

এই দ্বাবিংশতি পরগণার মধ্যে আমরা ফেদাইনগর, ফরোক্কাবাদ এবং খোর্দ্দসফিপুর নামে আরও নূতন পরগণার নাম দেখিতে পাই, কিন্তু রতন্দি কালিকাপুরের কোন নামোল্লেখ নাই। বেভারিজ্ সাহেব বলেন যে নাজিরপুর এবং নিকটবর্ত্তী অন্যান্য পরগণা হইতে রতন্দি কালিকাপুর বাহির হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে সেলিমাবাদ ব্যতীত, অন্যান্য যাবতীয় পরগণা চন্দ্রদ্বীপ হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে; * কেননা, চন্দ্রদ্বীপ হইতেই এই দেশের প্রাধান্য, এবং ইহারই গৌরবে অদ্য পর্য্যন্ত এই দেশবাসী গৌরবান্বিত। সম্ভবতঃ শাসন এবং রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য অন্যান্য পরগণাগুলি বাহির করা হইয়াছে। আবার ইহাও সম্ভবপর হইতে পারে যে চন্দ্রদ্বীপ-রাজগণ হীনবল হইলে, অধীনস্থ প্রজাগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বীয় নামানুসারে নূতন পরগণা সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। যতগুলি পরগণা দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে প্রায় সকলগুলিতেই নাম সংযোজিত আছে: তন্মধ্যে অধিকাংশই যাবনিক। প্রকৃতপক্ষে চন্দ্রদ্বীপ পরগণা হইতে উল্লিখিত পরগণাগুলি বাহির হইবার কোন কারণ এযাবৎ অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় নাই। বর্ত্তমান ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালীপাড়া পরগণাও চন্দ্রদ্বীপ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। অন্য জিলাভুক্ত বলিয়া বেভারিজ্ সাহেব তৎকৃত গ্রন্থমধ্যে ইহার উল্লেখ করেন নাই।

চন্দ্রদ্বীপ এবং অন্যান্য পরগণা, ও তদন্তর্গত প্রসিদ্ধ গ্রাম এবং উল্লেখযোগ্য বংশাবলীর ইতিহাস যতদূর সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহা প্রকাশিত হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনেক স্থলে এই সমস্ত সংগ্রহ করিতে যাইয়া বিফলমনোরথ হইয়াছি। বলিতে লজ্জা হয় যে, কোন কোন স্থানে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। দেশের ইতিহাস সঙ্কলন একজনের সাধ্য নহে, দশজনের সাহায্য আবশ্যক; জানি না, আমাদের স্বদেশবাসিগণ কখন এই সত্য উপলব্ধি করিবেন। এই হতভাগ্য দেশে সেই শুভদিন কখনও আসিবে কি?

---

* Chandradwip,—a pargana, which included the whole of the modern zila of Bakarganj with the exception of Mahal Sulimabad.—Dr. James Wise's *Bara-Bhuya* of Bangal, 1874.

১—চন্দ্রদ্বীপ।

বাখরগঞ্জে যতগুলি পরগণা আছে, তন্মধ্যে চন্দ্রদ্বীপ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন; হিন্দু রাজত্বের সময়েও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। কোন সময়ে যে ইহা সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ।

আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে চন্দ্রদ্বীপের উল্লেখ দেখিতে পাই। প্রাচীন ভৌগোলিকগণ রাঢ় এবং বঙ্গদেশকে দ্বাদশ ভাগে* বিভক্ত করিয়া তাহাদের স্থিতি নির্ণয় করিয়াছেন; চন্দ্রদ্বীপ তন্মধ্যে অন্যতম। ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ সমাজপতিগণ ইহাকে পাশ্চাত্য বৈদিকগণের প্রধান সমাজ স্থান এবং বহু সৎক্রিয়ান্বিত ব্রাহ্মণগণের বাসস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইহার অন্যতম নাম যে বাকলা তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার অন্তর্গত প্রদেশগুলি সমুদ্রতীরবর্ত্তী; সময়ে সময়ে জল মগ্ন হইত, আবার উত্থিত হইত। মিশ্রী গ্রন্থে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়; যথাঃ—

রত্নাকরো মহাতীর্থ দক্ষিণস্যাং দিশিস্থিতঃ।
মুক্তবেণী মধ্যদেশে পদ্মাযস্যোত্তরা সদা॥
বলেশ্বর পূর্ব্বভাগে চন্দ্রদ্বীপ সমন্বিতঃ।
দেশোঽয়ং পুণ্যতীর্থস্ত ব্রাহ্মাণ্য ইতিকথ্যতে॥

এড়ু মিশ্র আরও একটু স্পষ্টভাবে চন্দ্রদ্বীপের স্থিতি এবং উক্ত প্রকার নামের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি।—

চন্দ্রদ্বীপস্য সীমায়াং রত্নাকরো বিরাজতে।
চন্দ্রবৎ ক্ষীয়তে তস্য চন্দ্রবৎ বর্দ্ধতে বপুঃ॥
তস্য তদ্‌গুণযোগেণ চন্দ্রদ্বীপ ইতিস্মৃতঃ।
গুহক ইতি বিখ্যাতোনাম্না সর্ব্বজনৈরয়ম্॥

ভবিষ্য পুরাণে চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি সম্বন্ধে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই ভূখণ্ড সর্ব্বদা জলসিক্ত এবং আর্দ্র থাকিত; ভগবান ভবানীপতির ললাটস্থ অগ্নির উত্তাপে শুষ্ক হইয়া ত্বরায় প্রবীণ জনপদে পরিণত হওয়ায় শৈবদিগের আবাস নিকেতন হইল। অপিচ মহাদেবের

---

* ১। অগ্রদ্বীপ ২। নবদ্বীপ ৩। মধ্যদ্বীপ ৪। চক্রদ্বীপ ৫। এড়ুদ্বীপ ৬। প্রবালদ্বীপ ৭। বৃদ্ধদ্বীপ ৮। কুশদ্বীপ ৯। অম্বুদ্বীপ ১০। সূর্য্যদ্বীপ ১১। জয়দ্বীপ ১২। চন্দ্রদ্বীপ।

ভালস্থিত শশিকলা ভূখণ্ডকে অগ্ন্যুত্তাপ হইতে পুনরায় শীতল করিল। ভবিষ্য পুরাণ, উপপুরাণের মধ্যে গণ্য ; অনেকে অনুমান করেন যে, এই গ্রন্থের বয়স দুই শত বৎসরের অধিক হয় নাই। ইহার মধ্যে মগ, পর্ত্তুগীজ যবন, ইংরাজ, ফিরিঙ্গী প্রভৃতি অনেকের কথা আছে। অন্যান্য পুরাণের ছায়াবলম্বনে দেবাসুরের যুদ্ধ সম্বন্ধেও যে দুই একটা গল্প লিখিত না আছে তাহা নহে। আবার রাজনীতি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম, চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রভৃতিরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ভাষা দেখিলে বোধ হয় যে কোন আধুনিক পণ্ডিত নানা গ্রন্থ হইতে কতক কতক সংগ্রহ করিয়া সাময়িক কতকগুলি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। চন্দ্রদ্বীপ সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থ মধ্যে যাহা পাইয়াছি তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম, ইহার সত্যাসত্য পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।—

চন্দ্রদ্বীপে পুরা বিপ্রাস্তোয় পূর্ণাচ ভূমিকা।
মহাদেব প্রসাদেন শুষ্ক ভূতাহি মৃত্তিকা॥
ললাটানলদাহেন বিলীনং হি জলংবহু।
স্থলীভূতাচ পৃথিবী শৈবানাং সুখকারিকা॥
মহাদেবং মৃড়ানীচ পপৃচ্ছ সারদান্বিতা।
পূর্ণচন্দ্রং বিহায়ৈব ধার্য্যতে শশিনঃ কলা॥

* * * * *

পুনশ্চঃ—

মহাদেব উবাচ—

"অনাদি পৌর্ণমাস্যন্তাঃ যা এব শশিনঃ কলাঃ।
তিথয়স্তাঃ সমাখ্যাতা ষোড়ষৈব বরাননে॥
অমা ষোড়ষভাগেন দেবীপ্রোক্তা মহাকলাঃ।
সংহিতা পরমামায়া দেহিনাং দেহধারিণী॥
অমানাম্নী কলামধ্যে খাবাসাং ত্বং প্রতিষ্ঠিতা।
অতোহি ত্বং মমাধার্য্যা কলাকাল প্রমাথিনী॥
তস্যাকলায়াঃ কিরণৈঃ সিক্তা দ্বীপাচ ভূসুরাঃ।
অতো প্রজাঃ কলা চন্দ্রদ্বীপে ধর্ম্মপরায়ণাঃ॥"

উল্লিখিত যে দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে আমরা শ্লোকগুলি উদ্ধৃত

করিয়াছি, ইহাদের প্রাচীনত্ব না থাকিলেও মিশ্রী গ্রন্থের বচনগুলিতে ভৌগোলিক আভাষ পাওয়া যায়। প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্লোকে ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, চন্দ্রদ্বীপ সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং ইহার আর আর যে কয়েকটী সীমা দেওয়া হইয়াছে, বর্ত্তমান সময়েও সেই স্থানগুলি আছে; এই চতুঃসীমাবর্ত্তী চন্দ্রদ্বীপ যে একটা বৃহৎ জনপদ এবং প্রধান সমাজস্থল তাহার আর সন্দেহ নাই।

ভবিষ্য পুরাণোক্ত বচনগুলির ঐতিহাসিক তত্ত্ব ছাড়িয়া দিলেও ইহাতে প্রাকৃতিক তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। উল্লিখিত শ্লোকগুলিতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, চন্দ্রদ্বীপ ভূখণ্ড কোন সময় সম্যক্ প্রকার জলমগ্ন ছিল, ইহা প্রকৃত; কেননা সাগরতীরব্যাপী অনেক স্থল যে সাগর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

বর্ত্তমান বাখরগঞ্জের অধিকাংশ সুগন্ধা নদী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই নদীর অস্তিত্ব এখন নাই, তবে ঝালকাঠী থানার অন্তর্গত পঞ্চকরণের সম্মুখবর্ত্তী ক্ষুদ্র খালকে অনেকে সুগন্ধা নদীর একটী বেণী বলিয়া উল্লেখ করেন। আবার কেহ কেহ কালীজিড়া নদীর অংশবিশেষকেও সুগন্ধা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মিঃ রেনেলকৃত মানচিত্রেও * সুগন্ধার উল্লেখ আছে। বর্ত্তমান ঝালকাঠী নদী এবং কালীজিড়ার কোন কোন অংশকে তিনি সুগন্ধা নদী বলিয়াছেন; কিন্তু মানচিত্র দেখিলে বোধ হয় যে তৎকালে ঐ নদীর অনেক স্থান সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি সম্বন্ধে এদেশে দুইটী কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। মহাত্মা বেভারিজ্, ডাক্তার ওয়াইজ এবং বাবু ব্রজ সুন্দর মিত্র প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ স্বীয় স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে তাহা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আমরাও পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণার্থ উহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

১। যখন এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের প্রায় অধিকাংশস্থল সুগন্ধার গর্ভে বিলীন ছিল, তখন বিক্রমপুর পরগণায় চন্দ্রশেখর নামে একজন ধার্ম্মিক, শুদ্ধাচার এবং তপানুশীল ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহাকে সুপাত্র দেখিয়া জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহার সহিত স্বীয় সর্ব্বগুণসম্পন্না সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ দিলেন। সম্প্রদানের সময়ে চন্দ্রশেখর সভয়ে শুনিলেন যে তাঁহার নবোঢ়া

* ১৭৬৪ এবং ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে জরিপ দ্বারা এই মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছিল

পত্নীর যে নাম, তাঁহার উপাস্যা দেবীরও সেই নাম; ব্রাহ্মণের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। যে উপাস্যদেবীকে তিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে শয়নে স্বপনে সর্ব্বদা আরাধনা করিয়া থাকেন, আজ সেই উপাস্যদেবীকে চিন্তা করিলে স্ত্রীর নাম স্মৃতিপথে উদয় হইবে, যাহাকে মা বলিয়া ডাকিলে স্ত্রীর নাম মুখে আসিবে, আজ তিনি কেমন করিয়া সেই স্ত্রীসহবাসে মহাঘোর পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইবেন ? অকস্মাৎ ব্রাহ্মণের হৃদয়ে এই সকল চিন্তা উপস্থিত হইল, তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন; তাঁহার হৃদয় দুরদুর করিতে লাগিল। অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, নিশ্চয়ই তাঁহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত মহাপাপে এই প্রকার সংঘটিত হইয়াছে। এখন প্রাণত্যাগ ব্যতীত কিছুতেই ইহার প্রায়শ্চিত্ত নাই ব্রাহ্মণ আত্মহত্যা করিতে স্থির সংকল্প করিলেন।

ধীরে ধীরে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইল, স্ত্রী-আচার পর্য্যন্ত নির্ব্বাহ হইয়া গেল; বর কন্যা বাসরঘরে যাইবার পূর্ব্বে চন্দ্রশেখর কৌশলে পলায়ন করিলেন। বরবেশেই সেই গভীর নিশীথ সময়ে ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ একাকী স্বগৃহে আসিয়া, একখানি ক্ষুদ্র তরণী আরোহণপূর্ব্বক একমাত্র ক্ষুদ্র ক্ষেপণি সহযোগে উত্তালতরঙ্গসমাকুল সমুদ্রতুল্য নদীবক্ষে ভাসমান হইলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল; চতুর্দ্দিকে অনন্ত জলরাশি,—স্ফীতবক্ষে দিগ্‌দিগন্তপানে ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথায়ও উদ্বেলিত তরঙ্গগুলি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া জলের সহিত মিশিতেছে. আবার কোথাও বা উচ্ছৃঙ্খল গতিতে পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত হইতেছে। এই ভীষণ তরঙ্গাভিঘাতের শ্রবণভীতিকর শব্দেও কিঞ্চিৎমাত্র ভীত না হইয়া, ব্রাহ্মণ একাকী সেই ক্ষুদ্র তরণী লইয়া স্রোতে ভাসিতে লাগিলেন। জনমানব দূরে থাকুক, এমন কি আকাশে কোন উড্ডীয়মান পক্ষী পর্য্যন্ত তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না। এইরূপ দুইদিন গত হইল, তৃতীয় দিনে সূর্য্যোদয়ের পর ব্রাহ্মণ অনতিদূরে ক্ষুদ্র তরণী আরূঢ়া অসামান্যা রূপবতী এক কিশোরীকে দেখিতে পাইলেন। এই সমুদ্রতুল্য ভীষণ নদীগর্ভে একাকিনী এই রমণীকে দেখিয়া চন্দ্রশেখর অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন এবং কৌতূহলী হইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার তরণী উক্ত রমণীর নিকটবর্ত্তী হইলে, চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন সাহসে একাকিনী এই সমুদ্র মধ্যে আসিয়াছ ? তোমার কি প্রাণের ভয় নাই ?"

ব্রাহ্মণের কথা শেষ হইলে কিশোরী বলিল "আমি ধীবরকন্যা, নদীতে বাস করাই আমার ব্যবসা; আমি ইহাতে কোন প্রকার ভীতা বা সঙ্কুচিতা হই নাই। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যান্বিতা হইলাম যে আপনি একাকী এই ভয়ঙ্কর নদীতে আসিয়াছেন; আপনারও কি প্রাণের ভয় নাই?"

রমণীর এই কথা শুনিয়া চন্দ্রশেখর অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ক্ষণকাল চিন্তাপূর্ব্বক তাঁহার মনোগতভাব ব্যক্ত করিলেন।

ধীরবকন্যা তাঁহার কথায় হাস্য করিয়া বলিল "ঠাকুর, দেখিতেছি আপনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, শাস্ত্রতন্ত্র প্রভৃতি অনেক অধ্যয়ন করিয়াছেন; এই সমান্য রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া আত্মহত্যারূপ মহাপাপে লিপ্ত হইতেছেন? আপনি কি জানেন না যে জগন্মাতা ভগবতী প্রত্যেক নারীতে অংশরূপে অধিষ্ঠিতা? আপনার মাতা, পিতামহী, মাতামহী, স্ত্রী, কন্যা, প্রভৃতি যাবতীয় নারীতেই তিনি সমভাবে বিরাজ করেন, ইহা কি বুঝিতে পারেন না? আবার যে প্রত্যেক পুরুষদেহে ভগবান মহাদেব অংশরূপে বিরাজিত, তাহাও কি ভুলিয়া গিয়াছেন? ইহাতে যদি পাপ হইত তবে বিধাতা কিছুই সৃষ্টি করিতেন না। যা'ন ঠাকুর! বাড়ী গিয়া স্ত্রীর সহিত স্বধর্ম্ম পালন করুন।"

ধীবরকন্যার বাক্য শেষ হইলে ব্রাহ্মণের ভ্রমান্ধকার কাটিয়া গেল। অল্প বয়স্কা, অশিক্ষিতা, ধীবরকন্যার মুখ হইতে এই প্রকার সারগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিয়া চন্দ্রশেখর অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার দিব্যজ্ঞান উদয় হইল। তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া একলম্ফে ধীবরকন্যার নৌকায় গিয়া দুই হস্তে তাঁহার পদযুগল বেষ্টন করিয়া বলিলেন, "মা, তোমার কথায় আমার মোহ ঘুচিয়াছে। ধীবরকন্যার মুখ হইতে এই প্রকার সারগর্ভ কথা কিছুতেই বাহির হইতে পারে না, তুমি নিশ্চয়ই কোন দেবী, ছল করিয়া আমাকে ভুলাইতে আসিয়াছ; তোমার সত্য পরিচয় প্রদান করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর।" এই বলিয়া চন্দ্রশেখর তাঁহার চরণদ্বয়ের উপর স্বীয় মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন।

ধীবরকন্যা ব্রাহ্মণের এবম্বিধ আচরণে ক্রুদ্ধা হইয়া বলিল "আমি অস্পৃশ্যা ধীবরকন্যা, আপনি ব্রাহ্মণ হইয়া কেন আমার অকল্যাণ করিতেছেন? শীঘ্র আমার পদদ্বয় পরিত্যাগ করুন।"

চন্দ্রশেখর কিছুতেই পদত্যাগ না করিয়া ভক্তিগদগদকণ্ঠে বলিলেন, "মা, আমার বিশ্বাস হইতেছে তুমি নিশ্চয়ই দেবী ; অভাগাকে ভুলাইতে আসিয়াছ। তোমার প্রকৃত পরিচয় না পাইলে পদযুগল পরিত্যাগ করিব না। এখনই তোমার পায়ে মাথা রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিব। তোমার ব্রহ্মহত্যার পাপ ঘটিবে।"

রমণী তথাপিও আত্মপরিচয় দিতে স্বীকৃতা হইল না। এই প্রকার অনেকক্ষণ গত হইলে যখন চন্দ্রশেখর দেখিলেন যে ইনি কিছুতেই আত্ম-পরিচয় দিবেন না, তখন আত্মত্যাগ করিবার জন্য নদীতে ঝম্প প্রদান করিলেন। তখন সেই রমণী বলিল "বৎস চন্দ্রশেখর! আমি এতক্ষণ তোমার ভক্তি ও দৃঢ়তা পরীক্ষা করিতেছিলাম। তুমি যাঁহাকে দিবানিশি ভক্তি-সহকারে আরাধনা করিয়া থাক, আমিই তোমার সেই উপাস্যা দেবী। বৎস, আত্মহত্যা মহাপাপ, তুমি নৌকায় আরোহণ কর।"

চন্দ্রশেখর অতীব আহ্লাদের সহিত দেবীর আদেশ অনুসারে নৌকায় উঠিলেন ও ভক্তিভরে উপাস্যা দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। যাঁহাকে মনে মনে অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন চিন্তা করিয়া থাকেন, যাঁহার শ্রীপদ পাইবার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ দিবানিশি আরাধনা করেন, ব্রাহ্মণ আজ সেই দেবদুর্লভ চরণ দর্শন পাইয়া পুনঃ পুনঃ সেই চরণে প্রণতি পূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার মন ভক্তিরসে ভিজিয়া উঠিল। দেবী স্তবে তুষ্টা হইয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেন। প্রণতি-শিরোধরাংসা চন্দ্রশেখর ভক্তিগদগদকণ্ঠে বলিলেন, "মা, যাঁহার স্বরূপ হৃৎপদ্মে বিকশিত হইলে সর্ব্ববিধ বাসনা পরিপূর্ণ হয়, আজ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া আমার সকল আশা পূর্ণ হইয়াছে। মাগো, কৃপা করিয়া এ দাসকে একবার স্বরূপে দেখা দাও।"

ভক্তবৎসলা দয়াময়ী তৎক্ষণাৎ স্বরূপ ধারণ করিয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতঃ বলিলেন "বৎস, আজ যে স্থানে তুমি আমার দর্শন পাইলে আমার বরে অতি সত্বরই এই বিপুল জলরাশি সর্ব্বশস্যময়ী মেদিনীতে পরিণত হইবে, এবং এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে তুমিই রাজত্ব করিবে।"

চন্দ্রশেখর পুনঃ প্রণত হইয়া বলিলেন "মাতঃ! যখন পূর্ব্বপুণ্যফলে ও পবিত্র চরণ দর্শন পাইয়াছি তখন রাজ্যভোগে আর আমার স্পৃহা নাই,

কেবল এই বর দাও যেন বারংবার আর এই পাপময়ী পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়। রাজ্যভোগে বিন্দুমাত্র স্পৃহা নাই, তবে এই কর মা যেন এই ভূখণ্ড তোমার এই দীন সন্তানের নামে প্রসিদ্ধ হয়।" দেবী "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। এবং চন্দ্রশেখরও হৃষ্টমনে দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। দেবীর আশীর্ব্বাদে অতি শীঘ্র সেই বিশাল জলরাশি অপসারিত হইল। সেই নবাবিস্কৃত ভূমি চন্দ্রদ্বীপ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিল।

২।—চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মচারী * কতিপয় শিষ্য সমভিব্যাহারে তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছিলেন। রামনাথ দনুজমর্দ্দন দে নামে তাঁহার একজন প্রিয় শিষ্যও সঙ্গে ছিলেন। একদা এই সুগন্ধা বক্ষে সকলেই রাত্রিযোগে নৌকা মধ্যে সুষুপ্ত আছেন, এমন সময়ে ব্রহ্মচারী স্বপ্নে দেখিলেন যেন জগদম্বা কালিকাদেবী, তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া বলিতেছেন যে, যেস্থানে চন্দ্রশেখরের নৌকা রহিয়াছে তাহার অনতিদূরে তিনটী পাষাণময়ী দেবমূর্ত্তি জল-নিমগ্ন অবস্থায় আছে ; ব্রহ্মচারীর প্রিয় শিষ্য দনুজমর্দ্দন কর্ত্তৃক ঐ মূর্ত্তিত্রয় উদ্ধৃত হইলে, এই বিশাল নদী সত্বরই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে পরিণত হইবে।

স্বপ্নান্তে চন্দ্রশেখর জাগ্রত হইলেন, অবশিষ্ট রাত্রি আর নিদ্রা গেলেন না। রাত্রি প্রভাত হইলে, তিনি প্রিয় শিষ্য দনুজমর্দ্দনকে গোপনে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। দনুজমর্দ্দন গুরুর আজ্ঞানুসারে স্বপ্নকথিত স্থানে ডুব দিলেন। প্রথমবার দেবী কাত্যায়নীর পাষাণময়ী মূর্ত্তি উঠাইলেন। গুরুদেব পুনরায় ডুব দিতে আদেশ করায় শিষ্য তদনুসারে দ্বিতীয়বার মদনগোপালের পাষাণময়ী মূর্ত্তি উঠাইলেন।† গুরুদেব আবার ডুব দিতে বলিলেন, কিন্তু দনুজ-মর্দ্দন আর ডুব দিতে সাহসী হইলেন না। চন্দ্রশেখর বলিলেন,—"ভগবতী কালিকার প্রসাদে এই বিশাল জলরাশি অতি সত্বর সর্ব্বশস্য-ময়ী মেদিনীতে পরিণত হইবে এবং তাঁহার আদেশে তুমিই এই দেশের

* কেহ কেহ বলেন সংসারত্যাগী যোগী পুরুষ।

† এই পাষাণ প্রতিমাদ্বয় এখনও মাধবপাশা রাজবাড়ীতে বর্ত্তমান আছে।

রাজা হইবে। তৃতীয়বার ডুব দিলে মহালক্ষ্মীর পাষাণময়ী মূর্ত্তি পাওয়া যাইত, তুমি ডুব না দিয়া অতিশয় অবিমৃষ্যকারিতার কার্য্য করিয়াছ।”

এই দনুজমর্দ্দন দে চন্দ্রদ্বীপরাজ্য স্থাপয়িতা। ইনি গুরুর নামানুসারে নূতন রাজ্যের নামকরণ করেন; তাই এই দেশ ‘চন্দ্রদ্বীপ’ বলিয়া বিখ্যাত।

রামনাথদনুজমর্দ্দন দের আবির্ভাব কাল নির্ণয় করা বড় দুরূহ। “চন্দ্রদ্বীপ-রাজবংশ” প্রণেতা বাবু ব্রজ সুন্দর মিত্র মহাশয় বলেন যে ইনি মহারাজ বল্লাল সেনের কিছু পরেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।* বাবু নগেন্দ্র নাথ বসু, তৎ প্রণীত “বিশ্বকোষে” লিখিয়াছেন যে দনুজমর্দ্দন গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণ সেনের প্রপৌত্র! পাঠান সম্রাট্ বুলবন্ যখন মঘিসুদ্দিন তুগ্রলকে তাড়াইয়া পূর্ব্ববঙ্গ অধিকার করেন, তখন দনৌজা নামে এক রাজা সুবর্ণগ্রামে রাজত্ব করিতেন।† নগেন্দ্র বাবু ইহাকেই চন্দ্রদ্বীপের রাজ্যস্থাপয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এখন এই উভয় ঐতিহাসিক, দনুজমর্দ্দনের আবির্ভাব কাল যাহাই নির্দ্দেশ করুন না কেন, বল্লাল সেনের আবির্ভাব কালের সহিত দনুজমর্দ্দনের আবির্ভাব কাল হিসাব করিলে, অন্যূন সার্দ্ধদ্বিশত বৎসরের পার্থক্য লক্ষিত হইবে। আমরা যাহা বুঝিয়াছি তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

আমাদের দেশে ৩০ বৎসরে এক পুরুষ গণনা করা যায়, এবং ইহাই ঐতিহাসিকদিগের মত। রাজা জগদানন্দ, দনুজমর্দ্দনের সাত পুরুষ অধস্তন, সুতরাং অনুমান ২০০ বৎসর পরবর্ত্তী। তিনি সম্রাট্ আকবরের সমকালীন; উক্ত সম্রাট্ ১৫৪২ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ১৫৪২ হইতে ২০০ বৎসর বাদ দিলে ১৩৪২ খৃঃ অব্দ অর্থাৎ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ দনুজমর্দ্দনের আবির্ভাব কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ডাঃ ওয়াইজও এসিয়াটিক সোসাইটীর জার্নেলে দনুজমর্দ্দন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “He lived according to their pedigree in the fourteenth Century.” ‡ মহারাজ বল্লাল সেন ইহার ২৫০ কি ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

---

* “চন্দ্রদ্বীপ-রাজবংশ” ১২শ পৃষ্ঠা

† “বিশ্বকোষ” চন্দ্রদ্বীপ শব্দ দ্রষ্টব্য।

‡ Journal of the Asiatic Society of Bengal, Part I. No. III, 1874.

নগেন্দ্র বাবু দনুজমর্দ্দনকে পাঠান সম্রাট্ বুলবনের সমকালীন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই উক্তি সম্বন্ধে আমরা এসিয়াটিক সোসাইটীর জার্নেলে যাহা উল্লেখ পাইয়াছি তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

"It is currently believed that the sons of the five Kayasthas who accompanied the five Brahmins of Kanuj in the reign of Ballal Sen (!!!) settled in Bakla-Chandradwip, a purgana which included the whole of the modern zilla of Backergunge with the exception of Mahal Selimabad. The first of the Chandradwip family was Danujamardan Dey. He was styled by the Ghatakas as Raja and was the first Samajpati or President of the Bangaja Kayasthas.

He lived according to their pedigree in the fourteenth Century. The Ghatakas enumerate seventeen Rajas of Chandradwip up to the present day, while they name twenty three generations since the immigration of the Kayasthas from Kanuj.

It is not improbable that the founder of this family is the same person as the Rai of Sonargong by name Dinuja Rai, who met emperor Bulbon on his march against Sultan Mahisuddin Tughluk (Tugral ?) in the year 1280 A. D. It is not likely that the Mahomedan usurper would have allowed a Hindu to remain in independence at his capital Sonargong. If the principality of Chandradwip extended to the river Meghna, the agreement made with the emperor, that he would guard against the escape of Mahisuddin to the west becomes intelligible." *

এসিয়াটিক সোসাইটীর জার্নলে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা অনুমান মাত্র। অনুমানটী যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে সুবর্ণ-গ্রামের 'দনৌজা' যে রামনাথদনুজমর্দ্দন দে নহেন, পরন্তু সেনবংশীয় স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তাহা হরি মিশ্রের কারিকা ও আইন-ই-আকবরি প্রভৃতি গ্রন্থে সপ্রমাণ। কেবলমাত্র 'দনুজ' ভাগের সাদৃশ্য বশতঃ উভয়কে এক

* Journal of the Asiatic Society of Bengal, Part I. No. III., 1874.

মনে করা অসঙ্গত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বক্তিয়ার কর্ত্তৃক নবদ্বীপ বিজয়ের পরেও কেশব সেন প্রমুখ সেনরাজবংশধরগণ একশত বৎসরের অধিক কাল বিক্রমপুর এবং সুবর্ণগ্রামে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সম্রাট্ বুলবনের পুত্রের সময় পর্য্যন্ত সুবর্ণগ্রাম সেনবংশীয়গণেরই করায়ত্ব ছিল।* হরি মিশ্র, মহারাজ কেশব সেনের পরবর্ত্তী সেনরাজগণের মধ্যে স্পষ্টভাবে দনৌজামাধব † সেনের উল্লেখ করিয়াছেন। আইন-ই-আকবরিতে ইনি 'নৌজ' সেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

নগেন্দ্র বাবু বলেন যে, সুবর্ণগ্রামরাজ দনৌজামাধব সেনই দনুজমর্দ্দন দে এবং দনুজমর্দ্দন মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের প্রপৌত্র !!!

এখন দেখা যাক দনুজমর্দ্দন দে মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের প্রপৌত্র কিনা। কায়স্থগণের কুলগ্রন্থে আমরা এই বঙ্গদেশে দুই শ্রেণী দেখিতে পাই; যথা—রাঢ় এবং বঙ্গজ। এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে পদবীতে কতক কতক অসামঞ্জস্য দেখা যায়। ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, ভিন্ন অন্যান্য কায়স্থগণের কোন কোন পদবীতে বঙ্গজ এবং রাঢ়ীয় গণের কিছু প্রভেদ আছে। রাঢ়ীয় মৌলিকগণের পদবীর সঙ্গে বঙ্গজগণের বিশেষ অনৈক্য আছে। দেব, দে, দাম, (দাঁ) হেঁশ, প্রভৃতি উভয় কায়স্থ কুলের পদবী, কেননা মৌলিক ও কুলবিহীনগণের পদবী অসংখ্য।

এই সমস্ত পদবীর মধ্যে কতকগুলি (দে, দাস, নন্দী, হোড়, বল, ভদ্র, রুদ্র প্রভৃতি) বঙ্গদেশে বিশেষভাবে প্রচলিত। ইহাদের সঙ্গে রাঢ়ীয়গণের কোন প্রকার বৈবাহিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয় না। বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ জিলায়

---

* তৃতীয় অধ্যায় ৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (সম্রাট বুলবনের পুত্রকর্ত্তৃক সুবর্ণগ্রাম বিজয়ের পরেও মহারাজ দ্বিতীয় বল্লাল সেন বিক্রমপুরে হিন্দুস্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। গোপাল ভট্ট রচিত 'বল্লাল চরিত' পাঠে জানা যায় যে বৈদ্যরাজ বল্লাল খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বাবা আদমের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইনিই সেনবংশের শেষরাজা।)

† বল্লালতনয়ো রাজা লক্ষ্মণোঽভূৎ মহাশয়ঃ।
তৎপুত্রঃ কেশবো রাজা গৌড়রাজ্যং বিহায় চ॥
বসতিং চাপ্য করোৎ বঙ্গে যবনস্য ভয়াৎততঃ।
ন শক্নুবন্তি তে বিপ্রাস্তত্র স্থাতুং তদাপুনঃ॥
প্রাদুরভবৎ ধর্ম্মাত্মা সেনবংশাদনন্তরং।
দনৌজামাধবঃ সর্ব্বভূপৈঃ সেব্যপদাম্বুজঃ॥

দুইটী কায়স্থ সমাজ, চন্দ্রদ্বীপ এবং সেলিমাবাদ; চন্দ্রদ্বীপের রাজগণের সহিত এই দেশীয় কায়স্থগণের ক্রিয়া কর্ম্ম হয়। কিন্তু সেলিমাবাদস্থ রায়ের-কাঠীর কায়স্থগণের সহিত দক্ষিণরাঢ়ীয়গণের ক্রিয়া হইয়া থাকে। রায়ের-কাঠীর রাজবংশ বাসুকী গোত্রোৎপন্ন সেনবংশ, ইহারা দক্ষিণরাঢ়ীয়। দনুজমর্দ্দন "দে" উপাধিধারী বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন। সেন রাজগণের যতগুলি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহার দুই একটাতে "সেনদেব" ইতি ভাষা লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়; এইস্থলে "সেন" শব্দই রাজগণের বংশোপাধি, "দেব" বিশেষণ বাচক শব্দমাত্র।* বিজয়বল্লালাদি নরপতিগণ নিজ বংশকে সেনান্ববায়, সেনবংশ, সেনকুল, সেনান্বয় ভিন্ন কভুও দেবান্ববায়, দেববংশ, দেবকুল কি দেবান্বয় বলিয়া বর্ণন করেন নাই। যথাঃ—

তস্মিন সেনান্ববায়ে প্রতিসুভটশতোৎসাদন ব্রহ্মবাদী।
স ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ॥

* * *

পৌরাঢ্যাশ্চপুরীঃ শ্মশানবসতে র্ভিক্ষাভুজস্যাঙ্কয়াং।
লক্ষ্মীং স ব্যতনোৎ দরিদ্রভবনে সুজ্ঞোহি সেনান্বয়ঃ॥

(রাজসাহীর প্রস্তরফলক।)

হেমন্তঃ স্ফুটমেব সেনজননক্ষেত্রৌঘপুণ্যাবণী।
শালিশ্লাঘ্য বিপাকপীবর গুণস্তেষামভুৎ বংশজঃ॥

(লক্ষ্মণসেনী তাম্রশাসন।)

মহারাজ বল্লাল সেন দানসাগর গ্রন্থে নিজ বংশকে "অবনেভূর্ষণং সেনবংশ" বলিয়া বিঘোষিত করিয়াছেন। ইদিলপুরের তাম্রশাসনেও মহারাজ কেশবসেন "সেনকুলকমলবিকাশভাস্কর" বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। লক্ষ্মণ তাম্রশাসনে স্পষ্টতঃ আপনাকে "সেন" বলিয়াছেন—সেনজননক্ষেত্রৌঘপুণ্যাবণী। সেনের প্রপৌত্র "দে" (বা দেব) ইহাও কি কখন সম্ভব?

তার পর গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণ সেনের বংশধরগণের মধ্যে যাহারা

---

* রাজা ভট্টারকো দেব স্তৎসুতা ভর্ত্তৃদারিকা।
দেবী কৃতাভিষেকায়ামিতরাসু চ ভট্টিনী॥—(অমরকোষ)

মুসলমান ভয়ে পলায়ন করিয়া বাকলায় গিয়াছিলেন, * তন্মধ্যে রামনাথ দনুজমর্দ্দন নামধেয় কোন ব্যক্তির নাম পাওয়া যায় না। কায়স্থ জাতির মধ্যে "সেন" পদবীও আছে, কিন্তু ব্রজ সুন্দর মিত্র মহাশয় দনুজ-মর্দ্দন দে কে "ভরদ্বাজ" গোত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।† কায়স্থ বংশাবলী গ্রন্থে সেনবংশের "ভরদ্বাজ" গোত্র নাই, কিন্তু দে, এবং দেব বংশে ভরদ্বাজ গোত্র আছে।‡ "বিশ্বকোষ" এবং "চন্দ্রদ্বীপ-রাজবংশ" প্রণেতা উভয়ই কুলীন কায়স্থ ; এখন আমরা কাহার কথা বিশ্বাস করিব ?

বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রমাণ করিতেছেন যে, তাঁহারা ক্ষত্রিয় জাতির অন্যতম শাখা এবং সেনরাজগণ ক্ষত্রিয়-কায়স্থ। তন্নিমিত্ত, অনেকে সংস্কৃত বচনাদি উদ্ধৃত করিয়া বহুপ্রবন্ধ এবং পুস্তক রচনা করিতেছেন। এই সমস্ত বচন প্রমাণের সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে গেলে, অনেক গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ের অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এ সমস্ত বচনের বিরুদ্ধে তর্ক করিতে যাইয়া লাঞ্ছিত হইয়াছেন। ক্ষত্রিয় হইতে কায়স্থ যে ভিন্ন জাতি, আমরা দুই একটী কথায় যাহা বুঝিয়াছি, তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব।

অতি প্রাচীন কাল হইতে ক্ষত্রিয় জাতি দুইটী শাখায় বিভক্ত ; যথা চন্দ্রবংশ এবং সূর্য্যবংশ। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতিতে যতগুলি ক্ষত্রিয় রাজা এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ পাইয়াছি, তাঁহারা এই দুই শাখার অন্তর্ভুক্ত ; কিন্তু কায়স্থগণের জাতির ইতিবৃত্তে এই সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই, মন্বাদি স্মৃতিতেও ইহার অনুকূলে কোন বচন দেখা যায় না। তারপর অশৌচব্যবস্থায় আরও গোল। ভগবান মনু চারি জাতির অশৌচ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে,—

---

* সুখসেন, অরুণসেন, তরুণসেন, হরিসেন এবং বিজয়সেন নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বাঞ্চলে পলায়ন করেন। ঘটক কারিকা।

† "চন্দ্রদ্বীপ-রাজবংশ" ৮ পৃষ্ঠা।

‡ সেন...(গোত্র) বাসুকি, আলম্যান, ধন্বন্তরি ও কাশ্যপ।

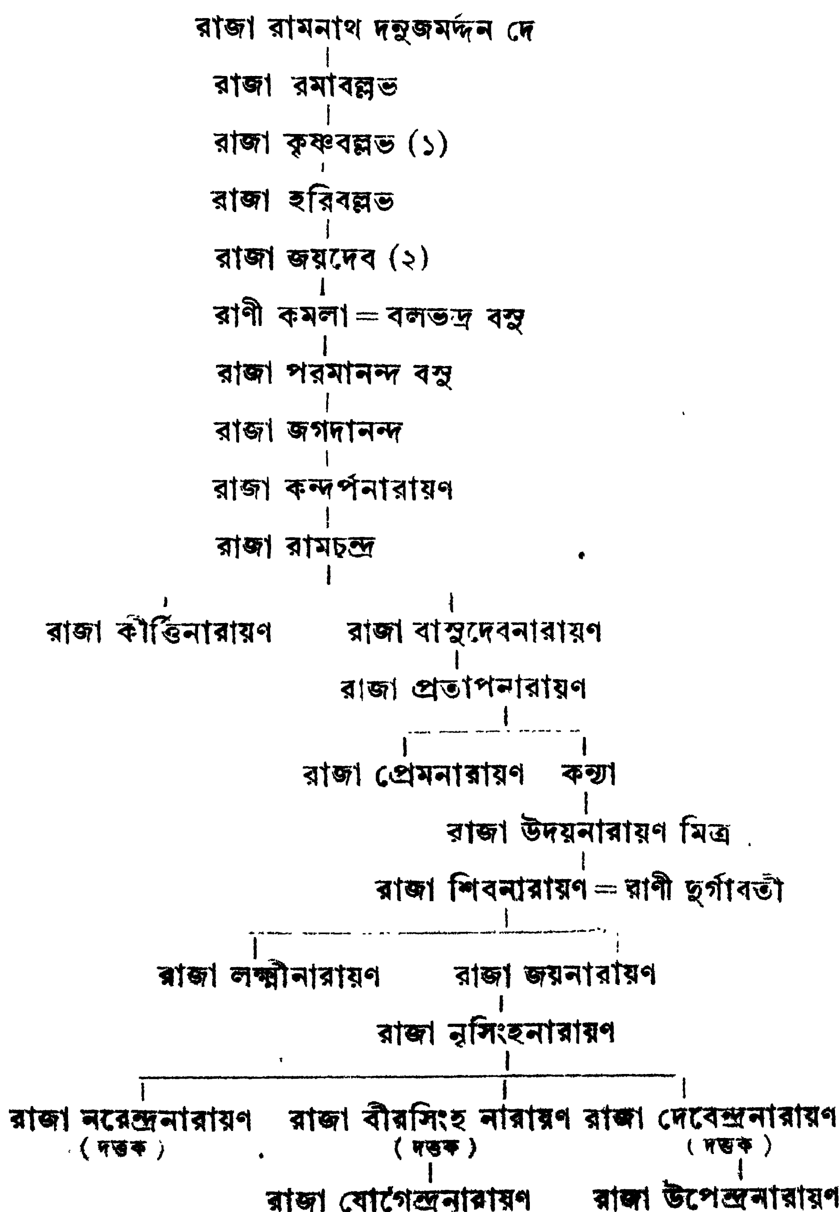
দে, দেব...(গোত্র) ঘৃত কৌশিক, আলম্যান, কাশ্যপ, পরাশর, মৌদগল্য, শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, গৌতম, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ। কায়স্থ বংশাবলী ১৭ পৃঃ।

"বিপ্রঃ শুদ্ধঃ দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন, শূদ্রঃ মাসেন শুদ্ধতি॥"

এই বচনে স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে ভূমিপ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতি দ্বাদশ দিনে শুদ্ধি লাভ করেন। কিন্তু কায়স্থসন্তানগণ কি দ্বাদশ দিনে শুদ্ধি লাভ করেন, না মাসান্তে শুদ্ধিলাভ করেন? ক্ষত্রিয়গণের মত তাঁহাদের দ্বিজত্ব কই? আর একটা কথা; কায়স্থগণ চিত্রগুপ্তের সন্তানের অন্যতম শাখা বলেন, এবং ক্ষত্রোচিত অসিচর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মানবহিতার্থে মসি ও লেখনী ধারণ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের জাতিগত অশৌচ এবং দ্বিজত্ব লোপ হইল কেন? ইহাতে কোন সামাজিক অপরাধ থাকিলে হয়ত সমাজে হীনমর্য্যাদা হইবে, কিন্তু তা বলিয়া ক্ষত্রজাতিগত নিত্যক্রীয়া লোপ হইল কেন? বঙ্গদেশে বর্ত্তমান সময়ে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থ অনেক ক্ষত্রিয় সন্তান বাস করিতেছেন; তাঁহারা কিন্তু কায়স্থগণের স্পৃষ্ট অন্নাদি ভোজন করা দূরে থাক, তাঁহাদের স্পৃষ্ট জল দ্বারা সন্ধ্যাবন্দনাদি পর্য্যন্ত করেন না। কান্যকুব্জাগত কায়স্থগণ এই দেশে স্থিতি লাভ করিলে, তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ কিন্তু পিত্রাদির ন্যায় সম্মানার্হ হইলেন না। তাঁহারা এই দেশস্থিত শূদ্রাদির সহিত বিবাহাদি দ্বারা ক্রমশঃ হীনত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ভাণ্ডারী শ্রেণীর শূদ্রগণ ধনশালী হইলেই কুলীন কায়স্থগণের সহিত আদান প্রদান করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশস্থ প্রধান প্রধান কায়স্থ সমাজে ইহা এখন প্রচলিত। যে সমস্ত ভাণ্ডারী শ্রেণীর শূদ্রগণ চিরকাল ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ সন্তানগণের দাসত্ব করিতেছে, তাহাদের সঙ্গে আদান প্রদান করিয়াও কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়া মনে করেন; ইহা তাঁহাদের পক্ষে কতদূর সঙ্গত তাহা পাঠক বিবেচনা করিবেন। ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য অতি কঠোর, তন্নিমিত্ত অনেক অপ্রিয় সত্যের অবতারণা করিতে হইল।

বঙ্গের সেন রাজগণের জাতিবিচার সম্বন্ধে বড় গোল। আমরা যাহা বুঝিয়াছি তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, তবে তাঁহারা যে কায়স্থ ছিলেন, তাহার কোন যুক্তিযুক্ত প্রমাণ নাই; এবং ভরদ্বাজ গোত্রীয় কায়স্থ দনুজমর্দ্দন দে যে, সেনরাজ লক্ষ্মণের বংশধর নহেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ দনুজমর্দ্দনের পিতৃপুরুষগণের প্রকৃত পরিচয় অদ্যাপি জানা যায় নাই।

দনুজমর্দ্দন হইতে যে কয়জন রাজা চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিয়াছেন তাঁহাদের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।



বেভারিজ সাহেবের মতে (১) ইহার নাম শ্রীবল্লভ, (২) ইহার নাম কৃষ্ণবল্লভ।

রামনাথ দনুজমর্দ্দন দে রাজোপাধি গ্রহণ করিয়া কচুয়া * নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। ঐ রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ এখনও স্থানে স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তিনি কত বৎসর রাজত্ব করেন তাহার কোন প্রমাণ নাই, তবে তাঁহার সময়ের ঘটনা পর্য্যালোচনা করিলে কতকটা বুঝা যায় যে তিনি অল্পকাল রাজত্ব করেন নাই। ঘটক-গণের কুলগ্রন্থে প্রকাশ যে, দনুজমর্দ্দন রাজ্য স্থাপন পূর্ব্বক যথাশাস্ত্র অভিষিক্ত হইয়া এবং দুর্গ, পরিখা, অশ্ব, হস্তি, সৈন্য প্রভৃতিতে পরিবৃত থাকিয়া সর্ব্ববিধ স্বাধীনতাসহ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়েই প্রথমতঃ বঙ্গজ কায়স্থ সমাজ স্থাপিত হয়। † এই সমাজের সীমা উত্তরে ঢাকা জিলাস্থ ইচ্ছামতী নদী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদ, এবং পশ্চিমে তেলিহাটী ও সেলিমাবাদ। এই সীমার বাহিরে কোন কুলীন বসতি করিলে তাহার কুল নষ্ট হইত। যাহাতে কুলীন কায়স্থগণ স্বশ্রেণী ব্যতীত বৈবাহিক ক্রিয়া না করেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন। ইদিলপুর পরগণার কায়স্থগণের কুলাচার্য্যগণকে ব্রহ্মোত্তর প্রদান করিয়া সেখানে স্থিতি করেন। অদ্যাপি তাঁহাদের সন্তানসন্ততিগণ ঘটক-স্বর্ণামাত্য বলিয়া কায়স্থসমাজে বিশেষ পূজা। তৎকালে কুলীন কায়স্থগণ হীনকর্ম্ম করিলে যেমন তাঁহারা রাজশাসনাধীনে থাকিতেন তদ্রূপ ঘটক-স্বর্ণামাত্যগণেরও বিলক্ষণ ক্লেশ ভোগ করিতে হইত। রাজার নিযুক্ত ঘটক-স্বর্ণামত্যগণ, রাজ নিমন্ত্রিত কুলীন কায়স্থগণ ভোজন সময়ে, কে রাজার দক্ষিণে বা কে বামে বসিবেন, কুলগ্রন্থ দেখিয়া তাহার নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন, তদনুসারে কুলীনগণ অর্ভ্যর্থিত হইতেন। রাজার স্থাপিত

---

* বর্ত্তমান পটুয়াখালী সবডিভিসনের অন্তর্গত।

† The chief event of this rule was the organisation of the Bangaja Kayasthas. He (Danujmardan) appointed certain Brahmins whose descendants still reside in Idilpur to be Ghutuks or Kulacharyyas of Kayasthas and he directed that all marriages should be arranged by them. He also appointed a Swarnamatya or master of the ceremonies, who fixed the precedence of each member of the Sabha or assembly and who pointed out the proper seat, each individual was to occupy, at the feast given by the Raja. These offices still exist and the holders of them are much respected by all Kayasthas.—Journal of the Asiatic Society of Bengal, Part I. No. III, 1876.

কায়স্থ সমাজের মধ্যে কাহারও পুত্রকন্যার বিবাহ উপস্থিত হইলে পূর্ব্বে রাজার অনুমতি লইয়া কিঞ্চিৎ কর দিতে হইত। ইহাকে "রাজ-মধ্যস্থ" বলে। কেহ এরূপ না করিলে তাহাকে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে হইত।

ব্রাহ্মণদিগকে রাজা "নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষ" পাঠে পত্রাদি লিখিতেন এবং কুলীনগণকে "সানুগ্রহ পত্র মিদং" ইত্যাদি লিখিতেন। কোন ব্রাহ্মণ বা কুলীন, রাজাকে পত্র লিখিলে—"আর্দ্দান শ্রী অমুক……"এই ভাবে লিখিতেন। কায়স্থগণ রাজসভায় উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে রীতিমত কুর্ণিশ করিতে হইত। বয়ঃকনিষ্ঠগণ রীতিমত নমস্কার করিত। বহুকাল পর্য্যন্ত এই নিয়ম চন্দ্রদ্বীপের রাজগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

দনুজমর্দ্দনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রমাবল্লভ রাজাসনে আসীন হইলেন। কায়স্থগণের সামাজিক ক্রিয়াদি দর্শন করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করেন, এবং তাঁহাদের বৈবাহিক কুলসম্বন্ধে কতগুলি নিয়ম প্রচার করিয়া সমাজের মধ্যে আরও দৃঢ়তা স্থাপন করেন। ঘটকগণ তাঁহার আবির্ভাব কাল বঙ্গীয় অষ্টম শতাব্দী বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। তাঁহার ক্ষমতা এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে তাঁহার রাজ্যের বহির্ভূত ভূম্যধিকারিগণও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহাতে রাজ্যের সীমা বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।

তিনি যেরূপ শাস্ত্রজ্ঞ, তদ্রূপ অস্ত্রশস্ত্রবিশারদও ছিলেন। তিনি রাজধানীকে উৎকৃষ্টরূপে গড়বন্দী করিয়া বহিঃশত্রু হইতে রাজ্যরক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। নৌবল, অশ্ব, সৈন্য ও হস্ত্যাদিতে পরিবৃত হইয়া স্বনামে একটী নগর স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া ঘটকগণের কুলগ্রন্থে উল্লেখ আছে। কিন্তু বহু অনুসন্ধান করিয়াও এই নগর কোথায় এবং ইহার বর্ত্তমান কি নাম তাহা সম্যক্ অবগত হইতে পারি নাই। কেহ কেহ বলেন যে কচুয়াই "রমাবল্লভপুর" নামে অভিহিত হইত। কিন্তু ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না।

রমাবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ এবং তাঁহার পর তৎপুত্র হরিবল্লভের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে ঘটকগণের কুলগ্রন্থে প্রকাশ যে, তাঁহারা উভয়ই সদাচারী, ধার্ম্মিক এবং ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তাঁহারাও কায়স্থসমাজে আরও কতকগুলি নিয়ম প্রচলিত করেন। সমাজ

হইতে বিবাহের কন্যা-পণ উঠাইয়া দেন, কেবলমাত্র পাত্রপাত্রীর মর্য্যাদানু-সারে সামান্য অর্থ "মর্য্যাদা-পণ" রূপে ধার্য্য করিয়া দেন।

হরিবল্লভের তিরোধানের পর তাঁহার পুত্র জয়দেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অধিক দিন রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই, রাজ্য-প্রাপ্তির অল্প পরেই স্বর্গারোহণ করেন।

অপুত্রক জয়দেবের মৃত্যুর পর কমলা নাম্নী তাঁহার সর্ব্বগুণ-সম্পন্না কন্যা, কিছুকাল স্বামীসহ রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। রাণী কমলা সাতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না রমণী ছিলেন। তিনি রাজ্যের অশেষবিধ মঙ্গল সাধন এবং লোকহিতকর কার্য্যে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে "কমলার দীঘী" নামক একটী কীর্ত্তি, বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অদ্যাপি কচুয়ার বিলুপ্ত প্রায় রাজধানীতে এই দীঘীর চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। ইহাতে এখন আর জল নাই, কিন্তু চারিদিকের পাড়গুলি পর্ব্বতের মত উচ্চ, এবং নানাবিধ বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ। এই দীঘী দৈর্ঘ্যে প্রায় তিন দ্রোণ তের কালী হইবে; ইহা খনন করিতে প্রায় নয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল।

এই দীঘীর উৎপত্তি সম্বন্ধে, একটী আশ্চর্য্য কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। দীর্ঘিকা খননের স্থান নির্ব্বাচিত হইলে কমলা আজ্ঞা করিলেন যে, তিনি কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে গমন করিতে করিতে যে স্থানে ক্ষান্ত হইবেন, সেই স্থান পর্য্যন্ত খনন করিতে হইবে। কমলা চলিতে আরম্ভ করিলেন; বহুদূর গমন করিয়াও থামিলেন না। তখন কোন এক কর্ম্মচারীর আদেশে জনৈক অনুচর একটা পারাবত ছিন্ন করিয়া আনিয়া কমলার পাদমূলে অলক্ষ্যে রক্ত সিঞ্চন করিয়া দিল, কমলা চমকিতা হইয়া সেই স্থানে দাঁড়াইলেন। অনুচরগণও সেই খানে দীঘীর সীমা স্থির করিল।

এইরূপে প্রকাণ্ড জলাশয় খনিত হইল, কিন্তু জল আসিল না। ইহাতে রাজ্যস্থিত নানালোক নানাকথা কাণাকাণি করিতে লাগিল। কমলার কাণে নানারূপ জনরব পৌঁছিল, তিনি অতীব বিষণ্ণা হইলেন। চিন্তাক্লিষ্টা, কমলা একদা স্বপ্নে দেখিলেন যেন, সর্ব্বাভরণযুক্তা, পট্টবস্ত্র পরিহিতা একটী সুন্দরী রমণী বলিতেছেন "কমলা, যদি তুমি স্বয়ং দীর্ঘিকায় নামিয়া এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত যাও, তবে দীর্ঘিকা জলপূর্ণ হইবে।"

প্রভাতে এই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইলে, রাজ্যস্থিত অগণ্য

নরনারী এই অদ্ভুত কার্য্য দর্শন করিতে আসিল। রাজ্ঞী কমলা শুদ্ধচিত্তে দেবপূজা করতঃ পট্টবস্ত্র এবং নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া ধীরে ধীরে জলশূন্য দীর্ঘিকায় নামিলেন। মধ্যদেশ অতিক্রম করিতে না করিতে, চতুর্দ্দিক হইতে ভৈরব বেগে জলরাশি দীর্ঘিকায় পতিত হইতে লাগিল। কমলার স্বামী * পত্নীকে প্রায় নিমজ্জিতা দেখিয়া সত্বর তাঁহাকে উঠিয়া আসিতে আদেশ করিলেন; কিন্তু সন্তরণাক্ষমা কমলার আর সে সাধ্য রহিল না। স্বামী উন্মত্তবৎ জলমধ্যে ঝম্প প্রদান করিতে উদ্যোগী হইলে কমলা তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। স্বামী বলিলেন "তুমি তোমার শিশু পুত্রকে ফেলিয়া যাইও না; তোমার অভাবে কে তাহাকে প্রতিপালন করিবে?" কমলা বলিলেন যে, প্রত্যহ প্রত্যূষে যদি কেহ শিশুকে এই সোপানোপরি রক্ষা করে, তবে তিনিই তাহার ব্যবস্থা করিবেন। কমলা আর কথা বলিতে পারিলেন না, বিশাল জল রাশিরমধ্যে বিলীন হইলেন।

কমলার স্বামী পত্নী শোকে নিতান্ত কাতর হইলেন। কমলার বাক্যানুসারে প্রত্যহ প্রত্যূষে একজন ধাত্রী, শিশুকে সোপানোপরি রক্ষা করিয়া যাইত। এক দিন প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া রাজা দেখিলেন যে, একটী স্ত্রীলোক আসিয়া শিশুটিকে স্তন্য দান করিতেছেন। "কমলা" "কমলা" বলিয়া উন্মত্তভাবে তিনি তাহাকে ধরিতে গেলেন; অমনি রমণী ক্রোড়স্থিত বালককে নিম্নে রক্ষা করিয়া বিদ্যুৎবেগে জল মধ্যে ঝম্প প্রদান করতঃ নিমগ্না হইলেন। সেই অবধি উক্ত রমণীকে আর দেখা গেল না।

কমলার এই শিশুপুত্র পরমানন্দ তৎপরে সিংহাসনারোহণ করেন। ইনি বসু বংশোদ্ভব। বরিশাল সদর ষ্টেসনের অন্তর্গত দেহের গতি † গ্রামে ইহার পিতা পিতামহাদির বাসস্থান। অদ্যাপি তাঁহাদের বাড়ী রাজবাড়ী নামে অভিহিত হয়। ইষ্টকাদির চিহ্ন ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড

---

* কেহ কেহ বলেন ইঁহার নাম বলভদ্র বসু; কিন্তু ইনি "কালারাজা" বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। কালারাজার বিল অদ্যাপি বর্ত্তমান।

† Joydeb Rai, the fourth in descent died childless. His heir, a sister's son was Paramanand Rai of Basu family of Dehergati, Chandradwip, who traced their pedigree to Dasaratha Basu, one of the original Kayasthas. He, and his successors were acknowledged as the Samajpati of the Kayasthas of southern and eastern Bengal.—Journal of the Asiatic Society of Bengal, Part I No. 3.
This is evedently a mistake, Kamala was Jaydeb's daughter, instead of sister.

জানালা প্রভৃতি পূর্ব্বগৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বসুবংশীয় যে কয়েক ঘর কায়স্থ এখনও এখানে বসতি করেন, তাঁহারা সগর্ব্বে রাজবংশীয় বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন।

রাজা পরমানন্দ * সিংহাসনারূঢ় হইয়া, পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের ন্যায় রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি কুলীন কায়স্থদের সম্বন্ধে কতিপয় নূতন নিয়ম বিধান করেন। পূর্ব্বে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র এইরূপ গণনা করা হইত, কিন্তু তাঁহার সময়ে বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র এরূপ গণনা আরম্ভ হইল। তিনি স্বয়ং বসুবংশোদ্ভব বলিয়া নিজের বংশমর্য্যাদা, সকল কুলীন হইতে শ্রেষ্ঠ করিবার জন্য বোধ হয় এই নিয়ম করিয়াছিলেন। তিনি রাজা এবং সমাজপতি ; সুতরাং বিনা বাধায় ইহা সমাজে প্রচলিত হইল। অন্যান্য কুলীনগণ ইহাতে আন্তরিক বিরক্ত হইলেও মুখে কিছু প্রকাশ করিতে পারিতেন না।

পরমানন্দ কচুয়াতে সকল সময়ে বাস করিতেন না ; বৎসরের মধ্যে কতক সময়ে সবান্ধবে পৈত্রিক বাসভূমিতে অবস্থান করিতেন। দেহের-গতি গ্রামে যে সমস্ত ভগ্নাট্টালিকার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে, তথাকার অধিবাসিগণ উহা পরমানন্দের অট্টালিকা বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজভবনে কোন উৎসব ক্রিয়া উপস্থিত হইলে দেহেরগতির বসুবংশীয়গণ বিশেষ সম্মানিত হইয়া থাকেন।

পরমানন্দের তিরোধানের পর তদীয় পুত্র জগদানন্দ সিংহাসনোরোহণ করেন। তিনি অত্যন্ত সরলচিত্ত ও ঈশ্বরভক্ত পুরুষ ছিলেন। সর্ব্বদা ইষ্টদেবী-চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে তাঁহার বড় প্রবৃত্তি ছিল না। তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে একটী আশ্চর্য্যজনক প্রবাদ প্রচলিত আছে। রাজা সর্ব্বদা ইষ্টদেবী চরণে প্রার্থনা করিতেন যেন তিনি অন্তকালে গঙ্গার পবিত্র ক্রোড়ে জীবন ত্যাগ করিতে পারেন। একদা তিনি শুনিতে পাইলেন যে নদীর জল উচ্ছ্বসিত হইয়া নগর অতিক্রম পূর্ব্বক ভীমবেগে তাঁহার প্রাসাদাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। জগদানন্দ এই বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শন মানসে প্রাসাদশিখরে দণ্ডায়মান হইলেন, উত্তাল জলরাশি তাঁহার প্রাসাদ আক্রমণ করিল এবং সেই উদ্বেলিত জলরাশি হইতে চতুর্ভুজা

* ইহার অপর নাম শিবানন্দ।

শ্বেতবরণা, মকরবাহিনী গঙ্গামূর্ত্তি আবির্ভূতা হইয়া রাজার দিকে হস্ত প্রসারণ করিলেন। ভক্ত জগদানন্দ বুঝিলেন যে, দয়াময়ীর কর্ণে তাঁহার চির অভিলষিত প্রার্থনা পৌঁছিয়াছে, তাই তাঁহাকে লইতে জননী স্বয়ং আবির্ভূতা হইয়াছেন। কাল পূর্ণ হইয়াছে বুঝিয়া তিনি অবিলম্বে নদীতে ঝম্পপ্রদান করিলেন, জলরাশি রাজাকে লইয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল।

কেহ কেহ বলেন যে জনৈক দৈবজ্ঞ রাজার মৃত্যু দিন অবধারিত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, অমুক দিন গঙ্গাগর্ভে তাঁহার মৃত্যু হইবে। রাজা ভীত হইয়া সর্ব্বদা রাজপ্রাসাদে থাকিতেন এবং কখনও নদী বা জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী হইতেন না। দৈবজ্ঞকথিত দিবসে সহসা নদীর জল উদ্বেলিত হইয়া রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিল এবং রাজাকে লইয়া অন্তর্হিত হইল।

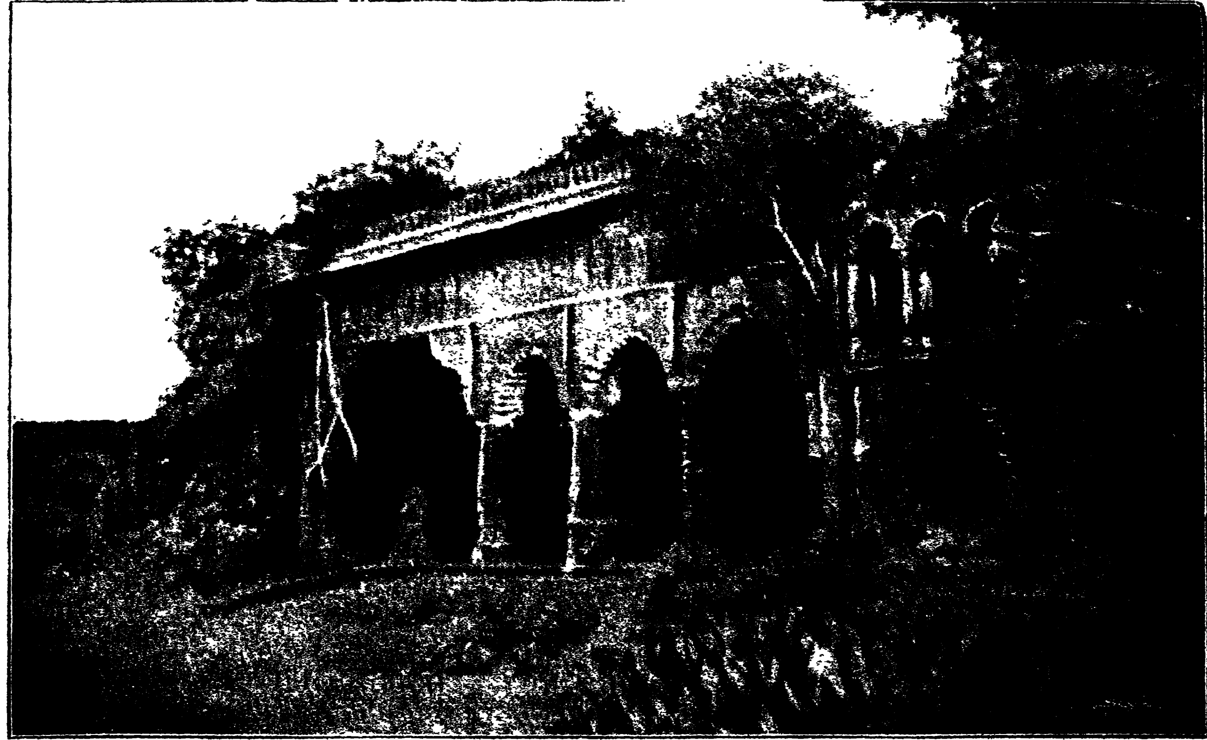
"আইন-ই-আকবরি"তে সরকার বাকলায় আমরা এক ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত ও জলপ্লাবনের উল্লেখ দেখিতে পাই। এই ভয়ঙ্কর খণ্ডপ্রলয়ে প্রায় লক্ষাধিক প্রাণী বিনষ্ট হয়। রাজা তখন গীতবাদ্যাদিতে মগ্ন ছিলেন। তিনি আত্মরক্ষার অন্য কোন উপায় না পাইয়া নৌকায় আরোহণ করিলেন, কিন্তু প্রাণরক্ষা করিতে পারিলেন না; নৌকাসহ অচিরাৎ জলমগ্ন হইলেন। রাজপুত্র এক উচ্চ মন্দিরের চূড়ায় উঠিয়া প্রাণরক্ষা করেন।*

আবুলফজেল, রাজপুত্রের নাম নির্দ্দেশ লইয়া একটু গোলে পড়িয়াছেন; তিনি জগদানন্দের পুত্রস্থানে, তদীয় পিতা পরমানন্দের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা ভুল হইবার সম্ভব, কেননা চন্দ্রদ্বীপের স্থাপিত ঘটক-স্বর্ণামত্যগণের কুলগ্রন্থে এবং চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ তালিকায় আমরা পরমানন্দকে, বসুবংশের প্রথম রাজা বলিয়া দেখিতে পাই। তাঁহার পুত্রের মৃত্যু সম্বন্ধে উল্লিখিত কিম্বদন্তী ঘটকগণের কুলগ্রন্থে লিখিত রহিয়াছে।

এই দুর্ঘটনার কিছুকাল পর হইতেই দুরন্ত মগ ও পর্ত্তুগীজ দস্যুগণের অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ হয়। সমুদ্র ও বৃহৎ নদীর তীরস্থ স্থানগুলি তাহাদের অত্যাচারে অত্যন্ত বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়েও এই সমস্ত স্থানের অরণ্যানী মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ, জলাশয় ও প্রশস্ত রাজবর্ত্মাদির চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়।

জগদানন্দের পুত্রের নাম কন্দর্পনারায়ণ। রাজা কন্দর্পনারায়ণ এই

* See Gladwin's Translation of Ain-i-Akbari, Page 304.



রাজবাটী—(মাধবপাশা)।

SEYNE PRESS.

সমস্ত মগ ও ফিরিঙ্গী দস্যুদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইলেন। তাহাদের সঙ্গে বহুবার যুদ্ধ করিয়াও তাহাদের আক্রমণ হইতে অব্যাহতির কোনও উপায় দেখিতে পাইলেন না। পিতার শোচনীয় নিয়তি এবং পঙ্গপালতুল্য জলদস্যুগণের পুনঃ পুনঃ আক্রমণহেতু কচুয়াতে রাজধানী রক্ষা করা কিছুতেই নিরাপদ নহে স্থির করিয়া, রাজা কন্দর্পনারায়ণ বর্ত্তমান বরিশাল নগরীর উত্তরপূর্ব্বে বাসুরিকাঠী নামক গ্রামে রাজধানী স্থাপন করিলেন। সেস্থান হইতে পুনরায় হোসেনপুর, পরে ক্ষুদ্রকাঠী গ্রামে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই সকল স্থানের স্বাস্থ্য ও সমাজ দোষনীয় জ্ঞান করিয়া অবশেষে মাধবপাশা নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন।* তৎকালে এইখানে গাজী উপাধিধারী একজন মুসলমান বাস করিতেন। তিনি প্রতিবন্ধক হইলে রাজা তাঁহাকে বিনাশ করিয়া মাধবপাশায় রাজধানী নির্ম্মাণ করিলেন।†

মহাবল কন্দর্পনারায়ণ, মাধবপাশায় রাজধানী স্থাপন করিয়া, চতুর্দ্দিক পরিখা, এবং সুদৃঢ় প্রাচীরে বেষ্টন করিলেন। তৎপর যুদ্ধোপযোগী সৈন্য এবং উৎকৃষ্ট নৌযানসমূহ নির্ম্মাণ করাইতে লাগিলেন। রাজার সঙ্গে সামাজিক কায়স্থগণও নিকটবর্ত্তী স্থানে বসতি স্থাপন করিতে লাগিলেন। রাজা কন্দর্পনারায়ণের বহু কীর্ত্তির লুপ্তপ্রায় চিহ্নসমূহ এখনও বর্ত্তমান আছে; তন্মধ্যে পিত্তল নির্ম্মিত একটী কামান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।‡ ইহার দৈর্ঘ্য পৌণে আট ফিট, পরিধি সাড়ে উনত্রিশ ফিট; ইহার উপর তৎকালীন বাঙ্গলা অক্ষরে ইহার নির্ম্মাতা ও রাজা কন্দর্পনারায়ণের নাম

---

* The residence of the Rajas of Chandradwip was at Kachua, close to the modern station of Bakarganj, but during the life time of Kandarpanarayan Rai or immediately afterwards, they were obliged to move farther inland to a place called Madhabpassa, where the rajas have resided ever since The removal was necessitated by frequent forages made by the Mughs and Portuguese of Chittagong, against whom the Raja was unable to contend,—Journal of the Asiatic Society of Bengal, Part I. No II; 1874.

† গাজীর দীঘী বলিয়া একটী প্রাচীন দীঘী মাধবপাশায় বর্ত্তমান আছে। ইহা সেই গাজী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া প্রকাশ।

‡ বিগত ১২৯৭ সনের বৈশাখ মাসে আমার মধ্যম ও তৃতীয় সহোদরের বিবাহোৎসবে আমাদের বাড়ীতে এই কামানটী আনীত হইয়াছিল। বহু পরিমাণে বারুদ বোঝাই করায় উহার একস্থান ফাটিয়া যায়। সেই অবস্থায় উহা এখনও বরিশালের পুলিসকোর্টের সম্মুখে পড়িয়া আছে।

লেখা আছে। কামানটীর শেষভাগে কয়েকটি অঙ্ক খোদা আছে বহু চেষ্টা করিয়াও তাহা পড়িতে পারিলাম না। ইহার গঠন ও নির্ম্মাণ-প্রণালী প্রশংসাযোগ্য। মাধবপাশার 'কামানতলা' নামক একটী পুষ্করিণী আছে, অনেকে অনুমান করেন যে, এইস্থানে এখনও বহুসংখ্যক কামান আছে।

কন্দর্পনারায়ণের রাজত্বের সময় পর্ত্তুগীজ ভ্রমণকারিগণ প্রথম এই দেশে পদার্পণ করেন। এই সকল ভ্রমণকারিগণ খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারক, রেলফ্ ফিচ্ ইহাদের নেতা; ইনি কন্দর্পনারায়ণ কর্ত্তৃক বিশেষ অর্ভ্যথিত হইয়াছিলেন এবং ইঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তের মধ্যে বাকলা রাজ্য ও রাজার সম্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়।*

ভুলুয়া পরগণাধিপতি রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য, রাজা কন্দর্পনারায়ণের শ্রীবৃদ্ধি ও লোকাতীত যশে ঈর্ষ্যাবশতঃ তাঁহার ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন। মধ্যে মধ্যে সুযোগ মত সৈন্যসামন্ত লইয়া চন্দ্রদ্বীপ আক্রমণ করিতেন। কন্দর্পনারায়ণও মধ্যে মধ্যে বৈরনির্য্যাতন মানসে ভুলুয়া আক্রমণ করিয়া প্রতিশোধ লইতেন। এই বিবাদে উভয় পক্ষের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল।

এই অনর্থক বিবাদের কারণ কেহ কেহ বলেন, যে রাজা কন্দর্প-নারায়ণের ইষ্টদেব উজীরপুর নিবাসী সিদ্ধপুরুষ দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে জোর করিয়া লক্ষ্মণমাণিক্য ভুলুয়ায় লইয়া তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। প্রবাদ এই যে, দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য্য সস্ত্রীক যেস্থানে অবস্থান করিতেন লক্ষ্মণ মাণিক্যের অনুচরগণ সেই স্থানের ঘর, বাড়ী, বৃক্ষাদি পর্য্যন্ত লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। ইহাকেই "ভুলুয়া-লুঠ" বলে। রাজা লক্ষ্মণমানিক্য অমিত বলশালী যোদ্ধা ছিলেন; রাজা কন্দর্পনারায়ণও দুর্ব্বল হস্তে অসি ধারণ করেন নাই; মাঝে মাঝে উভয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন, কিন্তু কেহ কাহাকে পরাজয় করিতে পারিতেন না।

---

* From Chittagong in Bengal, I came to Bakla, the king here is a Gentoo (Hindu), a man very well-disposed and delighted much in shooting gun. His country is very great and fruitful, and hath store of rice, much cotton cloth and cloth of silk. The houses are very fair and high built, the streets large, the people naked except a little cloth about their waist. The women wear great store of silver hoops about their necks and arms, and their bags are ringed about with gold, silver, copper, and rings made of elephant's teeth.—Extracts from James Wise's *Bara Bhuia* of Bengal.

রাজা কন্দর্পনারায়ণের সময়ে মোগল-কুল-গৌরব-রবি সম্রাট্ আকবর স্বীয় প্রতিভাবলে চতুর্দ্দিকে যশঃরশ্মি বিকীর্ণ করিতেছিলেন। চন্দ্রদ্বীপ মোগল সাম্রাজ্যান্তর্গত করদ মিত্র রাজ্য ছিল। রাজ্যশাসন, প্রজা পালন, বিদ্রোহদমন প্রভৃতি রাজাকেই করিতে হইত; কেবল বাৎসরিক রাজকর, এবং যুদ্ধ সময়ে নিয়মানুযায়ী সৈন্য বাদসাহকে পাঠাইতে হইত।* এইটুকু অধীনতা ব্যতীত চন্দ্রদ্বীপরাজ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ছিলেন।

এই সময়ে মোগলের বাহুবলে পাঠানশক্তি প্রায় উন্মূলিত; তথাপি তাহারা দলবদ্ধ হইয়া প্রনষ্ট গৌরব উদ্ধারার্থ সময়ে সময়ে নানাস্থান আক্রমণ করিত। যখন মোগল সেনাপতির পরাক্রমে পাঠানগণ পূর্ব্ববঙ্গ হইতে উড়িষ্যাভিমুখে পলায়ন করে, তখন তাহারা চন্দ্রদ্বীপে উপস্থিত হইয়া রাজা কন্দর্পনারায়ণের নিকট কর প্রার্থনা করে এবং রাজা মোগলের বশীভূত হইয়াছেন বলিয়া রাজ্যমধ্যে নানাবিধ অত্যাচার আরম্ভ করে। বীরহৃদয়, তেজস্বী কন্দর্পনারায়ণ সসৈন্যে পাঠানগণকে আক্রমণ করিয়া এবম্প্রকার বিপর্য্যস্ত করিয়াছিলেন যে, হতাবশিষ্ট পাঠানেরা বহুকষ্টে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। কেহ কেহ ধৃত হইয়া রাজা কর্তৃক বাদসাহের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। আকবর, কন্দর্পনারায়ণের অসাধারণ বাহুবল ও রণপাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে প্রশংসালিপিসহ বহুমূল্য উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন। মাধবপাশার নিকটবর্ত্তী হোসেনপুর নামক স্থানে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

এই যুদ্ধের অব্যবহিত পরে, দুর্দ্দান্ত মগ দস্যুগণ রাজ্যমধ্যে ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করে। রাজা কন্দর্পনারায়ণ, ইহাদিগকেও সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া দেশ হইতে বিদূরিত করিয়া দিলেন। মাধবপাশার অতি নিকটেই এই খণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান "মাণিকমুদীর ভারানী" নামক খাল যেস্থানে কালীজিরা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে, কেহ কেহ ঐস্থানকেই যুদ্ধক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। রাজা কন্দর্পনারায়ণ যে কয় বৎসর সিংহাসনারূঢ় ছিলেন, প্রায় সকল সময়েই তাঁহাকে যুদ্ধ বিগ্রহ লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হইত।

এই সময়ে আর একজন বীরপুরুষ, পশ্চিমবঙ্গে প্রাদুর্ভূত হইয়া,

* See Gladwin's Translation of Ain-i-Akbari, Page 464.

লোকাতীত শক্তি, অসীম বাহুবল, অসাধারণ প্রতিভা, অনুপম স্বদেশ হিতৈষীতায় সমগ্র ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। এই ক্ষণজন্মা বীরপুরুষ কায়স্থকুলশেখর মহারাজ প্রতাপ আদিত্য রায়। প্রতাপ স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম রক্ষার্থে, যে অতুলনীয় বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিতে গেলেও দুর্ব্বল হীনদশাপ্রাপ্ত বাঙ্গালীর হৃদয় গর্ব্বিত ও স্ফীত হইয়া উঠে। যে বীরপুরুষের অসির ঝঞ্চনায় এ কদিন মোগলসম্রাট্‌শ্রেষ্ঠ আকবর শাহের হৃদয় পর্য্যন্তও কম্পিত হইয়াছিল, যাহার বাহুবলে, অসংখ্য মোগল সেনা-সেনাপতির রক্তে কপোতাক্ষের জল রঞ্জিত হইয়াছিল, হায়! কুটিল সংসারচক্রের আবর্ত্তনে, কতিপয় স্বদেশদ্রোহী, স্বার্থান্ধ, কাপুরুষের বিশ্বাসঘাতকতায় সেই প্রতাপ অকালে কালসাগরে লীন হইয়াছেন। তৎসঙ্গে বঙ্গের স্বাধীনতা, বাঙ্গালীর আশাভরসা, জাতীয় গৌরব বুদ্‌বুদের ন্যায় চিরতরে অনন্তে মিশিয়া গিয়াছে। জ্ঞাতিদ্রোহিতা ও স্বার্থপরতা যে জাতীয় অধঃপতনের মূল, তাহা এই প্রতাপ আদিত্যের জীবনে সম্যক্ প্রতিফলিত হইয়াছে। *

চন্দ্রদ্বীপাধিপতি কন্দর্পনারায়ণ ও রাজা প্রতাপ আদিত্য রায় উভয়ই বীর ও সমধর্ম্মী; ত্বরায় উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইল। উভয় রাজা পরস্পরকে বিবাদ বিসম্বাদে বন্ধুজ্ঞানে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। প্রতাপ স্বীয় রাজধানীতে সমাজ স্থাপন জন্য, চন্দ্রদ্বীপ হইতে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ আনাইয়া ঐকান্তিক যত্নসহকারে স্থাপন করিলেন।† এই বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী করিবার জন্য রাজা প্রতাপ আদিত্য, কন্দর্প নারায়ণের পুত্র রামচন্দ্রের সহিত স্বীয় দুহিতার উদ্বাহের প্রস্তাব করেন। রাজা কন্দর্পনারায়ণ এই শুভ প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন, সম্বন্ধ যথাশাস্ত্র ধার্য্য হইয়া গেল; বরকন্যার অল্প বয়স হেতু তৎকালে বিবাহ স্থগিত রহিল মাত্র, কিন্তু উভয় রাজার মধ্যে কুটুম্ববৎ আচার ব্যবহার হইতে লাগিল।

এই ঘটনার অল্প পরেই কন্দর্পনারায়ণ স্বর্গারোহণ করিলেন। রামচন্দ্র তখন সপ্তম কি অষ্টম বর্ষীয় বালক। এই দুর্দ্দিনে রাজা প্রতাপ আদিত্য মধ্যে

---

* আমরা পাঠককে এই বীরপুরুষের জীবনী পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

† চন্দ্রদ্বীপ পুরাৎ তস্মিন্ কায়স্থান্ ব্রাহ্মণান্ তথা
বৈদ্যকানানয়ামাস সমাজেশ বভূব সঃ।—ঘটককারিকা (পরিশিষ্টভাগ)

মধ্যে ভাবী জামাতার তত্ত্ব গ্রহণ করিতেন। রাজা রামচন্দ্র পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার গর্ভধারিণী, মন্ত্রীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। রাজা রামচন্দ্র বয়সে বালক হইলেও তাঁহার বয়োচিত চপলতা ছিল না। তিনি স্থির ও গম্ভীরভাবে গুরুর নিকট বিদ্যাভ্যাস এবং অস্ত্রবিদ্যাবিশারদগণের নিকট যুদ্ধ শিক্ষা করিতে লাগিলেন। অত্যল্প দিনের মধ্যেই তিনি শাস্ত্র ও শস্ত্র বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইলেন।

এই সময়ে আর একজন পর্ত্তুগীজ ভ্রমণকারী চন্দ্রদ্বীপে উপনীত হইয়া বালক রাজা রামচন্দ্র কর্ত্তৃক যেরূপে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই ভ্রমণকারীর নাম মেলকয়র ফন্‌সিক (Melchior Fonseca), ইনি ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে চন্দ্রদ্বীপে আসিয়াছিলেন। রাজা রামচন্দ্র তখন অষ্টমবর্ষীয় বালক তিনি সভাসদগণসহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া ধীর ভাবে বিদেশী ধর্ম্মযাযককে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক উপযুক্ত অর্থ প্রদান করিলেন এবং রাজ্যমধ্যে ধর্ম্মমন্দির প্রস্তুত করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। প্রাচীন তত্ত্ব-সংগ্রহাধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালে প্রভৃতি কয়েক জন দস্যু তখন রামচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তাঁহারই সাহায্যে সন্দ্বীপ উদ্ধার করিয়া যে কৃতঘ্নতার কার্য্য করিয়াছিল তাহাও পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

ইহার কয়েক বৎসর পরে বিবাহার্থী রাজা রামচন্দ্র বহু সংখ্যক অনুচর লইয়া মহাসমারোহে যশোহরে আগমন করিলেন। যে বিবাহ-সম্বন্ধে উভয় রাজ্যের সৌহার্দ্দ চিরস্থায়ী হইবে ভাবিয়া উভয় রাজা স্থির করিয়াছিলেন, ঘটনাক্রমে তাহার ফল বিপরীত হইল।

শুভলগ্নে রাজা রামচন্দ্রের সহিত মহারাজ প্রতাপ আদিত্যের কন্যা বিমলার * বিবাহক্রিয়া সমাধা হইয়া গেল। স্ত্রী-আচার ও অন্যান্য মাঙ্গলিক ক্রিয়া সমাপনান্তে মহাসমারোহে বরকন্যা বাসর ঘরে নীত হইল। হঠাৎ রামচন্দ্র শুনিলেন যে রাজ্যলোলুপ প্রতাপ আদিত্য, চন্দ্রদ্বীপ স্বরাজ্যভুক্ত

* বাবু সত্য চরণ শাস্ত্রী, ইঁহার নাম বিন্দুমতী বলিয়াছেন, কিন্তু মাধবপাশার বর্ত্তমান রাজা শ্রীযুক্ত বীরসিংহ নারায়ণ রায় বলেন যে রাজা রামচন্দ্রের স্ত্রীর নাম বিমলা। প্রতাপ আদিত্য প্রদত্ত যৌতুক ভুমি তৎকন্যা বিমলার নামেই প্রদত্ত হইয়াছে।

করিবার জন্য তাঁহাকে গুপ্তহত্যা করিবেন। এই বজ্রপাত তুল্য ভীষণ সংবাদ শ্রবণমাত্র তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। যে প্রতাপ আদিত্যের অসীম স্নেহগুণে তিনি পিতার অকাল বিয়োগব্যথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন সেই হৃদয়বান পুরুষ, গৃহাগত আত্মীয়কে—স্বীয় জামাতাকে—এই ভাবে হত্যা করিবেন, এই চিন্তা রামচন্দ্রকে শত বৃশ্চিকবৎ দংশন করিতে লাগিল। প্রথমতঃ আদৌ তাঁহার বিশ্বাস হইল না। তাহার পর নব পরিণীতা স্ত্রীর নিকট শুনিলেন যে, তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা উদয়াদিত্য এই বিপদে মুক্তির উপায় ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরেই প্রতাপের জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়াদিত্য সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভাই ভগ্নী ক্ষণকাল পরামর্শ করিলেন, তারপর উদয়াদিত্য ভগিনীপতিকে মশাল-ধারীবেশে সজ্জিত করিয়া তৎসহ রাজা বসন্তরায়ের ভবনোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন ; ছদ্মবেশ হেতু প্রহরীগণ তাঁহাকে চিনিতে পারিল না।

রাজা রামচন্দ্র এই প্রকার মুক্তিলাভ করিয়া, কৌশলে স্বীয় অনুচর-গণকে বিপদ বার্ত্তা জ্ঞাত করাইলেন। রামমোহন 'মাল (মল্ল) নামক একজন অমিত বলশালী প্রভুভক্ত ভৃত্য, রাজা রামচন্দ্রের শরীর রক্ষক ছিল ; রাজা তাহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া বিদ্যুৎবেগে স্বীয় নৌকায় আসিলেন। অনতিবিলম্বে নৌকা খুলিয়া দেওয়া হইল ; কিন্তু কিয়দ্দূর গমন করিয়া সকলে সভয়ে দেখিলেন যে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ দ্বারা জলপথ একেবারেই রুদ্ধ করা হইয়াছে। রাজা এবং অনুচরবর্গ প্রমাদ গণিলেন। অমিত পরাক্রমশালী বীর রামমোহন, রাজার সেই সুবৃহৎ দ্বিষষ্টিতম দাঁড়ের নৌকা বৃক্ষাদির উপর দিয়া টানিয়া প্রশস্ত নদীতে আনয়ন করিল। এই প্রকার সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, রাজা রামচন্দ্র শত্রুপক্ষকে তাঁহার নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন বৃত্তান্ত অবগত করাইবার নিমিত্ত ; সজ্জিত কামান শ্রেণীতে অগ্নি সংযোগ করিতে আদেশ করিলেন। নিশীথিনীর গম্ভীর শান্তি ভগ্নকরতঃ কামান শ্রেণী দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া ভীমনাদে গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

অকস্মাৎ কামানের এই তুমুল শব্দ শ্রবণ করিয়া, মহারাজ প্রতাপ আদিত্য অনুচরগণকে কারণ সন্ধানের জন্য চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিলেন। অচিরাৎ তাহারা প্রত্যাগত হইয়া রাজ-জামাতার পলায়ন বৃত্তান্ত জ্ঞাপন

করিল। প্রতাপ আদিত্য, রামচন্দ্রকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বিস্তর অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু তিনি কোন কথাই শুনিলেন না; বরং শ্বশুরের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্ব্বিঘ্নে চন্দ্রদ্বীপে পৌঁছিলেন।

প্রতাপ আদিত্যের চরিত্রে এই প্রকার দুরপনেয় কলঙ্কের কথা লইয়া অনেকের মতদ্বৈধ আছে; কেহ কেহ বলেন যে, রাজা রামচন্দ্রের জনৈক বিদূষক নরসুন্দর জাতীয় রমাইভাঁড় স্ত্রীবেশে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক রাজমহিষীর সহিত বাক্য রহস্য করিয়াছিল; পরিশেষে এই কথা প্রতাপের কর্ণগোচর হইলে,তিনি জামাতা এবং তাঁহার অনুচরবর্গের প্রাণনাশ করিয়া এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে বাসনা করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন প্রতাপ জামাতাকে নিহত করিয়া তদীয় রাজ্য অধিকার করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে প্রতাপের ন্যায় চরিত্রে এই সকল কথা কতদূর সত্য জানি না। শত্রুপক্ষ হইতে প্রতাপের সম্মান খর্ব্ব করিবার জন্য হয়ত মিথ্যা রটনা মাত্র। তাঁহার এই লোকাতীত প্রতিভা, অসাধারণ বাহুবল, দিঙ্মণ্ডল বিঘোষিত শুভ্র যশোরাশি অবলোকন করিয়া ঈর্ষ্যাপরবশ শত্রুগণ, আত্মীয়বিচ্ছেদমানসে প্রতাপের নামে অনর্থক এই প্রবাদের সৃষ্টি করিয়া তাঁহার শুভ্র যশোরাশিতে কালিমা ঢালিতে চেষ্টা করিয়াছিল। বিশেষতঃ তাঁহার খুল্লতাত বসন্ত রায়ের পুত্রগণের সহিত প্রতাপের বিন্দুমাত্র সদ্ভাব ছিল না; তাঁহারাই এই জনপ্রবাদের মূল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। যশোহর রাজ্য যে প্রকার ক্ষমতাশালী, তৎকালে চন্দ্রদ্বীপও সেই উপমায় কোন অংশে ন্যূন ছিল না; এই উভয় রাজ্য কুটুম্বিতাসূত্রে একত্রীভূত হইলে প্রতাপের শত্রুপক্ষ হীনবল হইবে, এই বিবেচনায় তাঁহারা এই প্রকার মিথ্যা কথা রামচন্দ্রের কর্ণগোচর করাইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, রাজা রামচন্দ্র ইহার সবিশেষ তত্ত্ব অনুসন্ধান না করিয়াই, শত্রুপক্ষ প্রচারিত এই জঘন্য নারকীয় প্রবাদ সত্য বলিয়া ধারণা করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে এই বিশ্বাস এতদূর বদ্ধমূল হইয়াছিল যে তিনি শ্বশুরের নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করিতে পারিতেন না। তিনি শ্বশুরের সহিত যাবতীয় বন্ধন ছিন্ন করিলেন।

আমরা প্রতাপ আদিত্যের জীবনী যাহা পাঠ করিয়াছি, তাহাতে দেখা যায় যে, তাঁহার ন্যায় মহানুভব, তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী, ন্যায়পরায়ণ, নীতিজ্ঞ

দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত নরপতি তৎকালে বিরল ছিল। ঘটককারিকা গ্রন্থ তাঁহার রাজধানীকে পুণ্য ভূমি কাশীধামের সহিত তুলনা করেন ; যথা :—

"যশোহর পুরী কাশী, দীর্ঘিকা মণিকর্ণিকা।
তর্কপঞ্চাননো ব্যাসঃ বসন্তঃ কালভৈরবঃ ॥"

তাঁহার রাজত্ব এবং প্রতাপ সম্বন্ধে তদ্দেশে এখনও অনেকে বলেন :—

"স্বর্গে ইন্দ্রদেব রাজা, বাসুকী পাতালে,
প্রতাপ আদিত্য রায় অবনী মণ্ডলে।"

প্রকৃতপক্ষে প্রতাপের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন নৃপতি সুদুর্লভ। তাঁহার নামে এই প্রকার ঘোরতর নারকীয় কথা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।

রাজা রামচন্দ্র রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া পত্নীর কোন সংবাদই লইলেন না। দেখিতে দেখিতে কয়েক বৎসর অতীত হইল ; রাজ্ঞী বিমলা পতি সহবাসলাভেচ্ছায় গোপনে স্বামীর নিকটে দূত পাঠাইলেন ; কিন্তু রামচন্দ্র শ্বশুরের ব্যবহারে এতদূর কুপিত হইয়াছিলেন যে, তিনি সেই জন্য তাঁহার নিরপরাধিনী ভার্য্যাকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিলেন না।

রাজ্ঞী বিমলা পতির এই নিদারুণ সঙ্কল্প অবগত হইয়া নীরব শোকাগ্নির মুহুর্মুহু দাহনে দিবানিশি দগ্ধীভূতা হইতে লাগিলেন। দুষ্যন্ত-পরিত্যক্তা শকুন্তলার ন্যায় স্বীয় অদৃষ্ট লিপি জানিয়া তিনি এক অসমসাহসিক কার্য্যে ব্রতী হইলেন। কাশী যাত্রাচ্ছলে রাজনন্দিনী বিমলা, বহুসংখ্যক অনুচর ও তরণী সমভিব্যাহারে, পতিরাজ্যে উপস্থিত হইয়া মাধবপাশার নিকটবর্ত্তী স্থানে নৌকা রক্ষা করিলেন। তিনি স্বয়ং তাঁহার আগমন বৃত্তান্ত রাজসমীপে ব্যক্ত না করাইয়া রাজধানীর সন্নিকটে নৌকার মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। বোধ হয় তাঁহার এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে রাজা তাঁহার আগমনবার্ত্তা জানিতে পারিলে তাঁহাকে সমাদরে স্বগৃহে লইয়া যাইবেন। তিনি যে স্থানে বাস করিতে লাগিলেন, তাঁহার আগমন এবং বহু সংখ্যক জনসমাগম হেতু, সেস্থানে প্রতি সপ্তাহে দুইদিন করিয়া হাট বসিতে লাগিল। ইহাই প্রসিদ্ধ "বউ ঠাকুরাণীর হাট"। বর্ত্তমানে আর তদ্রূপ হাট মিলে না, কিন্তু এখনও ঐ স্থানটী "বউ ঠাকুরাণীর হাট" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এইরূপ কিছুকাল গত হইল, কিন্তু রামচন্দ্র কোন তত্ত্বই লইলেন না ;

রাজমহিষী সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া সারসী গ্রামের নিকট নৌকা রক্ষা করিলেন। তিনি কখন কখন তীরে বৃহৎ তাম্বু ফেলিয়া, তন্মধ্যে অবস্থান করিতেন। দীন দরিদ্র ভিক্ষুকগণকে আশাতিরিক্ত দান করিতেন। কিয়দ্দিন পরে, সেখানে এক প্রকাণ্ড জলাশয় খনন করাইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

তাঁহার এই কীর্ত্তিসমূহ অচিরাৎ রাজা রামচন্দ্রের কর্ণগোচর হইল। তিনি অনুসন্ধান দ্বারা সকল তত্ত্ব অবগত হইলেন, তথাপি স্বীয় ধর্ম্মপত্নীকে রাজধানীতে আনয়ন করিলেন না। রাজমাতা (রামচন্দ্রের জননী) পুত্রবধূর আগমন বৃত্তান্ত শুনিতে পাইয়া অবিলম্বে তাঁহাকে যত্ন পূর্ব্বক গৃহে আনয়ন করিবার জন্য পুত্রকে বলিলেন। রামচন্দ্র জননীর আদেশ পালনের কোন উদ্যোগ করিলেন না। ইহাতে রাজমাতা নিতান্ত ক্ষুব্ধা হইয়া, পুত্রবধূকে স্বভবনে আনিবার জন্য স্বয়ং তাঁহার নৌকায় গমন করিলেন। শ্বশ্রূকে সমাগতা দেখিয়া রাজমহিষী বিমলা দেবীর পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তিনি অবগুণ্ঠনে মুখচন্দ্র আবৃত করিয়া স্বর্ণমুদ্রা পরিপূর্ণ এক সুবর্ণ থালা তাঁহার চরণপ্রান্তে রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। রাজমাতা বহুমূল্য অলঙ্কারপরিপূর্ণ গজদন্ত নির্ম্মিত পেটিকা, বধূর হস্তে দিয়া আশীর্ব্বাদ করতঃ তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক মুখচুম্বন করিলেন। বধূর ভ্রমর-কৃষ্ণ-পক্ষ-পংক্তি অশ্রুনিষিক্ত দেখিয়া, তিনিও অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন; পরে মহাসমারোহে বধূকে লইয়া রাজধানী মাধবপাশায় প্রত্যাগতা হইলেন।

রাজা রামচন্দ্র প্রতাপের ব্যবহারে যার পর নাই বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি পত্নীর সহিত তিন দিনের মধ্যে সাক্ষাৎ করেন নাই; পরিশেষে জননীর অনুরোধে ও ভর্ৎসনায় এবং পত্নীর রোদনে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই সম্বন্ধেও দুই মত দেখা যায়; কেহ কেহ বলেন যে, রাজ্ঞী বিমলা শ্বশ্রূ কর্ত্তৃক ভর্ত্তৃভবনে নীতা হইয়াও স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন। সেখানে কয়েক দিন মাত্র অবস্থান করিয়া, সঙ্গীয় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থগণকে চন্দ্রদ্বীপে স্থাপন করিয়া, চিরজীবনের মত কাশী যাত্রা করিয়াছিলেন। * আবার কেহ কেহ বলেন যে, রামচন্দ্র অল্প কয়েক-

* ব্রাহ্মণ, রৈভদ্রদি এবং বাবৈথালী রাজ-পুরোহিতগণের আদি পুরুষ; বৈদ্য, গুঠিয়া মজুমদার-বংশের আদিপুরুষ এবং কায়স্থ, গৌরীবায় এবং কাশীপুরের রায়বংশের আদিপুরুষ।

দিন পরে পত্নীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শেষোক্ত ঘটনাই সম্ভব বলিয়া বোধ হয়; কেন না, কায়স্থকারিকা স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে প্রতাপ-দুহিতার গর্ভে রাজা রামচন্দ্রের মহাবলশালী দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বার্দ্ধক্যে রাজমহিষীর কাশীবাসিনী হওয়াও সম্ভবপর, কিন্তু রাজা রামচন্দ্র যে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন নাই, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। মিঃ বেভারিজ্, তৎকৃত গ্রন্থে রামচন্দ্রের পলায়নবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন যে,—

"Afterwords Pratapaditya relented and sent his daughter to Ramchandra and the place where she landed near Madhabpasa, is still called "*Badhumata-hat*" or the bride's market, as a market was established there in her honour.

রাজমহিষী বিমলা, পিতৃনিয়োগানুসারে স্বামীভবনে আসিয়াছিলেন, না, কাশী যাত্রাব্যপদেশে চন্দ্রদ্বীপে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারা যায় না।

রাজা রামচন্দ্রের পিতৃবৈরী ভুলুয়াধিপতি দুর্দ্দান্ত লক্ষ্মণমাণিক্য, রামচন্দ্রকে বালকজ্ঞানে সর্ব্বদা তুচ্ছ এবং অবজ্ঞা করিতেন। দূতমুখে রাজা রামচন্দ্রের এই কথা কর্ণগোচর হইলে, তিনি যুদ্ধার্থ সসৈন্যে ভুলুয়ায় গমন করেন; এবং ভীষণ সংগ্রামের পর লক্ষ্মণমাণিক্যকে পরাস্ত পূর্ব্বক বন্দী করিয়া মহাসমারোহে মাধবপাশায় আগমন করিলেন।

লক্ষ্মণমাণিক্যকে বন্দী করিয়া আগমন করার সম্বন্ধে "চন্দ্রদ্বীপ-রাজবংশ" প্রণেতা বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র বলেন যে, যখন লক্ষ্মণমাণিক্য শুনিলেন যে তাঁহার অবজ্ঞেয় বালক, যুদ্ধার্থে তাঁহার দ্বারদেশে উপস্থিত, তখন ক্রোধে তাঁহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল এবং রামচন্দ্রকে হত্যা করিবার জন্য, কর্ম্মচারিবর্গকে কিছু না জানাইয়া, একাই খড়্গ হস্তে ধাবমান হইলেন।

ক্রোধ ও জিঘাংসায় প্রণোদিত হইয়া লক্ষ্মণমাণিক্য যেমন নৌকায় উঠিবার জন্য লম্ফ প্রদান করিলেন, অমনি পদস্খলনবশতঃ নৌকার ডহরের মধ্যে পতিত হইলেন। রামচন্দ্রের আজ্ঞায় তৎক্ষণাৎ সৈন্যগণ লক্ষ্মণমাণিক্যকে উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া নৌকা খুলিয়া দিল। অতি অল্পদিন মধ্যেই রামচন্দ্রের নৌকা তদীয় রাজধানীতে উপস্থিত হইল।

পূর্ব্ববৈরতা প্রতিশোধার্ত্ত রামচন্দ্র লক্ষ্মণমাণিক্যকে এক লৌহ-পিঞ্জরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। প্রহরী আসিয়া উপযুক্ত সময়ে বন্দীকে স্নানাহার করাইয়া যাইত। একদিন রাজা রামচন্দ্র স্নানার্থ বহির্ব্বাটীতে বসিয়া তৈল মর্দ্দন করিতেছেন, এমন সময়ে লক্ষ্মণমাণিক্যও স্নানার্থ বাহিরে আনীত হইলেন। রাজা যে স্থানে বসিয়াছিলেন, তাহার নিকটেই একটী নারিকেল বৃক্ষ ছিল; হস্তপদবদ্ধ লক্ষ্মণমাণিক্য বৈরনির্য্যাতন-মানসে সেই নারিকেল বৃক্ষের উপর সমস্ত শরীর দ্বারা এরূপ চাপ দিলেন যে, ঐ বৃক্ষ তৎক্ষণাৎ ভগ্ন হইয়া সশব্দে রাজার অতি নিকটে পতিত হইল। ঈশ্বরেচ্ছায় রাজার প্রাণ রক্ষা হইল। রাজমাতা এবম্বিধ দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকে জীবিত রাখা নিতান্ত আশঙ্কাপ্রদ বিবেচনায়, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বধ করিবার জন্য পুত্রকে বলিলেন। অচিরে রামচন্দ্র লক্ষ্মণ-মাণিক্যের বধাজ্ঞা প্রদান করিলেন।

রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা কীর্ত্তিনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইনিই রাজা প্রতাপাদিত্যের দৌহিত্র। কীর্ত্তিনারায়ণ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পিতাপিতামহাদির পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। ইনি যে প্রকার বীর, তদ্রূপ নৌযুদ্ধবিশারদ ছিলেন; এবং মগ ও ফিরিঙ্গীগণকে, বহুযুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করতঃ মেঘনা নদী পর্য্যন্ত বিদূরিত করিয়া দিয়াছিলেন। মোগল-সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের প্রতিনিধি, ঢাকা নগরীর নবাব এই সমস্ত ফিরিঙ্গী ও মগ দ্বারা নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। তিনি, রাজা কীর্ত্তিনারায়ণ কর্ত্তৃক এইরূপ উপকৃত হইয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন; এবং তার পর কীর্ত্তিনারায়ণের সহায়তায় বহু শত্রু পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। *

---

* কীর্ত্তিনারায়ণো বীরো মহামানি তদঙ্গজঃ।
জগদেক শূরো সোঽপি নৌযুদ্ধে সুপ্রসিদ্ধকঃ ॥
মেঘ্নাদোপকূলে স ফেরঙ্গ সৈন্যকৈঃসহ।
অদ্ভুতং সমরং কৃত্বা তাঁস্তাঃ সর্ব্বান তাড়য়ৎ ॥
জাহাঙ্গীর পুরাধীশো নবাব যবনস্ততঃ
স্থাপয়ামাস মিত্রত্বং সার্দ্ধং তেন প্রবর্ত্তঃ।
কায়স্থ কুলকারিকা। (চন্দ্রদ্বীপ)

একদা রাজা কীর্ত্তিনারায়ণ, নবাবের সঙ্গে কোন যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছেন, এমন সময়ে কোন বিশেষ সামরিক পরামর্শ জন্য, নবাব তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। কীর্ত্তিনারায়ণ গৃহের দ্বারে আসিয়া দেখিলেন যে, নবাব আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সুতরাং তিনি বহির্দ্দেশেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে নবাব তাঁহাকে ভিতরে আসিবার অনুমতি করিলে, কীর্ত্তিনারায়ণ বস্ত্র দ্বারা নাসাপুট আচ্ছাদিত করিয়া নবাবের নিকট স্বতন্ত্র আসনে উপবিষ্ট হইলেন। নানা বাক্যালাপ এবং যুদ্ধ সম্বন্ধীয় গূঢ় মন্ত্রণার পর নবাব, কীর্ত্তিনারায়ণকে নাসাপুট আচ্ছাদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কীর্ত্তিনারায়ণ তদুত্তরে বলিলেন যে, হিন্দু শাস্ত্রে কথিত আছে, যাবনিক খাদ্য দ্রব্যের গন্ধ গ্রহণ করিলেও ধর্ম্মচ্যুতি হয়। নবাব আর কোন কথা বলিলেন না, কীর্ত্তিনারায়ণকে বিদায় দিলেন।

পরদিন অন্য কার্য্যোপলক্ষে নবাব আবার কীর্ত্তিনারায়ণকে ডাকিলেন। তখন নবাব বাহিরে উপবিষ্ট ছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিকটে মুসলমান-সূপকারগণ হিন্দুর অখাদ্য, নানা প্রকার অস্পৃশ্য মাংস জ্বলন্ত চুল্লির উপর রন্ধন করিতেছিল। কীর্ত্তিনারায়ণ আসন গ্রহণ করিলে পর, সূপকারগণ নবাবাদেশে পাত্রাবরণী সকল উন্মোচন করিল, পাক-দ্রব্যের গন্ধও অমনি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইল; কীর্ত্তিনারায়ণ ঘ্রাণ পাইয়া তৎক্ষণাৎ বস্ত্র দ্বারা নাসাপুট আবৃত করিলেন। নবাব ব্যঙ্গহাস্য করিয়া বলিলেন, "রাজন্! গতকল্য আপনারই মুখে শুনিয়াছি যে, যাবনিক খাদ্যের আঘ্রাণ গ্রহণ করিলেও হিন্দুদের ধর্ম্মচ্যুতি হয়। আপনি এই মাত্র আপনাদের অখাদ্য দ্রব্যের গন্ধ পাইলেন, এখন অবশ্যই হিন্দুশাস্ত্রানুসারে আপনার ধর্ম্মচ্যুতি ঘটিয়াছে। অতএব আপনি আর হিন্দু ন'ন, এখন আমাদের সহিত একত্রে আহার করিতে আর দ্বিধা করা উচিত নহে।"

রাজা কীর্ত্তিনারায়ণ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। উপস্থিত সকলেই নবাবের বাক্যে অনুমোদন করিলেন, কাজেই রাজা কীর্ত্তিনারায়ণ অনন্যোপায় হইয়া স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর বাসুদেবনারায়ণকে রাজ্যার্পণ করিয়া স্বয়ং তদবস্থায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তৎকালে হিন্দুসমাজের বন্ধন এরূপ সুদৃঢ় ছিল যে, যবনস্পৃষ্ট পানীয় স্পর্শ করিলেও স্নান করিয়া

শুচি হইতে হইত। মগ ও ফিরিঙ্গী নামে তৎকালে এরূপ ঘৃণা ছিল যে পথে কোন হিন্দুর সঙ্গে তাহাদের দেখা হইলে; হিন্দুর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। মিঃ বেভারিজ্ এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

কোন নদীর তীর দিয়া একদা জনৈক মগ যাইতেছিল, তখন কতিপয় গ্রাম্য স্ত্রীলোক নদীতে স্নান করিতেছিল। মগ আসিতেছে দেখিয়া কয়েক-জন স্ত্রীলোক পলায়ন করিল, একজন পালাইতে না পারিয়া নদীর মধ্যে ডুব দিয়া রহিল। মগ মনে করিল, হয় ত এই স্ত্রীলোকটী ডুবিয়া মরিল; সে তৎক্ষণাৎ ঝম্পপ্রদানপূর্ব্বক নদীতে পতিত হইয়া স্ত্রীলোকটীকে উঠাইল। এই কথা সমাজে প্রচারিত হইলে, জাতিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া সেই স্ত্রীলোক সমাজচ্যুত হইল। এইরূপে জাতিনষ্ট হইলে কেহ কেহ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে উঠিতেন, কেহ কেহ বা মগদের সঙ্গে মিলিয়া বিভিন্ন আখ্যায় অভিহিত হইতেন।

কীর্ত্তিনারায়ণ প্রতাপান্বিত রাজা ও প্রাচীন হিন্দুজনপদের সমাজপতি, তাই তিনি বাধ্য হইয়াই কনিষ্ঠের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিলেন।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গে যবন-সংস্পর্শদোষী অনেক হিন্দুপরিবার এখনও আছেন, তাঁহাদের "পীরালী" বলে। মুরদিয়ার মজুমদারবংশের পূর্ব্বপুরুষগণ সুব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু যবনদোষে তাঁহারা জাতিচ্যুত হইয়া-ছেন। অদ্যাপি তাঁহারা হিন্দুর ন্যায় আচার ব্যবহার করিতেছেন বটে কিন্তু হিন্দুসমাজ-পরিত্যক্ত। কলিকাতার ঠাকুরবংশও এই দোষে সমাজে অচল হইয়াছিলেন, এখন অনেকটা সমাজভুক্ত হইয়াছেন।

"পীরালী" ধর্ম্মের একটী ইতিহাস শুনিতে পাওয়া যায়। আকবরের অভ্যুত্থানের প্রায় একশতবৎসর পূর্ব্বে, পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে খাঞ্জা আলি নামক জনৈক ধার্ম্মিক মুসলমান, বর্ত্তমান বাগেরহাটের সন্নি-হিত কোন এক গ্রামে বাস করিতেন। * তাঁহার লোকাতীত চরিত্র, অসীম ধর্ম্মপ্রাণতা ও অপ্রতিহত ক্ষমতায়, তদ্দেশীয় জনৈক ব্রাহ্মণ জাতিত্যাগ

* "বাগেরহাটের চারিক্রোশ পশ্চিমে খাঞ্জা আলির বাসস্থান এখনও বর্ত্তমান আছে। তিনি একটী প্রকাণ্ড দীঘী খনন করিয়াছিলেন, তাহা "খাঞ্জাআলির দরগা" নামে পরিচিত। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক দীঘী ও বড় বড় প্রস্তরনির্ম্মিত অট্টালিকা এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। "খাঞ্জাআলির" দীঘীতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নক্রসমূহ সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই দীঘীতে সর্ব্বদা বহুলোক স্নান করিতেছে অথচ কুম্ভীরগণ কাহাকেও হিংসা করে না।

করিয়া তাঁহার নিকট মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। খাঞ্জা আলির তিরোধানের পর উক্ত ব্রাহ্মণযুবক "পীরালী" নাম ধারণ করতঃ হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্ম-মিশ্রিত এক নূতন ধর্ম্ম আবিষ্কার করিলেন। কেহ কেহ এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহার অস্তিত্ব দেখা যায় না।

মাধবপাশার বর্ত্তমান "বড় রাজা" মহাত্মা বীরসিংহনারায়ণ রায় বলেন যে, রাজা কীর্ত্তিনারায়ণ জাতিচ্যুত হইলে একেবারে মহম্মদীয় নাম ধারণ করতঃ পূর্ব্বস্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া যবনী বিবাহ করেন। ইহাতে যে কায়স্থ-সমাজে কিছু কিছু গোলযোগ উপস্থিত না হইয়াছিল তাহা নহে; তবে কীর্ত্তিনারায়ণ, আর কখনও চন্দ্রদ্বীপে প্রত্যাগমন করেন নাই। নবাবের অধীনে, কখনও বা ঢাকা, কখনও বা রাজমহলে বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া কতকাল কোথায় কি ভাবে যে বাস করিয়াছিলেন, তাহার সঠিক ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে প্রকাশ যে, তিনি দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন এবং চন্দ্রদ্বীপ অথবা অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের সহিত তাঁহার আর কোন সংশ্রব ছিল না।

রাজা বসুদেবনারায়ণের রাজত্বকালে কোন বিশেষ ঘটনা হইয়াছিল কিনা জানা যায় না। "ঘটককারিকা" ও "কায়স্থকারিকা" গ্রন্থে ইহার বিশেষ কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু এই সময় হইতেই যে রাজ্য সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ছিল না, তাহার কতক আভাষ পাওয়া যায়। বসুদেবনারায়ণ, স্বীয় পিতা ও ভ্রাতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া স্বয়ং কোন শত্রুদমনে বিজয়বাহিনীর অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন কিনা, তাহার কোন নিদর্শন নাই। কীর্ত্তিনারায়ণ কর্ত্তৃক মগ ও ফিরিঙ্গী দস্যু বিতাড়িত হওয়ায় রাজ্য নিরাপদ ছিল বটে, তথাপি উক্ত দস্যুগণ সুযোগ পাইলেই অতর্কিত আক্রমণে রাজ্যমধ্যে যথেষ্ট উৎপাত করিত।

রাজা বসুদেবনারায়ণ স্বয়ং যেরূপ বিদ্বান্ ছিলেন, তাঁহার বিদ্যাচর্চ্চায় আগ্রহও তদ্রূপ প্রবল ছিল। এরূপ প্রবাদ যে, তাঁহার যত্নে ও ব্যয়ে রাজপুরীতে এক বৃহৎ চতুষ্পাঠী স্থাপিত হইয়াছিল; তাহাতে ব্যাকরণ, কাব্য, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি যত্নের সহিত শিক্ষা দেওয়া হইত। অতি অল্প কাল মধ্যেই দিগদিগন্ত হইতে বহু সংখ্যক বিদ্যার্থী সে স্থানে আগমন করিতে লাগিলেন। নলচিড়া, উজীরপুর এবং কোটালিপাড়া নিবাসী ভট্টাচার্য্যগণ

অধ্যাপকের কার্য্য করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ, এখনও রাজপ্রদত্ত বৃত্তি ভোগ করিতেছেন।

রাজা বসুদেবনারায়ণের তিরোধানের পর তদীয় পুত্র প্রতাপনারায়ণ সিংহাসনারোহণ করিলেন। এই ভূপতি নিতান্ত ভীরুস্বভাব ছিলেন এবং রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সময়ে সময়ে অলসতা প্রদর্শন করিতেন। এই সুযোগে শত্রুগণ ধীরে ধীরে মস্তকোত্তলন করিতে লাগিল, এবং রাজকর্ম্মচারিগণও সুবিধা বুঝিয়া প্রজার রক্তশোষণ করিতে ক্রটি করিল না। মোগল সাম্রাজ্যের সহিত এতকাল যে বন্ধুত্ব ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে দাসত্বে পরিণত হইতে আরম্ভ করিল। দেশীয় মোগল শাসনকর্ত্তা, রাজাকে সামান্য ভূম্যধিকারীজ্ঞানে, তাঁহার সহিত সময়ে সময়ে অন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সমাজপতির এবম্বিধ ভীরুতায়, সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। পরস্পর কলহহেতু অনেক ব্রাহ্মণ ও কুলীন কায়স্থ সেলিমাবাদ, তেনিহাটী ও অন্যান্য স্থানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। প্রতাপনারায়ণ এই লোকদিগকে শাসন করিতে বিশেষ সমর্থ হইলেন না। কিন্তু রাজ্যশাসনে ততটা দক্ষতা না থাকিলেও, তিনি নিরতিশয় ধার্ম্মিক ও সরলস্বভাবসম্পন্ন দয়ালু ভূপতি ছিলেন ; কেহ গুরুতর অপরাধ করিলেও তাহাকে কঠিন দণ্ড প্রয়োগ করিতেন না। তাঁহার এই প্রকার দয়া, দুষ্ক্রিয়াকারিগণের আনন্দ স্বরূপ হইয়াছিল, কারণ অপরাধিগণ প্রায়ই বিনা দণ্ডে মুক্তিলাভ করিত।

রাজা প্রতাপনারায়ণের জীবলীলা সাঙ্গ হইলে তদীয় অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র প্রেমনারায়ণ অমাত্যগণ কর্ত্তৃক সিংহাসনে স্থাপিত হইলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার অদৃষ্টে অধিক দিন রাজ্যভোগ ঘটিল না ; দুরন্ত কালকীট মুকুল অবস্থায়ই তাঁহার জীবন-কুসুম ছিন্ন করিয়া দিল। রাজা প্রেমনারায়ণই বসুবংশীয় শেষ নৃপতি। রাজা পরমানন্দ হইতে রাজা প্রেমনারায়ণ পর্য্যন্ত আটজন নৃপতি রাজা দনুজমর্দ্দনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া রীতিমত রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনপূর্ব্বক অনন্ত কালসাগরে সামান্য বুদ্বুদের ন্যায় বিলীন হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের তেজঃ, বীর্য্য, উল্লাস, প্রভৃতি কিছুই নাই, আছে কেবল সামান্য স্মৃতি ; তাহাও হয় ত সময়স্রোতের ভীষণ ঘূর্ণীপাকে একদিন অনন্তে মিশিয়া যাইবে।

সিংহাসন শূন্য দেখিয়া রাজামত্যগণ প্রেমনারায়ণের ভাগিনেয়, মিত্র-বংশীয় গৌরীচরণের পুত্র উদয়নারায়ণকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। ঢাকার অন্তঃপাতী উলাইল গ্রামে এই মিত্রবংশীয়গণের বাসস্থান। ইঁহাদের বহু জ্ঞাতি ছিলেন, তাঁহাদের সন্তানসন্ততিগণের মধ্যে কেহ কেহ তথায় এখনও বাস করিতেছেন।

রাজা উদয়নারায়ণের রাজনারায়ণ নামে আর এক সহোদর ছিলেন। মাতামহের সিংহাসন লইয়া উভয় ভ্রাতার মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হইলে, রাজনারায়ণ "রাজমাতা" নামক এক বৃহৎ তালুক,এবং চন্দ্রদ্বীপান্তর্গত "মহাল তিম্যাজাত" ও "মহাল উজুহাত" নামে সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া রাজ্যাশা প্রত্যাহার করতঃ মাধবপাশার সন্নিকট প্রতাপপুর নামক স্থানে বাসস্থান স্থাপন করিলেন। এই সম্পত্তিগুলি অত্যন্ত মূল্যবান এবং লাভপ্রদ। রাজনারায়ণের অধস্তন তিন চারি পুরুষ এই বৃহৎ সম্পত্তি ভোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন আর সে সম্পত্তি নাই, সামান্য অংশ মাত্র বর্ত্তমান আছে। এই বংশে মোহননারায়ণ রায় মহদ্ব্যক্তি ছিলেন। মাধবপাশার রাজাদের ন্যায় ইঁহারাও, ইঁহাদের নামের সঙ্গে "নারায়ণ" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

রাজা উদয়নারায়ণ, চাখারনিবাসী. মেন্দি মজুমদার ও সরফ মজুমদার নামক দুই ব্যক্তি কর্ত্তৃক রাজ্যাধিকার হইতে বঞ্চিত হ'ন। এই মুসলমান-ভ্রাতৃদ্বয়, নবাবের সহিত তাঁহাদের সুন্দরী ভগ্নীর বিবাহ দিয়া তৎপরিবর্ত্তে এই রাজত্ব প্রাপ্ত হ'ন। নিরুপায় উদয়নারায়ণ, রাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির জন্য নবাবের নিকট দরবার করিতে গেলেন। যে চন্দ্রদ্বীপের রাজা এক দিন নবাবের সমকক্ষ ছিলেন, যাঁহার বাহুবলে মোগলসাম্রাজ্যের সুদৃঢ় স্তম্ভ পূর্ব্ব রাজ্যে প্রথিত হইয়াছিল ; আজ তাঁহারই বংশধর নবাবসমীপে দীন প্রজার ন্যায় উপস্থিত হইলেন. দীন প্রজার ন্যায় আবেদন করিলেন, কিন্তু ফলে কিছুই হইল না।

একদিন নবাব উদয়নারায়ণকে বলিলেন যে, তিনি যদি খড়্গ চর্ম্ম ধারণ করিয়া একাকী একটী ভীষণ শার্দ্দূল নিহত করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা যাইতে পারে। তৎকালীন নবাবদের প্রায়ই এই প্রকার খামখেয়ালীর কথা শ্রুতিগোচর হয়। রাজা উদয়নারায়ণ একজন শিক্ষিত শস্ত্রবিদ্ যোদ্ধা এবং অসাধারণ

ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন। তিনি মনে ভাবিলেন, যদি রাজ্যলাভই না হয়, তবে অপমান সহ্য করিয়া জীবনধারণাপেক্ষা শার্দ্দূলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করা সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ। তিনি বাহুবলের পরীক্ষা দিতে স্বীকৃত হইলেন।

এই কথা নগর মধ্যে ঘোষিত হইল; এই প্রাণ সংহারক অদ্ভুত ক্রীড়াদর্শনার্থ নরনারী, দলে দলে নবাববাড়ী সমাগত হইতে লাগিল। দুর্গসম্মুখস্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গনে ক্রীড়োপযোগী স্থান নির্ম্মিত হইল। রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী এবং সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদিগের বসিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন আসন নির্ম্মিত হইল, সকলের সম্মুখে নবাব, নবাবপত্নী ও পুর-মহিলাগণের জন্য স্বতন্ত্রাকারে একটী উচ্চ মঞ্চ প্রস্তুত হইল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে দ্বিতীয় সঙ্গীবিহীন উদয়নারায়ণ এক মাত্র অসিচর্ম্ম ধারণ করিয়া দ্বিতীয় সেরখাঁর ন্যায় রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কমনীয় অথচ বীরকান্তি দর্শন করিয়া অনেক দর্শক নীরবে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। রঙ্গভূমির কেন্দ্রস্থলে পিঞ্জরাবদ্ধ এক ভীষণ শার্দ্দূল, মধ্যে মধ্যে ভীম গর্জ্জন সহকারে চতুর্দ্দিক বিকম্পিত করিতেছিল। উদয়নারায়ণ ইষ্টদেব স্মরণ করিয়া রক্ষীকে পিঞ্জরাবরণ উন্মোচন করিতে বলিলেন। দ্বার উদ্ঘাটিত হইবামাত্র ব্যাঘ্র লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক বাহিরে আসিল। তখন সেই জনসমুদ্র একেবারে নিস্তব্ধ হইল।

ব্যাঘ্র উদয়নারায়ণের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবকে প্রতিযোগী জ্ঞান না করিয়া উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর অন্বেষণে রঙ্গভূমির চতুর্দ্দিকে ধীরে ধীরে পরিভ্রমণ করিতেছিল। উদয়নারায়ণ এক সিংহনাদ করিয়া ব্যাঘ্রের সম্মুখীন হইলেন। শার্দ্দূল তখন ভীষণ গর্জ্জন করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। হস্তস্থিত সুদৃঢ় চর্ম্মের বিচিত্র আন্দোলনে সেই আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া উদয়-নারায়ণ ব্যাঘ্রের কুক্ষী লক্ষ্য করিয়া ভীষণ আঘাত করিলেন। ব্যথায় ভীম আর্ত্তনাদ করিয়া শার্দ্দূলও লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক আততায়ীকে আক্রমণ করিল। বিদ্যুৎগতিতে উদয়নারায়ণ লম্ফ দিয়া সেই আক্রমণ ব্যর্থ পূর্ব্বক, ব্যাঘ্রের স্কন্ধদেশ লক্ষ্য করিয়া আর এক আঘাত করিলেন। দারুণ বেদনায় অস্থির হইয়া ব্যাঘ্র বিদ্যুৎবেগে উদয়নারায়ণের উপর পতিত হইল। হস্তস্থিত চর্ম্ম দ্বারা সম্পূর্ণরূপ আত্মরক্ষাপূর্ব্বক উদয়-

নারায়ণ প্রভূত বলের সহিত ব্যাঘ্রের মস্তকোপরি তরবারির আঘাত করিলেন। একাঘাতেই ব্যাঘ্রের মুণ্ড দ্বিধা বিভক্ত হইল।

তখন সেই নিস্তব্ধ জনমণ্ডলী জয়সূচক তুমুল কোলাহল উত্থিত করিল। অনেকে বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক বিজয়ী বীরকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। রাজা উদয়নারায়ণ, রক্তাক্তকলেবরে মঞ্চের তলদেশে আসিয়া নবাবের কাছে পুরস্কার প্রার্থনা করিলেন। মজুমদার-ভগিনী—নবাবের সেই নবপরিণীতা বেগম, এতক্ষণ শার্দ্দূলদংষ্ট্রায় উদয়নারায়ণের মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এখন তাঁহাকে অক্ষত শরীরে প্রত্যাগত ও পুরস্কার প্রার্থনা করিতে দেখিয়া, নিম্নস্থিত কতকগুলি পক্ক কদলীর বাক্‌লা উঠাইয়া তাঁহার দিকে নিক্ষেপ করিলেন। প্রত্যুৎপন্নমতি উদয়নারায়ণ সেই নিক্ষিপ্ত বাক্‌লা উঠাইয়া মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন যে, তিনি তাঁহার প্রাপ্য বাকলা রাজ্যই পুরস্কারস্বরূপ পুনরায় প্রাপ্ত হইলেন। নবাব পূর্ব্বেই উদয়নারায়ণের অসাধারণ বাহুবল এবং সাহস দেখিয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এখন তাঁহার উপস্থিত বুদ্ধিচাতুর্য্য দেখিয়া অতীব আহ্লাদিত হইলেন। তখনই স্বীয় শ্যালকদ্বয়ের কবল হইতে চন্দ্রদ্বীপের রাজ্যভার তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন, তৎসঙ্গে সুলতান প্রতাপ নামক পরগণারও ষষ্ঠাংশের অধিকার প্রদান করিলেন।

মিত্রবংশীয় যে কয়জন নরপতি চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রাজা উদয়নারায়ণ নানাগুণে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও সদ্বিবেচক ছিলেন, এবং সর্ব্বদা রাজ্যোন্নতিকল্পে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন। তাঁহার মাতামহের সময়ে রাজ্যমধ্যে যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি তৎসমুদয় দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; এবং কতকগুলি নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া অনেক উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে সর্ব্বদা এই আশা ছিল যে তিনি চন্দ্রদ্বীপকে পূর্ব্ববং বঙ্গদেশের শীর্ষস্থানে স্থাপন করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু বিধিলিপি অখণ্ডনীয়, উদয়নারায়ণ তাঁহার সংকল্প সাধন করিবার পূর্ব্বেই ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে রাজশ্রীও অন্তর্হিতা হইলেন।

রাজা উদয়নারায়ণের পর শিবনারায়ণ পিতৃসিংহাসনারোহণ করেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্র পিতার চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া উঠিল। তিনি

যেরূপ অলস, তদধিক উন্মনা এবং নিরতিশয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। রঘুবংশের শেষ রাজা অগ্নিবর্ণের ন্যায় তিনি সকল সময়েই স্ত্রীগণ-পরিবৃত হইয়া অন্তঃপুরে বাস করিতেন। কেবল বিবাহিতা পত্নীগণে তিনি পরিতৃপ্ত হইতেন না, কন্যাসমা পালনীয়া প্রজাপত্নীগণও তাঁহার পাপনয়নের পথবর্ত্তিনী হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে পাশববৃত্তির বশীভূত হইয়া তিনি গ্রাম্যমহিলাদিগের সর্ব্বনাশসাধনে ত্রুটি করিলেন না। এই প্রকার পাশবিক অত্যাচারে প্রজা ও অন্যান্য গ্রামবাসিগণ স্বীয় স্বীয় মানমর্য্যাদা রক্ষার্থ আবাসস্থান পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে ক্রমে গ্রাম জনশূন্য হইতে লাগিল। যে সমস্ত শত্রু ও দুষ্টাশয় অমাত্যবর্গ রাজা উদয়নারায়ণের শাসনে ভীত ও ত্রাসিত ছিল, তাহারা অবসর বুঝিয়া মস্তকোত্তলন পূর্ব্বক যথাসাধ্য স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইল।

রাজা শিবনারায়ণের প্রধানা মহিষী দুর্গাবতী স্বামার এবম্বিধ উচ্ছৃঙ্খলতায় অত্যন্ত মর্ম্মাহতা হইলেন। প্রতিদিনই তাঁহার কর্ণে রাজ-কর্ম্মচারিগণের বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ ও প্রপীড়িত প্রজাদের আর্ত্তনাদ পৌঁছিতে লাগিল। রাজ্যের হিতের জন্য তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি স্বয়ং কতিপয় বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীসহ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। ইহাতে অনেকটা অশান্তি নিবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু পূর্ব্ববৎ সুশৃঙ্খলা আর হইল না।

শিবনারায়ণের স্বর্গীয় পিতা, স্বীয় বাহুবল প্রদর্শন করিয়া নবাবের নিকট, তাঁহার জ্ঞাতিবর্গের অংশ হইতে সুলতান প্রতাপ পরগণার যে ষষ্ঠাংশ পাইয়াছিলেন, তাহার ও পরগণার সম্পূর্ণ অংশের স্বয়ং মালিক-দখলকার বলিয়া শিবনারায়ণ, রামগোপাল নামক এক ব্যক্তিকে উহা ইজারা দিলেন। ফলে উহা লইয়া উলাইলনিবাসী জ্ঞাতিবর্গের সহিত তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইল।

ইহার কয়েক বৎসর পরে লর্ড ক্লাইব, সম্রাট্ সাহ আলমের নিকট হইতে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হইলেন। তারপর ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নামে রাজত্ব চলিতে থাকে। উক্ত সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য উলাইলের মিত্রগণ জাহাঙ্গীরনগরে (ঢাকায়) এক মোকর্দ্দমা উপস্থিত করেন। ইহাতে রাজা রাজবল্লভের পুত্র গঙ্গাদাস দুই পক্ষ

কর্ত্তৃক মধ্যস্থ নির্ব্বাচিত হইলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিকট সমস্ত রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িল। . রামগোপাল তখন বাধ্য হইয়া ইজারা ইস্তাফা দিলেন, তারপর গোলমাল মিটিয়া গেল। এই মোকর্দ্দমায় মিঃ এন্, গ্লোভার (N. glover) এবং হরিরাম মল্লিক জজ ছিলেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ২রা ডিসেম্বর ইহা নিষ্পত্তি হয়।

অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবাজনিত উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিতে শিবনারায়ণের মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ায় তিনি উন্মাদ হইলেন। সর্ব্বদা প্রহরী পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহাকে বন্দী অবস্থায় কালাতিপাত করিতে হইত। কোন প্রকারে ছুটী পাইলে তিনি সকলের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিতেন।

এক দিন নিশীথসময়ে তিনি কারাগৃহ হইতে বাহির হইয়া সুপ্তরাজ-বাটীর প্রায় সকল গৃহেই অগ্নিপ্রদান করিলেন। অনুকূল বায়ুর সাহায্যে অগ্নিদেব শীঘ্রই প্রচণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিলেন, রাজবাড়ীর বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা-সমূহ ভস্মে পরিণত হইল। অনেক বহুমূল্য জিনিস, পুরাতন দলিল পত্র * এই সঙ্গে ভস্মীভূত হইয়া গেল। কেবলমাত্র কাত্যায়নী ও মদনগোপালের মন্দির এবং নহবৎখানা রক্ষা পাইয়াছিল। রাজপরিবারগণ ও অন্যান্য ভৃত্যবর্গ কোন প্রকারে প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রাজা শিবনারায়ণের মৃত্যুর পর, তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলেন। অতি অল্প দিন মধ্যেই তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তি হইলে, তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা জয়নারায়ণ রাজা হইলেন।

জয়নারায়ণ নিতান্ত বালক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার মাতা রাণী দুর্গাবতী রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। হোসেনপুরনিবাসী বক্সীবংশের আদি-পুরুষ শঙ্কর বক্সী, রাজ্যের একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি অন্যান্য কতিপয় কর্ম্মচারীকে সহায় করিয়া, ক্রমে ক্রমে সর্ব্বময়কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। তিনি যাহা করিতেন, তাহাই হইত। নিরীহ প্রজাপুঞ্জের প্রতি অত্যাচার করিয়া এই সমস্ত দুর্ব্বৃত্তগণের বহুতর অর্থসঞ্চয় হইতে লাগিল। রাজা অপ্রাপ্তবয়স্ক, রাণী দুর্গাবতী স্ত্রীলোক; সুতরাং তাঁহারা ইহার কোন প্রতীকার করিতে সমর্থ হইলেন না।

* মোগল সম্রাটদের নিকট চন্দ্রদ্বীপের রাজগণ, পাঞ্জাঙ্কিত অনেকগুলি সনন্দ বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সমস্ত দলিল এবং তৎসহ সি হাসন পর্য্যন্ত ভস্মীভূত হইয়াছিল।

এইভাবে প্রায় সাত বৎসর পর্য্যন্ত বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারিগণ অবাধে লুণ্ঠন করিতে লাগিল। পরিশেষে রাণী দুর্গাবতী, বিখ্যাত দেওয়ান গঙ্গা-গোবিন্দ সিংহের * সাহায্যে দুর্ব্বৃত্তগণকে দূর করিয়া রাজত্ব স্ববশে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রাণী দুর্গাবতী অনেকগুলি লোকহিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং অনেকগুলি দেবালয় ও দীঘী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সমস্ত কীর্ত্তির মধ্যে একটী প্রকাণ্ড দীঘিকা এখনও বর্ত্তমান আছে; উহা "দুর্গা সাগর" নামে বিখ্যাত। বর্ত্তমানে এই দীর্ঘিকার চতুষ্পার্শ্ব এবং কিনারা নানাবিধ শৈবাল, নল প্রভৃতি দ্বারা পরিপূর্ণ। ইহার তীরে দাঁড়াইলে চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের প্রাচীন ইতিহাস স্মৃতিপথারূঢ় হয়। এই বিস্ময়কর দৃশ্য অদ্যাপি ইঁহাদের অসীম কীর্ত্তি ও লোকাতীত ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। একদিন সমস্তই ছিল; প্রতিভা, তেজ, বাহুবল, দীধিতি প্রভৃতি সমস্তই এখন কাল-সাগরের ঘূর্ণীপাকে অন্তর্হিত হইয়াছে, কেবল সামান্য স্মৃতিটুকু এখন পর্য্যন্তও যায় নাই; তাহাও যে অধিক দিন স্থায়ী থাকিবে তাহারই বা বিশ্বাস কি?

রাজা জয়নারায়ণের রাজত্ব সময়ে সুপ্রসিদ্ধ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইল। এই সময়ে চন্দ্রদ্বীপ হইতে কোটালিপাড়া, সুলতানাবাদ, বোজরোগউমেদপুর, ইদিলপুর, রতনদিকালিকাপুর, বাঙ্গড়োরা প্রভৃতি পরগণা পৃথক করা হইল। ইহাতে রাজ্যের আয় প্রায় অর্দ্ধাপেক্ষাও কমিয়া গেল; তবুও যাহা রহিল, তাহাও প্রকাণ্ড জমীদারী। ইহাই রাজা জয়নারায়ণের সঙ্গে বন্দোবস্ত হইল।

এই সময় হইতেই রাজ্যের অবস্থা শোচনীয় হইল। শিবনারায়ণের সময় হইতেই ইহার সূত্রপাত; তৎপর শঙ্কর প্রভৃতি কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক রাজ-কোষ প্রায় অর্থশূন্য হইয়াছিল। রাণী দুর্গাবতী রাজ্যের এই প্রকার অর্থাভাব দেখিয়াও প্রায় তিন চারি লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া, দীর্ঘিকাখনন, দেবালয়-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি করিয়াছিলেন। ইহাতে যেমন প্রচুর অর্থখরচ, তদ্রূপ

---

* কলিকাতার সন্নিহিত পাইকপাড়ার রাজগণ, এই গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বংশধর। ইহার ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা করিলে, আমরা স্বনামখ্যাত ৺চণ্ডীচরণ সেন প্রণীত "দেওয়ান গঙ্গা-গোবিন্দ সিংহ" পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে কতকগুলি পরগণা বাহির হইয়া যাওয়ায়, রাজ্যের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। এই সময় হইতেই চন্দ্রদ্বীপের সৌভাগ্য-সূর্য্য রাহু-কর-কবলিত হইল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কয়েক বৎসর পরেই ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক নিলামের আইন জারী হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে দেয় রাজকর প্রদান না করিলে সম্পত্তি নিলাম-বিক্রয় দ্বারা টাকা আদায় করা হইত। দেশীয় ভূম্যধিকারিগণ সে সময়ে খাজানার টাকা ধার্য্য দিনে আদায় করিতে ততটা অভ্যস্ত ছিলেন না বলিয়া অনেকে ইহাতে হৃতসর্ব্বস্ব হইলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিধিবদ্ধ হইলে অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত "ফিরিঙ্গীকে খাজানা দিতে হইবে" এরূপ কার্য্য নিতান্ত পাপের এবং গর্হিত বিবেচনায় উপযুক্ত সময়ে উপস্থিত হইতেন না। ফলে তাঁহাদের বংশধরগণ, বর্ত্তমান সময়ে চাকুরি অথবা উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা বহুক্লেশে পরিবার প্রতিপালন করিতেছেন।

রাজা জয়নারায়ণ একে বালক, তদুপরি স্বার্থপূর্ণ আত্মীয়কুটুম্বগণে পরিবৃত! এই সমস্তলোক, নির্দ্দিষ্ট তারিখে কলেক্টরীতে * টাকা না দিয়া আত্মসাৎ করিতে লাগিল। প্রথমতঃ ১২০০ সালে চন্দ্রদ্বীপ-জমীদারীর ষোল আনির /১৭।/ ক্রান্তি নিলামে বিক্রয় হইয়া যায়। তৎপরে ক্রমাগত ঐ কারণে ১২০২ এবং ১২০৪ সালে ৵১২॥ ও ৵১৭॥ অংশ নিলাম-বিক্রয় হইয়া গেল। রাজাকে তাঁহার দুষ্ট কর্ম্মচারী ও কুটুম্বগণ বুঝাইলেন যে, টাকা দিয়া শীঘ্রই আবার তাঁহারা জমীদারী আনিতে পারিবেন। তাঁহারা যেরূপ বুঝাইলেন রাজা তাহাই বিশ্বাস করিলেন। ফলে, অবশিষ্ট ॥১২॥// অংশও নিলাম-বিক্রয় হইয়া গেল।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ চন্দ্রদ্বীপের জমীদারী নিলামে ক্রয় করিয়াছেন।

রামমাণিক্য মুদী (মাণিকমুদী)		॥১২॥//
পানিয়াটী সাহেব	...	।/১০
দাল সিংহ	...	/১৭।/
সমষ্টি		১৲ ষোল আনা

* তখন ঢাকায় কলেক্টরী ছিল। খাজনা প্রভৃতি তথায় দাখিল করিতে হইত।

রামমাণিক্য মুদী, রাজার "খানাবাড়ী"র প্রজা; এবং রাজসরকারের একান্ত অনুগত দোকানদার ছিল। প্রবাদ যে, মুদীগণ এই সম্পত্তি রাজার আজ্ঞানুসারে তাঁহারই টাকা দ্বারা বেনামিতে ক্রয় করে। স্বনামে খরিদ হইলে এই অংশও বাকী করের দায়ে নিলাম হইয়া যাইবে, এই ভয়ে রাজমাতা, মুদীকে বিশ্বাস করিয়া এই জমীদারী ক্রয় করিবার জন্য টাকা প্রদান করেন। এই প্রবাদটার সত্যাসত্য সম্বন্ধে পাঠক বিবেচনা করিবেন।

দুর্নাম দূর করিবার জন্যই হউক, অথবা স্বেচ্ছায়ই হউক, মুদীগণ, তাহাদের ক্রীত অংশ হইতে, মাত্র এক আনা অংশ রাখিয়া বাকী অংশ সমস্তই রাজাকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু দুষ্টাশয় ভৃত্যবর্গ এবং কুটুম্বগণ রাজাকে বুঝাইলেন যে, খানাবাড়ীর মুদীর সঙ্গে একত্রে জমীদারী ভোগ করা নিতান্ত অপমানের বিষয়; সুতরাং অপরিণামদর্শী রাজা এই প্রস্তাব ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিলেন। লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইলে, অলক্ষ্মীর দৃষ্টিতে দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হয়। রাজা উক্ত অংশ রাখিলে, তাঁহার বংশধরগণ আজ এই দুরবস্থায় পতিত হইতেন না।

এই নিলাম রহিত করিবার জন্য রাজা জয়নারায়ণ মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিলে, তিনি জয়লাভ করিলেন। মুদীগণ সদর দেওয়ানী-আদালতে আপীল করিল। তাহাতে রাজা পরাস্ত হইলেন। পুনরায় রাজার পক্ষ হইতে প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করা হইল।

বিলাত-আপীলের ফলাফল শীঘ্র জানিবার উপায় নাই; বর্ত্তমানকালেও শীঘ্র ফলাফল বাহির হইলে অন্যূন তিন চারি বৎসরের মধ্যে কিছুই জানা যায় না। তৎকালে ইহা অপেক্ষাও দীর্ঘ সময় লাগিত। এদিকে রাজার এবং রাজপরিবারবর্গের অবস্থা ক্রমশঃই শোচনীয় হইতে লাগিল, সম্পত্তি হইতে টাকা আদায় এক প্রকার বন্ধ হইল। রাজকোষ প্রায় অর্থশূন্য; যাহা ছিল, মোকর্দ্দমাদিতে তাহাও প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল।

বিপদ কখনও একাকী আসে না; এই সময়ে রাজা জয়নারায়ণ পরলোক গমন করিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র রাজা নৃসিংহনারায়ণ তখন বালক; তদীয় মাতা, রাণী করুণাময়ী বালককে বুকে লইয়া কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইলেন। তিনিই নাবালগের পক্ষ হইতে প্রিভিকাউন্সিলে মোকর্দ্দমা চালাইতে আরম্ভ করিলেন। মুদীগণ জমীদারীর অধীন কয়েকখানা

নিষ্কর তালুক ও লাখেরাজ সম্পত্তি ছাড়িয়া নিষ্পত্তির প্রস্তাব করিয়াছিল। কিন্তু রাজপরিবারের তখন এতদূর ক্লেশ যে, সময়ে সময়ে গ্রাসাচ্ছাদনেরও অভাব হইত ; সুতরাং রাণী করুণাময়ী, মুদীগণের প্রস্তাবানুসারে নিষ্পত্তি করিলেন।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই প্রিভিকাউন্সিলের হুকুম প্রচারিত হইল। ইহাতে রাজা নৃসিংহনারায়ণই সম্পূর্ণ জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং মুদীগণের নিকট খরচ ও ওয়াশিলাতেরও ডিক্রি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না ; চন্দ্রদ্বীপের বিস্তীর্ণ জমীদারী, রাজাদের হস্ত হইতে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

রামমাণিক্য মুদীর বংশধরগণ অদ্যাপি রাজার খানাবাড়ীতে বাস করিতেছেন, তাঁহারা বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ ধনাঢ্য হইলেও রাজাদের বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বাড়ীতে কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে, রাজাকে রীতিমত নজর দিয়া অনুমতি গ্রহণান্তে কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

রাজা নৃসিংহনারায়ণ তৎকালে একজন প্রসিদ্ধ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুরুষ ছিলেন ; তাঁহার অলৌকিক রূপরাশিদর্শনমানসে বহুদূর হইতে নরনারী আগমন করিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার সৌভাগ্য তদনুরূপ ছিল না, দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পীড়ন এবং নৈরাশ্যের ভীষণ হুহুঙ্কার তাঁহাকে অহর্নিশি যন্ত্রণা প্রদান করিত।

বিজয়া দশমীর পরদিন, রাজা নৃসিংহনারায়ণ, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় বহুজনসমভিব্যাহারে নৌযাত্রা করিতেন। প্রজাবর্গ ও অন্যান্য সকলে যথাযোগ্য উপঢৌকন দিয়া তাঁহার দর্শনলাভ করিত। কেননা অনেকের বিশ্বাস যে, বিজয়ার পরদিন রাজদর্শন শুভকর।

রাজা নৃসিংহনারায়ণ ধীর, গম্ভীর এবং শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। তিনি সরল এবং অমায়িক ব্যবহার দ্বারা সকলের মনস্তুষ্টি করিতেন। কেহ তাঁহার নিকট কোন ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে অবস্থানুরূপ দানে পরাঙ্মুখ হইতেন না।

রাজা নৃসিংহনারায়ণের দুই বিবাহ, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন রাণীই সন্তানবতী ছিলেন না বলিয়া বংশরক্ষার জন্য প্রথমতঃ একজন দত্তকপুত্র গ্রহণ করা হয় ; তাঁহার নাম নরেন্দ্রনারায়ণ, কিন্তু তিনি শীঘ্রই কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তৎপর জ্যেষ্ঠা মহিষী রাজেশ্বরী এবং কনিষ্ঠা মহিষী

অন্নপূর্ণার জন্য এক সময়েই দুইজন দত্তক গ্রহণ করা হয়। তাঁহারা "বড় রাজা" এবং "ছোট রাজা" নামে বিখ্যাত।

রাজা বীরসিংহনারায়ণ, জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞীর পুত্র; তাই ইনি "বড় রাজা" বলিয়া অভিহিত। ইঁহার দেবোপম আকৃতি, সর্ব্বজনপ্রিয় উদারতা, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র প্রভৃতি সদ্‌গুণ ইঁহার বংশের উপযুক্তই বটে। নানাবিধ মনোক্লেশে, তদুপরি পত্নীবিয়োগজনিত দুঃখে, ইনি সর্ব্বদাই ম্রিয়মান। ইনি সন্ধ্যাহ্নিক এবং ধর্ম্মগ্রন্থ-পাঠ করিয়া সময়াতিবাহিত করিয়া থাকেন।

কনিষ্ঠা রাজ্ঞীর পুত্র রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ একজন বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। পুরুষোচিত ব্যায়াম, অশ্বারোহণ, বন্দুক-চালনা প্রভৃতি তাঁহার নিত্যকার্য্য ছিল। কথিত আছে যে, তিনি রিক্তহস্তে একদা একটী চিতাবাঘকে ধৃত করিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, দৃপ্ত যৌবনের মধ্যভাগেই তাঁহার মানবলীলা শেষ হয়।

এই উভয় রাজপরিবারের অবস্থা ক্রমশঃই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরস্পর গৃহবিবাদ এবং অন্যান্য কারণে জমীদারীর অধীন যে কয়েকখানি তালুক ছিল, তাহাও ক্রমে নিলাম-বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। এখন একমাত্র নিষ্কর খানাবাড়ী এবং লাখেরাজ সম্পত্তিই এই রাজবংশের গ্রাসাচ্ছদনের সম্বল। ভূতপূর্ব্ব লেফ্‌টেনেণ্ট্‌ গবর্ণর সার চার্লস্‌ ইলিয়ট, রাজা বীরসিংহ-নারায়ণের পুত্র রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণকে সব্‌রেজেষ্ট্রারপদে নিযুক্ত করিয়া দুঃস্থ রাজপরিবারের যে মহদুপকার করিয়াছেন, তাহা চিরস্মরণীয় থাকিবে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে একমাত্র বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ লইয়াই বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ জিলা গঠিত হইয়াছে। যতগুলি পরগণা আছে, তন্মধ্যে সেলিমাবাদ ও তেনিহাটী ব্যতীত সকলগুলিই কোন সময়ে এই চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্ভূত ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং অন্যান্য কারণে অনেকগুলি পৃথক করা হইয়াছে। কোটালিপাড়া এবং মলফৎগঞ্জ এখন আর এই জিলায় নাই, বহু বৎসর হইল ফরিদপুর জিলাভুক্ত হইয়াছে। যেগুলি এখনও বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে অনেকটা, ব্রিটিশসাম্রাজ্য পত্তন হইবার পরে সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের প্রাচীন তত্ত্ব বিশেষ কিছুই নাই।

এই চন্দ্রদ্বীপে তিয়াত্তর খানি পৃথক তালুক আছে, ইহাদের রাজস্ব ৫৮,১০৪৸৶৮॥ পাই। এই পরগণাস্থিত যে সমস্ত ভূম্যধিকারী আছেন,

তন্মধ্যে ভারুকাঠীর মজুমদারবংশ, রহমৎপুরের চক্রবর্ত্তীবংশ এবং লাখুটিয়ার রায়বংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারুকাঠীর মজুমদারগণ মৌদ্‌গল্যগোত্রীয় বৈদ্য। এই বংশের রামজীবন দাশ গুপ্ত প্রথমে বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিয়া ভারুকাঠীতে আগমন করেন। ভারুকাঠী, বরিশাল সদরের অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। অধিবাসীর সংখ্যা সহস্রপ্রায়। মৌদ্‌গল্য ও ভরদ্বাজগোত্রীয় দাশগণ এবং অম্বষ্ঠ শ্রেণীর দত্তগণ এই গ্রামের প্রধান অধিবাসী।

রামজীবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামগোপাল, চন্দ্রদ্বীপ রাজসরকারে দেওয়ানপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং রাজ্য সম্বন্ধীয় সকল বন্দোবস্ত করিতেন, এবং তাঁহার হস্তেই রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত ছিল। তিনিই রাজসরকার হইতে 'মজুমদার' উপাধি প্রাপ্ত হ'ন। অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ মজুমদার উপাধিতে অলঙ্কৃত হইয়া তদর্জ্জিত বিপুল 'জনার্দ্দন দাশ' নামক তালুক ভোগ করিতেছেন। মহাত্মা রামগোপাল ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও পরহিতে রত ছিলেন। তিনি জ্ঞাতি, পুরোহিত, গুরু এবং অধীনস্থ ভৃত্যগণকে যে সকল ব্রহ্মোত্তর এবং জায়গীর প্রদান করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাঁহারা তাহা ভোগ করিতেছেন। তিনি ভারুকাঠীর চতুর্দ্দিকে যে সকল সুবৃহৎ রাস্তানির্ম্মাণ ও দীর্ঘিকাখনন করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহারা তাঁহার যশোগান করিতেছে। "গোয়াচোৎরা" নামক বিশাল দীর্ঘিকা তাঁহারই কর্ম্মজীবনের আংশিক পরিজ্ঞাপক। কথিত আছে, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জনার্দ্দন দাশ সাবালগত্ব প্রাপ্ত হইলে মহাত্মা রামগোপাল, পুত্রহস্তে বিপুল বিষয়ভার সমর্পণ করিয়া পুণ্যভূমি কাশীধামে অবস্থিতি করেন, এবং আকণ্ঠ জহ্নুবীজলে নিমজ্জিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গঙ্গাস্তোত্র পাঠ করিতে করিতে এ পৃথিবী হইতে তিরোধান করিলেন।

অধুনা ভারুকাঠী সংস্কৃতচর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ। গ্রামের মধ্যে অনেকেই বিশেষরূপে সংস্কৃতভাষায় অভিজ্ঞ; কবিরাজ সারদাকান্ত দাশ গুপ্ত মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে একটী আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর হইতে ইংরাজীশিক্ষিত গ্রাজুয়েটগণের সংখ্যাও দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। গ্রামে পাশ্চাত্যজ্ঞান বিতরণের জন্য একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। শিক্ষিত যুবকগণ ক্রমশঃ রাজসরকারে অধিষ্ঠিত

হইয়া গ্রামের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন। তাঁহাদের অকৃত্রিম সুখসৌহৃদ্যে গ্রামে সুখশান্তি বিরাজিত। গ্রাম্য যুবকগণের যত্ন ও পরিশ্রমে নিদাঘশ্রান্ত পথিকগণের পথশ্রান্তি ও তৃষ্ণার্ত্তের তৃষ্ণা নিবারণ করিবার জন্য গ্রামের প্রান্তভাগে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের রাস্তার উপর একটী জলছত্র ও বিশ্রামাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চৈত্র মাসের শেষভাগে যখন মার্ত্তণ্ডদেব অগ্নিমূর্ত্তিতে অনলরাশি বর্ষণ করেন, সেই নিদাঘ-মধ্যাহ্নে পথিকগণ, 'বরিশাল-বানরিপাড়া রোডে' গমন সময়ে মাধবপাশার পর প্রায় দেড় ক্রোশ পর্য্যন্ত স্থানে পানীয় জলাভাবে সাতিশয় তৃষ্ণাতুর হইয়া যে ভীষণ পথক্লান্তি অনুভব করেন; তাহা অপনয়ন করিবার জন্যই জলছত্র খোলা হইয়াছে। গ্রামে কয়েকটী প্রাচীন দেবালয় ও বিগ্রহ বর্ত্তমান আছে; তন্মধ্যে 'বিষহরিবাড়ী' এবং 'হরিখোলাই' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রহমৎপুরের চক্রবর্ত্তীবংশ চন্দ্রদ্বীপ পরগণার মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ বংশ বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ নারায়ণ চক্রবর্ত্তী এই বংশের প্রকৃত স্থাপয়িতা। নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর আদি বাসস্থান চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত কাঁচরাপাড়া চন্দ্রদ্বীপের দেওয়ান, সেরাই আচার্য্য তাঁহার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। একদা ভীষণ রোগাক্রান্ত হইয়া আচার্য্য মহাশয় জীবনে হতাশ হ'ন এবং মৃত্যুকালে গুরুর পাদপদ্মদর্শনমানসে নারায়ণ চক্রবর্ত্তীকে স্বীয় ভবনে আনয়ন করেন। সেই সময়ে নারায়ণ চক্রবর্ত্তী কথাপ্রসঙ্গে আচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে চন্দ্রদ্বীপ রাজ-সরকারের অনেক ঘটনা অবগত হ'ন।

সেরাই আচার্য্য দীর্ঘকাল রুগ্নাবস্থায় থাকাতে রাজ্যের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে। এমন কি, দেয় রাজস্ব অনাদায় হেতু নবাব-সরকার হইতে কৈফিয়তনামা চন্দ্রদ্বীপে প্রেরিত হয়। রোগক্লিষ্ট চলচ্ছক্তিরহিত দেওয়ান বিপদে পড়িলেন। তাঁহার এবম্বিধ অবস্থা দেখিয়া গুরু নারায়ণ চক্রবর্ত্তী তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ নবাব-সরকারে উপস্থিত হইতে স্বীকৃত হইলেন। তার পর অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া তথায় গমন পূর্ব্বক চন্দ্রদ্বীপের রাজস্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রাজধানী হইতে নারায়ণের প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই আচার্য্য মহাশয় প্রাণত্যাগ করিলেন। নারায়ণের ঈদৃশ নিঃস্বার্থ পরোপকার এবং তীক্ষ্ণ-

বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া চন্দ্রদ্বীপের রাজা অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং তাঁহাকে সর্ব্বাংশে উপযুক্ত মনে করিয়া দেওয়ানপদে বরণ করিলেন। দেওয়ানী লাভ করিয়া নারায়ণ চক্রবর্ত্তী সপরিবারে কাঁচরাপাড়া হইতে মাধবপাশার সন্নিকটে রহমৎপুর গ্রামে স্বীয় বাসস্থান স্থাপন করেন। রহমৎপুর, বরিশাল হইতে আট মাইল দূরে অবস্থিত। গ্রামটির প্রাকৃতিক দৃশ্য সুন্দর, অনতিপ্রশস্ত তিনটী খাল তিন দিক হইতে আসিয়া রহমৎপুরে সম্মিলিত হইয়াছে এবং গ্রামটিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। বর্ত্তমানে ঐ তিন ভাগকে যথাক্রমে "উত্তরপাড়া" "পূর্ব্বপাড়া" এবং "দক্ষিণপাড়া" বলা হইয়া থাকে। প্রাচীনকালে উত্তরপাড়া "হুজুরী" এবং পশ্চিমপাড়া "গোশাসন" নামে প্রসিদ্ধ ছিল। হুজুরী প্রথমে জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। রহমৎ আলি এবং পুর আলি নামক দুই সহোদর এই স্থানের প্রথম অধিবাসী। তাহারা প্রবল পরাক্রান্ত ছিল এবং দস্যুবৃত্তিই তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহের প্রধান উপায় ছিল। চতুর্দ্দিক লুণ্ঠন করিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যসমূহ তাহারা এই অরণ্য মধ্যে রক্ষা করিত। রাজা কন্দর্পনারায়ণের রাজত্বকালে এই দস্যুদ্বয় ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের যুক্তনাম (রহমৎ + পুর) হইতেই এই গ্রামের নামোৎপত্তি হইয়াছে।

ত্রিশ বৎসর দেওয়ানী করিয়া নারায়ণ প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার দুই পুত্র, রঘুদেব ও রামদেব। পিতার মৃত্যুর পরে রঘুদেব উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হ'ন। তিনি অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন ; তাঁহার যত্নে নানা স্থানে সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বৎসরান্তে ছাত্রগণের পরীক্ষা গ্রহণ এবং পারিতোষিক বিতরণ জন্য বাকলা, বাঙ্গড়োরা, সোন্দারকুল, অরঙ্গপুর এবং সায়েস্তানগর এই পঞ্চ স্থান নির্ব্বাচিত হয়।

রঘুদেবের মৃত্যুর পরে তদীয় কনিষ্ঠ রামদেব উক্ত পদ লাভ করেন। তিনি প্রত্যহ রহমৎপুর হইতে পাল্‌কী আরোহণে রাজদরবারে গমন করিতেন। চন্দ্রদ্বীপের তদানীন্তন রাজা শিবনারায়ণ অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি এবং বিলাসপরায়ণ ছিলেন। একদা রাজা কোন কারণবশতঃ কাহাকেও সেই সময়ে ফটকের ভিতরে প্রবেশ করিতে দ্বারপালগণকে নিষেধাজ্ঞা দিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে রামদেব পাল্‌কী-বাহনে দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে, প্রহরিগণ বাহকদিগকে বাধা দিল। কিন্তু

বাহকেরা তাহাদের নিষেধবাক্যে দৃক্‌পাত না করিয়া যেমনি প্রবেশোন্মুখ হইল, অমনি তাহারা পাল্‌কী লক্ষ্য করিয়া তরবারি নিক্ষেপ করিল। রামদেব নিদ্রাভিভূত ছিলেন। তরবারি তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিল, তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। রাজা এই সংবাদ অবগত হইয়া মর্ম্মাহত হইলেন। নিজের অবিমৃষ্যকারিতার এইরূপ শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া যারপরনাই অনুতাপ করিতে লাগিলেন। তিনি অবিলম্বে রঘুদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র রামভদ্রকে দেওয়ানী প্রদান করিলেন। দেওয়ান রামভদ্রের যত্নে রাজকীয় অনেক বিষয়ে উন্নতি হইয়াছিল। তদানীন্তন প্রজাসমূহ অনেকেই গোরক্ষা করিয়া স্বীয় স্বীয় ভূমি কর্ষণ করিত। দেয় রাজস্ব রীতিমত আদায় না হইলে তাহাদের গোরু ক্রোক করিয়া খাজানা আদায় করা হইত। এই উপলক্ষে অনেকগুলি গোরু একত্র করা হইত, কাজেই গোরুগুলি সযত্নরক্ষিত হইত না। রামভদ্র এই অভাব দূর করিবার জন্য রহমৎপুরের পশ্চিমপাড় গোরক্ষার জন্য নির্দ্দেশ করেন। এই সময় হইতেই উক্ত স্থানের নাম "গোশাসন" হইয়াছিল। গোরুগুলি অতি সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইত বলিয়া রামভদ্র সম্বন্ধে একটি গ্রাম্য কবিতা প্রচলিত ছিল, যথা—

"তঙ্কাতে তিনটী গোরু, একটি তার ফাও,
কেন যদি গোরু, রামভদ্র কাছে যাও।
সর্‌সরাণী, সর্‌সরাণী, সর্‌সরাণী সর্,
রাজমন্ত্রী বেচে গোরু শীঘ্র করি চল্॥"

রামভদ্রের শেষ অবস্থায় রাজকীয় অনেক বিষয়ে বিশৃঙ্খলা ঘটে। তাঁহার মৃত্যুসময়ে দেয় রাজস্ব সাত লক্ষ টাকা বাকী পড়িয়াছিল।

রামভদ্রের তিন পুত্র। তন্মধ্যে রামজীবনই সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি মাত্র ত্রয়োদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে দেওয়ানী কার্য্যভার গ্রহণ করেন এবং স্বীয় প্রতিভা ও কার্য্যদক্ষতাগুণে অল্পকাল মধ্যেই দেয় রাজস্ব সাত লক্ষ টাকা নবাব-সরকারে দাখিল করেন।

চন্দ্রদ্বীপের তদানীন্তন রাজা শিবনারায়ণের মৃত্যুর অত্যল্প দিন পরেই তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা লক্ষ্মীনারায়ণও অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তখন রাজ্যমধ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইল; কতিপয় স্বার্থপর কর্ম্মচারী শত্রুপক্ষে যোগদানকরতঃ গোপনে নানাবিধ অত্যাচার আরম্ভ করিল।

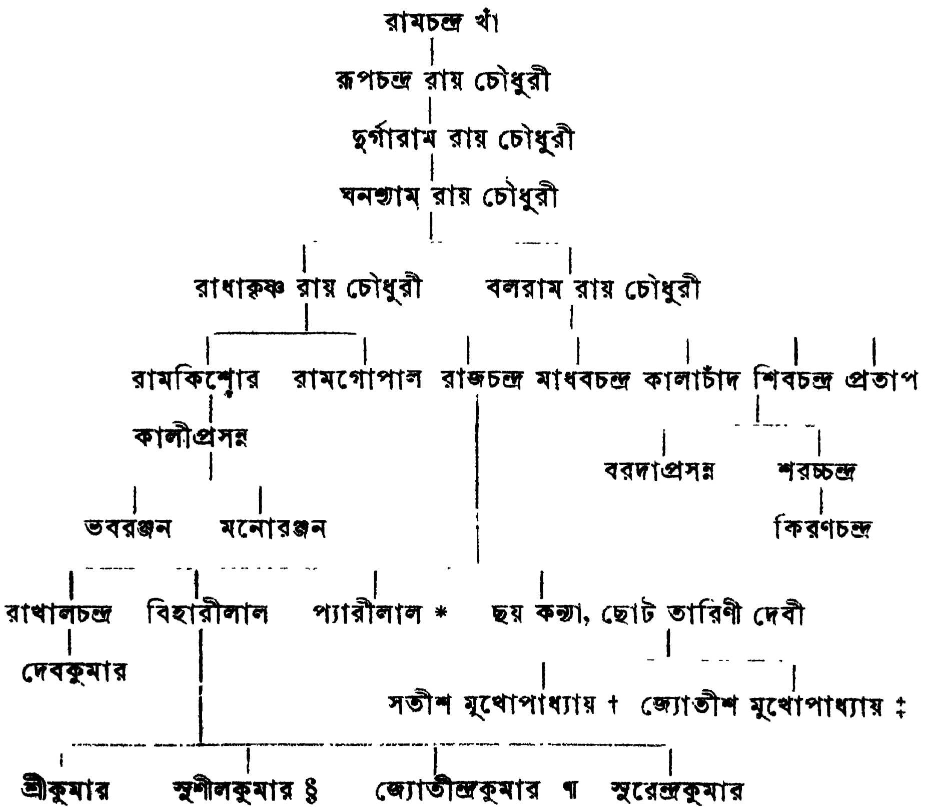
অবিলম্বে এই সংবাদ প্রচারিত হইলে চন্দ্রদ্বীপ খাসরাজ্যভুক্ত করার জন্য নবাব-সরকার হইতে এক পরওয়ানা দেওয়ান রামজীবনের নিকট প্রেরিত হয়। পরওয়ানা হস্তগত হইলে প্রভুভক্ত রামজীবন যারপরনাই চিন্তিত হ'ন। তিনি ক্ষণবিলম্ব না করিয়া সকলের অজ্ঞাতে নবাব-দরবারে গমন করেন এবং আবেদন করেন যে, রাজ্য অরাজক নহে, শত্রুর ষড়যন্ত্রজনিত অমূলক জনরব মাত্র। রাজা শিবনারায়ণের আর এক নাবালগ পুত্র বর্ত্তমান। রাণী দুর্গাবতীই স্বীয় পুত্র 'দুর্গাকুমার' নামে রাজ্য শাসন করিতেছেন, নবাব যেন সেই নামেই রাজস্ব বহাল রাখিবার অনুমতি দেন। নবাব এই প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া রামজীবনকেই রাজত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু রামজীবন কিছুতেই তাহা স্বীকার করিলেন না। নবাব তাহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন, এবং রামজীবনের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। রাণী দুর্গাবতী রামজীবনের এই জ্বলন্ত প্রভুভক্তি ও নিঃস্বার্থ পরোপকারিতার পরিচয় পাইয়া পুরস্কারস্বরূপ রামজীবনের নিজ সম্পত্তির রাজস্ব বহুল পরিমাণে হ্রাস করিয়া দেন এবং চন্দ্রদ্বীপের দেয় রাজস্বের সহিত তাঁহার রাজস্ব পৃথকভাবে নবাব-সরকারে দাখিল করিবার অনুমতি প্রদান করেন।

রহমৎপুরের ভূম্যধিকারিগণের উদারতা, মহত্ত্ব, প্রভুভক্তি এদেশের ইতিহাসে একটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ইঁহারা ভূসম্পত্তি প্রাপ্তির পর হইতেই বহুবিধ লোকহিতকরকার্য্য করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে অস্মদ্দেশে ব্রাহ্মণকুলে এই বংশই সর্ব্বাপেক্ষা সংক্রিয়ান্বিত। ইঁহাদের পূর্ব্ব গৌরব এখন আর নাই, তবে স্মৃতিটুকু মাত্র অবশিষ্ট আছে। ইঁহাদের মধ্যে চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী, ভৈরব চক্রবর্ত্তী, বৈকুণ্ঠ চক্রবর্ত্তী, বরদাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, সারদাচরণ চক্রবর্ত্তী, আনন্দমোহন চক্রবর্ত্তীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লাখুটিয়ার রায়বংশ বঙ্গদেশের গৌরববর্দ্ধন করিয়া সর্ব্বত্র সর্ব্বথা প্রখ্যাত হইয়াছে। মহামতি রামচন্দ্র খাঁ, সর্ব্বপ্রথমে বাখরগঞ্জ জিলায় এই বংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। ইনি বঙ্গ ও উড়িষ্যার সীমান্তবর্ত্তী দেশ-সমূহের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কালক্রমে দুরদৃষ্টনিবন্ধন নবাবের রোষানলে পতিত হইয়া এই জিলার দক্ষিণ-প্রান্তে একটী উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন, তাই জগন্নাথদেবের স্মরণার্থে এই স্থানের

নাম "পুরী" রাখিয়াছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ ইঁহারই সহায়তায় বঙ্গদেশ হইতে শ্রীক্ষেত্রে গমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত 'পুরী', বর্ত্তমান পটুয়াখালীর অন্তর্গত বাউফল থানার অধীনে অবস্থিত।

রামচন্দ্র খাঁএর সংক্ষিপ্ত বংশতালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।



* ইহার তিন পুত্র ও তিন কন্যা লণ্ডনে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন।

† সিভিলিয়ান—ম্যাজিষ্ট্রেট-কলেক্টর।

‡ ব্যারিষ্টার—হাইকোর্ট।

§ ইনি চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শী হইবার জন্য অনূন পঞ্চদশ বর্ষ ইংলণ্ডে অবস্থান করেন, এবং তথা হইতে এম, বি, সি, এম, এল, আর, সি, পি, এল, আর, সি, এস, উপাধিতে ভূষিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

¶ ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া লণ্ডনে বাস করিতেছেন।

রামচন্দ্রের প্রপৌত্র ঘনশ্যাম রায় ধাত্রী কর্ত্তৃক পুরী হইতে চন্দ্রদ্বীপের রাজধানী মাধবপাশায় নীত হ'ন। তৎকালে দস্যুদের অমানুষিক অত্যাচারে বাখরগঞ্জের দক্ষিণদিকস্থিত অনেক স্থান বিপর্য্যস্ত হইত, তাই পিতৃমাতৃহীন ঘনশ্যামকে রক্ষা করিবার জন্য মাতৃস্বরূপা স্নেহময়ী ধাত্রী তাঁহাকে মাধবপাশায় লইয়া আসেন। রাজা অনুসন্ধান পূর্ব্বক শিশু ঘনশ্যামের বিখ্যাত বংশের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন, এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে ব্রহ্মোত্তরস্বরূপ যথেষ্ট ধন-সম্পত্তি দিয়া লাখুটিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই গ্রাম বরিশাল সহরের আড়াই ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে পূর্ব্বে অসংখ্য টিয়া বা শুক পাখী বাস করিত বলিয়া এই গ্রাম লাখটিয়া (লাখুটিয়া) নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ঘনশ্যামের পৌত্র রাজচন্দ্র রায় চৌধুরী একজন অসাধারণ লোক ছিলেন। * ইনি পারস্য ও সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। জীবনের প্রারম্ভে স্বল্পকাল ইনি পুলিশবিভাগে কর্ম্ম করেন; কিন্তু এই বিভাগের কার্য্যপ্রণালীর প্রতি বিবিধ কারণে একান্ত বীতরাগ হইয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বরিশাল জজ-আদালতে আইন ব্যবসায়ে ব্রতী হ'ন। দৈবানুগ্রহে এবং স্বীয় অনন্য-সাধারণ প্রতিভাপ্রভাবে ইনি অতি অল্পকাল মধ্যেই প্রভূত সম্পত্তির অধিপতি হইয়া অসংখ্য শুভ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে স্বীয় পুণ্য-নাম চিরস্মরণীয় রাখিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রে মানবের ত্রিবিধ ঋণ নির্দ্দিষ্ট আছে,—দেবঋণ, ঋষিঋণ, এবং পিতৃঋণ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই মহাপুরুষ শাস্ত্রবিহিত যাবতীয় কর্ত্তব্য অনাবিল ও একাগ্রনিষ্ঠার সহিত সুসম্পন্ন করিয়া, উক্ত ত্রিবিধ ঋণ হইতেই মুক্তিলাভ করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। দুঃস্থ ও নিঃসহায় ব্যক্তিগণের দুঃখবিমোচনের জন্য অকাতরে ও মুক্তহস্তে ইনি দান করিতেন। বাখরগঞ্জ জিলার জনসাধারণের যাতায়াতের সুবিধা বিধান-কল্পে ইনি বরিশাল সহর হইতে লাখুটিয়া গ্রামের প্রান্তবাহী নদী পর্য্যন্ত সুপ্রশস্ত পথ ও খাল, প্রচুর অর্থব্যয়ে প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু-ধর্ম্মানুমোদিত সামাজিক ক্রিয়াদি দ্বারা হিন্দুসমাজে বিশেষ খ্যাতি ও

* "the Brahman-family of Lakhutia can boast of at least one member, who would have done honour to any family. This was Raj Chandra Rai —"I. Beveridge' History of Bakarganj, Page 93.

প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার স্বোপার্জ্জিত অর্থে লাখুটিয়ায় যে রাজ-প্রাসাদতুল্য ভবন নির্ম্মিত হয় এবং লাখুটিয়ার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বিভিন্ন গ্রামস্থ অধিবাসিগণের জলকষ্ট নিবারণার্থ যে সকল তড়াগ খনিত হয়, তাহা পূর্ব্ববঙ্গের,—বিশেষতঃ এই জিলার পরম গৌরবের বিষয়। জ্ঞানে, কর্ম্মে ও চিন্তায়, এরূপ সুসঙ্গত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন এ সংসারে দুর্লভ।

রাজচন্দ্র রায় চৌধুরীর সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরী। যৌবনারম্ভেই ইঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে, এবং সেই সময় হইতেই ধৈর্য্য, নিপুণতা ও যোগ্যতার সহিত ইনি পৈত্রিক সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ইনি পারস্য, সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বাখরগঞ্জ জিলায় লোক-মত সংগঠনের ও সর্ব্ববিধ অভাব দূরীকরণের নিমিত্ত ইনি বরিশাল সহরে জনসাধারণের সভা (peoples' association) প্রতিষ্ঠিত করেন। সমগ্র বঙ্গদেশে যতগুলি সভাসমিতি আছে, প্রায় সকলগুলির সহিতই ইনি সহানুভূতির সহিত যোগদান করিতেন। কতিপয় বৎসর ইনি বরিশাল ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যান (vice chairman) পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দেশবাসীর বিবিধ উপকার করিয়াছেন। জনসমূহের জলপথে গমনাগমনের অসুবিধা নিবারণ করিবার জন্য ইনি নিজ অর্থে বরিশাল হইতে পটুয়াখালী পর্য্যন্ত "ভারত-কুসুম" ও "চারু-কুসুম" নামক দুইখানি ষ্টীমার চালাইতেন। ইহাঁর সরল ও উদার ব্যবহারে, পরম শত্রুর মনেও ইহাঁর প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হইত। দরিদ্রের প্রতি দয়া, আর্ত্তের প্রতি অনুকম্পা, আশ্রিতের প্রতি বাৎসল্য, ধর্ম্মের প্রতি নির্ব্বিকার আসক্তি এবং ঈশ্বরের প্রতি অচপল অনুরাগ ও অবিচলিত বিশ্বাস প্রভৃতি লোক-দুর্লভ সদ্‌গুণ-ভূষণে ইহার জীবন অলঙ্কৃত ছিল।

রাখালচন্দ্রের একমাত্র পুত্র দেবকুমার রায় চৌধুরী ১২৯২ সালের ১১ই মাঘ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সাধক, এবং সাহিত্য জগতে একজন সুকবি বলিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। ইহার "অরুণ", "প্রভাতী", "মাধুরী" প্রভৃতি গীতিকাব্য আমাদের সাহিত্য-জগতের গৌরবস্বরূপ। ইনি সাহিত্য ও সাহিত্যসেবিগণের একজন প্রধান উৎসাহদাতা। আমরা আশা করি, নবীন কবি স্বীয় প্রতিভাবলে একদিন কবিবর রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ হইতে পারিবেন।

রাজচন্দ্রের মধ্যম পুত্র বিহারীলাল রায় চৌধুরী। বরিশাল ডিষ্ট্রিক্ট ও লোকালবোর্ডের সদস্য এবং মিউনিসিপালিটীর ভাইস্ চেয়ারম্যান হইয়া ইনিও দেশের অনেক শুভকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় পিতার স্মৃতিরক্ষার্থ, ইঁহারই অধ্যবসায় ও যত্নে বরিশাল সহরে "রাজচন্দ্র কলেজ" সংস্থাপিত হয়। বরিশাল জিলায় ইহাই সর্ব্বপ্রথম শিক্ষানুষ্ঠান। এইরূপ প্রথম শ্রেণীর উচ্চ বিদ্যালয় সংস্থাপন ও পরিচালন করিতে ইঁহার বহুসহস্র অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে।

রাজচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র প্যারীলাল রায় চৌধুরী; সাধারণতঃ ইনি পি, এল, রায় নামে খ্যাত। বাল্যবয়সে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয় এবং তৎপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া ইনি বর্দ্ধিত হ'ন। প্রথমতঃ কলিকাতা সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ইনি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। তথায় কেম্ব্রিজের 'ডনিং' কলেজে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য হ'ন, পরে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে সবিশেষ যোগ্যতার সহিত ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী-ব্যবসায়ে অতি অল্পকালমধ্যেই ইনি অসাধারণ প্রতিষ্ঠা-লাভ করেন। বাখরগঞ্জ জিলার অধিবাসিগণের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসার পর কতিপয় বৎসরের মধ্যে আইন ব্যবসায়ে পরম যশস্বী হইয়া উঠিলে, গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে হাইকোর্টের "লিগাল রিমেম্ব্রান্স" পদে নির্ব্বাচিত করেন। ইতি-পূর্ব্বে আর কোনও ভারতবাসী এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ ও একান্ত সম্মানিত উচ্চপদ লাভ করিতে পারেন নাই। মিঃ রায়, কয়েক বৎসর এই কার্য্য সম্যক্ যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করেন; কিন্তু আর্থিক ক্ষতিনিবন্ধন পদত্যাগ করিতে বাধ্য হ'ন। কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে, ইঁহার কর্ম্মদক্ষতার জন্য, প্রভূত প্রশংসা ও ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। ইঁহার সাধু চরিত্র, সরল ব্যবহার ও অপূর্ব্ব সত্যনিষ্ঠা, ইঁহার জীবনকে গৌরব-প্রভা-মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে।

২। গ্রেদ-বন্দর।

গ্রেদ-বন্দর, কীর্ত্তনখোলা নদীর তীরবর্ত্তী চন্দ্রদ্বীপের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ। বর্ত্তমান বরিশাল বন্দর লইয়াই এই "গ্রেদ" অর্থাৎ ক্ষুদ্র পরগণার সৃষ্টি হইয়াছে। *

মেজর রেনেল্ কৃত মানচিত্রদৃষ্টে অনুমিত হয় যে, তাঁহার সময়েই বরিশাল এতদ্দেশের একটী প্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ নবাবী আমলেই বরিশাল বন্দরের ভাবী সমৃদ্ধির সূচনা আরম্ভ হইয়াছিল। ১৭৬২ খৃঃ অব্দে, ২৬শে ডিসেম্বর নবাব মীরকাসিম, গবর্ণর বান্সিটার্ট (Vansittart) সাহেবের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন তৎকালে বরিশাল লবণের একটী প্রধান 'চৌকি' † ছিল বলিয়া তাহাতে উল্লেখ আছে। আমরা নিম্নে এই পত্রখানি উদ্ধৃত করিলাম।

"In the parganas of Gopalpur and Dakhanbarpur (Dakhin Shahabazpur), and other districts where salt is made, the people of the Company's factory work the salt-pans; and they take possession of all the salt which the molunghies of other parganas have made, by which means I suffer a very great loss. Moreover, they oblige the ryots to receive money from them for purchasing rice, and by force and violence they take more than the market price affords, and the ryots all run away on account of these oppressions. For many years it has been customary for the Casmere merchants to advance money at Sunderbund, and provide molunghies to work the salt-pans there: they paid the rents for the salt-pans at several parganas; and the duties on the salt which were paid at *Burry-saul Chokey*, belonging to the Shahbunder, amounted to near Rs. 30,000. At present the people of the factory have dispossessed the Cashmere merchants, and have appropriated all the salt to themselves" ‡

---

* The village of Barisal is a very small one, and lies in the Pargana of its own called the Gird-i-Bandar which appears to have been formed out of Pargana Chandradwip as a site for the Bazar.—H. Beveridge's History of Bakarganj, Page 867.

† এই স্থানে লবণের শুল্ক আদায় হইত।

‡ H. Beveridge's History of Bakarganj, Page 305—306.

১৮০১ খৃঃ অব্দে উইনটেল (Mr. Wintle) সাহেব বাখরগঞ্জ হইতে বরিশালে স্থানীয় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন; এই সময়েই গ্রেদ-বন্দর সৃষ্ট হয়। এই গ্রেদের যাবতীয় ভূমি লইয়া 'হরি রাধানাথ দাস' নামক তালুক গঠিত হইয়াছে। এই তালুক যথেষ্ট লাভজনক, ইহার সরকারী রাজস্ব ৫৩।/৪ পাই মাত্র। বরিশালের আদালত, কলেক্টরী, গীর্জ্জা প্রভৃতি এই তালুকে অবস্থিত। রেনেলের সময়ে বরিশালের সীমা শুধু জেলখানা-নদীর দক্ষিণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বরিশাল, গ্রেদ-বন্দরের সীমা অতিক্রম করিয়া বগুরা, আমানতগঞ্জ, আলেকান্দা, কাউনিয়া এবং কাশীপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার প্রান্ত দিয়া সরিদ্বরা কীর্ত্তনখোলা কুলকুলনাদে বহিয়া চলিয়াছে। এই নদীর তটদেশ অতি মনোরম। কলিকাতার ষ্ট্রাণ্ড্রোডের মত প্রশস্ত একটী রাস্তা জন-কোলাহল বক্ষে লইয়া প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্য্যের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। এই পথটীর দুই পার্শ্বে সারি সারি ঝাউ গাছ এবং শিকরসিক্ত মন্দ পবন ইহাকে সর্ব্বদা স্নিগ্ধ রাখিয়াছে। নদীর স্ফীতবক্ষ স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়া বালারুণ যখন প্রভাতাকাশে উদিত হয়, কূলে বৃক্ষশাখাস্থিত অগণিত পাখীকলরবে সমগ্র সহরটী যখন নিদ্রাবেশ হইতে উত্থিত হইয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, বিশাল ষ্টীমারগুলি যখন আপনাদের বিশাল বপু ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করিতে করিতে নদীর গলায় অসংখ্য উর্ম্মিমালা পরাইয়া চলিতে থাকে, তখন মনে হয় যেন সৌন্দর্য্য-ভার প্রপীড়িতা প্রকৃতিরাণী, আপনার অপরিসীম সৌন্দর্য্যের কিয়দংশ সেখানে ঢালিয়া রাখিয়াছেন।

সমগ্র বঙ্গদেশে বরিশাল একটী প্রধান ষ্টীমার ষ্টেসন। ঢাকা, নারায়ণ-গঞ্জ, কাছার, নোয়াখালী, খুলনা, কলিকাতা প্রভৃতি যাবতীয় স্থানের ষ্টীমার প্রত্যহই এখানকার পোতাশ্রয়ে আশ্রয় লইয়া থাকে।

বর্ত্তমান বরিশাল, নিকটস্থ গ্রামগুলি লইয়া বর্দ্ধিতায়তন হইয়াছে। ইহার বিস্তৃতি প্রায় ছয় বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় চৌদ্দ হাজার। এখানে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান এই তিনশ্রেণীর লোকের বাস। সহরটীর মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিদের জন্য মন্দির, মসজিদ ও গীর্জ্জা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

৩। বোজরগউমেদপুর।

বর্ত্তমান সময়ে বাখরগঞ্জে এই পরগণা যেরূপ বিস্তৃত, তদ্রূপ লাভজনক। ইহার বিস্তৃতি প্রায় সমুদ্র পর্য্যন্ত, এবং প্রায় সমুদয় ভূখণ্ডই শস্যশালিনী।

মোগলরাজত্বসময়ে ইহার অধিকাংশ স্থান নিবিড় অরণ্যানীতে পরিণত ছিল। ভীষণ শ্বাপদকুল ভীমগর্জ্জনে দিগ্‌দিগন্ত কম্পিত করিয়া, দিবাভাগেই শিকারানুসন্ধানে নির্ভয়ে বিচরণ করিত। আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই পরগণা "সরকার বাজুহা" অর্থাৎ সংরক্ষিত বন ছিল। এই স্থান হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষাদি ছেদিত হইয়া দিল্লীতে রাজসরকারে প্রেরিত হইত। কখন কখনও বা সাধারণের নিকট বিক্রীত হইত, এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ রাজকোষে প্রেরিত হইত। তৎকালে সরকার বাজুহা মহালে বিলক্ষণ লাভ ছিল। বর্ত্তমানে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট, সংরক্ষিত বনের (Reserve Forest) জন্য যে সমস্ত আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, সেই সময়েও এইরূপ বিশেষ কোন আইন প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়।

সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের রাজত্বসময়ে ১৬৬৪ খৃঃ অব্দে সায়েস্তা খাঁ বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হ'ন। তিনি তের বৎসর যাবৎ এই দেশে ছিলেন।* তাঁহার সময়ে নিম্নবঙ্গের অনেক জঙ্গলাকীর্ণ স্থান পরিষ্কৃত হইয়া লোকালয়ে পরিণত হইয়াছিল। সায়েস্তা খাঁ যে কেবল রাজ্যশাসন করিবার জন্যই আসিয়াছিলেন তাহা নহে, রাজ্যশাসনের সহিত মগ ও পর্ত্তুগীজ দস্যুগণের উৎপীড়ন হইতে রাজত্বরক্ষণবিষয়ে তাঁহাকে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। এই সমস্ত দস্যুদিগকে দমন করিবার জন্য তিনি কখন বা ঢাকা, কখনও বা চট্টগ্রাম থাকিতেন। সেই সময়ে দুর্দ্দান্ত দস্যুদের অত্যাচারে এই দেশের নিরীহ অধিবাসিগণ যারপরনাই নিগৃহীত হইতেছিল। এই অত্যাচার-কাহিনী সায়েস্তা খাঁর কর্ণগোচর হইলে, তিনি স্বীয় পুত্র বোজরগউমেদ খাঁকে বহুসংখ্যক সৈন্যসহ এদেশে প্রেরণ করেন।† বোজরগউমেদ খাঁ এই কার্য্য নির্ব্বাহার্থ কয়েক বৎসর এদেশে

---

* সায়েস্তা খাঁ ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

† Stewart's History of Bengal, Page 187,

ছিলেন। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে ও উৎসাহে এই দেশের অনেক জঙ্গলাকীর্ণ স্থান পরিষ্কৃত হইয়া মানববসতিতে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহারই নামানুসারে এই পরগণার নাম হইয়াছে।

বোজরগউমেদ খাঁ কিছুদিন নানাস্থানে খণ্ডযুদ্ধ করিয়া দস্যুদিগকে এই দেশ হইতে দূর করিয়া দেন। কিন্তু পুনরায় নববলে বলীয়ান ও দলবদ্ধ হইয়া দস্যুগণ দ্বিগুণতেজে এই দেশবাসিগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করে। তখন বোজরগউমেদ খাঁ, ঢাকায় পিতৃসমীপে এই সংবাদ জ্ঞাপন করেন এবং তথা হইতে বহুসংখ্যক সৈন্য আনাইয়া 'গোলাবাড়ী' নামক স্থানে ছাউনী করিলেন। তারপর ক্রমাগত কয়েকটী খণ্ডযুদ্ধে দস্যুগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গোলাবাড়ী বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী। এই স্থানে এখনও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ, * রাজবর্ত্মের চিহ্ন প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে।

লোকহিতকর কার্য্য করিয়াও বোজরগউমেদ খাঁ যশস্বী হইতে পারেন নাই, বরং কলঙ্ক-কালিমায় তাঁহার যশোরাশি মলিন হইয়াছিল। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, যে সমস্ত ইন্দ্রিয়দোষে মুসলমান-নবাবগণ কলঙ্কিত, বোজরগউমেদ খাঁও সেই দোষে কলঙ্কিত ছিলেন। † তাঁহার পৈশাচিক ব্যবহারে ধনী হইতে দীন দরিদ্র পর্য্যন্ত কেহই অব্যাহতি পায় নাই। পুত্রের এবম্বিধ কুক্রিয়া সায়েস্তা খাঁর কর্ণগোচর হইলে, তিনি পুত্রকে অবিলম্বে ঢাকায় আসিতে আদেশ প্রদান করিলেন এবং তৎস্থলে অন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

ইহার কিছুদিন পরে এই পরগণা সম্পূর্ণরূপে আগাবাখরের হস্তগত হয়। আগাবাখর খাঁ ‡ এই পরগণাস্থিত যাবতীয় নিমকের কারখানার উপর এক প্রকার নূতন কর স্থাপন করতঃ অধিবাসিগণের বহু কষ্টোপার্জ্জিত শস্যশালিনী ভূমি জোরপূর্ব্বক কাড়িয়া লইতে লাগিলেন। কতক জমি

---

* কিছুদিন হইল জঙ্গল পরিষ্কার করিবার সময়ে এইস্থানে বল্মীক মধ্যে দুইটী প্রস্তর স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে।

† Stewart's History of Bengal and Dr. Taylor's Topography of Dacca.

‡ প্রাচীন তত্ত্ব-সংগ্রহাধ্যায়, ৮৩—৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অন্যায়রূপে কর বৃদ্ধি করিয়া প্রজাগণকে ভোগ করিতে দিলেন, কতক বা স্বীয় অনুচরবর্গকে বিনামূল্যে বিলাইয়া দিলেন। ইহার ফলে দেশে হাহাকার পড়িয়া গেল। অনেক দরিদ্র অধিবাসী ঘরবাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র পলায়ন করিল। কেবল যে ভূমি গ্রহণ করিয়াই আগাবাখর ক্ষান্ত হইলেন, তাহা নহে, হতভাগ্য অধিবাসিগণের অনেক সুন্দরী যুবতী তাঁহার এবং তাঁহার পুত্রের বিলাস-বাসনার সামগ্রী হইতে লাগিল।

পাপিষ্ঠ আগাবাখরের অত্যাচার-কাহিনী বর্ণনাতীত; কিন্তু এই দুরাচার এবং তৎপুত্র মহাপাপিষ্ঠ আগাসাদক এই পরগণাস্থিত একজন সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারীর যে প্রকার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিতে গেলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আমরা সেই ঘটনাটী উল্লেখ করিতেছি।

বোজরগউমেদপুর যখন জঙ্গলাকীর্ণ, তখন দয়াল চৌধুরী নামক জনৈক ব্যক্তি শ্বাপদগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া এই স্থানে বাসস্থান স্থাপন করেন। নবাব মুরশিদকুলী খাঁ তখন বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। দয়াল চৌধুরী নবাব-নাজিমের নিকট হইতে রীতিমত ফরমান গ্রহণ করিয়া জঙ্গলাবাদে প্রবৃত্ত হ'ন। বহুদিনে, বহুঅর্থব্যয়ে এবং ব্যাঘ্র-নিহত-নরশোণিতে ভূমি রঞ্জিত করিয়া দয়াল চৌধুরী কতকটা স্থান পরিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

যখন আগাবাখর সদলবলে বোজরগউমেদপুর অধিকার করিতে আসিলেন, দয়ালচৌধুরী নানাপ্রকার উপঢৌকনসহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আগাবাখর পূর্ব্ব হইতেই দয়াল চৌধুরীর কথা শুনিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই অদম্য অধ্যবসায়ে ও যত্নে যে উক্তস্থানে জনসমাবেশ হইয়াছে, তাহাও জানিতেন। বিশেষতঃ দয়াল চৌধুরী যে একজন ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি, তাহাও আগাবাখরের অবিদিত ছিলনা।

খলপ্রকৃতি একজাতীয় মানুষ আছে, পরের ক্ষতি করাই যেন তাহাদের জীবনের এক মহাব্রত; তারপর যদি ক্ষমতাপ্রাপ্ত কেহ এই প্রকৃতির লোক হ'ন, তবে যে কত অনর্থ, অত্যাচার, অবিচার হয়, তাহার সংখ্যা করা যায় না। আগাবাখর এবং তৎপুত্র আগাসাদক এই প্রকৃতির মানুষ। দয়াল-চৌধুরীর প্রভুত্ব এবং সম্মান কিসে খর্ব্ব হইবে, ইহাই তখন তাঁহাদের লক্ষ্য হইল। কি উপায়ে দয়াল চৌধুরীর সর্ব্বনাশ হইবে, দিবারাত্র

পারিষদগণসহ এই পরামর্শ হইতে লাগিল। নিরীহ দয়াল প্রায়ই আসিয়া দেখাসাক্ষাৎ করিতেন।

এদিকে আগাবাখর ও আগাসাদকের দৌরাত্ম্যে হিন্দু-মুসলমান প্রজাগণের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। জাতিপ্রাণরক্ষার্থে অনেকে সপরিবারে পলায়ন করিতে লাগিল। বোজরগউমেদপুরের ঘরে ঘরে তুমুল আর্ত্তনাদ উপস্থিত হইল। আগাবাখর ও তাঁহার পুত্র যেন ক্ষুদ্র নবাব, কাহারও সুন্দরী কন্যা, ভগ্নী অথবা স্ত্রী তাঁহাদের ইচ্ছামত উপস্থিত না করিলে, প্রজার কাঁধে মাথা থাকিত না। ঘরবাড়ী অগ্নিদেবকে সমর্পণ করিয়া দুরাত্মাদের পিশাচ অনুচরবর্গ রোরুদ্যমানা যুবতীগণকে ধরিয়া আনিত।

দয়াল চৌধুরীর একটী সুন্দরী যুবতী কন্যা ছিল, আগাসাদক তাহা টের পাইয়া, তাঁহার পাপযজ্ঞে ইন্ধনস্বরূপ তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। দয়াল চৌধুরীর মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি একদিন অতি বিনীতভাবে মর্ম্মব্যথা আগাসাদককে জানাইলেন। তাঁহার প্রার্থনা ত অগ্রাহ্য হইল, অধিকন্তু জনৈক পারিষদ ঈষৎ ব্যঙ্গের সহিত বলিল যে, প্রজার কন্যা জমিদারের অঙ্কশায়িনী হওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নহে। এহেন ঘৃণিত উক্তি শ্রবণ করিয়া দয়াল চৌধুরীর হৃদয়ে যুগপৎ ঘৃণা ও দুর্দ্দমনীয় ক্রোধের উদয় হইল। মনে মনে স্থির করিলেন যে, প্রাণ দিয়া কুলসম্মান রক্ষা করিবেন। তিনি কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া নীরবে চলিয়া আসিলেন।

অপরাহ্নে কতিপয় ফৌজ দয়াল চৌধুরীর কন্যাকে লইতে আসিলে, তিনি তাহাদের প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। আগাসাদক আবার লোক পাঠাইলেন, তাহারাও পূর্ব্বদশা প্রাপ্ত হইল। দয়াল চৌধুরী যেরূপ সম্মানিত, তদ্রূপ তাঁহার ধনবল ও জনবলও ছিল। কিন্তু তিনি ইহা নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন যে, যখন আগাসাদকের ন্যায় ক্ষমতাশালী রাজপুরুষের সহিত বিরোধ ঘটিয়াছে, তখন সপরিবারে অন্যত্র গমন না করিলে, পরিত্রাণের আর উপায় নাই। কাজেই তিনি পলায়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

এদিকে পাপাত্মা আগাসাদক, পিতার সহিত যুক্তি করিয়া নবাব-নাজিমের নিকট এই মর্ম্মে সংবাদ পাঠাইলেন যে, বোজরগউমেদপুরে দয়াল চৌধুরী নামক একজন তালুকদার বিদ্রোহী হইয়াছে; তাহাকে দমন করিতে কতক ফৌজ আবশ্যক।

সামান্য একটা তালুকদার, বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবাবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে কিনা, নবাব তাহা তদন্ত করিলেন না; তিনি প্রার্থনানুসারে ফৌজ প্রদান করিলেন। অতি সত্বর সৈন্য আসিয়া দয়ালের পলায়নপথ রুদ্ধ করিল। দয়াল চৌধুরী তখন পরিবারবর্গকে উপস্থিত বিপদের কথা জানাইয়া বলিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী, কন্যা, পুত্রবধূ প্রভৃতি মুসলমানের করস্পৃষ্ট হইবার পূর্ব্বেই যেন ইহলোক পরিত্যাগ করে। এই বলিয়া তিনি, আগতপ্রায় নবাব সৈন্যকে বাধা দিতে অমিতবলশালী কয়েক জন অনুচরসহ সশস্ত্রে ধাবমান হইলেন।

এদিকে দয়াল চৌধুরীর পরিবারস্থ সমস্ত স্ত্রীলোক, বালকবালিকাসহ অন্তঃপুরস্থ দীর্ঘিকাবক্ষে একখানি নৌকায় সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। দয়াল চৌধুরী, মুক্ততরবারিহস্তে মুষ্টিমেয় সঙ্গী লইয়া নবাবের অসীম সেনাতরঙ্গে ঝাঁপ দিলেন। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালী জাতি ভীরু এবং দুর্ব্বল বলিয়া যে প্রকার উপহাসাস্পদ হইয়াছেন, আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তৎকালে বাঙ্গালীর বাহুতে বল ছিল, তাঁহাদের তরবারিতে অনেক শিক্ষিত সৈন্যের মুণ্ড স্কন্ধচ্যুত হইত, তাঁহাদের রণোল্লাসজনিত সিংহনাদে শত্রুহৃদয় কম্পিত হইত। তৎকালে বঙ্গবীরগণ যে প্রকার অসিহস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিতেন, বঙ্গকুললক্ষ্মীরাও তদ্রূপ হাসিতে হাসিতে স্বামীপুত্রের অনুগামিনী হইতেন।

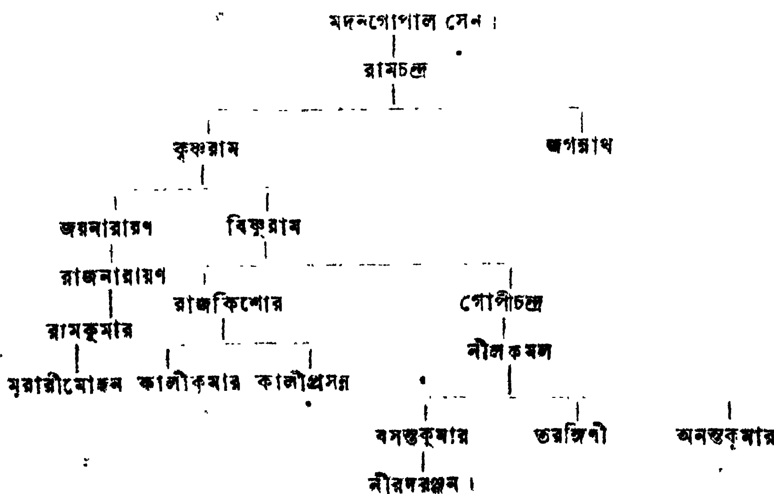
কিছুকাল অসুরপরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া দয়াল চৌধুরী ও তৎসঙ্গিগণ বীরগতি লাভ করিলেন; জনৈক মুসলমান সৈনিক তাঁহার ছিন্ন মস্তক বর্শায় বিদ্ধ করতঃ উচ্চ করিয়া ধরিল। সেই মুহূর্ত্তে সরসীবক্ষোপরি ভাসমান নৌকার তলদেশ ছিদ্র করা হইল। বেগে জলরাশি নৌকার মধ্যে প্রবেশ করিল এবং অনতিবিলম্বে সব ফুরাইয়া গেল।

দয়াল ও তাঁহার পরিবারবর্গ ধর্ম্মরক্ষার্থ যেরূপ অসম সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও কীর্ত্তি, আমাদের জাতীয় ইতিহাসে কোন উল্লেখ না থাকিলেও, অমরধামে পরমধর্ম্মময়ের পূতসিংহাসনতলে আগ্নেয়াক্ষরে চিরকাল খোদিত রহিবে।

দয়াল চৌধুরীর বিস্তীর্ণ বাড়ী এখন জঙ্গলাকীর্ণ। এখনও স্থানে স্থানে ইষ্টকাদি দেখা যায়। যে দীঘীতে দয়ালের পরিবারবর্গ আত্মসমর্পণ

করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান, তবে এখন প্রায় সমভূমি হইয়াছে। স্থানীয় লোকে এখনও উহাকে 'দয়ালের দীঘী' বলিয়া থাকে। এই পরগণার অন্তর্গত সরমহল গ্রামে "জগানন্দের দীঘী" নামে এইরূপ আর একটী প্রাচীন দীঘী দৃষ্ট হয়। জগানন্দের সম্বন্ধেও পূর্ব্বোক্তরূপ কাহিনী স্থানীয় লোকমুখে শুনা যায়। জগানন্দের দীঘীর পার্শ্বেই "ঝিনুইর পুষ্করিণী" নামে আর একটী দীর্ঘিকা আছে। প্রবাদ যে, এই দীঘী ঝিনুক দ্বারা খনিত হইয়াছিল। উক্ত দীর্ঘিকাগুলি সরমহলের সেনবংশের স্বত্বাধীনে আছে। সম্ভবতঃ সরোবরের আধিক্য বশতঃই এই অঞ্চল "সরমহল" নামে অভিহিত হইয়াছে। সরমহলের সেনবংশ এই পরগণার প্রসিদ্ধ তালুকদার। এই বংশের আদি পুরুষ মদনগোপাল সেন, * মহারাজ রাজবল্লভের নিকট সরমহল তালুক প্রাপ্ত হইয়া নলচিড়া হইতে এস্থানে আগমন করেন।

দয়াল চৌধুরীর মৃত্যুর পর জয়োন্মত্ত আগাবাখর খাঁর ভীষণ পাপস্রোত অবাধে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দয়ালের ন্যায় শক্তিশালী বীরপুরুষের লোমহর্ষণকর পরিণাম ভাবিয়া নিরুপায় অধিবাসিগণ নিঃশব্দে এই পাশবিক অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিল। আগাবাখরের ন্যায় ক্ষমতাশালী দুর্দ্দান্ত রাজপুরুষের বিরুদ্ধে, মুর্শিদাবাদ নবাব-নাজিমের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করা, তাহাদের মত দুর্ব্বল দরিদ্রের একেবারেই সাধ্যাতীত



ছিল। কেবলমাত্র তাহারা গলদশ্রুলোচনে সর্ব্বসুখদুঃখনিয়ন্তা জগদীশ্বর সমীপে তাহাদের কাতর প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে লাগিল।

আর্ত্তের করুণ ক্রন্দন করুণাময়ের শ্রীচরণে পৌঁছিল। অত্যল্পকাল মধ্যেই দুরাত্মা আগাবাখরের পাপজীবনের যবনিকা পতন হইল। অত্যাচার-পীড়িত জীবন্মৃত অধিবাসিগণ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

আগাবাখরের শাসনাধীনে এই পরগণা তৎকর্ত্তৃক দুই ভাগে বিভক্ত হয়। নিমকমহাল নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিয়া তিনি অন্য মহালের শাসনভার তৎপুত্র আগাসাদকের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। পিতাপুত্র কেহই এক কপর্দ্দকও মুর্শিদাবাদে অথবা ঢাকায় প্রেরণ করেন নাই; সুতরাং ধৃত হইয়া রাজধানীতে নীত হইলেন। পরে তাঁহাদের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

আগাবাখর এবং তৎপুত্র আগাসাদক নিহত হইলে, তাঁহাদের অধিকৃত ভূসম্পত্তি সমস্তই মহারাজ রাজবল্লভের হস্তগত হয়। রাজবল্লভ এই দেশ-বাসী না হইলেও, আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি সেই সময়ে তাঁহার সহিত অস্মদ্দেশের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল; সুতরাং তাঁহার সংক্ষিপ্তজীবনী যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিব। *

কোন সালে যে এই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা জানিতে পারি নাই। তবে রাজনৈতিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তিনি নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর সমকালীন হইলেও বয়ঃকনিষ্ঠ; কারণ আলিবর্দ্দি খাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতা নিবাইস মহম্মদ যখন ঢাকার সুবেদার ছিলেন, রাজা রাজবল্লভও সেই সময়ে তদধীনে নায়েব ছিলেন। এই হিসাবে ধরিতে গেলে রাজবল্লভের জন্মকাল ১৭০৭ হইতে ১৭১০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অনুমান করা যাইতে পারে।

রাজবল্লভের পিতার নাম কৃষ্ণজীবন মজুমদার, ইনি ধন্বন্তরিগোত্রীয় বৈদ্যবংশসম্ভূত; বিক্রমপুর পরগণায় ইহার পৈতৃক বাসস্থান। কৃষ্ণজীবনের চারি পুত্র; রাজবল্লভ পিতার তৃতীয় সন্তান। কৃষ্ণজীবনের যৎকিঞ্চিৎ

* মহারাজ রাজবল্লভের বিস্তৃত জীবনচরিত বহু অনুসন্ধান করিয়াও সংগ্রহীত হয় নাই। তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে অনেকেই সুশিক্ষিত, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহারাও এবিষয়ে বিশেষ কিছুই জ্ঞাত নহেন।

ভূসম্পত্তি ছিল, তদ্দ্বারাই গ্রাসাচ্ছাদন অনায়াসে নির্ব্বাহ হইত। তাঁহার অপর তিন পুত্রাপেক্ষা রাজবল্লভই বাল্যবয়সে অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি ছিলেন, লেখাপড়ায় তাঁহার আদৌ যত্ন ছিল না। তিনি সমবয়সিগণের সহিত সর্ব্বদা খেলা করিয়া বেড়াইতেন, সময়ে সময়ে নানারূপ দৌরাত্ম্যও করিতেন। তাঁহার এইরূপ প্রবৃত্তি দেখিয়া কৃষ্ণজীবন একদিন তাঁহাকে যথেষ্ট ভৎর্সনা করিলেন। রাজবল্লভ পিতৃশাসনে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন, নিজ জীবনের প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিল। গোপনে আত্মহত্যামানসে তিনি সেই দিনই নিশীথসময়ে অদূরবর্ত্তী কোন এক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। আত্মহত্যার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে জনৈক সন্ন্যাসী তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে এই মহাপাপ হইতে বিরত থাকিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন। রাজবল্লভ চপলস্বভাবসুলভ সংকল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসীর নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী রাজবল্লভকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "বৎস, তুমি কালে রাজা হইবে।"

সন্ন্যাসীর কথায় নির্ভর করিয়াই হউক অথবা যে কারণেই হউক, রাজবল্লভ ধীরে ধীরে অরণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বাড়ী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সেই হইতেই তাঁহার বাল্যচপলতা দূর হইল, তিনি মনোযোগসহকারে লেখাপড়া অভ্যাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার অসাধারণ মেধা ও সূক্ষ্মবুদ্ধি ছিল, অতি সত্বরই তিনি তৎকালোচিৎ বাঙ্গালা এবং পার্শিভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। কৃষ্ণজীবনের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্রগণ পৃথগন্ন হইলে অবিবাহিত রাজবল্লভ সর্ব্বজ্যেষ্ঠের সহিতই একত্র রহিলেন।

কিছুদিন পরে নবাব-নাজিমের অনুমতিক্রমে, জনৈক কাননগুই জরিপ-বন্দোবস্ত করিবার জন্য এদেশে আগমন করেন; রাজবল্লভ তাঁহার অধীনে সামান্য কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। স্বীয় প্রতিভা ও বুদ্ধিপ্রভাবে অত্যল্পকালমধ্যেই তিনি, এই কার্য্যে বিশেষ দক্ষতালাভ করিলেন। কাননগুই, তাঁহার কার্য্যতৎপরতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া, জরিপ-সংক্রান্ত হিসাবনিকাশ প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যভার সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার হস্তেই অর্পণ করিলেন।

কার্য্য শেষে কাননগুই, জরিপ-বন্দোবস্তি কাগজপত্র মুর্শিদাবাদে নবাব-সরকারে দাখিল করিলেন, নবাব এই সমস্ত কাগজপত্র পরিদর্শনে

অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, কাননগুইকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই সমস্ত কাগজ কে প্রস্তুত করিয়াছে। কাননগুই, তখন বলিলেন যে, রাজবল্লভ নামক এক-জন ভদ্রসন্তান তাঁহার মুহুরী, তিনিই তাঁহার উপদেশক্রমে ঐ সমস্ত কাগজ প্রস্তুত করিয়াছেন। নবাব তখন রাজবল্লভকে তলব করিলেন। রাজ-বল্লভ যথাসময়ে নবাব-দরবারে উপস্থিত হইয়া যথারীতি অভিবাদন করিলেন। তাঁহার সুন্দর মুখকান্তি এবং উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয় দর্শনে তাঁহার প্রতি নবাবের একপ্রকার স্নেহ জন্মিল, তিনি কাননগুইর প্রদত্ত কাগজপত্র, রাজবল্লভের প্রস্তুত কিনা জিজ্ঞাসা করিলে, রাজবল্লভ নতমস্তকে তাহা স্বীকার করি-লেন। নবাব তখন, তাঁহাকে দুই তিনটী প্রশ্ন করিয়া, রাজস্ববিভাগের কোন এক কার্য্যে তৎক্ষণাৎ নিযুক্ত করিলেন।

এই সময় হইতেই রাজবল্লভের জীবনাকাশে দুঃখ-তিমির নাশ করিয়া সৌভাগ্য-সূর্য্য ধীরে ধীরে উদয় হইতে লাগিল। দিন দিন রাজবল্লভের যোগ্যতা এবং কার্য্যতৎপরতাগুণে, তাঁহার পদবৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং তৎ-সঙ্গে ক্রমে ক্রমে প্রচুর স্বর্থাগমও হইতে আরম্ভ করিল। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর সময়ে যখন নিবাইস মহম্মদ, ঢাকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন, রাজবল্লভ তখন তাঁহার অধীনে ডেপুটী-গবর্ণর এবং নাওরা মহালের পেস্কার নিযুক্ত হইলেন। এই সময়েই তিনি রাজনগর গ্রামে স্বীয় বাসস্থান স্থাপন করিয়া, রাজপ্রাসাদতুল্য অত্যুচ্চ অট্টালিকা, দেবালয়, পণ্যবীথিকা, প্রশস্ত রাজবর্ত্ম প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া দ্বিতীয় ইন্দ্রভবন তুল্য করাইয়াছিলেন। এতকাল এই সমস্ত অট্টালিকা স্থপতিকার্য্যের নিদর্শনস্বরূপ বিদ্যমান ছিল, কিন্তু কয়েক বৎসর হইল সেগুলি ভীষণা পদ্মার গর্ভে বিলীন হইয়া মহারাজ রাজবল্লভের শেষকীর্ত্তি পর্য্যন্ত লোপ করিয়া দিয়াছে। এই সমস্ত অট্টালিকা যাহারা দেখিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেকে এখনও জীবিত আছেন; তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন যে এরূপ কারুকার্য্যবিশিষ্ট উচ্চ অট্টালিকা, নবরত্ন, পঞ্চরত্ন, দোল প্রভৃতি, তাঁহারা কদাচিৎ দর্শন করিয়াছেন। সর্ব্বগ্রাসী ভয়ঙ্করী পদ্মা যে কেবল মহারাজের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ অট্টালিকাগুলি গ্রাস করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছে, তাহা নহে; তাঁহার ভদ্রাসন পর্য্যন্তও তাহার বিশাল উদরে বিলীন হইয়াছে, যেস্থানে পদ্মা মহারাজের কীর্ত্তি লোপ করিয়াছে, সেই স্থানের বর্ত্তমান নাম কীর্ত্তিনাশা।

নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর রাজত্বসময়ে রাজবল্লভ রাজকীয় কার্য্যে উন্নতির শীর্ষস্থানে আরোহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়েই তিনি রাজসম্মানসূচক মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। তখন তিনি মহারাজা রাজবল্লভ ছৌলজঙ্গ বাহাদুর নামে সর্ব্বত্র সম্মানিত হইয়াছিলেন।

ঢাকার কার্য্য আরম্ভ করিয়া মহারাজ রাজবল্লভ, স্বজাতির উন্নতিকল্পে বিস্তর চেষ্টা এবং প্রভূত অর্থব্যয় করিয়াছিলেন এই সমস্ত কার্য্যের মধ্যে বৈদ্যসন্তানগণের পুনঃ বৈদিক-সংস্কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাঢ়বাসী বৈদ্য-গণ যে প্রকার রীতিমত বৈদিক আচরণ করিয়া আসিতেছেন, পূর্ব্ববঙ্গবাসী বৈদ্যসন্তানগণ, এই দেশে উপনিবেশ স্থাপন হইতেই সেই সংস্কারবিহীন হইয়াছিলেন। * রাজা রাজবল্লভ, ইহার উদ্ধারকল্পে, কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়, মিথিলা, কনোজ, নবদ্বীপ, বাকলা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলী আনয়ন পূর্ব্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন; এবং তদবধি পূর্ব্ববঙ্গজ বৈদ্যসন্তানগণ উপনয়নাদি বৈদিক দীক্ষা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। ইহার পূর্ব্বে এই দেশস্থ বৈদ্যসন্তানগণ শূদ্রাচারী ছিলেন, এবং শূদ্রবৎ একমাস অশৌচাদি পালন করিতেন; দেবার্চ্চনা প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াও তদ্রূপ নির্ব্বাহ হইত। এই সমস্ত কার্য্যোদ্ধারে রাজা রাজবল্লভের বিশেষ শ্রম এবং অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল, রাঢ়দেশবাসী সাধকপ্রবর মহাপুরুষ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, এই কার্য্য নির্ব্বাহার্থ রাজবল্লভকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

আলিবর্দ্দি খাঁর স্বর্গারোহণের পর হইতেই রাজবল্লভের ভাগ্যাকাশ নিবিড় জলদাবৃত হইল। সিরাজদ্দৌলা, তাঁহাকে বিষনয়নে দেখিতেন, এবং নির্য্যাতনমানসে নানা উপায় অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হ'ন নাই। কেহ কেহ বলেন যে, সিরাজদ্দৌলার মাতৃস্বসা—নিবাইস মহম্মদের পত্নী, ঘসেটী বেগমের সহিত রাজবল্লভের অবৈধ প্রণয় সম্বন্ধে সিরাজদ্দৌলা বিশেষ সন্দিহান ছিলেন। † ক্রমে এই সন্দেহ সিরাজের হৃদয়ে এতদূর বদ্ধমূল হইল যে, তিনি ইহা সত্য বলিয়াই ধারণা করিলেন। রাজবল্লভ নূতন নবাবের

* বৈদ্যগণ সকলেই রাঢ়দেশবাসী: কোন স্মরণীয় রাষ্ট্রবিপ্লবে বৈদিকক্রিয়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

† Nowazioz (Niwais Mahamed) died in 1756, and Raj Ballav's influence continued during the time of the widow, with whom, Raj Ballav was said to be improperly intimated.—Orme, Vol II, Page 49.

মনোভাব পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন, সুতরাং তিনি সর্ব্বদাই অন্তরালে থাকিতেন। এই জনপ্রবাদ সত্য কি না তাহা জানা দুরূহ; তবে কোন কোন ঐতিহাসিক ইহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া, রাজবল্লভের ক্ষমতা ও ধনহরণই সিরাজের মুখ্য উদ্দেশ্য, এইরূপ লিখিয়াছেন। সে যাহা হউক রাজবল্লভকে নির্য্যাতন করাই তখন সিরাজদ্দৌলার প্রধান কর্ম্ম। রাজনগরে রাজদূত আসিলে, রাজবল্লভ প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া তদীয় মধ্যমপুত্র কৃষ্ণদাসকে প্রেরণ করেন। কৃষ্ণদাস, বহুমূল্য রত্ন, বহুলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি সঙ্গে লইলেন। তিনি মুর্শিদাবাদে নবাবের নিকট না যাইয়া কলিকাতায় ইংরাজের শরণাপন্ন হ'ন। নবাব, কৃষ্ণদাসকে পাঠাইবার জন্য ইংরাজ অধ্যক্ষকে পত্র লিখিলেন; কিন্তু ইংরাজগণ, শরণাগতকে রক্ষা করা পরম ধর্ম্ম বলিয়া কৃষ্ণদাসকে পরিত্যাগ করিলেন না। এই অবমাননার প্রতিশোধার্থ সিরাজদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করিয়া যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের নিকট তাহা অবিদিত নাই। এই সময় হইতেই পলাশীর যুদ্ধের সূচনা। ব্রিটিশ-গৌরব-রবির উদয়োন্মুখ ঊষার স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় কিরণে তখন বঙ্গাকাশ ঈষৎ উদ্ভাসিত। ভাগ্য-বিধাতা, তখন অলক্ষিতরূপে ইংরাজ-রাজলক্ষ্মীর করকমলে, উৎপীড়িতা কঙ্কালাবশিষ্টা ভারতমাতাকে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারিগণের মধ্যে রাজবল্লভ অন্যতম; কিন্তু তিনি প্রচ্ছন্নভাবে কার্য্য করিতেন। সিরাজের শোচনীয় অধঃপতন এবং নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর রাজবল্লভকে, বিশেষ কোন রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। মীরজাফরের পর যখন মীরকাসিম আলি খাঁ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন কোন কোন রাজনৈতিক কার্য্যে রাজবল্লভের নাম আছে। তিনি কখন বা ঢাকা, কখন বা মুঙ্গের, আবার কোন কোন সময়ে মুর্শিদাবাদে রাজকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ নবাব মীরকাসিম, সিরাজের বিরুদ্ধ-ষড়যন্ত্রকারিগণকে সর্ব্বদা সন্দেহ-চক্ষে দেখিতেন; বিশেষতঃ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা রাজবল্লভ, জগৎ শেঠ প্রভৃতিকে তিনি ইংরাজের লোক বলিয়া জানিতেন। সুতরাং তাঁহারা কেহই নিরাপদ ছিলেন না। মীরকাসিম

সন্দিগ্ধ ব্যক্তিগণকে সর্ব্বদা চক্ষে চক্ষে রাখিতেন, এমন কি, অনেকেই এক প্রকার 'নজরবন্দী'র মত ছিলেন। ইংরাজের সহিত কাটোয়াযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া মীরকাসিমের এক দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হইল; তিনি মুঙ্গের দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রথমতঃ বন্দী ইংরাজগণকে হত্যা করিলেন, পরে রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ-ভ্রাতৃদ্বয়, রামনারায়ণ, রায়দুর্লভ প্রভৃতিকেও নিহত করিলেন। রাজবল্লভ প্রভৃতির মৃত্যু বড় শোচনীয়; তাঁহাদিগকে বালুকাপরিপূর্ণ এক বৃহৎ থলিয়ার ভিতর পূরিয়া মুঙ্গের দুর্গ-প্রাকার হইতে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল।* ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়।

রাজবল্লভের বিষয় যতটুকু জানা যায়, তাহাতে তিনি যে একজন প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন, তাহার আর কোনও সন্দেহ নাই। মনুষ্যদেহ ধারণ করিতে হইলেই পাপ এবং পুণ্যের ভাগী হইতে হয়। রাজবল্লভও মনুষ্য, সুতরাং তিনিও সেই নিয়মের অধীন। তবে যে তিনি স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, এরূপ কোনও উল্লেখ পাই নাই। নিবাইস মহম্মদ খাঁ, রাজবল্লভকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন, এবং প্রায় সমস্ত কার্য্যেই তাঁহাকে নিয়োজিত করিতেন; সম্ভবতঃ দুষ্ট লোকে ঈর্ষাবশতঃ নিবাইস মহম্মদের পত্নী ঘসেটী বেগমের সহিত রাজবল্লভের অবৈধ প্রণয়-কলঙ্ক রটনা করিয়া থাকিবে।

রাজা রাজবল্লভ মৃত্যুর পূর্ব্বে, রাজনগর এবং বোজরগউমেদপুরের জমিদারী দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, স্থাপিত বিগ্রহ লক্ষ্মীনারায়ণ এবং দুর্গা

* Of that number were Ram Narayan, heretofore Deputy Governor of Azemabad, as well as Raja Raj Ballav, who had himself enjoyed that office after having been a long time before Dewan and Prime Minister to Nowaziz Mahamed Khan, and in the sequel to Miran, son to Mir Jaffar Khan. This unfortunate name had all his sons with him. Some others of those persons were Roy Rayan Umed Roy, with his son, the Zaminders of Tickary. Raja Fatte Singh and Raja Buniad Singh and also Saha Abdulla, the same who had been heretofore confined at Purniah. There were numbers of other persons of distinction and characters, all which were dispatched the regions of non-existance. I have heard it said that Ram Narayan had been drowned in the Ganga, with a bag of sand and astued to his neck, and probably the others also were dismissed out of this world in the like manner.—Siyar-ul-Mutaakhirin, Vol. II. Pages 492—493.

এই দুই নামে দেবোত্তর সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট করেন। * তাঁহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে এই দেবোত্তরের অস্তিত্ব লোপ হইয়া যায়। এখনও অনেক পুরাতন দলিল-পত্রে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

রাজা রাজবল্লভ বিধবা-বিবাহ সমাজে পুনঃ প্রচলন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার নবম কি দশম বর্ষীয়া একটী কন্যা, বিবাহের অব্যবহিত পরেই বিধবা হয়। বালিকা-কন্যার এই অবস্থা দর্শন করিয়া রাজবল্লভ বড়ই ব্যথিত হইলেন। তিনি বাল-বিধবার পুনরায় বিবাহ দিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সমাজচ্যুতির ভয়ে কোন বৈদ্য-সন্তান তদীয় কন্যাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন রাজবল্লভ, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত কিনা, তাহার ব্যবস্থা আনিবার জন্য স্বয়ং নবদ্বীপ গমন করিলেন।

রাজার আগমনবার্ত্তা পাইয়া নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতমণ্ডলী, তাঁহাকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিলেন। রাজা কেন যে স্বয়ং নবদ্বীপ আগমন করিয়াছেন, অধ্যাপকগণ তাহা জানিতে পারিয়া বিষম বিপদে পড়িলেন। বিধবা-বিবাহ স্মৃতিশাস্ত্রানুমোদিত, সুতরাং ব্যবস্থা চাহিলে পণ্ডিতগণের বাধ্য হইয়া ব্যবস্থা দিতে হয়, অথচ বিধবা-বিবাহপ্রথা বহুকাল হইতে সমাজবর্জ্জিত। পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া পরামর্শ পূর্ব্বক এক কৌশল উদ্ভাবন করিলেন।

অপরাহ্নে অধ্যাপকগণ ও গ্রামস্থ অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ভদ্রমণ্ডলী, রাজার আহারের জন্য নানা প্রকার ভোজ্যবস্তু উপঢৌকন লইয়া রাজবল্লভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। নানাপ্রকার শিষ্টালাপের পর পণ্ডিতগণ, তাঁহাদের আনীত আহার্য্যসামগ্রী রাজসমীপে আনয়ন করিলেন। এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে একটী গো-শিশু ছিল। রাজা আহার্য্যসামগ্রীর মধ্যে গো-শাবক দর্শন করিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে জনৈক পণ্ডিত বলিলেন যে, উহা মহারাজের আহারার্থ আনীত হইয়াছে।

* Previously to Raja Raj Ballav's death, he subdivided his estate by creating Bozragumedpua and Rajnagar, into a Zamindary in the name of God Laksmi-Narayan and Shujabad fisral division into a seperate estate in the name of the Goddess Durga.—Sir W. W. Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. V, Page 222.

রাজবল্লভ যেমন বিস্মিত তদ্রূপ চমকিত হইলেন। ক্ষণকাল চিন্তাকরতঃ পণ্ডিতবর্গের কৌশল বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "আমি যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলাম তাহা সিদ্ধ না হইলেও, আমি আপনাদের নিকট যথেষ্ট উপদেশ প্রাপ্ত হইলাম। জানিতাম যে, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত হইলেও বহুকাল হইতে সমাজে রহিত হইয়াছে ; কিন্তু বালিকা-কন্যার বৈধব্য-দর্শনে শোকে অধীর হইয়া, তাহাকে পুনরায় পাত্রস্থা করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে আসিয়াছিলাম। আপনারা মুখে কিছু না বলিয়া, আমার আহারার্থ গো-বৎস আনিয়াই যথার্থ উত্তর প্রদান করিয়াছেন।"

সমাগত পণ্ডিতদিগের মধ্যে জনৈক প্রাচীন বলিলেন, "মহারাজের আগমন উদ্দেশ্য পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া আমরা এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছি। বিধবা-বিবাহ যেমন শাস্ত্রসঙ্গত, গো-ভক্ষণও তদ্রূপ অশাস্ত্রীয় নহে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে গোমাংস ভক্ষণ করা দূরে থাক, হিন্দুমাত্রই এই কথা শ্রবণ করিলে হস্ত দ্বারা কর্ণাচ্ছাদন পূর্ব্বক সেই স্থান পরিত্যাগ করিবে। যুগভেদে ধর্ম্ম এবং তদনুসারে সমাজ গঠিত হইয়াছে। বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রে উল্লেখ থাকিলেও বহুকাল হইতে সমাজ কর্ত্তৃক তাহা রহিত হইয়াছে। পরন্তু ইহা রহিত হওয়ায় সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইয়াছে। মহারাজ স্বয়ং অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ এবং মহাবিচক্ষণ, আপনাকে আমরা আর কত বুঝাইব ?"

রাজা ব্রাহ্মণদিগকে অর্থ বস্ত্র এবং দীন দরিদ্রগণকে নানা প্রকার দান করিয়া ক্ষুণ্ণ মনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

রাজা রাজবল্লভের কোন কোন কীর্ত্তির শেষ চিহ্ন এখনও এদেশে দৃষ্ট হয়। নলছিটী বন্দরে তাঁহার স্থাপিত পাষাণময়ী এক তারামূর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। প্রতিমাখানি খর্ব্বাকৃতি এবং কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত ; দেখিলে প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য পালবাবুগণ এই দেবী প্রতিমার বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারী। ঝালকাঠীর নিকট সুতালড়ী গ্রামে রাজার কাছারী বাড়ীর কতক কতক চিহ্ন আছে। জলাশয়টী প্রায় সম্পূর্ণ সমভূমি হইয়াছে, ইষ্টকালয়ের কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গোলাবাড়ী বোজরগউমেদপুরের রাজধানী স্বরূপ ছিল। এই স্থানে ব্যবসাবাণিজ্য উপলক্ষে অনেক ধনাঢ্য বণিক

বাস করিত। কতিপয় ইউরোপীয় বণিকও এই স্থানে নানাবিধ ব্যবসা করিত; তাহাদিগকে কুঠিয়াল বলিত। মিঃ বেভারিজ্ এই সমস্ত ইংরাজ বণিকের যে প্রকার অমানুষিক অত্যাচার বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বড় ভয়ানক। কুঠিয়ালগণ স্থানীয় প্রজাবর্গকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া সুন্দর বনে অথবা লবণের জ্বালে কাজ করিতে দিত; তাহাদের প্রায়ই পারিশ্রমিক দিত না, কখনও বা অর্দ্ধাংশ প্রদান করিত। জমীদারের নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়া, অথবা কোন প্রকার পাট্টা গ্রহণ না করিয়া লবণের "তাফাল" প্রস্তুত করিত। কর চাহিলে দেওয়া দূরে থা'ক, স্থানীয় নায়েব ও তদনুচর প্রভৃতির উপর যথেষ্ট পীড়ন হইত। কোন কোন কুঠিয়াল "আমাদের কুঠিতে চুরি হইয়াছে" বলিয়া ভাণ করতঃ জমীদারের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবী করিত, টাকা না দিলে পেয়াদা পাঠাইয়া অত্যাচার করিত; এবং প্রত্যেক পেয়াদার দৈনিক খরচ বাবদ তলবানা আদায় করিয়া লইত। জমীদারের খাজানা না দিয়া, প্রজারা কুঠিতে আশ্রয় লইলে, কুঠিয়ালগণ তাহাদের ছাড়িয়া দিত না, সুতরাং খাজানা আদায়ের ব্যাঘাত হইত। কুঠিয়ালের মধ্যে ডবিন নামক জনৈক ইংরাজের অত্যাচার অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল। এই পিশাচের পাশবিক অত্যাচারে স্থানীয় কুল ললনাগণ দেবদুর্লভ সতীত্বরত্ন হইতে বঞ্চিতা হইয়াছিলেন। এই জন্য অনেক প্রজা পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল, সুতরাং জমীদারের রাজস্ব অনেক পরিমাণে বাকী পড়িল।

মিঃ বেভারিজ্ সরকারী কাগজ হইতে, জমীদারগণের প্রদত্ত একখানি দরখাস্তে উল্লিখিত বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; * আমরা তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।

"By reason of the oppressions of the factories of the Company and many other English traders, all the inhabitants fled: the people of the factories take from the merchants what they please at half price; cut down bamboos and trees belonging to the inhabitants, and take them away by force; if any one complain, they punish him for it. They press the inhabitants, and

* H. Beveridge's History of Bakarganj, pages 95—96.

carry them in the woods of Sundarban, paying them only half their wages. They take possession of land in the Sundarban and make *tafalls* of salt for which they pay no rent. They seize the salt of the tafalls of the pargana and of the inhabitants. They force the inhabitants to take tobacco, salt, and other articles, and refuse to pay the legal duties on the trade which they carry on. If we demand a sight of the Company's *dustak*, they beat us with bamboos. Some of them pretend that they have been robbed and insist on our making restitution, placing peons upon us, and putting us to a good expense. They judge causes, impose and exact fines. They send peons and seize the Naib of the pargana, taking for *talabana* (peons' fees) one rupee every day. They grant guards to many of the taluqdars and mahajuns in the country, by which means we are prevented from collecting the King's revenues; and many inhabitants take shelter in the factories, and thereby avoid paying the rents. There is little chunam made within the distance of four days' journey from hence, the whole quantity made within the pargana not exceeding 2000 maunds. Notwithstanding, Mr. Dobins has established two factories within my pargana, committing every species of injury and oppression, and violating the women of the inhabitants, and erecting factories in places where none ever were before, drives away the inhabitants, and upon the information of many people he takes upon him to recover debts of five and ten years' standing."

রাজা রাজবল্লভের সাত পুত্র, * সকলেই কৃতিমান; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র রাজোপাধি ধারণ করিতেন। দ্বিতীয় কৃষ্ণদাস, নবাব কর্ত্তৃক 'রাইরাইয়া জঙ্গবাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজ-

* (১) রাজা রামদাস, (২) রাজা কৃষ্ণদাস, (৩) রাজা গঙ্গাদাস, (৪) রায় রতনকৃষ্ণ (৫) রায় গোপালকৃষ্ণ, (৬) রায় রাধামোহন এবং (৭) কেবলরাম বাবু।

বল্লভের মৃত্যুর পর, তদীয় বংশধরগণের মধ্যে ভয়ানক অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হইল। এই গৃহবিবাদই তাঁহাদের সর্ব্বনাশের মূল।

রাজবল্লভের মৃত্যুর সময়ে তাঁহার সাতপুত্র মধ্যে কেহ জীবিত ছিলেন কিনা, ইহা লইয়া কতক মতদ্বৈধ দেখা যায়। সুপ্রসিদ্ধ মুতক্ষরীণপ্রণেতা গোলামহোসেন খাঁ বলেন যে, মীরকাসিম, রাজবল্লভকে তাঁহার সাতপুত্রসহ একই সময়ে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছেলেন। * কিন্তু মিঃ বেভারিজ্ বলেন যে একমাত্র কৃষ্ণদাস, পিতার সঙ্গে নিহত হইয়াছিলেন। † রায় গোপালকৃষ্ণের পুত্র পীতাম্বর সেন, বিগত ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে জুনমাসে মহামান্য ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী বাহাদুরের নিকট, দুঃখকাহিনীপূর্ণ এক দরখাস্ত করিয়াছিলেন। সেই দরখাস্তে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি রাজবল্লভের বংশধর; কোম্পানী বাহাদুরের হিতকামনা এবং সাহায্য করার জন্য রাজবল্লভকে এবং তৎপুত্র কৃষ্ণদাসকে নবাব মীরকাসিম গঙ্গায় ডুবাইয়া বধ করিয়াছিলেন, তৎপর আগা রেজা নামক জনৈক কর্ম্মচারী পাঠাইয়া তাঁহার (রাজবল্লভের) সম্পত্তি প্রভৃতি সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন। আমরা সেই দরখাস্তের ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি।

"In a petition of Pitambar Sein, Dated June 1798, he says "We are the descendants of Maharajah Raj Ballab, who was a wellwisher of the Company, in consequence of which Kassim Ally Khan drowned him and his son Kissen Das Bahadur in the Ganges, and having deputed Aka Reza, confiscated to the State his house and Property." ‡

নবাব মীরকাসিম যখন এই সকল অমানুষিক হত্যাকাণ্ড সংসাধিত করেন, তখন গোলাম হোসেন খাঁ মুঙ্গেরে ছিলেন না। এই সকল ঘটনা তিনি শুনিয়া লিখিয়াছিলেন। আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই যে রাজবল্লভ যেমন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন, তৎপুত্র কৃষ্ণদাসও তদ্রূপ

* Vide Siyar ül-Mutaakhirin, Vol II. Page 492.

† Kissen Dass escaped on this occasion only to die a violent death some years afterwards, for he and his father were seized by Mir Kassim and drowned in the Bhagireti at Monghyr. Raja Gopal Kissen, another son, thereon succeeded to the charge of the Property.—H. Beveridge's History of Bakarganj, Page, 97.

‡ Extract from the foot note of H. Beveridge's History of Bakarganj, Page 97.

ছিলেন ; অধিকন্তু কৃষ্ণদাসই সকল অনর্থের মূল ; সুতরাং কেবলমাত্র তাঁহারই, তদীয় পিতার সহিত নিহত হওয়ার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ মিঃ বেভারিজ্ যে দরখাস্তের অনুবলে লিখিয়াছেন, সেই দরখাস্ত রাজবল্লভেরই পৌত্র কর্ত্তৃক লিখিত। পিতামহের কথা পৌত্রেরই অধিক জানিবার সম্ভাবনা, সুতরাং আমরাও উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি।

রাজা রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসের শোচনীয় পরিণামের পর তাঁহাদের সম্পত্তি রায় গোপালকৃষ্ণের কর্ত্তৃত্বাধীন হয়। কিন্তু তিনি অধিক দিন জীবিত ছিলেন না, ১১৯৪ বঙ্গাব্দের ২৪শে আষাঢ় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর এই বিপুল সম্পত্তির কেহ অধিনায়ক রহিলেন না। গোপাল-কৃষ্ণের পুত্র ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্রগণের মধ্যে এই সমস্ত সম্পত্তির কর্ত্তৃত্ব লইয়া তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইল। কেহ কাহারও অধীনে না থাকিয়া, সকলেই স্বীয় স্বীয় প্রাধান্য বিস্তারের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। যাহার যেরূপ ক্ষমতা, তিনি তাহা পরিচালনা করিয়া জমীদারী হইতে নিজ নিজ দখলে পৃথক পৃথক তালুক করিতে লাগিলেন। সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইলে যেমন বিচক্ষণ বুদ্ধিমানেরও মস্তিষ্ক বিকৃত হয়, ইহাদেরও তাহা ঘটিল। তখন প্রপীড়িত অংশীদারগণ কোম্পানী বাহাদুরের নিকট অংশানুসারে জমীদারীর বণ্টন প্রার্থনা করিলেন।

বহু গোলযোগ ও অনেক মোকদ্দমার পর ঢাকার সহকারী কলেক্টর (Assistant Collector) মিঃ টম্সন্ বহু শ্রম ও আয়াসে বণ্টনকার্য্য নিষ্পন্ন করেন। কিন্তু অত্যল্পকাল পরেই জমীদারগণ এক দরখাস্ত দাখিল করেন যে টমসন সাহেব জমা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়াইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা রাজকর দিতে অশক্ত। বিশেষতঃ ঝড়বৃষ্টি এবং জলপ্লাবনে প্রচুর শস্যহানি হইয়াছে, সুতরাং কোনমতেই ধার্য্য কর আদায় করিতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে সেই বৎসর জলপ্লাবন প্রভৃতিতে শস্যের যেরূপ ক্ষতি হইয়াছিল তদপেক্ষা জমীদারী বিভাগের পূর্ব্বে, রাজবল্লভের বংশধরগণ কর্ত্তৃক শস্যশালিনী জমিগুলি স্বীয় স্বীয় তালুকভুক্ত হওয়ায় বেশী ক্ষতি হইয়াছিল। রায় গোপালকৃষ্ণের কর্ত্তৃত্বাধীনে ইহার প্রথম সূচনা হয়। তৎকালে বোজরগউমেদপুর পরগণার অধিকাংশস্থল সুন্দরবন ছিল ; তাহাকে জঙ্গলবাড়ী তালুক বলিত। এই তালুকের কোন কর ছিল না বলিয়া

গোপালকৃষ্ণ জমীদারীর লাভজনক অংশসমূহ অতি গোপনে এই তালুকের অন্তর্ভূক্ত করেন।

টম্‌সন্ সাহেব জমীদারী বিভাগসময়ে ইহা জানিতে পারেন নাই, এখন অনুসন্ধান দ্বারা প্রকৃত কারণ অবগত হইয়া বড় অপ্রতিভ হইলেন। বাস্তবিক জমীদারীর সদর খাজানা ঠিকই ছিল, কিন্তু শস্যশালিনী ভূমি প্রায় সমস্তই উল্লিখিত জঙ্গলবাড়ী তালুক এবং পক্ষগণের স্বীয় স্বীয় তালুকের অন্তর্গত ছিল। টমসন সাহেব বিষম গোলে পড়িলেন। এই সমস্ত গোলযোগ মীমাংসা করিয়া পুনরায় বণ্টন করা একপ্রকার অসম্ভব হইল।

বোজরগউমেদপুর শীঘ্রই বাকীকরের দায়ে নিলামে উঠিল। ঢাকার তদানীন্তন কলেক্টর মেসি সাহেব (Mr Massie) এই জমীদারী নিলামে উঠাইলে কোন ক্রেতাই অগ্রসর হইল না। এই প্রকার প্রত্যহ এক ঘণ্টা করিয়া তিন দিন যাবৎ নিলাম ডাকাডাকি হইল। কেহই খরিদ করিতে আসিল না দেখিয়া ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে নবেম্বর মাসে গবর্ণমেণ্ট এক টাকা মূল্যে নিলাম খরিদ করিলেন। গবর্ণমেণ্ট ইহার দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮০১ খৃঃ অব্দে অধীনস্থ তালুকগুলিও নিলাম করাইলেন। এই তালুক গুলির তৎকালীন সংখ্যা ৫৯৪।

গবর্ণমেণ্ট প্রথমতঃ এই তালুকগুলির রাজস্ব, খাসে আদায় করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাহাতে যেমন বিস্তর অর্থব্যয় তদ্রূপ অন্যপ্রকার অসুবিধা উপস্থিত হইল। তখন এই সমস্ত তালুক পৃথক করিয়া পৃথক নম্বরে তৌজীভুক্ত করা হইল ; ইহাই বোজরগউমেদপুরের খারিজা তালুক। এই খারিজা তালুকগুলিই বিশেষ লাভজনক, কারণ ইহার অধিকাংশ ভূমিই শস্যশালিনী। এই তালুকগুলির মধ্যে আয়লা, ফুলঝুরি, বুড়ামজুমদার, বামনা, পাদ্রিশিবপুর এবং শ্রীরামপুর প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

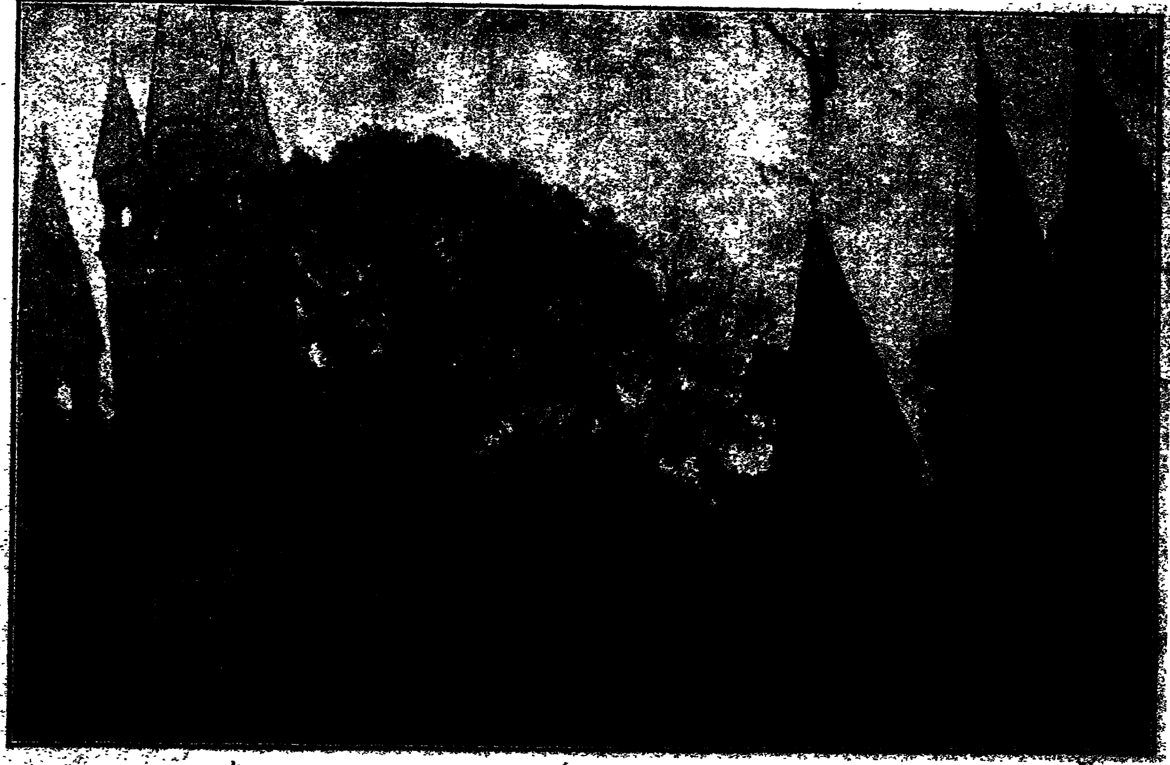
পাদ্রিশিবপুর সম্বন্ধে একটু প্রাচীন ইতিহাস আছে। রাজবল্লভের সময়ে এই পরগণার কতক প্রজা বিদ্রোহী হইবার উপক্রম করে। এই প্রজারা যেরূপ ধনাঢ্য, তদ্রূপ দুর্দ্ধর্ষ। মহারাজ রাজবল্লভ অনেক চেষ্টা করিয়াও ইহাদিগকে দমন করিতে পারিলেন না। তখন জাতিনাশের ভয় প্রদর্শন করিবার জন্য কয়েকজন পার্ত্তুগীজ আনয়ন করেন। এই খৃষ্টানগণ রাজাজ্ঞাক্রমে বিদ্রোহী প্রজাদের বাটীর পার্শ্বে স্বীয় স্বীয় বাসস্থান স্থাপন

করিলেন এবং তাঁহাদের ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহার্থ একজন যাজক আনাইলেন। ধর্ম্মযাজকের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহের জন্য ইহারা রাজার নিকট কতক ভূমি প্রার্থনা করিলেন। রাজবল্লভ প্রার্থনানুসারে কতক ভূমি হাওলা স্বরূপ প্রদান করেন। রাজবল্লভের মৃত্যুর পর ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে তদীয় অন্যতম পুত্র গোপালকৃষ্ণ এই হাওলা এবং তৎসংলগ্ন আরও অনেক ভূমি তালুক-স্বরূপ পাট্টা প্রদান করেন। পেদ্রু গণসেল্‌ভ্‌ (Pedro Gonsalvis) নামক এক ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম তথাকার গীর্জ্জা নির্ম্মাণ করেন। পাট্টা গ্রহণের পূর্ব্বে খৃষ্টানদের মধ্যে পরস্পরের মনোমালিন্য উপস্থিত হইলে ফ্রে রেফেল ডেস্ এঞ্জুস্ (Fray Raphail Das Anjos) নামক ধর্ম্মযাজক নামে পাট্টা গৃহীত হয়, ইনিই সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মযাজক নিয়োজিত হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান ডিসিল্‌ভা সাহেবগণের পূর্ব্বপুরুষ ডোমিঙ্গো ডিসিল্‌ভা যে প্রকার ধর্ম্মপ্রাণ পুরুষ ছিলেন, তদ্রূপ বৈষয়িক কার্য্যেও তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। তাঁহার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শিবপুরস্থিত সাহেবদিগের সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর উদয় হইল।

বোজরগউমেদপুরের ক্ষুদ্র বৃহৎ ভূম্যধিকারীর সংখ্যা অনেক; তন্মধ্যে ঢাকার ও সায়েস্তাবাদের নবাব, জলায়ের চন্দ্রকান্ত বাবু, রহমৎপুরের বরদাপ্রসন্ন ও সারদাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি, বামনার আফ্‌সারউদ্দীন চৌধুরী, বরিশালস্থ মিঃ এডওয়ার্ড ব্রাউন, গ্রন্থকার ও তদীয় ভ্রাতৃগণ, শিবপুরের ডিসিল্‌ভাগণ এবং খিদিরপুরের রাজাবাহাদুর প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই পরগণার মোট রাজস্ব ৩০০৪৪৬।৵৪ পাই মাত্র।





নবদ্বীপ—(রাণের বাড়ী)

৪। সেলিমাবাদ।

যৎকালে চন্দ্রদ্বীপ ধনধান্যপূর্ণ বিশাল জনপদ, তৎকালে তাহার পশ্চিম-দিকে তত্তুল্য আর একটী বিশাল ভূখণ্ড জলা অবস্থায় পতিত ছিল; ইহাই সেলিমাবাদ। কেহ কেহ বলেন, যে চন্দ্রদ্বীপ হইতেই সেলিমাবাদ বাহির হইয়াছে, কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে, চন্দ্রদ্বীপের প্রাচীন ইতিবৃত্ত এবং এসিয়াটিক্ সোসাইটীর জার্ণেল্এ প্রকাশ যে, সেলিমাবাদ চন্দ্রদ্বীপ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং সংশ্রব রহিত। *

এই পরগণার অধিকাংশস্থল, একদা উত্তাল তরঙ্গময়ী সুগন্ধার গর্ভে বিলীন ছিল। নৈসর্গিক কারণে, ইহা ক্রমশঃ উত্থিত হইয়া কালে মৃত্তিকাকারে পরিণত হইয়াছে। তাই ইহার অধিকাংশ স্থান "সোন্ধার কূল" বলিয়া বিখ্যাত।

আমরা সুগন্ধার অবস্থিতি লইয়া একটু গোলে পড়িয়াছি। এই নদী পূর্ব্বে যে, অতীব বিস্তীর্ণা এবং বেগবতী ছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। অতি পুরাকালে, অস্মদ্দেশে একমাত্র সুগন্ধা ব্যতীত অন্য কোন নদ-নদীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সুগন্ধা পতিতপাবনী জাহ্নবীর শাখা-নদী এবং সর্ব্বপাপ বিনাশিনী। পীঠমালা এবং কালিকা পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে এই সুগন্ধার উল্লেখ স্পষ্টই আছে। †

কিন্তু এই সুগন্ধার কোন অস্তিত্ব এখন পাওয়া যায় না। তবে এই সেলিমাবাদ পরগণার মধ্যে যতগুলি নদীর চিহ্ন আছে, তন্মধ্যে কেহ কেহ বর্ত্তমান ঝালকাঠীর প্রান্তর্বাহী নদীকে সুগন্ধা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বাস্তবিক ইহার কোন সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না।

এই নদীর বিস্তৃতি সম্বন্ধে সর্ব্বজনসম্মত এক জনপ্রবাদ আছে। পোনাবালিয়া গ্রামের সন্নিহিত শ্যামরাইলের শিবলিঙ্গ এবং শিকারপুরের উগ্রতারা দেবী এই নদীর উভয় তটে স্থাপিত। ইহার মধ্য দিয়া বেগবতী স্রোতস্বতী প্রবাহিতা ছিল। 'গুপ্তপ্রেশ' পঞ্জিকা-প্রণেতা কিন্তু স্পষ্টাক্ষরে

---

* Extract from Asiatic Society of Bengal.

† সুগন্ধায়াং নাসিকামেদেব ত্র্যম্বক ভৈরব। সুন্দরীসা মহাদেবী সুনন্দা তত্র দেবতা॥

কালিকাপুরাণ।

সুগন্ধাকে গঙ্গার শাখা এবং বর্ত্তমান সোনাবালিয়ার সন্নিহিত প্রবাহিনীই বলিয়াছেন। *

চন্দ্রদ্বীপ পরগণা হইতে সেলিমাবাদ যে, আধুনিক তাহার আর সন্দেহ নাই। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দের পূর্ব্বভাগে ইহা জনসমূহের বসতিরূপে পরিণত হয়; ইহার পূর্ব্বে কোন কোন স্থান বিল, এবং সুন্দরবনে পরিণত ছিল।

যখন যুবরাজ সেলিম বিদ্রোহী হইয়া অস্মদ্দেশে আগমন করেন, তাঁহারই আদেশানুসারে তদীয় অনুচরবর্গ কর্ত্তৃক এই পরগণার অধিকাংশ স্থল আবাদ হয়। তাই তাঁহারই নামানুসারে এই ভূভাগের নামকরণ হইয়াছিল। ঐতিহাসিক প্রবর আবুলফজেল প্রণীত আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে সেলিমাবাদের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না, সুতরাং এই পরগণা উক্ত গ্রন্থ প্রণয়নের পরবর্ত্তীকালে অর্থাৎ ১৬০৩ খৃঃ অব্দের † পরে গঠিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। ১৬০৫ খৃঃ অব্দে যুবরাজ সেলিম জাহাঙ্গীর নাম ধারণপূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেলিমাবাদ তাঁহার যৌবরাজ্যের সময়ে তাঁহারই পূর্ব্ব নামানুসারে গঠিত হইয়াছে, অতএব ১৬০৩-১৬০৫ খৃঃ অব্দ সেলিমাবাদের সৃষ্টিকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

ব্লকম্যান সাহেব বলেন যে, পূর্ব্বে এই পরগণা সুলইমানাবাদ নামে অভিহিত হইত। সুলইমান নামক জনৈক রাজপুরুষ পূর্ব্বেই এই স্থান আবাদ করাইয়াছিলেন। কিন্তু নিজ নামের পরিবর্ত্তে ভাবি সম্রাটের সন্তোষার্থে তাঁহারই নামানুসারে এই স্থানের নাম রাখিয়াছিলেন।

সুলইমান নামক কোন রাজপুরুষ মোগল সম্রাটের প্রতিনিধি স্বরূপ বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন কিনা তাহা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। আগা সুলইমান নামক একজনের কথা, সিয়ার-অল-মুতক্ষীরণে আছে, কিন্তু তিনি সম্রাট্ মহম্মদ সাহের উজীর ছিলেন। আকবরের সময়েও সুলইমান নামক এক রাজপুরুষের উল্লেখ আছে, কিন্তু তিনি উড়িষ্যাপ্রদেশের একজন সামান্য কর্ম্মচারী ছিলেন। মোগল রাজত্ব সময়ে

---

* 'গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা' ১৩১০-১১ বঙ্গাব্দ।

† সম্রাট আকবরের রাজত্বের সপ্তচত্বারিংশৎ বর্ষে আইন-ই-আকবরি সমাপ্ত হয়। ১৫৫৬+৪৭= ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দ।—Gladwin's translation of Ain-i Akbari, Preface i-ii.

বঙ্গদেশের রাজকার্য্য অথবা যুদ্ধবিগ্রহাদিতে আমরা সুলইমান নামক কাহাকেও দেখিতে পাই না। * ব্লকম্যান সাহেব কোথা হইতে এই সুলইমানকে উপস্থিত করিলেন তাহা বুঝিতে পারি না। সুলইমানাবাদ বলিয়া এই পরগণার উল্লেখ কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং সেলিম কর্ত্তৃক এই স্থান আবাদ হওয়াই যথার্থ বলিয়া মনে হয়। এই পরগণার বিস্তৃতি বড় কম নহে। পূর্ব্বে চন্দ্রদ্বীপ, পশ্চিমে খুলনা জিলার অন্তর্গত বাগেরহাট, উত্তরে বাঙ্গরোড়া এবং দক্ষিণে বোজরগউমেদপুর। এই পরগণা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও কয়েকটী পরগণা বাহির হইয়াছে।

বাদসাহী আমলে এই পরগণার অনেক স্থলে লবণের জ্বাল ছিল, এবং তজ্জন্য রাজকোষে বিলক্ষণ অর্থাগম হইত। আইন-ই-আকবরিতে সরকার ফতিহাবাদ অন্তর্গত "হাসিল নিমক" বলিয়া একটী মহলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার রাজস্ব বার্ষিক ২৭৭,৭৫৮ ডাম, অর্থাৎ ৬৯৪৩৸৶০ আনা; ইহা হইতেই বোধ হয় সেলিমাবাদের সৃষ্টি। সেলিমাবাদে যে পূর্ব্বে লবণের জ্বাল ছিল এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। † যাহারা পূর্ব্বে লবণের জ্বাল দিত তাহাদের বংশধরগণ এখনও মলঙ্গী নামে অভিহিত। এই পরগণার অধিকাংশ স্থল যখন বসতিহীন অবস্থায় পতিত ছিল তখন কলিকাতার সন্নিহিত দেবগ্রাম (দিগঙ্গা) নিবাসী জনৈক কায়স্থসন্তান এইস্থানে আগমন করেন। ইনিই বর্ত্তমান রায়েরকাঠীর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

ইহার নাম ও অভ্যুত্থানের সময় লইয়া বড় গোল দেখিতে পাওয়া যায়। বেভারিজ্ সাহেবের মতানুসারে ইঁহার নাম শত্রাজিত রায়। কিন্তু বর্ত্তমান রায়েরকাঠীর রাজবংশের অন্যতম বংশধর রাজা অদ্বৈতনারায়ণ বলিয়াছেন যে, ইঁহার নাম শ্রীনাথ রায়। রাজা অদ্বৈতনারায়ণ যে বংশতালিকা প্রদান করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে শত্রাজিত শ্রীনাথ রায়ের চারি পুরুষ অধস্তন।

* বঙ্গের শেষ পাঠান নৃপতি দাউদসাহের পিতা সুলইমনসাহ কিরানী ১৫৬৪ হইতে ১৫৭৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনিই কি ব্লকম্যানকথিত সুলইমন?

† "Besides Sandeep, there was also a great salt-mart at Sondercool, a vast tract of land west of Chandradwip..............." Extracts from the Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol III. 1868.

কথিত আছে, শ্রীনাথ রায় একটী দরিদ্র বালক ছিলেন। দারিদ্র্যের কঠোর নিপীড়নে উঁহার জননী একমাত্র শিশু পুত্র ক্রোড়ে লইয়া ভিখারিণীর ন্যায় গৃহ হইতে বাহির হইলেন। নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে এক ব্রাহ্মণের দাসীবৃত্তি স্বীকার পূর্ব্বক জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। শ্রীনাথও ব্রাহ্মণের দৈনিক পূজার জন্য পুষ্প প্রভৃতি আহরণ করিয়া মধ্যাহ্নে গরু চরাইতে মাঠে গমন করিতেন। ব্রাহ্মণের অনেকগুলি গাভী ছিল। তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ, দুগ্ধদোহন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য শ্রীনাথ নির্ব্বাহ করিতেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহার জননী সাহায্য করিতেন মাত্র।

একদিন শ্রীনাথ পরিশ্রমাতিশয্যে এবং প্রখর সূর্য্যোত্তাপে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া নিকটবর্ত্তী এক বটবৃক্ষমূলে নিদ্রিত হইলেন। সূর্য্য ক্রমশঃ মধ্যাকাশ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িলেন, তথাপি বালকের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। দেখিতে দেখিতে পশ্চিম গগনস্থ সূর্য্যকিরণ বৃক্ষকাণ্ড এবং স্বল্পাচ্ছাদিত পত্রাবলীর মধ্য দিয়া নিদ্রিত বালকের মুখোপরি পতিত হইল। নিকটে এক গর্ত্ত ছিল, তথা হইতে এক বিষধর কৃষ্ণসর্প বহির্গত হইয়া ছত্রের ন্যায় স্বীয় ফণা বিস্তারপূর্ব্বক প্রখর সূর্য্যকিরণ হইতে বালকের মুখে ছায়া প্রদান করিতেছিল। জনৈক ব্রাহ্মণ অনতিদূরে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া এই অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য অবলোকন করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া হউক, অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃই হউক, সর্প গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণ নিদ্রিত শ্রীনাথের নিকট আগমন করিয়া দেখিলেন যে, বালক গভীর নিদ্রায় মগ্ন রহিয়াছে। প্রথম তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, বালক সর্পদষ্ট হইয়া মৃতাবস্থায় পড়িয়া আছে। কিন্তু তাহাকে অক্ষত শরীরে নিদ্রিত দেখিয়া ব্রাহ্মণ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মনে ভাবিলেন, এই বালক সাধারণ মনুষ্য নহে, কালে নিশ্চয়ই এক জন ভাগ্যবান পুরুষ হইবে। বালকের প্রশস্ত ললাট, আজানুলম্বিত বাহু এবং সুঠাম গৌরকান্তি দেখিয়া ব্রাহ্মণের এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইল। তিনি ধীরে ধীরে নিকটে আগমন করিয়া বালকের নিদ্রাভঙ্গ করিলেন এবং তাহার নাম, ধাম, জাতি ব্যবসা ইত্যাদি সম্যক্ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীনাথও ধীর নম্রভাবে যথাযথ উত্তর প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া, বালকের আকৃতি পুনরায় পর্য্যবেক্ষণ করিলেন এবং একটু চিন্তা

করিয়া বলিলেন "তোমার অদৃষ্ট ভাল; আমি ব্রাহ্মণ, তোমার নিকট কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছি।"

শ্রীনাথ বলিলেন, "ঠাকুর, আমার জননী ব্যতীত এজগতে আমার আর কেহ নাই। তিনি ঐ ব্রাহ্মণবাড়ী দাসীত্ব করিতেছেন, আমি ব্রাহ্মণের গো পালন করিয়া থাকি; আমাদের ন্যায় দরিদ্র আপনাকে কি ভিক্ষা প্রদান করিবে? অনুগ্রহ পূর্ব্বক যদি আমার সহিত জননীর নিকট গমন করেন, তাহা হইলে তিনি যে প্রকার আদেশ করিবেন, আমি তৎক্ষণাৎ তাহাই শিরোধার্য্য করিব।"

ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন "তাহাই হউক, তোমার জননীর নিকট চল।"

এদিকে সন্ধ্যাও সমাগতা হইল, বালক শ্রীনাথ গাভীগুলি লইয়া ব্রাহ্মণের সহিত গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

বাড়ী উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ, শ্রীনাথের জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মা, তোমার এই বালক সামান্য নহে। ইহার যে সকল সুলক্ষণ দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে এই বালক নিশ্চয়ই অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইবে। আমি তোমার পুত্রের নিকট কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিলাম; কিন্তু সে তোমার বিনা আদেশে প্রার্থনা পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইতেছে না, তাই তোমার নিকটই আগমন করিয়াছি।"

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া শ্রীনাথের জননী যারপর নাই আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। তিনি প্রথমে কোন উত্তরই প্রদান করিতে পারিলেন না। কিয়ৎ কাল পরে বলিলেন "ঠাকুর, আমাদের ন্যায় দীন দরিদ্র বোধ হয় আর কেউ আছে কিনা সন্দেহ। আমি ভদ্রবংশ-মহিলা, এই বালকও ভদ্রবংশ-জাত কায়স্থ সন্তান; দুরদৃষ্ট বশতঃ এখন এই অবস্থা। আমাদের এমন কি আছে যে ব্রাহ্মণকে দান করিয়া কৃতার্থ হইব"?

ব্রাহ্মণ তখন শ্রীনাথের জননীর নিকট, সর্পের ফণা বিস্তার ও শ্রীনাথের সামুদ্রিক লক্ষণগুলি বলিলেন। শ্রীনাথের জননী বিশেষ বুদ্ধিমতী; স্থির মনে সকল শ্রবণ করিয়া বলিলেন "ঠাকুর, আপনার আশীর্ব্বাদে যদি ইহার অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়, তবে আপনিই ইহার কুলপুরোহিত হইবেন, এবং এতদিন যাঁহার অন্নে শরীর ধারণ করিতেছি, এবং যিনি পিতার ন্যায়

পালন করিতেছেন ভগবানের কৃপায় যদি কখনও সুদিন উপস্থিত হয়, তবে তিনিই বালককে দীক্ষা প্রদান করিবেন।”

শ্রীনাথের গর্ভধারিণীর এই প্রকার সুযুক্তিপূর্ণ উত্তর শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ, তাহাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন। *

এই ঘটনার কতিপয় বৎসর পরে নবাব সদলে “সফরে” বহির্গত হইলেন। যে গ্রামে শ্রীনাথ বাস করিতেন সে স্থানে নবাবের তাঁবু পড়িল। একদিন দৈবাৎ শ্রীনাথ রায় নবাবের সম্মুখবর্ত্তী হইলে, তাহার প্রতি নবাবের কেমন একটা স্নেহদৃষ্টি পড়িল। তাহাকে নিকটে আনয়ন করিয়া সবিশেষ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীনাথ ধীর এবং বিনম্রভাবে তাঁহাকে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলেন। স্নেহশীল নবাব তাহার বিনয় ও সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে স্বীয় সঙ্গে যাইতে অনুমতি করিলেন। জননীর বিনানুমতিতে শ্রীনাথ কোন উত্তর করিলেন না। নবাব তাহার মনোগত ভাব বুঝিয়া তাহাকে জননীর অনুমতি লইয়া আসিতে বলিলেন।

গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীনাথ জননীর নিকট সকল কথা বলিলেন। সর্প ফণা বিস্তারের ঘটনা ও ব্রাহ্মণের ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার অন্তরে সর্ব্বদাই জাগরূক ছিল; এখন নিজ তনয়ের প্রতি নবাবের হঠাৎ অনুগ্রহের সংবাদে ভাবী শুভলক্ষণ বোধ করিলেন। তিনি পুত্রকে নবাবের সমভিব্যাহারে গমন করিতে হৃষ্টান্তঃকরণে অনুমতি প্রদান করিলেন।

নবাব, মীর মুন্সীকে ডাকিয়া বালককে লেখাপড়া শিক্ষা দিতে আদেশ করিলেন। শ্রীনাথ ইতিপূর্ব্বে অবকাশমত যৎসামান্য বাঙ্গালা লেখা পড়া অভ্যাস করিয়াছিলেন। মীর মুন্সীর অনুগ্রহে এবং অসাধারণ মেধা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে অতি অল্পকাল মধ্যেই পার্শী ভাষায় বিশেষ উন্নতি লাভ করিলেন।

শিক্ষা সমাপ্ত হইলে নবাব তাহাকে একটী কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। শ্রীনাথ রাজাদেশে অতি অল্পকাল মধ্যেই সেই কার্য্যটী অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিলেন। নবাব পূর্ব্বেই তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন,

* এই ব্রাহ্মণই ঝালকাঠী থানার অন্তর্গত তারপাশা নিবাসী রাজপুরোহিত বংশের আদিপুরুষ। ইঁহার বংশধরগণ এখনও এইস্থানে বর্ত্তমান আছেন।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহার এই প্রকার জটিল কার্য্যে কৃতকার্য্যতা লাভে তাঁহার স্নেহ শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। তিনি শ্রীনাথকে নিকটে আনয়ন করিয়া বলিলেন "শ্রীনাথ, আমি তোমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি, পুরস্কার প্রার্থনা কর।"

তখন মীর মুন্সী নবাবকে বলিলেন "জাঁহাপনা, শ্রীনাথের প্রতি হুজুরের যথেষ্ট অনুগ্রহ হইয়াছে। সম্প্রতি সেলিমাবাদ নামক স্থান জঙ্গলাকীর্ণ এবং বিল অবস্থায় পতিত আছে। ইহা শ্রীনাথকে প্রদান করিলে বোধ হয়, ইহার পক্ষে যথেষ্ট পুরস্কার হইতে পারে।"

নবাব তখনই সেইরূপ আজ্ঞা করিলেন, অচিরাৎ পাঞ্জাঙ্কিত পরওয়ানা প্রদান করিয়া নবাব পুনরায় শ্রীনাথকে বলিলেন "যে ভূসম্পত্তি তোমাকে জমীদারী প্রদান করিলাম, বিবেচনা করিয়া চলিলে তুমি সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে; যদি কখনও কোন বিপদে পতিত হও তখন আমার নিকট আসিও"।

জমীদারীর সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীনাথ সানন্দচিত্তে জননীর নিকট আগমন পূর্ব্বক মাতৃ চরণে সকল কথা জ্ঞাপন করিলেন। আহ্লাদে জননীর হৃদয় নাচিয়া উঠিল এবং আপনা আপনি চক্ষুর্দ্বয় হইতে হর্ষাশ্রু বাহিতে লাগিল। সর্পের ফণা বিস্তার এতদ্দিনে সার্থক হইল, আজ সত্য সত্যই তাঁহারই শ্রীনাথ রাজ্যেশ্বর হইতে চলিল।

শ্রীনাথ এই দেশে আগমন করিয়া নবাব প্রদত্ত অর্থদ্বারা সুন্দরবন আবাদ করিলেন, এবং খাল কাটাইয়া জলাভূমির উর্ব্বরতা সাধন করিতে লাগিলেন। তখন দলে দলে প্রজাগণ আসিয়া তথায় আবাস ভূমি স্থাপন করিতে লাগিল। শ্রীনাথের যত্নে অচিরাৎ এই নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্য জন পরিপূর্ণ বিশাল ভূখণ্ডে পরিণত হইল।

উল্লিখিত বিবরণ কিম্বদন্তী মাত্র। সর্পের ফণা বিস্তার, ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ভবিষ্যদ্বাণী প্রভৃতি কতকটা অনৈসর্গিক বোধ করিলে পাঠক তাহা ত্যাগ করিতে পারেন। আমরা রায়েরকাঠীর রাজ বংশের প্রকৃত ইতিহাস যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

রায়েরকাঠীস্থ রাজবংশীয়গণ কিঙ্কর ভূঁঞার বংশধর। তিনি দক্ষিণ রাঢ়ীয় সেন বংশোদ্ভব কায়স্থ ছিলেন। হুগলী জিলাস্থিত দিগঙ্গা গ্রামে

তাঁহার বাস স্থান ছিল। পরে জগদীশপুরে গড় নির্ম্মাণ করতঃ তথায় বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি চন্দন নগরের নিকট কিঙ্কর সেনের গড় বলিয়া একটী স্থান আছে। * অনেকগুলি মহল তাঁহার শাসনাধীন ছিল। পূর্ব্ববঙ্গে,—বনগাঁ, মধুদিয়া, হোগলা, সোন্দারকূল প্রভৃতি চতুর্দ্দশটী ভূখণ্ড তিনি ক্রমে ক্রমে হস্তগত করেন। এই সময় মহারাজ প্রতাপ আদিত্য বাদসাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া চিরুলিয়া ভিন্ন অন্য ত্রয়োদশটী দখল করিয়া লইয়াছিলেন, কিঙ্কর ঐ সকল পরগণা পুনরায় হস্তগত করিতে সমর্থ হইলেন না।

যুবরাজ সাহজাহান যখন এদেশে আগমন করিয়াছিলেন তখন কিঙ্করভুঞার পুত্র মদনমোহন এদেশজাত নানাবিধ উৎকৃষ্ট দ্রব্যসহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করতঃ পারস্য ভাষায় তাঁহার গুণ বর্ণনা করেন। সাহজাহান তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে সেরেস্তাদারের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া "রায় রাইয়া" উপাধি ও খেলাৎ প্রদান করেন। কিছুকাল পরে তিনি ফৌজদার ছবি খাঁর সহিত পূর্ব্ববঙ্গের পরগণা সমূহের রাজস্ব আদায় এবং দস্যুদমনের জন্য কতিপয় সৈন্য এবং কামান সহ প্রেরিত হ'ন। মদনমোহন পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়া জমীদারগণের নিকট বাকী রাজস্বের দাবী করিলেন, ফলে অনেক জমীদার জমীদারী ইস্তাফা দিতে বাধ্য হ'ন। একমাত্র চন্দ্রদ্বীপ-রাজের সহিত বাকী রাজস্বের বন্দোবস্ত করিয়া মদনমোহন বে-ওয়ারিসি পরগণা সকল খাসে আনয়ন করেন। অতঃপর নানাবিধ উপঢৌকনসহ তিনি জাহাঙ্গীরনগরে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আদায়ী রাজস্ব এবং হিসাবনিকাশ দাখিল করিলেন। নবাব তাঁহার কার্য্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া পুরস্কার প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, মদনমোহন খাস পরগণাগুলির পাট্টা প্রার্থনা করেন। বাদসাহের অনুগৃহীত ব্যক্তি বলিয়া, নবাব তাঁহার প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন। তদনুসারে মদনমোহন তাঁহার পুত্র শ্রীনাথ রায়ের নামে সেলিমাবাদ প্রভৃতি পরগণার সনন্দ প্রাপ্ত হন।

১০২৫ সালে মদনমোহন যখন অস্মদ্দেশে আগমন করিতেছিলেন, তখন বিশখালী নদীতে ৺দোলযাত্রার দিনে তিনি দক্ষিণচক্র নামক বিগ্রহ

* বাঙ্গলার ইতিহাস (নবাবী আমল)—কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত, ৪৮ পৃঃ ফুটনোট (৩।

প্রাপ্ত হ'ন। সেই তারিখই তিনি মহাসমারোহে উক্ত বিগ্রহ নথুল্লাবাদ গ্রামে স্থাপিত করিয়াছিলেন। পরে ঠাকুরের সেবার জন্য ছয়শত বিঘা জমি দেবোত্তর প্রদান করিয়া সমাদ্দার উপাধিধারী জনৈক ব্রাহ্মণকে ইঁহার সেবাইত নিযুক্ত করেন। তাঁহার বংশধরগণ আজও উক্ত দেবোত্তর ভোগ করিয়া ঠাকুরের সেবায় নিযুক্ত আছেন।

মদনমোহনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র শ্রীনাথ রায় জমীদারীর বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। নবাবের কৃপায় তিনি আরও কয়েকটী পরগণা এবং ফরমানের সহিত রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজা শ্রীনাথ ঐ সকল জমীদারী শাসনসংরক্ষণের জন্য লুৎফাবাদ (নথুল্লাবাদ) গ্রামে কাছারী বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া অনেক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন এবং সন্নিকটস্থ নদী তীরে একটী মৃণ্ময় গড় প্রস্তুত করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। অতঃপর শ্রীরাম নামক পুত্র রাখিয়া তিনি স্বর্গারোহণ করেন।

রাজা শ্রীরাম * বিশেষ দানশীল লোক ছিলেন। তাঁহার সময় এতদঞ্চলে মগের অত্যাচার আরম্ভ হয় এই দুর্বৃত্তদিগের দৌরাত্ম্যে প্রজাগণ বিশেষ প্রপীড়িত হইতে থাকে। তিনি এই দস্যুদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন।

শ্রীরামের পুত্র রাজা রুদ্রনারায়ণ বিশেষ শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। তিনি কিয়ৎকাল লুৎফাবাদে অবস্থান করেন। পরে স্বদেশ হইতে গমনাগমন বিশেষ কষ্টকর এবং সময় সাপেক্ষ বিবেচনা করিয়া চিরুলিয়া পরগণাস্থিত কোঁদলা গ্রামে বাড়ী প্রস্তুত করিয়া তথায় বাস করিবেন এইরূপ মনস্থ করতঃ পরিবারবর্গকে আনিবার জন্য দিগঙ্গা রওনা হইলেন। একদিন রাত্রে রুদ্রনারায়ণ স্বপ্নে দেখিলেন যেন ভগবতী বিশ্বজননী তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া বলিতেছেন যে বলেশ্বর নদের পূর্ব্ব তীরবর্ত্তী এক বিশাল ভূ-খণ্ড জঙ্গলাবস্থায় পড়িয়া আছে এবং ঐ অরণ্যানীর এক বৃক্ষমূলে জগদম্বার পাষাণময়ী দশভুজা মূর্ত্তি প্রোথিত আছে। রুদ্রনারায়ণ স্বপ্নোদ্দিষ্ট

---

* বর্ত্তমান ঝালকাঠীর নিকটবর্ত্তী সুতালড়ী নামক স্থানে শ্রীরাম রায়ের কাছারী বাটী ও লুৎফাবাদ নামক গ্রামে থানা বাটী নির্ম্মাণ, দেবতা প্রতিষ্ঠা, দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর দান করতঃ জমীদারী শাসন ও সংরক্ষণের জন্য ষষ্ঠ প্রকার জাতিকে উপরোক্ত গ্রামে সংস্থাপিত করিয়া, সময় সময় ঐ স্থানে বাস করিতেন। কায়স্থ কুল-দর্পণ, ২য় ভাগ, ১২৯ পৃঃ।

স্থানে আগমন করিয়া দেবী প্রতিমা * উদ্ধার করিলেন। অচিরে এই বিশাল ভূ-খণ্ড বহুজনপূর্ণ লোকালয়ে পরিণত হইল এবং রুদ্রনারায়ণ রায় তথায় রায়েরকাঠী নামক রাজধানী স্থাপন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

অতঃপর রাজা রুদ্রনারায়ণের কুল-পুরোহিত রূপরাম চক্রবর্ত্তীর স্বপ্নাদেশ হওয়ায়, জ্যোতির্ব্বিদ-পণ্ডিত দ্বারা গণনা করতঃ কুম্ভচক্র প্রস্তুত করাইয়া পাঁচটী নরমুণ্ড দ্বারা প্রস্তুত বেদির উপর রূপরাম চক্রবর্ত্তীর নামে ঐ মূর্ত্তি স্থাপিত করেন। এই কার্য্য ১০৬৫ সনে বৈশাখ মাসে সম্পূর্ণ হয়।† পাঁচটী নরমুণ্ড দ্বারা প্রস্তুত বলিয়া উক্ত বেদিকে পঞ্চমূর্ত্তি অথবা রত্নবেদি বলে। এই বেদিকা প্রস্তুত সম্বন্ধে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে, রাজা রুদ্রনারায়ণ পাঁচ জন চণ্ডালকে ধন রত্ন দ্বারা বশীভূত করিয়া তাহাদের মস্তক ক্রয় করেন। ক্রমে এই কথা রাষ্ট্র হওয়ায় চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রোষপরবশ হইয়া রুদ্রনারায়ণের নামে নবাব সমীপে নরহত্যার অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন। তদনুসারে রুদ্রনারায়ণ নবাব সমীপে নীত হইয়া কারারুদ্ধ হ'ন। কবে বিচার হইবে তাহার স্থিরতা নাই, সুতরাং রুদ্রনারায়ণকে বাধ্য হইয়াই বহু দিবস কারাবাস করিতে হয়। কি উপায় নবাবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন, রাজা রুদ্রনারায়ণ তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। নবাব এক দিন মৃগয়ার্থ বহির্গত হইলে রুদ্রনারায়ণও কোন প্রকারে কারাধ্যক্ষকে বাধ্য করিয়া গোপনে নবাবের সহিত গমন করেন এবং নবাব সমীপেই তরবারি দ্বারা একটী ব্যাঘ্র নিহত করেন। এই বীরোচিত কার্য্যে নবাবের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়, তখন নবাব তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। রুদ্রনারায়ণও উত্তম সুযোগ বুঝিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করেন এবং তাঁহার বন্দী হইবার কারণ সবিস্তারে নবাব সমীপে জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন যে, তিনি ধন রত্ন দ্বারা বশীভূত করায় পাঁচ জন চণ্ডাল স্বেচ্ছায়ই তাহাদের মস্তক বিক্রয় করিয়াছিল। চন্দ্রদ্বীপ-রাজ

* এই দেবী মূর্ত্তি অদ্যাপি রায়েরকাঠীতে স্থাপিত আছেন। প্রত্যহই ইঁহার পূজা হয়। ইঁনি সিদ্ধেশ্বরী নামে অভিহিতা। অতি উৎকৃষ্ট কৃষ্ণ প্রস্তরে এই মূর্ত্তি নির্ম্মিত।

† মহামতি বেভারিজ তাঁহার ইতিহাসে এই তারিখ ১০৫০ সন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে প্রস্তর লিপিতে উহা লিখিত আছে। কিন্তু রাজবংশের হস্ত লিখিত তুলাট কাগজে যে বিবরণ আছে উহাতে ১০৬৫ বলিয়া উল্লেখ আছে। সুতরাং তাহাই লিখিত হইল।

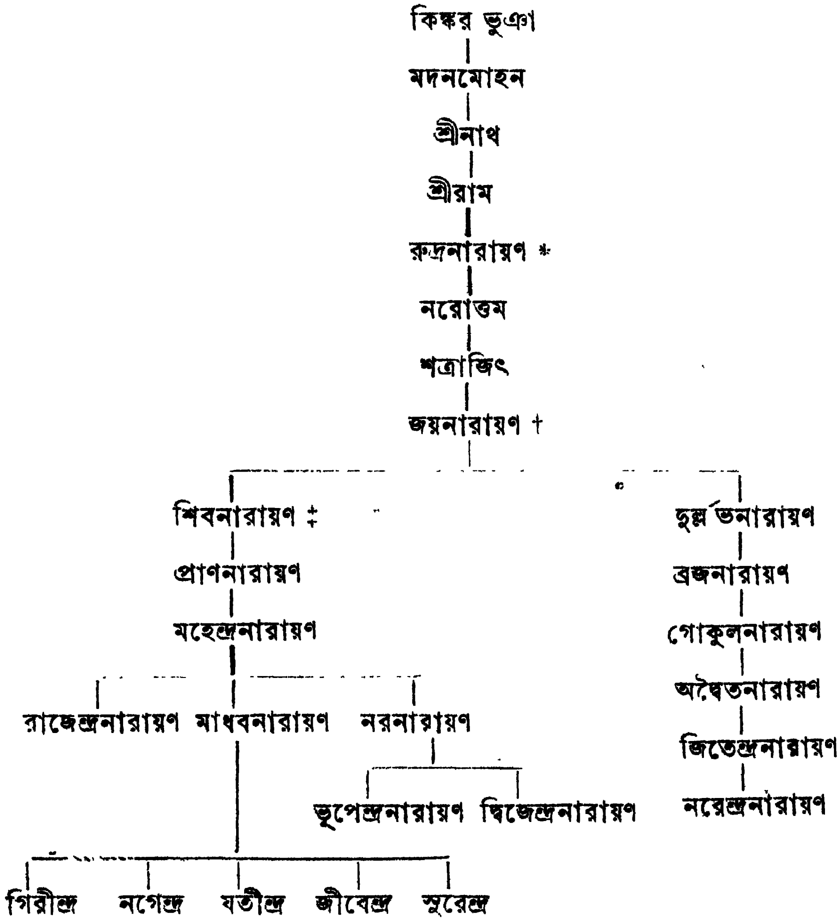
বৈরনির্য্যাতনমানসে তাঁহার নামে এইরূপ মিথ্যাভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। নবাব, রুদ্রনারায়ণের বংশগৌরব ও বীরত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হন, এবং তাহাকে সৈয়দপুর পরগণার সনন্দ প্রদান করেন। এইরূপে রুদ্রনারায়ণ মুক্তিলাভ করিয়া রায়েরকাঠীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এই কালী বাড়ীতে রূপরাম চক্রবর্ত্তী সিদ্ধিলাভ করায় উক্ত বিগ্রহের নাম 'সিদ্ধেশ্বরী' হয়। রাজা রুদ্রনারায়ণ সিদ্ধেশ্বরীর দৈনিক পূজা এবং প্রতি মঙ্গলবার ও প্রতি অমাবস্যাতে বলি প্রদানের জন্য ছয় শত বিঘা দেবোত্তর দান করিয়া গিয়াছিলেন। সেবাইত ব্রাহ্মণ ও চাকরদিগের বেতনের পরিবর্ত্তে লাখরাজ জমি এবং পুরোহিত রূপরামকে দুই শত বিঘা ব্রহ্মোত্তর দান করিয়া পুরুষানুক্রমে জীবিকানির্ব্বাহের সংস্থান করিয়া দিয়াছিলেন। রুদ্রনারায়ণ রায়েরকাঠীতে একটী সমাজ স্থাপন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তজ্জন্য অনেককে লাখরাজ জমি দান করিয়া বসবাস এবং জীবিকানির্ব্বাহের সংস্থান করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি সেলিমাবাদের পূর্ব্ব আবাদকার শ্রীমন্ত রায় এবং অনন্ত রায়কে বাইসারি গ্রামে একখানি নিষ্কর বাড়ী দান করেন এবং বঙ্গজ কুলীনশ্রেষ্ঠ গোপালকৃষ্ণ বসু মিরবহরকে বিশেষ আদরের সহিত নুৎফাবাদ গ্রামে নিষ্কর বাড়ী ও তালুক প্রদান করেন। * অতঃপর রাজা রুদ্রনারায়ণ সাগরদাড়ী গ্রামে যাইয়া পিতৃগুরু, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, সিদ্ধপুরুষ অবিলম্ব সরস্বতীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কিছু কাল পরে সস্ত্রীক ৺কাশীধামে গমন পূর্ব্বক মানবলীলা সম্বরণ করেন।

রাজা রুদ্রনারায়ণের চারি পুত্র—নরোত্তমনারায়ণ, নরেন্দ্রনারায়ণ, কন্দর্পনারায়ণ এবং গন্ধর্ব্বনারায়ণ। নরোত্তম বিষয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পর ভ্রাতৃগণের মধ্যে ক্রমে ক্রমে মনোমালিন্য উপস্থিত হইলে রাজা নরেন্দ্র নারায়ণ, পরগণা বনগাঁস্থিত শ্রীপুর কাছারী বাড়ীতে, রাজা কন্দর্পনারায়ণ পরগণা কাশিমপুরস্থ চিংড়াখালি কাছারীতে এবং রাজা গন্ধর্ব্বনারায়ণ চিরুলিয়া পরগণাস্থিত কোঁদলা বাটীতে স্বস্ব পরিবারসহ বাস করিতে থাকেন। রাজা গন্ধর্ব্বনারায়ণ কিছু কাল পরে কোঁদলা হইতে উঠিয়া গিয়া মঘিয়া গ্রামে বাস করেন। এইরূপে রায়েরকাঠীর রাজবংশ হইতে বনগ্রাম চিংড়াখালি, এবং মঘিয়াস্থিত রাজবংশের উদ্ভব হয়।

* উঁহার বংশধরগণ এখনও নুৎফাবাদে বাস করিতেছেন।

রাজা রুদ্রনারায়ণের বংশাবলী অতীব বিস্তৃত এবং তাঁহার বংশধরগণ বিভিন্নস্থানে অবস্থিত, তাই বাহুল্যভয়ে অতি সংক্ষেপে তাঁহাদের বংশ-তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।



---

* ইঁহার মধ্যম পুত্র নরেন্দ্রনারায়ণ খুলনা জিলার অন্তর্গত বনগ্রামে, তৃতীয় পুত্র কন্দর্পনারায়ণ খুলনার অন্তর্গত চিংরাখালী গ্রামে এবং কনিষ্ঠ পুত্র গন্ধর্ব্বনারায়ণ মথিরা গ্রামে বসতিস্থাপন করেন।

† ইঁহার চারি পুত্র, প্রত্যেকের পৃথক বাড়ী।

‡ ইঁহার চারি পুত্র, প্রত্যেকের পৃথক বাড়ী।



সিদ্ধেশ্বরী-মন্দির—(রায়েরকাঠী)।

Printed by H. V. SEYNE & BROS.

নরোত্তমের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শত্রাজিৎ রাজ্যলাভ করিলেন। কনিষ্ঠ শূরনারায়ণ পৈত্রিক বাড়ী ত্যাগ করিয়া উহার কিছু উত্তরে বাড়ী প্রস্তুত করতঃ বাস করেন। তদবধি উক্ত বাড়ী ছোট রাজ বাড়ী বলিয়া খ্যাত। তাঁহার বংশধরগণ এখনও সেই বাড়ীতে বাস করিতেছেন। রাজা শত্রাজিতের সময়ে রায়েরকাঠীর বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহার সময়েই সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরের কার্য্যারম্ভ, নিজ বাড়ীর প্রাচীর, ফটকের উভয় পার্শ্বে নহবৎখানা নির্ম্মাণ, দীর্ঘিকা খনন, অতিথি-শালা স্থাপন, বৃহৎ বাজার স্থাপন প্রভৃতি বহুবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন রাজা শত্রাজিৎ মুৎফাবাদ গ্রামে একটী দীর্ঘিকা খনন পূর্ব্বক গ্রামবাসীর জল কষ্ট দূর করিয়াছিলেন। তিনি নিজ নামানুসারে শত্রাজিৎপুর গ্রাম স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং সিদ্ধমন্ত্র রামগোবিন্দ সরস্বতীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া ৺কালীঘাটে মন্ত্র পুরশ্চরণ করিয়াছিলেন। পরে পুত্র জয়নারায়ণকে বিষয়ভার অর্পণ করিয়া পরলোক গমন করেন।

রাজা জয়নারায়ণ অসাধারণ তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সময়ে সুপ্রসিদ্ধ আগাবাখর, জমীদারীর কতকাংশ বলপূর্ব্বক দখল করিবার চেষ্টা করায় সুতালড়ী কাছারীতে তাঁহার সহিত জয়নারায়ণের এক যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে জয়নারায়ণ বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিয়া, বারইকরণের কেল্লা আক্রমন করতঃ দখল করেন। আগাবাখর এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বারইকরণাভিমুখে ধাবিত হইলেন। পথিমধ্যে জয়নারায়ণের লোকের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, এবং শেষে বারইকরণে উপস্থিত হইলে রাজা জয়নারায়ণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে জয়-নারায়ণ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বিশেষ বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া-ছিলেন, এবং আগাবাখর এই যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হ'ন। এই যুদ্ধে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত বাইশটী কামান রাজা জয়নারায়ণের হস্তগত হইয়াছিল। তিনি উক্ত কামানগুলি সঙ্গে লইয়া রায়েরকাঠীতে প্রত্যাগমন করেন।

জয়নারায়ণ রায়ের সময়ে এই দেশে বর্গীর হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। এই দুরাত্মা মহারাষ্ট্র দস্যুগণ যে প্রকার নির্দ্দয়তা প্রদর্শন পূর্ব্বক নরহত্যা

ও লুণ্ঠন প্রভৃতি দ্বারা নগর গ্রাম ভস্মাবশেষ করিত, তাহা ইতিহাসজ্ঞের অবিদিত নাই। এই দুর্বৃত্তগণ, জনসাধারণের এরূপ ভীতিজনক হইয়াছিল যে, ইহাদের আগমনাশঙ্কা জনরবে প্রকাশ হইলেও গ্রামবাসিগণ স্ব স্ব পরিবারবর্গ লইয়া অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিত। এই অত্যাচারে সেলিমাবাদ পরগণার রাজস্ব অনেক বাকী পড়িয়া যায়।

বর্ত্তমান সময়ে যেমন বঙ্গীয় প্রজা-ভূম্যধিকারী আইনের বলে (Bengal Tenancy Act) মহা ধনাঢ্য ভূম্যধিকারী হইতে সামান্য জোতদারের প্রাপ্য কর আদায় করিয়া লইতে হয়, নবাবী আমলে সেইরূপ ছিল না। দেয় রাজস্ব রাজকোষে দাখিল না হইলে জমীদারকে নবাব সরকার হইতে ধরিয়া আনা হইত; এবং বহুবিধ যাতনা দিয়া দেয় কর আদায় করা যাইত। যদি একান্ত পক্ষে ভূম্যধিকারী রাজস্ব আদায় করিতে অসমর্থ হইতেন; তাহা হইলে জমীদারী ইস্তাফা দিলেই টাকার দায় হইতে অব্যাহতি পাইতেন।

সেলিমাবাদ পরগণার রাজস্ব বাকী পড়িলে, নবাবের অনুচরগণ আসিয়া রাজা জয়নারায়ণকে ধরিয়া লইয়া গেল। এই সময় আলিবর্দ্দি খাঁ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার রাজপ্রতিনিধি স্বরূপ মুর্শিদাবাদে বিরাজ করিতে-ছিলেন। ঢাকা নগরী তখন পূর্ব্ব বঙ্গের রাজধানী ছিল; আলিবর্দ্দির জামাতা নিবাইস্ মহম্মদ খাঁ সুবেদার স্বরূপ তথায় অবস্থান করিতেন। রাজা জয়নারায়ণ বন্দী অবস্থায় তথায় নীত হইলেন, এবং কি জন্য তাঁহার রাজস্ব বাকী পড়িয়াছে তাহা জিজ্ঞাসিত হইলে, তিনি প্রকৃত অবস্থা সম্যক্ রূপে জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু তাহাতে কিছুই হইল না। নিবাইস্ মহম্মদ অত্যন্ত হৃদয়বান্ পুরুষ ছিলেন; জয়নারায়ণ কেন রাজস্ব দিতে পারিতেছেন না তাহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন; কিন্তু প্রভুর আদেশ পালন করিতে হইবে, তাই বাধ্য হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি জয়নারায়ণকে বলিলেন "যেমন করিয়া পারেন রাজস্ব দাখিল করুন, অথবা আইনানুসারে জমীদারী ইস্তাফা দিন্"। জয়নারায়ণ তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না, সুতরাং আইনানুসারে কারারুদ্ধ হইলেন।

কয়েক মাস কারাগারে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া জয়নারায়ণ জমীদারী ইস্তাফা দিয়া অব্যাহতি পাইতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু তৎকালে

শুধু ভূস্বামীর ইস্তাফাপত্র দস্তখতে উহা শুদ্ধ হইত না, দেওয়ানেরও দস্তখত আবশ্যক হইত। জয়নারায়ণ ইস্তাফা পত্রে স্বাক্ষর করিতে প্রতিশ্রুত হইলে দেওয়ানের জন্য পরওয়ানা বাহির হইল।

মহাত্মা কৃষ্ণরাম সেন * তখন রায়েরকাঠীর দেওয়ান ছিলেন, তিনি জয়নারায়ণ প্রমুখাৎ সমস্ত অবগত হইয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন এবং তাঁহার এই প্রকার কার্য্যের জন্য তাঁহাকে কথঞ্চিৎ ভৎ‍র্সনাও করিলেন। অল্প দিন পরে রাজানুচরগণ দেওয়ানকে ধৃত করিয়া ঢাকায় লইয়া গেল। যথা সময়ে কৃষ্ণরাম রাজপ্রতিনিধি সমক্ষে দরবারে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন।

সুবেদার বলিলেন "দেওয়ান, তোমার প্রভু জয়নারায়ণ বাকী রাজস্ব দায়ে জমীদারী ত্যাগ করিয়া ইস্তাফা পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। এখন সেই ইস্তাফা পত্রে তোমার স্বাক্ষর আবশ্যক, তুমি স্বাক্ষর করিয়া প্রস্থান করিতে পার।"

কৃষ্ণরাম তখন ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন "জাঁহাপনা, আমার প্রভু রাজা জয়নারায়ণ সেলিমাবাদ পরগণার একমাত্র ভূম্যধিকারী; তিনি ও তাঁহার স্বর্গগত পিতৃ পুরুষগণ চিরকাল রাজ ভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক, সাধ্যানুসারে হুজুরের আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছেন; এবং চিরকালই নিয়মিত সময়ে তাঁহাদের দেয় রাজস্ব রাজকোষে দাখিল করিয়া আসিয়াছেন। কতিপয় বৎসর যাবৎ মহারাষ্ট্র দস্যুগণের উৎপীড়নে জমীদারীর অনেক অংশ এক প্রকার ধ্বংস হইয়াছে, অনেক সমৃদ্ধিশালী প্রজা প্রাণ লইয়া ভদ্রাসন পরিত্যাগ করিয়াছে। এই সমস্ত দুর্লঙ্ঘ্য কারণেই রাজস্ব যে এত বাকী পড়িয়াছে তাহা জাঁহাপনা সম্যক্ অবগত আছেন। অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক যদি এই দীন প্রজাকে দুই বৎসরের অবকাশ প্রদান করেন, তাহা হইলে বাকী রাজস্ব সম্পূর্ণ আদায় করিতে পারি।"

নিবাইস মহম্মদ উত্তর করিলেন "দেওয়ান, তুমি বুদ্ধিমান হইয়া কেন নির্ব্বোধের ন্যায় কথা বলিতেছ? রাজস্ব বাকী পড়িলে জমীদারী রক্ষা হয় না। অতি সত্বর রাজস্ব দাখিল কর অথবা ইস্তাফা পত্রে স্বাক্ষর কর, অন্যথায় সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে, হয়ত প্রাণদণ্ডও হইতে পারে।"

* মহাত্মা কৃষ্ণরাম সেন আমার অতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহের জনক।

কৃষ্ণরাম তখন ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"জনাব, হিন্দু সন্তান কর্ত্তব্য পালন ও প্রভু রক্ষার্থ প্রাণ ত্যাগ করিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। এই অকিঞ্চিৎকর প্রাণ গ্রহণ করিয়া যদি প্রভুর জমীদারী প্রদান করেন তবে এই দণ্ডেই হাসিতে হাসিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারি। যদি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমা দ্বারা এই ইস্তাফা পত্রে স্বাক্ষর করাইতে ইচ্ছা করেন তবে পূর্ব্বেই আত্মঘাতী হইব।"

কৃষ্ণরামের এই নির্ভীক উত্তর শ্রবণ করিয়া সভাসদগণ চমকিত হইলেন। সুবেদার তৎক্ষণাৎ প্রহরিগণকে আদেশ করিলেন "ইহাকে কারাগারে লইয়া যাও, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইস্তাফা পত্রে স্বাক্ষর না করে, ততক্ষণ ইহাকে যন্ত্রণা প্রদান করিবে।"

প্রহরিগণ অবিলম্বে কৃষ্ণরামকে কারাগারে লইয়া গেল। এই প্রভুভক্ত ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষ কারাগারে যে কতদূর যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন তাহা বর্ণনাতীত। প্রহরে প্রহরে প্রহরিগণ তাঁহাকে বেত্রাঘাত করিয়া হস্তপদবদ্ধ অবস্থায় মধ্যাহ্ন সূর্য্য কিরণে অগ্নিতুল্য উত্তপ্ত বালুকোপরি রাখিয়া দিত। সময় সময় উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা শরীরের স্থানে স্থানে পোড়াইয়া দিত এবং কখন কখন বিষ্ঠা মূত্র পরিপূর্ণ কুপের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া রাখিত। দুই এক দিন অন্তর সামান্য আহার্য্য প্রদান করিত, কিন্তু যবনস্পৃষ্ট বলিয়া কৃষ্ণরাম তাহা স্পর্শও করিতেন না।

যখন রাজাজ্ঞায় ধৃত হইয়া কৃষ্ণরাম ঢাকায় নীত হইয়াছিলেন তখন কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর তাঁহার সঙ্গে তথায় আগমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এক ব্রাহ্মণ * কারাধক্ষ্যকে কিছু কিছু উৎকোচ প্রদান করিয়া কৃষ্ণরামকে সময় সময় সামান্য আহার্য্য প্রদান করিতেন।

এইরূপ অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও কৃষ্ণরাম বিচলিত হইলেন না। প্রভুর সম্পত্তি রক্ষার্থ প্রাণ বিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

এদিকে কৃষ্ণরামের কারাবাসের বৃত্তান্ত রায়েরকাঠীতে পৌঁছিল। জয়নারায়ণ পূর্ব্বেই মুক্ত হইয়া রাজধানীতে আসিয়াছিলেন। কৃষ্ণরামের এই

---

* ইহার নাম রামগোবিন্দ ভায়পঞ্চানন। ইহাকে কৃষ্ণরাম বাট বিঘা ব্রহ্মোত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। এখনও ইঁহার বংশধরগণ ইহা ভোগ করিতেছেন।

প্রকার আত্মত্যাগের কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তিনি কৃষ্ণরামের আহার ও প্রহরিগণকে উৎকোচ দিবার জন্য কতিপয় সহস্র মুদ্রা গোপনে কৃষ্ণরামের নিকট প্রেরণ করিলেন।

একদা জ্যৈষ্ঠ মাসের দারুণ গ্রীষ্মে কৃষ্ণরাম হস্তপদ বদ্ধাবস্থায় সাক্ষাৎ অগ্নিতুল্য উত্তপ্ত বালুকা শয্যায় পতিত আছেন, এবং অনতি দূরে প্রহরী শীতল পাদপচ্ছায়ায় তৃণ শয্যোপরি নাসিকাধ্বনি করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে, এমন সময়ে জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান সেই স্থানে আগমন করিলেন। কৃষ্ণরামকে তদবস্থ দেখিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে, এবং কেনই বা এই অবস্থায় এখানে পতিত রহিয়াছেন?"

কৃষ্ণরামের চৈতন্য তখন প্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছিল, ব্রাহ্মণের কথায় চক্ষুরুন্মীলন করিয়া অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন "ঠাকুর, আমার পরিচয়ে আপনার কি আবশ্যক? এই নিদারুণ রৌদ্রে কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন? যদি বলিতে বাধা না থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়া বলিতে পারেন।"

ব্রাহ্মণ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন "আমি বড়ই বিপদগ্রস্থ, শুনিয়াছি রায়েরকাঠীর দেওয়ান কীর্ত্তিপাশা নিবাসী কৃষ্ণরাম সেন বড় দাতা, তিনি এখানে আছেন, আমি তাঁহারই নিকটে আগমন করিয়াছি।"

কৃষ্ণরাম তখন আত্মগোপন করিয়া বলিলেন "ঠাকুর, কৃষ্ণরাম রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া কারাগারে অশেষ লাঞ্ছনায় কালাতিপাত করিতেছে। তাহার নিকট আপনার কি প্রয়োজন?"

ব্রাহ্মণ কৃষ্ণরামের কারাবাসের বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না, এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন "হায়! আমাদেরই দুরদৃষ্ট, নহিলে অমন পুণ্যবান ব্যক্তি রাজরোষে পতিত হইয়া কারাবাস যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তাঁহার ন্যায় প্রাতঃস্মরণীয় লোকের অদৃষ্টেও বিধাতা কারাবাস লিখিয়াছেন?" এইরূপ কিয়ৎকাল দুঃখ প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন "মহাশয়, আমার তিনটী কন্যা বয়স্থা এবং একটী মাত্র পুত্রের যজ্ঞোপবীত কাল প্রায় গত হইয়া আসিয়াছে, আমার এমন অর্থ নাই যাহা দ্বারা এই কন্যা তিনটীর কুলক্রিয়া ও পুত্রের যজ্ঞোপবীত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি। আমি এই কার্য্য নির্ব্বাহার্থ বহুস্থানে ভিক্ষার্থী

হইয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ যাহা পাইয়াছি তাহাতে যে এই সমস্ত কার্য্যের এক চতুর্থাংশ ব্যয়ও সম্পন্ন হয় এরূপ সম্ভব নহে। শুনিয়াছিলাম যে কৃষ্ণরাম এখানে আছেন; তাঁহার নিকট আমার দুঃখকাহিনী বলিলে আমার কষ্ট দূর হইবে ভাবিয়া এতদূর পথ পর্য্যটন করিয়া আসিয়াছি। আমার দুর্ভাগ্য, তাই তিনি কারারুদ্ধ।"

পরদুঃখকাতর কৃষ্ণরামের হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন "ঠাকুর, কত টাকা হইলে আপনার কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে?"

ব্রাহ্মণ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "কোন ক্রমে সহস্রাধিক মুদ্রা ব্যতীত হইতে পারে না।"

কৃষ্ণরাম কোন কথা বলিলেন না; তাঁহার সঙ্গীয় ব্রাহ্মণকে নিকটে ডাকিয়া জানিলেন যে রায়েরকাঠী হইতে তাঁহার জন্য দুই সহস্র মুদ্রা প্রেরিত হইয়াছে। কৃষ্ণরাম তখন সেই ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আপনি এতদূর ক্লেশ স্বীকার করিয়া যাহার নিকট আগমন করিয়াছেন, আমিই সেই হতভাগ্য কৃষ্ণরাম, রাজরোষে পতিত হইয়া আমার এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে। আমি যে ভাবে কালাতিপাত করিতেছি, তাহা আপনি স্বচক্ষে দেখিতেছেন, তাই আশানুরূপ দান করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিলাম না। ঐ যে নিকটে তোড়া বান্ধা টাকা রহিয়াছে, উহা সমস্তই আমার; আমি ঐ সমস্ত মুদ্রাই আপনাকে দান করিলাম; আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন শীঘ্র এই পাপ দেহের পতন হয়।"

ব্রাহ্মণ এতক্ষণ কৃষ্ণরামের পরিচয় জানিতে পারিয়াছিলেন না; এখন জানিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এই প্রকার অবস্থায় এতাদৃশ দান দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণের বাঙ্‌নিস্পত্তির ক্ষমতা রহিল না; তিনি একদৃষ্টে কৃষ্ণরামের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

ব্রাহ্মণকে নিস্তব্ধ দেখিয়া কৃষ্ণরাম পুনরায় বলিলেন "ঠাকুর, বোধহয় আপনার আশানুরূপ দান হয় নাই, তাই মৎপ্রদত্ত এই ক্ষুদ্র দান গ্রহণ করিতেছেন না। আমার একমাত্র এই মুমূর্ষ জীবন ব্যতীত আর কিছুই নাই; যাহা দান করিয়াছি কৃপা করিয়া গ্রহণ করিলে কৃতার্থ বোধ করিব।"

এই প্রকার কথোপকথনে নিকটস্থ নিদ্রিত প্রহরী জাগরিত হইয়া সমস্ত ঘটনা শ্রবণ পূর্ব্বক অত্যন্ত অশ্চর্য্যান্বিত হইল।

ক্রমে ক্রমে এই কথা প্রচার হইয়া পড়িল এবং সকলেই এই অত্যদ্ভুত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া একবাক্যে এই লোকাতীত দানের প্রশংসা করিতে লাগিল। প্রথমতঃ কারাধ্যক্ষ, তৎপর অন্যান্য রাজকর্ম্মচারী এবং সর্ব্বশেষে সুবেদার নিবাইস মহম্মদ ইহা শ্রবণ করিলেন। এই প্রকার অলৌকিক আত্মত্যাগের কথা শ্রবণপূর্ব্বক তিনি যারপরনাই পুলকিত হইয়া কৃষ্ণরামকে ভূয়সী প্রশংসা করিলেন এবং অচিরে তাঁহার বন্ধন মুক্তির আদেশ প্রদান করিলেন। তারপর সুবেদার কৃষ্ণরামকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "দেওয়ান, লোকমুখে তোমার যে অসাধারণ দান এবং প্রভুভক্তির কথা শুনিয়াছি তাহা কি সত্য ?" কৃষ্ণরাম কোন উত্তর করিলেন না ; কেবল করযোড়ে নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

কৃষ্ণরামকে নিস্তব্ধ দেখিয়া জনৈক প্রৌঢ় রাজকর্ম্মচারী করপুটে বলিলেন, "জাঁহাপনা, আপনি যাহা শ্রবণ করিয়াছেন তাহার এক বর্ণও মিথ্যা নহে ; বর্ত্তমানে পৃথিবীতে যে এতাদৃশ আত্মোৎসর্গের জীবন্ত দৃষ্টান্ত আছে, তাহা চক্ষে দেখা দূরে থাক, কর্ণেও শ্রবণ করি নাই। আমরা এই মহাপুরুষকে দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম।"

নিবাইস মহম্মদ তখন কৃষ্ণরামের সঙ্গীয় এবং ভিক্ষার্থী উভয় ব্রাহ্মণের নিকট সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ; তাঁহারাও যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্ত বলিলেন ; প্রহরিগণও প্রকৃত ঘটনা জ্ঞাপন করিল। অত্যন্ত হর্ষাগমে নিবাইস মহম্মদের সর্ব্ব শরীর কণ্টকিত হইল ; তিনি আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক, কৃষ্ণরামকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "দেওয়ান, আজ যাহা শুনিলাম, এরূপ লোকাতীত অদ্ভুত পূত কাহিনী আমি আর কখনও শ্রবণ করি নাই। তোমার ন্যায় যে এক জন পুণ্যবান পুরুষ এই রাজ্যমাধ্যে বাস করিতেছে, সেই জন্য এই রাজ্যও পবিত্র হইল। তোমার ন্যায় এক জন ধার্ম্মিক পুরুষের সমাগমে আমিও আপনাকে ধন্য বলিয়া জ্ঞান করিতেছি। তুমি আমার নিকট কি প্রার্থনা কর বল, আমি তাহা পূর্ণ করিয়া তোমার সৎকার্য্যের কতক পুরস্কার প্রদান করি।"

কৃষ্ণরাম তখন জানু পাতিয়া যুক্ত করে বলিলেন—"জাঁহাপনা, দেবসেবা, ব্রাহ্মণসেবা, প্রভুসেবা হিন্দুগণের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য ; আমি তাহা পালন করিয়াছি মাত্র। এই জন্য আমি প্রশংসার যোগ্য নহি ;

কিন্তু হুজুর যে এ দাসকে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন, ইহাই আপনার ঔদার্য্যের পরিচয়। জাঁহাপনা, যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এ দাসকে পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তখন যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক, আমার প্রভু রাজা জয়নারায়ণের পরিত্যক্ত জমীদারী তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করেন, তাহা হইলেই আমি যথেষ্ট পুরস্কৃত জ্ঞান করিব। হুজুরের নিকট আমার ইহা ভিন্ন অন্য প্রার্থনা নাই।"

নিবাইস মহম্মদ কৃষ্ণরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় সানন্দচিত্তে বলিলেন "দেওয়ান, তুমি ধন্য; জয়নারায়ণ যাহাতে পুনরায় তাঁহার জমীদারী প্রাপ্ত হইতে পারেন তজ্জন্য আমি মুর্শিদাবাদ নবাব-নাজিমের নিকট অনুরোধ করিব; তিনি উদারচেতা এবং ধার্ম্মিক, অবশ্যই তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর হইবে। দেওয়ান, তুমি নিজে কিছু প্রার্থনা করিলে না?"

কৃষ্ণরাম বলিলেন—"জাঁহাপনা, প্রভুর জমীদারী রক্ষাই আমার পক্ষে যথেষ্ট পুরস্কার; রাজা জয়নারায়ণের রাজত্ব অক্ষুণ্ন থাকিলে আমিও আমার সন্তানসন্ততিগণ তাঁহারই অন্নে জীবন ধারণ করিতে পারিব। আমি দরিদ্র, আমার অধিক ধনে প্রয়োজন কি?"

অতি সত্বরই মুর্শিদাবাদ হইতে নবাব-নাজিমের অনুমতি পত্র পৌঁছিল, সুবেদার মুক্তিপত্রসহ কৃষ্ণরামকে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন।

কৃষ্ণরামের এই অভূতপূর্ব্ব পুণ্যকাহিনী পূর্ব্বেই রায়েরকাঠীতে প্রচারিত হইয়াছিল; তিনি যথা সময়ে পৌঁছিয়া সমস্ত অবস্থা রাজা জয়নারায়ণের নিকট ব্যক্ত করিলেন।

জয়নারায়ণ বলিলেন "দেওয়ান, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক এই জমীদারী ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম, এখন আপনার অসাধারণ পুণ্যবলে এবং প্রভুভক্তি গুণে ইহা পুনরুদ্ধার হইয়াছে; আমার ইহাতে কোন স্বত্ব নাই, আপনি উদ্ধার করিয়াছেন, আপনিই ভোগ করুন।"

রাজার এই প্রকার উক্তি শ্রবণ করিয়া, সকলে তাঁহাকে অশেষ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণরাম বলিলেন "রাজন্! আপনি আমার প্রভু, আপনারই অন্নে এই শরীর পুষ্ট, আমি কর্ত্তব্য করিয়াছি মাত্র। রাজ্য আপনারই; আমাকে এইরূপ আদেশ করিলে আমি মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইব।"

রাজা জয়নারায়ণ পুনরায় বলিলেন "আপনি যে উপকার করিয়াছেন,

তজ্জন্য আমি আমার বংশাবলীসহ আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। কিন্তু এই মহদুপকারের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ আপনাকে পুরস্কৃত না করিলে আমাকে গুরুতর অধর্ম্মে পতিত হইতে হইবে।”

কৃষ্ণরাম বলিলেন “আমাকে পুরস্কার প্রদান করাই যদি আপনার অভিপ্রায় হইয়া থাকে, তবে আপনার এই জমীদারীর মধ্যে আমাকে কতক ভূ-সম্পত্তি প্রদান করুন, যদ্দ্বারা আমার সন্তানসন্ততিগণের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে।”

রাজা, কৃষ্ণরামের প্রার্থনানুসারে তৎপুত্র রাজারামের নামে এক বৃহৎ তালুক অর্পণ করেন। * এই সময় হইতেই কীর্ত্তিপাশার জমীদারীর সূত্রপাত হইল।

রাজা জয়নারায়ণ অত্যন্ত ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন। তাঁহার পুণ্য কীর্ত্তিসমূহ অদ্যাপি এদেশের প্রায় স্থানেই প্রচলিত আছে। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবনারায়ণ রাজা হইলেন।

রাজা জয়নারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ায় প্রত্যেকে পৃথক পৃথক বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইঁহারা পৃথগন্ন হইলেও জমীদারীর আদায়-তহসিল একত্র নির্ব্বাহিত হইত।

এই সময় দুর্ব্বৃত্ত আগাবাখর বোজরউমেদপুর সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া, সেলিমাবাদও গ্রাস করিল। রায়েরকাঠীর রাজাদের এমন শক্তি সামর্থ্য ছিল না যে বলপূর্ব্বক আগাবাখরের নিকট হইতে অপহৃত সম্পত্তি পুনরায় উদ্ধার করেন। তাঁহারা তখন অনন্যোপায় হইয়া মুর্শিদাবাদে নবাব-নাজিমের নিকট নালিশ উপস্থিত করিলেন। আগাবাখর এবং তৎপুত্র আগাসাদক তখন বঙ্গসিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী সিরাজ-দ্দৌলার একান্ত প্রিয় পাত্র। রাজারা আগাবাখরের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করিয়াছিলেন তাহা টিকিল না; বহু চেষ্টা, অর্থব্যয় ও কঠোর পরিশ্রমের পর মাত্র সাড়ে চারি আনা প্রাপ্ত হইলেন। এই অংশ আবার রায়েরকাঠীর সমস্ত রাজবংশ মধ্যে দশ ভাগে বিভক্ত হইল। ১৭৩ খৃঃ অব্দে দুরাত্মা

* এই তালুকের আয় কিঞ্চিদূর্দ্ধ ত্রিংশ সহস্র মুদ্রা।

আগাবাখর, রাজদ্রোহী অপরাধে নিহত হইলে, মহারাজ রাজবল্লভ উক্ত সম্পত্তির অরধিকার প্রাপ্ত হ'ন।

এই সময় হইতে বৃটীশ-কেশরী গম্ভীর গর্জ্জনে বঙ্গদেশে স্বীয় অখণ্ড আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন। বাণিজ্য-ব্যবসার জন্য কলিকাতা, গোবিন্দপুর, সুতানটী প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রামের অধিকার প্রাপ্ত হ'ন। এই সময়েই পলাসী ক্ষেত্রে ইংরাজের বাহুবলে মুসলমান-শক্তি লয় প্রাপ্ত হইল এবং হতভাগ্য সিরাজদ্দৌলাকে পদচ্যুত ও নিহত করিয়া লর্ড ক্লাইব, নরকুল-কলঙ্ক মীর জাফরকে বঙ্গসিংহাসন প্রদান করিলেন। ক্রমশঃ ইংরাজ সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। রাজা জয়নারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবনারায়ণ এবং তাঁহার অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গ, তদানীন্তন কুঠিয়াল (গভর্ণর) মিঃ ভিরেলষ্ট (Verelst) সাহেবের নিকট আবেদন করিলেন। চট্টগ্রামে সেই সময় গোকুলচন্দ্র ঘোষাল দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার সহিত চুক্তি হইল যে, যদি তিনি জমীদারীর বাকী সাড়ে এগার আনা পুনরুদ্ধার করিয়া দিতে পারেন তবে শিবনারায়ণ তাঁহাকে অর্দ্ধেক জমীদারী পুরস্কার দিবেন।

বহু চেষ্টার পর সেই সাড়ে এগার আনা শিবনারায়ণ প্রভৃতি প্রাপ্ত হইলেন, সুতরাং প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাঁহারা গোকুলচন্দ্রকে পৌনে ছয় আনি অংশ প্রদান করিলেন। ১৭৮২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই সাড়ে এগার আনা জমীদারী রাজা শিবনারায়ণ প্রভৃতি এবং গোকুল ঘোষাল একত্রে ভোগ দখল করিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হইল। তখন উভয় পক্ষের মতানুসারে ঢাকার তদানীন্তন কলেক্টর মিঃ বারওয়েল (Barwell), জমীদারী পৃথক করিয়া দেন এবং উভয় অংশই, পৃথক পৃথক নম্বরে কলেক্টরীর তৌজী ভুক্ত হয়।

গোকুল ঘোষালের মৃত্যুর প্রায় দশ বৎসর পরে দেনার দায়ে তাঁহার পৌনে ছয় আনি অংশ নিলামে বিক্রয় হইয়া গেল। কাশীনাথ চৌধুরী নামে এক ব্যক্তি ২৯,১০০৲ টাকায় উহা ক্রয় করিলেন, কিন্তু কাশীনাথ রায় চৌধুরী ঘোষালদের বেনামদার মাত্র।

ইহার কিছু কাল পূর্ব্বে রাজস্ব বাকী পড়ায় রায়েরকাঠীর জমীদারীর অর্দ্ধেক (দুই আনা সাড়ে সতের গণ্ডা) নিলামে বিক্রয় হইল। গোকুল ঘোষালের পৌত্র কালীশঙ্কর ঘোষাল উহা ক্রয় করেন। ক্রমে ক্রমে

১৭৯৬ খৃঃ অব্দে সুপ্রীম কোর্টের (Supreme Court) মতানুসারে কাশী-নাথের অংশও বিক্রয় হইয়া গেল। তখন রাজা রাজবল্লভের পৌত্র রাজকৃষ্ণ আসিয়া তাহা খরিদ করিলেন; এবং ঝালকাঠীর সন্নিহিত সূতালড়িতে কাছারী স্থাপন করিয়া জমীদারী দখল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেন না। পরে তাঁহার পুত্র নবকৃষ্ণ স্বীয় অংশ ঘোষালদের নিকট বিক্রয় করিলেন। সুতরাং ঘোষালগণ সেলিমাবাদের আট আনা সাড়ে বার গণ্ডা দুই ক্রান্তির মালিক হইলেন।

ঘোষাল বাবুগণ এদেশবাসী নহেন, কিন্তু তাহা না হইলেও, এই দেশের সঙ্গে তাঁহাদের বড় ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। খিদিরপুর সন্নিহিত ভূ কৈলাশ নামক স্থানে ইঁহাদের বাসস্থান। এই বংশজাত ব্যক্তিগণ বঙ্গদেশে প্রায় সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। দেশীয় ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে ইঁহাদের ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং যশঃ যেরূপ সর্ব্বত্র ঘোষিত, অন্যের তদ্রূপ নহে। কেবল যে এই জিলায় ইঁহাদের জমীদারী আছে, তাহা নহে, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, চব্বিশ-পরগণা, বারাণসী (কাশী), গয়া প্রভৃতি স্থানেও আছে; ইঁহাদের ভূ-সম্পত্তির আয় প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা হইবে। দেবসেবা, অতিথিসেবা, বিপন্নের সাহায্য, আশ্রিতপালন প্রভৃতি সদ্‌গুণে ইঁহারা সমগ্র বঙ্গদেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। রাজদ্বারেও ইঁহারা বিশেষ সম্মানিত।

স্বর্গীয় কালীশঙ্কর ঘোষাল, গবর্ণমেণ্ট হইতে “রাজাবাহাদুর” উপাধি পাইয়াছিলেন; সেই হইতেই “রাজাবাহাদুর” বলিয়া এই বংশপরম্পরা সর্ব্বত্র পরিচিত। ইঁহারা শান্তিপ্রিয়; অন্যের ভূ-সম্পত্তি বলপূর্ব্বক গ্রহণ বা প্রজাপীড়নজনিত কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইতে ইঁহারা বিরত। স্বর্গীয় গোকুল ঘোষাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বংশতালিকা প্রদত্ত হইল।

গোকুলচন্দ্র ঘোষাল
|
জয়নারায়ণ ঘোষাল
|
রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল বাহাদুর
|
রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর
|
রাজা সত্যানন্দ ঘোষাল বাহাদুর
|
রাজা সত্যশ্রী ঘোষাল বাহাদুর প্রভৃতি ভ্রাতৃ চতুষ্টয়

বর্ত্তমান ঝালকাঠীর * নিকট গুরুধাম নামক স্থানে রাজা বাহাদুরের কাছারী স্থাপিত; স্বর্গীয় রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর স্বয়ং এই স্থানে বাস করিতেন। তাঁহারই যত্নে এই স্থানে রাজপ্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা, আপণ সমাকুল প্রশস্ত রাজবর্ত্ম, স্বচ্ছ স্ফটিক তুল্য নির্ম্মল জলরাশি পরিপূর্ণ প্রশস্ত জলাশয় প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ঝালকাঠী বন্দর পূর্ব্ববঙ্গ মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য স্থান; রাজা সত্যশরণই ইহার প্রথম স্থাপয়িতা। তিনি স্বয়ং অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া বর্ত্মগুলি নির্ম্মাণ এবং বাণিজ্য ব্যবসায়িগণের নিমিত্ত গৃহাদি প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন।

রাজা সত্যশরণের মৃত্যুর অব্যবহিত পর হইতেই গৃহ-বিবাদ-বহ্নি নির্ধূম ভাবে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। সকলেই স্বীয় স্বীয় প্রাধান্য বিস্তারে ব্যস্ত হইলেন। শান্তির কোমল কুসুমে অশান্তি কীট ধীরে ধীরে প্রবেশ পূর্ব্বক আবাস স্থান স্থাপন করিল। এমন কি, দুই একটী ছোট খাট ফৌজদারী মোকর্দ্দমাও উপস্থিত হইল। গবর্ণমেণ্ট এই প্রকার শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া ষ্টেটের এক জন 'রিসিভার' (Receiver) নিযুক্ত করতঃ যাবতীয় কর্ত্তৃত্ব ভার তাহার উপর অর্পণ করেন। গত ১৩০৬ সালে হাইকোর্টের আদেশ অনুসারে 'রিসিভার' রহিত হইয়া অংশীদারগণ নিজ নিজ অংশ পৃথক রূপে বণ্টন করিয়া লইলেন।

সেলিমাবাদের অন্তর্গত দশটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরগণা ছিল। ক্রমে ক্রমে ইহার মধ্যে অনেক গুলি অন্য পরগণা ভুক্ত হয়, কতকগুলির অস্তিত্ব লোপ হয় এবং কতকগুলি অন্য জিলা ভুক্ত হইয়া স্বতন্ত্র ভাবে কলেক্টরীতে পৃথক পৃথক তৌজী ভুক্ত হয়।

বিগত ১৮০৫ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান 'ডিসিল্‌ভা' সাহেবগণের পূর্ব্বপুরুষ 'ডমিন্‌গো ডিসিলভা' (Domingo D Silva) জজ সাহেবের নিকট এক খানা দরখস্ত করেন; তাহাতে প্রকাশ যে, সেলিমাবাদ পরগণার অন্তর্গত কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরগণা ছিল। ইহার মধ্যে কতকগুলি অন্য পরগণা ভুক্ত হইয়াছে, কতকগুলির অস্তিত্বই নাই, দুই একটা অন্য জিলা ভুক্ত

* ইহার আর এক নাম "মহারাজগঞ্জ"।

হইয়াছে। আবার কোন কোন পরগণা, স্বতন্ত্র ভাবে কলেক্টরীতে পৃথক তৌজী ভুক্ত হইয়াছে। আমরা নিম্নে সেই ১০টী পরগণার নাম উল্লেখ করিতেছি—

১। তপ্পেহাবিলী সেলিমাবাদ।
২। সোন্দারকূল। *
৩। রুদ্রপুর তপ্পে জাহানপুর।
৪। বনগাঁও।
৫। তপ্পে সুলতানাবাদ।
৬। তপ্পে সুলতানপুর।
৭। কাশিমপুর।
৮। নাজিরপুর।
৯। রাজোর।
১০। শিবপুর।

ইহা ব্যতীত "পরগণা নিমকমহাল" বলিয়া আর একটী পরগণার উল্লেখ দেখা যায়। ১৮০৫ খৃঃ অঃ পূর্ব্বে, উল্লিখিত পরগণাগুলি সেলিমাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল; তপ্পেহাবিলী সেলিমাবাদ ব্যতীত অন্যান্য পরগণাগুলি

---

* কথিত আছে পূর্ব্বকালে বৈদ্যজাতির শালঙ্কায়ণ বংশোদ্ভব রাজা কুমারদাশ এই পরগণায় জমীদারী প্রাপ্ত হইয়া এদেশে রুনসী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। কুমারদাশ নবাব-সরকারে সৈন্য বিভাগে কার্য্য করিতেন। তাঁহার আগমনকালে এতদ্দেশে চণ্ডভণ্ড জাতির বসতি ছিল। কুমারদাশই সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মণাদি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদিগকে আনয়ন করেন। রাজা কুমার দাশের লক্ষীপতি ও দেবদাস নামে দুই পুত্র এবং আদ্যাশক্তি ও মহামায়া নাম্নী দুই কন্যা জন্মে। বিক্রমপুর নিবাসী রামরাম দাশ ও শুভঙ্কর সেনের সহিত কন্যাদ্বয়ের বিবাহ হয়। ইহারা যথাক্রমে স্থানীয় পাহিদাশ ও মহাব্রত সেনগণের আদিপুরুষ।

কুমার দাশের জ্যেষ্ঠ পুত্র লক্ষীপতির বংশধরগণ রুনসী গ্রামে বাস করিতেছেন। এই বংশের জয়শঙ্কর দাশ স্বীয় কন্যা মন্দাকিনীকে স্থানীয় রায়দের আদিপুরুষ রামভদ্র মজুমদার মহাশয়ের নিকট বিবাহ দেন। জয়শঙ্করের সহিত তাহার পুত্রের সদ্ভাব ছিল না। এই নিমিত্ত তিনি সমুদয় সম্পত্তি জামাতাকে অর্পণ করেন। এই সময় রায়েরকাঠীর রাজবংশ স্থাপয়িতা রাজা শ্রীনাথ রায় বাদসাহের নিকট সোন্দারকূলের জমীদারী প্রাপ্ত হ'ন। এই সময় হইতে সোন্দারকুল পরগণার নাম লুপ্ত হইয়া সেলিমাবাদ নাম প্রচলিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের নিমন্ত্রণে মাত্র উক্ত নামের ব্যবহার দেখা যায়। রামভদ্র মজুমদার রাজা শ্রীনাথের অধীন তালুকের বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন। এই হইতে ইহার বংশধরগণ রায় উপাধি ধারণ করতঃ দশ পুরুষ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছেন।

কোন্ সময়ে এবং কেন যে পৃথক করা হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা যায় না।* তপ্পেহাবিলী সেলিমাবাদের নয় আনা অংশ এখনও সেলিমাবাদ পরগণার অন্তর্গত। বনগাঁও বর্ত্তমান সময়ে খুলনা জিলার অন্তর্গত এবং কাশিমপুর ফরিদপুরের অন্তর্গত হইয়াছে। শিবপুর বোজরগউমেদপুর ভুক্ত হইয়াছে কিন্তু তপ্পে সুলতানাবাদ এখনও বর্ত্তমান আছে।

সেলিমাবাদ পরগণার জমীদারীর অংশগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া পৃথক পৃথক রূপে গবর্ণমেণ্টের তৌজী ভুক্ত হইয়াছে। রাজা বাহাদুরের অংশ ব্যতীত অন্যান্য গুলি এত জটিল এবং বিষমংশে পরিণত যে, তাহার সকলগুলি ঠিক করিয়া ষোল আনি হিসাব করাও বড় সহজ ব্যাপার নহে। আবার এই সমস্ত জমীদারীর রাজস্ব আদায়েও সময় সময় নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। কোন কোন অংশের রাজস্ব জমীদারের দণ্ড দিতে হয়। আমরা এই জমীদারীর অংশ সম্বন্ধে যাহা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তৎসহ রায়েরকাঠীর খ্যাতনামা কয়েক জন জমীদারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদান করিলাম।

সমগ্র সেলিমাবাদ পরগণার জমীদারীর বৃহৎ এবং বিষম অংশ সমষ্টি করিলে ষোল আনা হইতে এক কড়া অংশ বেশী হয়। কোন জমীদারীর অধীনে যে এই এক কড়া অংশ অধিক হইয়াছে অদ্যাপি তাহা নির্ণীত হয় নাই।

ইহা ব্যতীতও ৩৮৩৮ নং তৌজিভুক্ত দেড় আনা অংশ 'লুকাজ' সাহেবদের আছে; কিন্তু এই অংশ বিগত ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে খুলনার কলেক্টরী ভুক্ত হইয়াছে।

---

* A petition presented by Mr. Domingo D Silva to the Judge on the 20th March, 1805, and sent by him to the government, whence it was forwarded to the Collector for report through the Board, throws considerable light to the early history of the fiscal division. From this petition it would appear that Selimabad first composed of ten Purgaunas, viz: Tappa Havili Selimabad, Sundhurkul, Rudrapur Tappa Jahanpur, Bongaon, Tappa Sultanabad, Tappa Sultanpur, Kashimpur, Nazirpur, Rajor, Tappa Havili Nimak Mahal and Shibpure. These Purgaunas formed the whole of Purgauna Selimabad, which was originally divided into two estates; the larger estate was afterwards equally subdivided into two and one of these was again subdivided into two equal shares.—Sir W. W. Hunter's Statistical Account of Bengal (Bakarganj volume), page 224.

সেলিমাবাদ পরগণা বিভাগ। *

তৌজী নং	অংশ	মালিক	রাজস্ব
৩৮৪০	।/১৫	রাজা বাহাদুর	৪১৯৩১।৵১০॥
৩৮৪১	৵১৭॥	ঐ	১৮০২৯৶৭
৩৮৪২	৻১৮॥	কিরণচন্দ্র রায় প্রভৃতি	৫০৯৮॥৶০॥
৩৮৪৩	৻১৩	অন্নদাকুমার রায় চৌধুরী ও নবীনচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রভৃতি	৩৫৯৭।০॥
৩৮৪৪	৻১৩	৺চণ্ডীচরণ রায় প্রভৃতি	ঐ
৩৮৪৫	৻১৩	৺দুর্গানারায়ণ রায় ও জগৎনারায়ণ রায়	ঐ
৩৮৪৬	৻১২।	বৈকুণ্ঠনাথ বিশ্বাস প্রভৃতি	৩৬৮০৸৶২
৩৮৪৭	৻৯।	কিরণচন্দ্র রায় প্রভৃতি	২৯:৮।১০
৩৮৪৮	৻৯।	গ্রন্থকার ও তাহার ভ্রাতৃগণ	ঐ
৩৮৪৯	৻৯।	৺দুর্গানারায়ণ রায় ও জগৎনারায়ণ রায়	ঐ
৩৮৫০	৻১০॥	ভুবনেশ্বর রায় প্রভৃতি	৬৩২৩/২
৩৮৫১	৻১০।	মিঃ নলিনীমোহন গুপ্ত প্রভৃতি	৩২৮৫৻৭
৩৮৩৪	৻৬।	৺বরদাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি	১৮৩৩।৵১০॥
৩৮৩৫	৻৫	মঘিয়ার জমীদারগণ ও গ্রন্থকার এবং তাহার ভ্রাতৃগণ	১৭২০৵৮॥
৩৮৩৬	৻৭	ইন্দুভূষণ মিত্র প্রভৃতি	২০৭২৶০॥
৩৮৩৭	৻৪	কিরণচন্দ্র রায় প্রভৃতি	৯২৪৶৬॥
৩৮৩৯	৻।	বৃন্দাবনচন্দ্র রায় প্রভৃতি	২৭৻৬॥

* ৩৮৪০ ও ৩৮৪১ নং তৌজীভুক্ত জমীদারী 'বাবুয়ান,' ৩৮৪২—৩৮৪৫ নং জমীদারী 'চৌধুরীয়ান' এবং ৩৮৪৬—৩৮৪৯ নং জমীদারী "দুই আনী' নামে অভিহিত; এই সমস্ত জমীদারীর অধীনে অনেকগুলি লাভজনক তালুক আছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রাজা জয়নারায়ণের মৃত্যুর পর হইতেই তাঁহার পুত্র চতুষ্টয় মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছিল; এবং অতি সত্বরই সকলে পৃথগান্ন হইয়া পৃথক পৃথক স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়েই জমীদারীর গোলযোগ উপস্থিত হয়। ষোল আনী জমীদারী হইতে এই প্রকার অংশ গুলি বাহির হইবার পর সকলের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতে আরম্ভ করিল। শিবনারারণেরও চারি পুত্র; তাঁহারাও পৃথক পৃথক বাড়ী করিলেন।

শিবনারায়ণ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রাণনারায়ণের জীবনের কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা দেখা যায় না; কিন্তু প্রাণনারায়ণের পুত্র মহেন্দ্র-নারায়ণ বড় তেজস্বী এবং বিচক্ষণ পুরুষ ছিলেন। তিনি অনেক গুলি সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মহেন্দ্রনারায়ণের তৃতীয় পুত্র মাধবনারায়ণের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুরুষ অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহার অনন্য সাধারণ স্মৃতি শক্তি ছিল, এবং এই জন্য অনেকে তাঁহাকে শ্রুতিধর বলিত। মাধবনারায়ণ এই জিলার মধ্যে একজন বিশেষ সম্মানিত লোক ছিলেন। যখন ভিক্টোরিয়া ভারতেশ্বরী হইলেন তখন বরিশালের দরবারে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করা হইয়াছিল; কিন্তু তিনি উদারতাবশতঃ তাহা চন্দ্রদ্বীপের রাজাকে প্রদান করিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। সেই জন্য তিনি বিশেষ সম্মানিত ও প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। মাধবনারায়ণ ধীর, কর্ম্মঠ, মিতভাষী এবং ধার্ম্মিক ছিলেন।

রাজা মাধবনারায়ণের কনিষ্ঠ রাজা নরনারায়ণ জ্যেষ্ঠের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুরুষ না হইলেও তাঁহার ন্যায় সুপুরুষ সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় না। কলাবিদ্যায় নরনারায়ণ সমগ্র বঙ্গদেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্রানু-যায়ী মৃদঙ্গ বাদ্যে তিনি সিদ্ধহস্ত; যখন সংস্কৃত স্তোত্রগুলি মুখে আবৃত্তি করিয়া মৃদঙ্গ বাজাইতেন, তখন বোধ হইত যেন সেই স্তোত্রাবলী মৃদঙ্গমুখ হইতে অতি পরিষ্কার রূপে নিঃসৃত হইতেছে। নানা দেশ হইতে কলাবিদ্যা অভিলাষী ছাত্রগণ তাঁহার নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছেন। কলাবিদ্যা ব্যতীতও নরনারায়ণ মাতৃভাষার বিশেষ অনুরাগী; এদেশে যখন কবিতা রচনা এক প্রকার অপ্রচলিত ছিল, সেই সময়ে রাজা

নরনারায়ণ কতকগুলি শ্রুতিমধুর কবিতা প্রণয়ন করেন। তাঁহার রচিত সঙ্গীতগুলি বড়ই হৃদয়স্পর্শী এবং ভাবোদ্দীপক।

রাজা নরনারায়ণের বিদূষী পত্নী রাণী বসন্তকুমারীও বঙ্গভাষার অনুরাগিণী। তিনি রুগ্ন শয্যায় শায়িতাবস্থায় "রোগাতুরা বসন্তকুমারী" নাম্নী একখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। কবিতাগুলি বড় সুন্দর এবং হৃদয়ের আবেগ পরিপূর্ণ।

রাজা জয়নারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র উদয়নারায়ণের বংশধরগণের মধ্যে রাজকুমার রায় বিষয়কার্য্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তিনিও স্বকীয় বুদ্ধিবলে অনেক সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন; কিন্তু জনৈক আত্মীয়ের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিভূ থাকায় কতকগুলি অর্থ দণ্ড দিয়া নিঃস্ব হইয়া পড়েন। তাঁহার সন্তানগণের আর্থিকাবস্থা বড় শোচনীয়।

রাজা জয়নারায়ণের তৃতীয় পুত্র দুর্লভনারায়ণের সন্তানগণের মধ্যে রাজা অদ্বৈতনারায়ণ প্রতিষ্ঠাবান পুরুষ। বৈষয়িক কার্য্যে ইহার অসাধারণ দক্ষতা; কিন্তু ভাগ্যদোষে ইহার আর্থিক অবস্থা নিতান্ত খারাপ হইয়াছে। দুই তিন খানি সামান্য তালুক আছে; তাহারই আয় দ্বারা অতি কষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হইতেছে।

জয়নারায়ণের চতুর্থ পুত্রের সন্তানগণমধ্যে দুর্গানারায়ণ ও জগৎনারায়ণ জমীদারীর সওয়া নয় গণ্ডা অংশ ভোগী; তাঁহারাও বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন।

শিবনারায়ণের তৃতীয় পুত্রের সন্তানগণমধ্যে চন্দ্রনাথ রায় একজন যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন, পৈত্রিক জমীদারীর মধ্যে তাঁহারই উপযুক্ত পুত্রগণ সওয়া নয় গণ্ডা অংশ এখনও ভোগ করিতেছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে রুদ্রনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যতীত অপর পুত্রগণ পৈত্রিক বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া বিভিন্ন স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কালস্রোতের ভীষণ আবর্ত্তে, একমাত্র নরেন্দ্রনারায়ণের বংশধরগণ ব্যতীত আর সকলেই নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের বংশধরগণের মধ্যে প্রায় সকলেই কৃতিপুরুষ ছিলেন; তন্মধ্যে স্বর্গীয় রাজা মহিমা চন্দ্র রায় এবং নকুলেশ্বর রায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা স্ব স্ব ক্ষমতায় বিপুল সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। মহিমাচন্দ্রের মৃত্যুর পর রাণী কমলকুমারী চৌধুরাণী বিষয়কার্য্য নির্ব্বাহ

করিতেছেন। এই রমণী যে প্রকার বুদ্ধিমতী, তদ্রূপ তেজস্বিনী। ষ্টেটের সমস্ত কার্য্যভার কর্ম্মচারিবর্গের উপর নির্ভর না করিয়া স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন; ইঁহার কার্য্যকুশলতায় অনেক ভূসম্পত্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইঁহার কোন পুত্র নাই; দুইজন দৌহিত্র বর্ত্তমান আছেন, উভয়েই শিক্ষিত, বিনয়ী এবং ধার্ম্মিক।

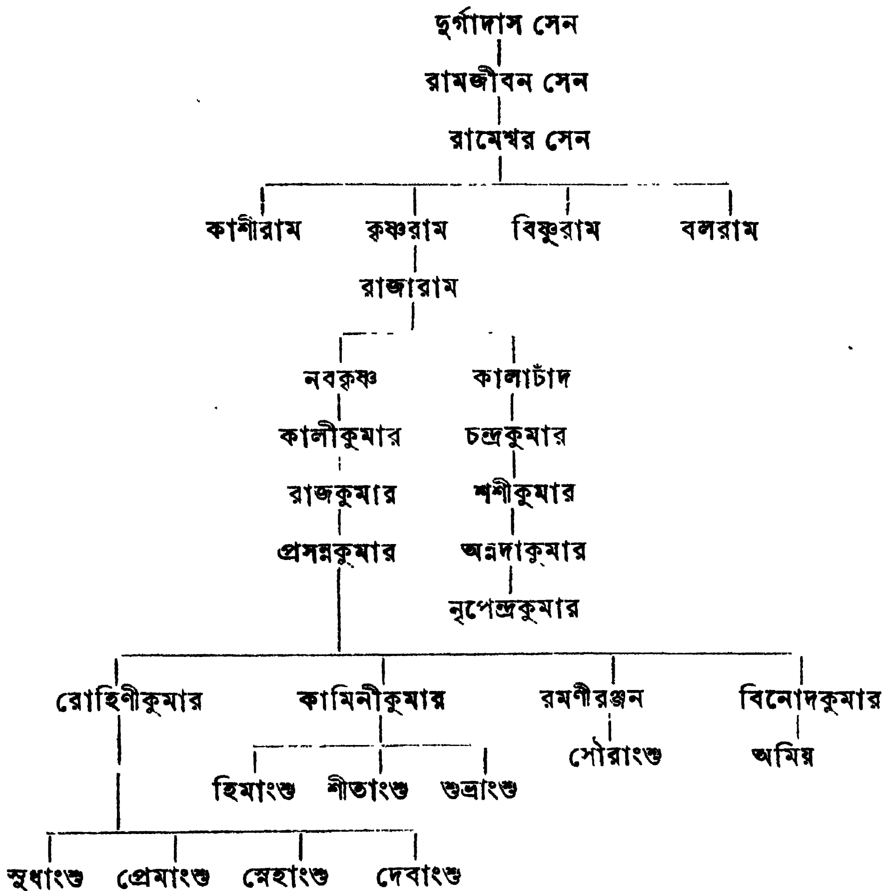
রায়েরকাঠীর রাজবংশ দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ; সুতরাং বঙ্গীয় কায়স্থগণের সহিত তাঁহাদের বৈবাহিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয় না বলিয়া কলিকাতার জঙ্গল বাদাল প্রভৃতি স্থানের স্বঘর কুলীনের সঙ্গে আদানপ্রদান করিতে হয়। এই প্রকার অনেক ঘর কুলীনসন্তান বৈবাহিক ক্রিয়া করতঃ রায়েরকাঠী গ্রামে রাজাদের আশ্রিত হইয়া বাস করিতেছেন। কয়েকজন হবিবকাঠী গ্রামেও রাজাদের বৃত্তিভোগী হইয়া বসতি করিতেছেন। ইঁহাদের অবস্থা রায়েরকাঠীর রাজাদের সঙ্গে সঙ্গে শোচনীয় হইয়াছে। এই সমস্ত কুলীনগণের মধ্যে শশিভূষণ মিত্র, সখানাথ মিত্র, প্রিয়নাথ মিত্র প্রভৃতির আর্থিক অবস্থা মন্দ নহে।

সেলিমাবাদের অন্তর্গত বহুসংখ্যক তালুক বর্ত্তমান আছে। এই সমস্ত তালুকের রাজস্বও কম নহে, কোন কোন তালুক যথেষ্ট লাভজনক। এই পরগণার ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে কীর্ত্তিপাশার মজুমদার, বাসণ্ডার মহলানবিশ, কেওরার চৌধুরী ও কবিবল্লভ বংশ জলাবাড়ীর বিশ্বাস, সাতুরিয়ার মিঞা, এবং অমরাজুড়ির দত্ত প্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কীর্ত্তিপাশার মজুমদারগণ প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা কৃষ্ণরাম সেনের বংশধর। সেলিমাবাদের ইতিহাসের সঙ্গে এই মহাত্মার অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ। এই মহাপুরুষই স্বীয় দৃঢ়তা ও ন্যায়পরায়ণতা দ্বারা সেলিমাবাদের জমীদারী পুনরুদ্ধার করিতে কি ভাবে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই স্থানে কৃষ্ণরামের সন্তানসন্ততিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

কৃষ্ণরামের প্রপিতামহ দুর্গাদাস সেন বিক্রমপুরের অন্তর্গত পোড়াগাছা গ্রাম হইতে কীর্ত্তিপাশায় আগমন করেন। দুর্গাদাসের পুত্র ও পৌত্র তাদৃশ বিখ্যাত ছিলেন না। তাঁহার প্রপৌত্র কৃষ্ণরামই এই বংশের সৌভাগ্যের সূত্রপাত করেন। ইনি সর্ব্বপ্রথম 'মজুমদার' উপাধিপ্রাপ্ত হ'ন।

ইঁহার সময় হইতেই কীর্ত্তিপাশার জমীদার বাড়ী 'মজুমদার বাড়ী' বলিয়া বিখ্যাত। ইঁহাদের বংশ তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।



কৃষ্ণরামের পুত্র রাজারাম সেন পিতার ন্যায় উদার হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণরামের জ্বলন্ত কীর্ত্তিসমূহ রাজারামের হৃদয়ে সম্যক্ প্রতিবিম্বিত হইয়া তাঁহাকে প্রাতঃস্মরণীয় করিয়া তুলিয়াছিল।

রাজারামের সম্যক্ জীবনী পাওয়া যায় না; তবে ইঁহার পূত জীবনের অলৌকিক দান ও ক্ষমাশক্তিজ্ঞাপক বহু আখ্যায়িকা এতদঞ্চলে অদ্যাপি প্রচলিত আছে। দেবদ্বিজের উপর ইঁহার অচলা ভক্তি ছিল। ইনি আধ্যাত্মিক বিষয়ে জীবনকে এতদূর উন্নত করিয়াছিলেন যে এদেশের লোকের বিশ্বাস, তিনি জগন্মাতা ভগবতী সিদ্ধেশ্বরী দেবীর সাক্ষাৎলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ধার্ম্মিক রাজারামের উপর স্থানীয় জনসাধারণের

অকৃত্রিম শ্রদ্ধা অদ্যাপি সামান্য সামান্য ঘটনায় প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কোন গাছে ফল না জন্মিলে গৃহস্থ মানৎ করে যে ফল হইলে প্রথম ফলটী রাজারামের নামে উৎসর্গ করিবেন। বিশ, পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে বালকগণ গুরুজনকে প্রণাম করিলে "রাজারামের মত হও" বলিয়া তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করিতেন।

রাজারাম রায়েরকাঠীতে পৈত্রিক চাকরী করিতেন। রাজা জয়-নারায়ণের মৃত্যুর পর যখন রাজপরিবারে আত্মকলহ উপস্থিত হয়, তখন অপক্ষপাতী রাজারাম মনোকষ্টে রাজসংসার হইতে বিদায় লইয়া কীর্ত্তিপাশায় ফিরিয়া আসেন। রাজপরিবারের জন্য তিনি সর্ব্বদাই মনোদুঃখে সময় অতিবাহিত করিতেন। প্রত্যেক পুণ্যাহ তিথিতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে দীন, দুঃখী ও ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে অকাতরে দান করিয়া ভগ্নহৃদয়ে শান্তি আনিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কথিত আছে কোন এক পুণ্যাহ তিথিতে রাজারাম এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্ব দান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

রাজারামের মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্রদ্বয় নবকৃষ্ণ ও কালাচাঁদ নাবালক ছিলেন বলিয়া সম্পত্তি রক্ষণের ভার তদীয় পত্নী রামমালার উপর পতিত হয়। তারপর মাতার জীবদ্দশায় প্রাপ্তবয়স্ক নবকৃষ্ণ ও কালাচাঁদ বিষয়কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। এই উভয় ভ্রাতার মধ্যে এতদূর সম্প্রীতি ছিল যে তাহাদের সৌভ্রাত্র আদর্শস্থানীয় বলিয়া কীর্ত্তিত হইতে পারে।

নবকৃষ্ণ একটী মহৎকার্য্য করিয়া অস্মদ্দেশে কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি মহাসমারোহে তাঁহার ভ্রাতৃকন্যাদ্বয় ও নিজের কন্যার বিবাহে "চন্দন" করিয়াছিলেন। বৈদ্যসমাজের যাবতীয় কুলীনগণকে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক, তাঁহাদের যথোচিত সম্মান রক্ষা করিয়া প্রত্যেকের ললাটে চন্দনের টিপ প্রদান করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারটী এক দিকে যেমন ব্যয়সাধ্য তেমনি শ্রমজনক। পূর্ব্বে মহারাজ রাজবল্লভ ও পোনাবালিয়ার চৌধুরীগণ এই কার্য্য করিয়া অতিশয় যশস্বী হইয়াছিলেন; তারপর নবকৃষ্ণ ও কালাচাঁদ ব্যতীত কেহ অস্মদ্দেশে এই কার্য্য করিয়াছেন কিনা এইরূপ শুনা যায় না।

পত্নীর প্ররোচনায় ভ্রাতৃবিচ্ছেদ সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। নবকৃষ্ণ ও কালাচাঁদ ভ্রাতৃপ্রেমের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হইলেও তাঁহাদের পত্নীদ্বয়ের মধ্যে

সদ্ভাব ছিল না। কালাচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী পোষ্যপুত্রসহ পৃথক্ হইয়া গেলেন। কালাচাঁদ মৃত্যুকালেও ভ্রাতৃপ্রেমের অমোঘ প্রমাণ প্রদান করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি পোষ্যগ্রহণে বিরোধী ছিলেন, কিন্তু পত্নী ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গের প্ররোচনায় শেষে স্বীকৃত হইলেন। নবকৃষ্ণের পুত্র কালীকুমারকে তিনি পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন এবং মৃত্যুকালে তাঁহার অংশের এক চতুর্থাংশ যৌতুকস্বরূপ প্রদান করেন। সেই হইতে নবকৃষ্ণের বংশধরগণ পৈত্রিক সম্পত্তির দশ আনা ও কালাচাঁদের বংশধরগণ ছয় আনা অংশ ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

নবকৃষ্ণ ও কালাচাঁদ বিবিধ লোকহিতকর কার্য্য সাধন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। সাধারণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য কীর্ত্তিপাশা হইতে ঝালকাঠী পর্য্যন্ত একটী প্রশস্ত বর্ত্ম নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। সম্প্রতি ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ড কর্ত্তৃক এই রাস্তাটী সংস্কৃত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। কালাচাঁদের স্ত্রী তেজস্বিনী তারিণী চৌধুরাণী 'তুলা' করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তুলাদণ্ডের একপার্শ্বে নিজে দাঁড়াইয়া সেই ওজনের স্বর্ণরৌপ্যাদি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন।

নবকৃষ্ণ কতিপয় বৎসর পরে তাঁহার বাৎসরিক পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ করিবার বিপুল আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। সুদূর হরিদ্বার বদরিকাশ্রম হইতে মণিপুর পর্য্যন্ত এবং নেপাল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত যাবতীয় শাস্ত্রজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ঢাকা হইতে প্রসিদ্ধ কর্ম্মকার আনাইয়া বিশুদ্ধ স্বর্ণ দ্বারা দুইটী "দানসাগর" নির্ম্মাণ করাইলেন। মণিমুক্তাখচিত মহার্ঘ চন্দ্রাতপ কাশ্মীর হইতে নির্ম্মিত হইয়া আসিল। শ্রাদ্ধের বিপুল আয়োজন হইল, নিরূপিত দিবসে পণ্ডিতগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু নবকৃষ্ণের দিন ফুরাইয়া আসিল। কঠোর পরিশ্রমে তিনি অতিশয় রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। ক্রমে রোগ কঠিনতর হইল এবং পরিশেষে ১২১৩ সালে নবকৃষ্ণ চলিয়া গেলেন। ইহার পত্নী অন্নপূর্ণা দেবীও অনুমৃতা হইলেন।

পিতার আরব্ধ কার্য্যের ভার অষ্টাদশ বর্ষীয় পুত্র কালীকুমারের হাতে পড়িল। তিনি দুর্ব্বিসহ পিতৃ-মাতৃ-শোকরাশি ভস্মাবচ্ছন্ন অগ্নিবৎ হৃদয়মধ্যে নিহিত রাখিয়া এই মহৎ কার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পাদন করিলেন। এবং

সমাগত পণ্ডিতবর্গকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন। কালীকুমারের দানে ও সদ্ব্যবহারে নিমন্ত্রিত ভদ্রমণ্ডলী আশাতিরিক্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে যথেষ্ট আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক সকলে প্রস্থান করিলেন। ভট্ট কবিগণের সুললিত কবিতায় কালীকুমারের কীর্ত্তিগাঁথা অদ্যাপি এতদঞ্চলে গীত হইয়া থাকে।

সংসারে প্রবেশ করিয়া কালীকুমার চারি বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। সহসা দুশ্চিকিৎস্য 'নিউমোনিয়া' (Pneumonia) রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। রোগের প্রকোপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইলে কালীকুমার বুঝিলেন যে তাঁহার সময় ফুরাইয়া আসিয়াছে। পত্নী হরসুন্দরী স্বামীর পদপ্রান্ত হইতে মুহূর্ত্তের জন্যও স্থানান্তরিত হইতেন না। প্রেম, ভক্তি, প্রীতির মূর্ত্তিমতী প্রতিকৃতি সতী হরসুন্দরীর বদন মণ্ডলে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ সর্ব্বদাই ফুটিয়া থাকিত। পতিভক্তিতে এই ষোড়শবর্ষীয়া রমণীর হৃদয়-খানি পরিপূর্ণ ছিল। স্বামীর মৃত্যু সন্নিকট জানিয়া সাধ্বী হরসুন্দরী মুহূর্ত্তের জন্যও হতাশ হইলেন না, বরং অধিকতর উৎসাহের সহিত স্বামীর পরিচর্য্যা করিতে প্রবৃত্তা হইলেন।

একদা নিশীথ সময়ে যখন সকলে সুষুপ্তির ক্রোড়ে বিরামলাভ করিতে-ছিলেন, তখন পতিসেবাপরায়ণা সাধ্বী রোগক্লিষ্ট স্বামীকে বলিলেন "বহুজন্ম তপস্যার ফলে তোমা হেন স্বামীরত্ন পাইয়াছি, তোমার প্রসাদে এই অল্প দিনেই অশেষ সুখ সম্ভোগ করিয়াছি। এতদিন আমার কোন সাধই অপূর্ণ রাখ নাই, আজ একটী প্রার্থনা পূর্ণ করিতে হইবে।" হরসুন্দরীর হৃদয় তখন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু তাহা দমন করিয়া তিনি স্বামীর অনুমতি প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া হীনপ্রভ বদনের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। কালীকুমার ক্ষীণ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন "তোমার ন্যায় সাধ্বী রমণী-রত্ন লাভ করা কয়জনের অদৃষ্টে ঘটে জানিনা। মনে বড় দুঃখ রহিল যে তোমাকে অনাথিনী করিয়া চলিলাম। এতদিন হৃদয় ঢালিয়া তোমাকেই ভালবাসিয়াছি; তোমাকে আমার কিছুই অদেয় নাই, অকপট চিত্তে তোমার প্রার্থনা জ্ঞাপন কর।" হরসুন্দরী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন "আমি তোমার সহধর্ম্মিণী; সুখে দুঃখে, বিপদে, সম্পদে চিরদিনই তোমার সহচরী, তুমি চলিয়া গেলে আমি কিছুতেই জীবন ধারণ করিতে পারিব না, অনুমতি

দাও, দাসীও তোমার সহগামিনী হইবে।" উচ্ছ্বসিত বাষ্পরাশি তরল হইয়া হরসুন্দরীর দু'নয়নে ছাপাইয়া পড়িল। কালীকুমার এই ষোড়শ বর্ষীয়া যুবতীর মুখে এবম্বিধ বাক্য শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং প্রথমতঃ তাঁহাকে এ কঠোর সংকল্প পরিত্যাগ করিতে বলিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন যে সতীর প্রতিজ্ঞা পর্ব্বতবৎ অটল, তখন কালীকুমার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অনুমতি প্রদান করিলেন। হরসুন্দরীর বদনমণ্ডল মেঘমুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, এবং হর্ষ চিত্তে স্বামীর চরণযুগল বক্ষে ধরিয়া ধ্যানস্তিমিতনেত্রে বসিয়া রহিলেন। পরদিন কালীকুমার বাইশ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। সকলে শব লইয়া শ্মশানে গেল, অনতিবিলম্বে তথায় সর্ব্বাবরণভূষিতা আলুলায়িতকুন্তলা একটী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীমূর্ত্তি উপনীতা হইলেন। হরসুন্দরী তদবস্থায় তথায় সমাগতা হইয়া সর্ব্বজনসমক্ষে স্বামী-সহগমনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। সহসা চারিদিকে হাহাকার উত্থিত হইল। সতীকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য কুলগুরুপ্রমুখ বৃদ্ধগণ নানাপ্রকার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই সতীর মন টলিল না। সিন্ধুর উদ্দেশে বেগবতী স্রোতস্বিনীর গতিরোধ করিতে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। প্রভাতে কুলগুরু আবার বলিলেন "মা, তোমার স্বামী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবার আদেশ করিয়াছিলেন, তুমি পোষ্য গ্রহণ না করিয়া সহমৃতা হইলে তোমার বিপুল সম্পত্তি কে রক্ষা করিবে?" সতী তাহাতে স্বীকৃতা হইয়া বলিলেন "আপনারা অবিলম্বে সর্ব্বগুণসম্পন্ন একটী পুত্র আনয়ন করুন, আমি ঐ সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত আছি।" সতীর আদেশানুসারে পুত্র অন্বেষণার্থে লোক বাহির হইল। একদিন দুইদিন করিয়া ছয়দিন কাটিয়া গেল। মৃতদেহ পচিয়া গেল, অসংখ্য কীট উদ্ভূত হইয়া শব ছাইয়া ফেলিল। সতী এই কয়দিন কোন খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করিলেন না; কেবল সূর্য্যাস্তের অত্যল্প পূর্ব্বে মৃতদেহের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধৌত করিয়া সেই জল পান করিতেন। সপ্তম দিবসে আনীত একটী শিশু পুত্রকে যথাশাস্ত্র পোষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া তিনি স্বীয় কণ্ঠদেশ হইতে বহুমূল্য মুক্তাহার * পুত্রকে প্রদান করিলেন,

* অদ্যাপি এই বহুমূল্য হার আমাদের বাড়ী বর্ত্তমান আছে।

পরিশেষে শিরশ্চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন "বাপ, তুমি যে বংশে আসিয়াছ, আশীর্ব্বাদ করি সেই বংশের উপযুক্ত সন্তান হও।"

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন সতীদাহ-প্রথা নিবারণের চেষ্টা চলিতেছিল। সতীর অনিচ্ছায় কেহ তাহাকে দগ্ধ না করে ইহা দেখিবার জন্য প্রত্যেক জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট বিশেষভাবে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। কীর্ত্তিপাশার এই সংবাদ বরিশালে পৌঁছিলে তত্রত্য ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সাহেব প্রমুখ কয়েকজন সাহেব তথায় আগমন করেন। সাহেবগণ শ্মশানক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন অগ্নির ন্যায় তেজস্বিনী আলুলায়িত-কুন্তলা মূর্ত্তিমতী সতী সহাস্যবদনে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। সাহেবগণ যুগপৎ বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়া সতীকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বারংবার অনুরোধ করিলেন। সতী কিছুতেই ফিরিলেন না। অতঃপর চিতা সজ্জিত হইল হরসুন্দরী স্নাতা হইয়া ক্রমে ক্রমে গাত্রস্থিত অলঙ্কারগুলি একে একে সমাগতা সধবা রমণীদিগকে বিলাইয়া দিলেন, তারপর সকলের নিকট হাস্যমুখে বিদায় লইয়া ধীরে ধীরে স্বামীর পার্শ্বে শয়ন করিলেন। চিতায় অগ্নি প্রদত্ত হইল। ধু ধু করিয়া অগ্নিরাশি জ্বলিয়া উঠিল। হরিধ্বনির গম্ভীর রবের সহিত অচিরে পুণ্যময় দেহ দুইটী ভস্মাবশেষ হইয়া গেল। সমাগত সাহেবগণ এবম্বিধ অলৌকিক কাণ্ড স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া অশ্রুমোচন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। ১২৩৫ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগে সতীশিরোমণি স্বামীসহ অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করিবার জন্য মহাপ্রস্থান করিলেন।

রাজকুমার বৈষ্ণবধর্ম্মপরায়ণ নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর তিনি ভক্তিচিত্তে গীতা অধ্যয়ন করিতেন এবং মাঝে মাঝে ভক্ত বৈষ্ণবগণের সঙ্গে হরিনাম-কীর্ত্তনে মাতিয়া থাকিতেন; সংসারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারিতেন না। এদিকে অবসর পাইয়া কতিপয় বিদ্রোহী কর্ম্মচারী জমীদারী আত্মসাৎ করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল।

অতি অল্প বয়সেই রাজকুমার ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ইনি একটা কঠিন ব্যাধিতে প্রায় অনেক সময়ই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। এই রোগেই ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যেই ইঁহার পত্নীর মৃত্যু হয়। কেহ কেহ বলেন যে বিষপ্রয়োগে রাজকুমারের মৃত্যু হইয়াছিল।

রাজকুমারের মৃত্যুকালে আমার পিতৃদেবের বয়স ছয় বৎসর মাত্র। শত্রুরা অবসর পাইয়া স্বীয় স্বীয় অভীষ্টসাধনে যত্নবান হইল। অতি শৈশবে পিতৃমাতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়া পিতৃদেব চিরবিশ্বস্ত অনুচর রাজচন্দ্র ভদ্র দ্বারা পালিত হইতে লাগিলেন। এই ভদ্র মহাশয় শত্রুদিগের ষড়যন্ত্র পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন, তাই রাজকুমারের মৃত্যুর অব্যবহিত পর হইতেই একমুহূর্ত্ত কালও তাঁহাকে নয়নান্তরাল করেন নাই।

রাজকুমারের পত্নীর মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইবা মাত্র সদাশয় ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের আদেশানুসারে বরিশালের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রেলী তৎক্ষণাৎ কীর্ত্তিপাশায় আগমন করেন। তিনি আসিয়া সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তির একটী তালিকা করিয়া অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্এর (Court of Wards) অধীনে আনিবার জন্য হুকুম প্রদান করতঃ পিতৃদেবকে সঙ্গে লইয়া বরিশাল চলিয়া আসেন। মহাত্মা রেলী সাহেব আমার পিতৃদেবের ও জমীদারীর সম্যক্ অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া আমাকে এক বিস্তৃত চিঠি লিখিয়াছিলেন। পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণ করিবার জন্য তাহার কতকাংশের বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদান করিলাম।

"আমি যখন তোমাদের বাড়ী পৌঁছিয়াছিলাম, তখন বেলা দশটার অধিক হয় নাই। সিংহদ্বার দিয়া পুর-প্রবেশ করিলে পর প্রথমতঃ কয়েকজন কর্ম্মচারী আমাকে সেলাম করিলেন। আমি তোমার পিতামহের বৈঠকখানায় পৌঁছিয়া দেখিলাম যে, ঘরের বারান্দায় অনেকগুলি খট্টার উপর সামান্য মাদুরের বিছানা রহিয়াছে। ঘরের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড কাষ্ঠ নির্ম্মিত চাবি-বন্ধ সিন্দুক রহিয়াছে। আমি চাবি চাহিলে পর * * * আমাকে চাবি দিলেন না। তারপর কামার ডাকিয়া তালা ভাঙ্গিয়া আমি সর্ব্বসমক্ষে সেই সিন্দুক উদঘাটন করতঃ নগদ টাকা যাহা ছিল, তাহা গণিয়া তোড়া বন্ধনপূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টের সিলমোহর করিয়া আমার বিশ্বস্ত পেস্কারের নিকট দিলাম। তোমার পিতাকে সে পর্য্যন্ত আমি দেখিতে পাই নাই, আমি তাহাকে দেখিতে চাহিলাম। অনতিবিলম্বে রাজু তাহাকে কোলে করিয়া আমার নিকট আনিল। তোমার পিতার বাহ্য চেহারা দর্শনে আমার যুগপৎ ক্রোধ এবং কষ্ট উপস্থিত হইল। তাহার সমস্ত শরীর অতিশয় শীর্ণ, পেট উঁচু এবং তাহাতে কাল কাল বড় শিরাসমূহ

স্ফীত। অঙ্গের বর্ণ কালিমা প্রাপ্ত হইয়াছে, গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম যে শরীর উষ্ণ। প্রকৃতপক্ষে তোমার পিতার তখন যে প্রকার অবস্থা ছিল, তাহাতে যে সে অচিরাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইত, তাহার আর কোন সন্দেহ ছিল না। আমি তারপর তোমাদের উত্তরের দ্বিতল কক্ষে গমন করিয়া দেখিলাম যে, কক্ষের প্রান্তভাগে একখানি মূল্যবান পালঙ্কোপরি সুন্দর শয্যা বিতান রহিয়াছে। ভাবিলাম, বোধ হয় তোমার পিতা ঐ শয্যায় শয়ন করিতেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, ঐ শয্যায় তোমাদের ইষ্টদেবতা ঠাকুরগণ শয়ন করিতেন। এই কথা জানিতে পারিয়া আমার বড়ই রাগ হইল। তখন প্রতীতি জন্মিল যে, নিশ্চয়ই * * * তোমার পিতাকে নিহত করিবার জন্য ভীষণ ষড়যন্ত্র করিয়াছে, নচেৎ কেন তাহাকে নীচের তলায় অন্ধকূপের ভিতর রাখিয়া, নিজেরা মহা সুখে দোতলায় বাস করিবে? আমি অবিলম্বে স্বহস্তে শয্যা নিম্নে নিক্ষেপ করিলাম। আমার রাগ দর্শনে, * * * অত্যন্ত ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল। তারপর আমি তোমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'তুমি আমার সঙ্গে যাইবে?' সে আমার আকৃতি এবং রাগ দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল। তাই প্রথমে কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। আমার নৌকায়, আমার ছেলেদের খেলিবার কয়েকটা পুতুল ছিল; আমি তাহা আনাইয়া তোমার পিতাকে দিলাম। সে তখন মহাহর্ষান্বিত হইয়া, ধীরে ধীরে আমার ক্রোড়ে আসিল। শেষে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এখন আমার সহিত যাইতে প্রস্তুত কিনা। তোমার পিতা প্রফুল্লবদনে স্বীকৃত হইল, কিন্তু রাজুকে কিছুতেই ছাড়িল না। রাজু, তোমার একজন জ্ঞাতি, তোমার পিতার মাতামহ এই কয়েকজন মাত্র সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ তোমার পিতাকে আমার নৌকায় লইয়া আসিলাম। নৌকা খুলিবার সময় দেখিলাম যে, তীর হইতে কতকগুলি ঢাল-সড়কিওয়ালা লোক, আমার নৌকা আক্রমণ করিতে আসিতেছে। আমার সঙ্গে কয়েক জন কনেষ্টবল ছিল মাত্র। আমি একটা রিভলভার (Revolver) হাতে লইয়া নৌকার ছাদের উপর উঠিলাম। আমার হাতে বন্দুক দেখিয়া, ঢাল-সড়কিওয়ালার দল পিছে হটিল। আমি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছিলাম যে এই অস্ত্রধারী লোক * * *

প্রেরিত। আমার নিকট হইতে তোমার পিতাকে লইয়া যাওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। আমার স্বর্গগত সহধর্ম্মিণী তোমার পিতাকে পাইয়া অতিশয় যত্নপূর্ব্বক লালনপালন করিতে লাগিলেন। আমার অন্যান্য পুত্র কন্যাদিগকে তিনি যে প্রকার স্নেহ ও যত্ন করিতেন, তোমার পিতাকেও তদপেক্ষা ন্যূন আদর করিতেন না। বর্ত্তমানে যে দ্বিতল প্রকোষ্ঠে বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কাছারী করেন, তোমার পিতা রাজুর সহিত ঐ ঘরে বাস করিতেন। কোন শত্রু কর্ত্তৃক রাত্রিতে তোমার পিতার প্রাণ বিনষ্ট না হয় এই জন্য আমার অনুমতি ক্রমে আটজন সঙ্গীনধারী কনেষ্টবল প্রহরীর কার্য্যে সর্ব্বদা দণ্ডায়মান থাকিত। এই প্রকার দুই তিন বৎসর তোমার পিতা বরিশালস্থ গভর্ণমেণ্ট স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ঢাকায় গমন করিয়াছিলেন।”

সাহেবের ক্রোড়ে সুশিক্ষিত হইয়া উত্তরকালে সংসারক্ষেত্রে ইনি পাশ্চাত্য যুবজনোচিত কর্ম্মদক্ষতা, সুশৃঙ্খলতা, সৌন্দর্য্যানুরাগ ও নিয়মপরায়ণতা প্রভৃতি গুণের যে পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন তাহা অতীব প্রশংসনীয়। প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্য্যন্ত পিতৃদেব ‘নাবালক বাবু’ নামে অভিহিত হইতেন। * সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তিনি পরগণা সেলিমাবাদের জমীদারীর একাংশ ক্রয় করেন।

স্বকীয় গ্রামবাসী ভদ্রলোকগণের সন্তানসন্ততির শিক্ষার সুবিধার্থ সুশিক্ষিত পিতৃদেব নানাবিধ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে ১লা জানুয়ারী একটী মধ্য-ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিলেন।† যদিও প্রথমতঃ গ্রামবাসিগণের কাছে কোন সহানুভূতি পাইলেন না, তথাপি অচিরেই ইহা দ্বারা সুফল ফলিয়া উঠিল। ইহার পর দরিদ্র গ্রামবাসিগণের সুবিধার জন্য নিজব্যয়ে ১৮৭২ খৃঃ অব্দে একটী সুবৃহৎ দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন।

পিতৃদেব বহুগুণসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে পরহিতৈষণা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা, লোকপ্রিয়তা ও সৌন্দর্য্যপরায়ণতা সম্যক্‌রূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল। ১২৮৩ সনে ৩রা অগ্রহায়ণ তাঁহার মৃত্যু হয়।

---

* তৎকালে এই নামটী সমগ্র বাকলায় প্রচলিত ছিল।

† গত ১৯০৩ খৃঃ অব্দে ২২শে জানুয়ারী এই বিদ্যালয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে।

পিতৃদেবের মৃত্যুর পর আম্রা চারিভ্রাতা নাবালক ছিলাম, তাই মাতৃদেবী স্বহস্তে জমীদারীর ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি অসাধারণ অধ্যবসায় এবং ন্যায়পরায়ণতার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তিনি অত্যন্ত তেজস্বিনী ও দয়াবতী ছিলেন।

রায়েরকাঠীর রাজা মাধবনারায়ণ আমাদের ষ্টেটের দশ হাজার টাকা ঋণী হইয়াছিলেন। এই টাকা সম্যক্ আদায় করিতে হইলে তাঁহার জমীদারী বিক্রয় না করিলে সঙ্কুলন হইবার সম্ভাবনা ছিল না; কারণ তখন তাঁহাদের জমীদারীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। তিনি কৃপাপ্রার্থী হইয়া মাতৃসন্নিধানে আগমন করিলেন। জননী প্রকৃতই দয়াময়ী ছিলেন, তিনি সাহ্লাদে রাজাকে সেই দশ হাজার টাকা হইতে মুক্তি প্রদান করিয়া খতখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। মাধবনারায়ণ যতকাল জীবিত ছিলেন তত কাল পর্য্যন্ত এই উপকার বিস্মৃত হন নাই। তিনি সর্ব্বসমক্ষে মাতৃদেবীর এই অসীম কীর্ত্তিপ্রকাশ করিয়া তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কালাচাঁদ পত্নীর প্ররোচনায় পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রকুমারকে যখন পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা হয়, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম একবৎসর কি দুইবৎসরের অধিক নহে। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার মাতা তারিণী চৌধুরাণী এবং ভগ্নীপতি বিষয়-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন।

তারিণী চৌধুরাণীর স্বর্গারোহণের পর চন্দ্রকুমার স্বয়ং বিষয়কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত সরল ছিলেন বলিয়া বৈষয়িক কুটিলতা বুঝিতে সমর্থ হইতেন না। তাঁহার সহধর্ম্মিণী অত্যন্ত তেজস্বিনী এবং বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন। চন্দ্রকুমারকে বৈষয়িক কার্য্যে অসমর্থ দেখিয়া, কর্ম্মচারিগণ নানা প্রকার চাতুরী দ্বারা অর্থাপহরণ করিতে লাগিল। চন্দ্রকুমারের স্ত্রী এই সমস্ত জানিতে পারিয়া, স্বহস্তে কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বৈষয়িক বুদ্ধি এবং তেজস্বিতা প্রশংসা যোগ্য। নিজ হস্তে বিষয় কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া, তিনি অনেক সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। চন্দ্রকুমারের কোন পুত্র হইল না দেখিয়া পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা হয়। শশিকুমার চন্দ্রকুমারের পোষ্যপুত্র।

শশিকুমার বৈষয়িক কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া, স্বীয় সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। তিনি কৃতবিদ্য, বুদ্ধিমান এবং সদ্বক্তা ছিলেন; ইংরাজী এবং বাঙ্গালা লেখাপড়ায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে, তিনি অতিশয় ব্যুৎপন্ন ছিলেন; পাখোয়াজ এবং তবলা বাজাইতে রায়েরকাঠীর রাজবংশের অন্যতম বংশধর রাজা নরনারায়ণ রায় মহাশয়ের পর তাঁহার ন্যায় বাখরগঞ্জ জিলায় আর কেহ ছিলেন কি না সন্দেহ। শশিকুমার একজন সঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন; তাঁহার প্রণীত হরিসঙ্কীর্ত্তনগুলি বড়ই মধুর এবং হৃদয়গ্রাহী।

বাসণ্ডার মহলানবীশগণ এই জিলায় বৈদ্য জমীদারগণের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই বংশের জয়দেব মহলানবীশের কন্যা রামমালার সহিত কীর্ত্তিপাশার মহাত্মা রাজারাম সেনের বিবাহ হইয়াছিল এবং এই সূত্রে জয়দেবের চারিপুত্র ও পৌত্র কিশোরচন্দ্র কীর্ত্তিপাশার জমীদারের অধীনে কার্য্য করিতেন। কিশোরচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র জগবন্ধু অত্যন্ত সদাশয় ও পরোপকারী ছিলেন; জনসাধারণের অশেষবিধ উপকার সাধন করিয়া তাহাদের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র যোগেশচন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য।

পুরাতন বাটীর কালীকুমার সেন মহাশয় ঢাকা নবাব বাহাদুরের দেওয়ানী কার্য্য করিতেন, তদ্বারা বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত কর্ম্মঠ, ন্যায়পরায়ণ এবং বিচক্ষণ ছিলেন। বর্ত্তমানে তাঁহার বংশধরগণই বাসাণ্ডার জমিদারগণের অন্যতম।

পরবর্ত্তী জমীদারগণের মধ্যে চন্দ্রনাথ সেনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য; ইনি নিজ ব্যয়ে বরিশালে একটী 'কলেরা ওয়ার্ড' স্থাপন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র উপেন্দ্রনাথ যোগ্যতার সহিত জমীদারী রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন।

পরাক্রান্ত মহলানবীশবংশের বাসস্থান বলিয়াই বাসণ্ডার প্রধান গৌরব নহে। বাসণ্ডা বঙ্গভাষার গৌরব চণ্ডীচরণ সেনের জন্মভূমি। ইনি ও ইঁহার কন্যা শ্রীমতী কামিনী সাহিত্যসমাজে দুইটী অনন্যসাধারণ প্রতিভা। ইঁহার দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী যামিনী এল্, এম্, এস্, পাশ করিয়া এই জিলার বিশেষ গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন। ইঁহাদের সম্যক্ বিবরণ স্থানান্তরে উল্লেখ করিব।

বাসণ্ডার গ্রাম্যদৃশ্যটী অতীব মনোরম। দেখিলেই মনে হয় যেন প্রকৃতি-রাণী বনরাজিবেষ্টিত হইয়া তাঁহার সৌন্দর্য্যসম্ভার ঢালিয়া রাখিয়াছেন।

কেওরার চৌধুরীবংশ পোনাবালিয়ার বিখ্যাত জমীদারবংশের শাখা মাত্র। সেনভূমিপতি রাজা শ্রীহর্ষ সেনের অন্যতম বংশধর রামকৃষ্ণ সেন বিদ্যার্ণব এই বংশ বাকলায় প্রতিষ্ঠিত করেন।* রামকৃষ্ণ হাবিলী সেলিমাবাদের জমীদার নরেন্দ্র রায় গুপ্ত চৌধুরীর শিবদা ও সারদা নাম্নী কন্যাদ্বয়ের পাণিগ্রহণ করিয়া পোনাবালিয়ার সন্নিহিত দেউরী গ্রামে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র গোপীবল্লভ,† রাজীবলোচন বিশারদ, শ্রীরাম, রামজীবন ‡ ও গোবিন্দ। শ্রীরাম ও গোবিন্দই যথাক্রমে পোনাবালিয়া ও কেওরার চৌধুরীগণের আদিপুরুষ। শ্রীরামের কীর্ত্তিমান বংশধরগণের বিস্তৃত বিবরণ হাবিলী সেলিমাবাদের ইতিহাসে প্রদত্ত হইবে, গোবিন্দের বংশধরগণের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গোবিন্দ মাতামহের (নরেন্দ্র চৌধুরীর) স্বর্গারোহণের পর তাঁহার সম্পত্তির একাংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র নারায়ণ, মধুসূদন ও জনার্দ্দন। গোবিন্দের পুত্রগণ পৈত্রিক সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে সমর্থ হন নাই। নবাব মুর্শিদকুলিখাঁর কঠোর শাসনে তাঁহারা জমীদারী ইস্তাফা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

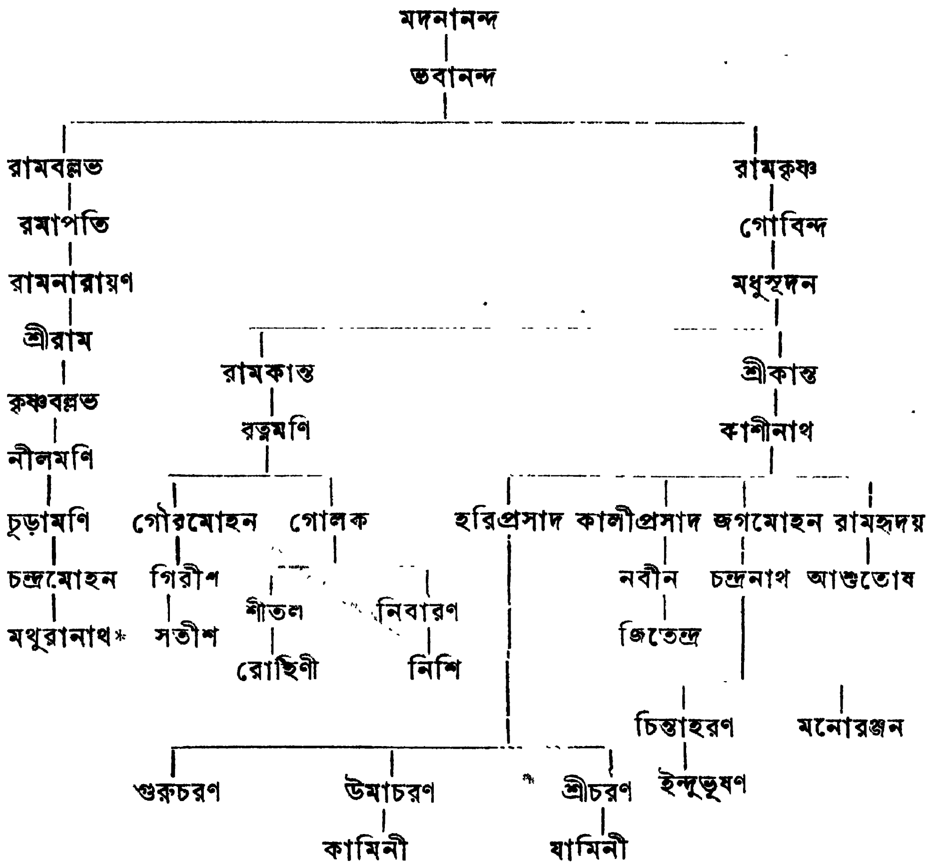
জমীদারী ইস্তাফা প্রদান করিয়া গোবিন্দের সন্তানগণ কেওরা গ্রামে আগমন করেন। রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণবের ভ্রাতুষ্পুত্র রমাপতি সেন কবিবল্লভ পূর্ব্বেই কবিকঙ্কণ গুপ্তের কন্যা বিবাহ করিয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। এইক্ষণে গোবিন্দের সন্তানগণ আসিয়া কবিবল্লভবংশের সহিত মিলিত হইলেন। গোবিন্দের বংশধরগণ বুদ্ধিবলে নূতন ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া প্রনষ্ট গৌরব উদ্ধারে বহুল পরিমাণে কৃতকার্য্য হন। বর্ত্তমান সময়ে কেওরার চৌধুরীগণ সেলিমাবাদ পরগণার একটী শ্রেষ্ঠ জমীদার বংশ বলিয়া পরিচিত। ইঁহাদের ও রামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রমাপতি সেন কবিবল্লভের সংক্ষিপ্ত বংশতালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

---

* তপ্পে হাবিলী সেলিমাবাদ দ্রষ্টব্য।

† কুলকাঠী ও বারইকরণের চৌধুরীগণের আদিপুরুষ।

‡ দেউরীর চৌধুরীগণের আদিপুরুষ।



গোবিন্দের প্রপৌত্রতনয় কালীপ্রসাদ চৌধুরী পাড়েরহাট, গারুড়িয়া প্রভৃতি কয়েকটী জমীদারীর বরিশালস্থ প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামহৃদয় ওকালতি করিতেন। ভ্রাতৃদ্বয় প্রভূত অর্থ ও ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া নিজ গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে কেওরায় লোক সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল। কালীপ্রসাদ ব্রহ্মোত্তর এবং বৃত্তি প্রভৃতি প্রদান করতঃ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি নানাজাতীয় অনেক লোক আনয়ন করিয়া অধিবাসী সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি লোকহিতার্থ নিজ গ্রামে একটী অতিথিশালা প্রতিষ্ঠিত করেন। কমিশনার বাহাদুর

* ইঁহারা তিন ভাই মথুরানাথ, যদুনাথ, উপেন্দ্রনাথ।

তাঁহার বহুবিধ সৎকার্য্যদর্শনে প্রীত হইয়া, সুন্দরবনস্থিত সুতালড়ী, গজালিয়া প্রভৃতি সাতটী চক তাঁহাকে পাট্টা প্রদান করেন। এই সকল স্থান আবাদের নিমিত্ত কালীপ্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্র গুরুচরণ ব্রতী হইলেন। বহু বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর, গুরুচরণ আরব্ধ কার্য্যে সাফল্য লাভ করেন। অগ্রজের দৃষ্টান্তে রামহৃদয়ও সুতালড়ীতে একটী অতিথিশালা স্থাপন করেন। তিনি দশ গণ্ডা জমীদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর কালীপ্রসাদের পুত্র স্বনামখ্যাত নবীনচন্দ্র রায় চৌধুরী দশ গণ্ডা অংশ ক্রয় করেন। নবীনচন্দ্র অত্যন্ত অধ্যবসায়ী, কার্য্যদক্ষ ও সামাজিক লোক ছিলেন। পিতা, পিতৃব্য ও জ্যেষ্ঠতাতভ্রাতা গুরুচরণের মৃত্যুর পর তিনি একাকী সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি স্থানীয় অধিবাসিগণের সুশিক্ষার নিমিত্ত কেওরায় একটী মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং অবস্থানুসারে অর্থ সাহায্য করিয়া দরিদ্র ছাত্রদিগের শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণবের ভ্রাতুষ্পুত্র রমাপতি সেন কবিবল্লভের বংশধরগণ সেলিমাবাদের ভূম্যাধিকারিগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এই বংশের চন্দ্রমোহন সেন বিশেষ প্রসিদ্ধ। চন্দ্রমোহনের বয়ঃক্রম যখন দ্বাদশ বৎসর তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার পিতৃস্বসা যশোদাদেবীর স্বামীও ঐ সময়ে লোকান্তরিত হন। পতির মৃত্যুর পর স্নেহময়ী যশোদা শিশুপুত্র গুরুদাস গুপ্তকে লইয়া পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রের গৃহে আগমন করেন। প্রতিভাবলে চন্দ্রমোহন ও গুরুদাস অনেক ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া শীঘ্রই গণ্যমান্য লোক হইয়া উঠিলেন। চন্দ্রমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মথুরানাথ সেন বি, এল্ বরিশাল ডিষ্ট্রিক্ট্ ও লোকাল বোর্ডের সদস্য পদে নিযুক্ত থাকিয়া বিবিধপ্রকার লোকহিতকর কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা যশস্বী হইয়াছেন।

জলাবাড়ীর বিশ্বাসবংশ বর্ত্তমানে এই জিলার কায়স্থ জমীদারগণের শীর্ষস্থানীয়। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ প্রাণনারায়ণ ও প্রতাপনারায়ণ রায়েরকাঠীর রাজসরকারে কার্য্য করিতেন। রাজা জয়নারায়ণের স্বর্গারোহণের পর যখন তাঁহার পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়, তখন ইঁহারা জ্যেষ্ঠ শিবনারায়ণের পক্ষাবলম্বন করেন। রাজা শিবনারায়ণ, প্রাণ-

নারায়ণকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। প্রাণনারায়ণও বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন করিয়া রাজানুগ্রহ লাভ করেন। এই সময়ে সেলিমাবাদের অনেক উর্ব্বর ভূমিখণ্ড অরণ্য ও বিলে সমাচ্ছন্ন ছিল; প্রাণনারায়ণ, রাজার নিকট এইরূপ কতিপয় স্থানের জিম্বা প্রার্থনা করিলেন। রাজা শিবনারায়ণ পূর্ব্বেই তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট ছিলেন সুতরাং অবিলম্বে তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। এই সময় হইতেই জলাবাড়ীর জমীদারীর সূত্রপাত হয়। কথিত আছে প্রাণনারায়ণ যখন জলপথে সেলিমাবাদের পশ্চিম অঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন একস্থানে কতকগুলি সুবর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বকালে বঙ্গের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ দস্যু তস্করের ভয়ে মৃত্তিকামধ্যে তাহাদের সঞ্চিত ধন রাখিতেন। প্রাণনারায়ণ সম্ভবতঃ এইরূপ কোন সঞ্চিত ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন।

প্রাণনারায়ণের দুই পুত্র, কৃষ্ণসুন্দর ও দ্বারিকানাথ। দ্বারিকানাথের পাঁচ পুত্র, কালীনাথ, বৈকুণ্ঠনাথ, তারকনাথ, উপেন্দ্রনাথ এবং কৈলাশনাথ; ইঁহারা বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত জমীদারী রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন।

প্রাণনারায়ণের ভ্রাতা প্রতাপনারায়ণের বংশধরগণও বিশেষ সমৃদ্ধিশালী। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীনাথ, ক্ষেত্রনাথ, হরিমোহন প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হরিমোহন একজন প্রসিদ্ধ উকীল। এই বিশ্বাসপরিবার বরিশাল জিলায় বিশেষ সমৃদ্ধিশালী।

আমড়াজুরীর দত্তগণ সেলিমাবাদের কায়স্থ ভূস্বামিগণের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ সর্ব্বপ্রথম 'নিমক মহালের' দারোগার কার্য্য করিতেন। পরে রায়েরকাঠীর রাজবংশের অধীনে কার্য্য গ্রহণ করেন। এই বংশের কাশীনাথ দত্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেলিমাবাদ ব্যতীত সাহাজাদপুর পরগণায়ও ইঁহাদের ভূসম্পত্তি আছে। কাশীনাথের পুত্র হরনাথ দত্ত ঐতিহাসিকপ্রবর বেভারিজের সময়ে সাহাজাদপুর পরগণার একজন প্রধান অংশীদার ছিলেন।

সাতুরিয়ার মিঞাগণের পূর্ব্বপুরুষ সেখ সাহাবদ্দিন রায়েরকাঠীতে চাকরী করিতেন। ক্রমে ক্রমে তিনি রাজসরকার হইতে কতক তালুক প্রাপ্ত হইয়া সুক্তাগড় নামক স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। তিনি

একজন স্বধর্ম্মপরায়ণ নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন এবং এদেশে ফকির বলিয়া অভিহিত হইতেন। তঁহোর নয় পুত্র ছিল। তাঁহারা স্বীয় স্বীয় কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক সূক্তাগড় হইতে সাতুরিয়ায় বাসস্থান স্থাপন করেন এবং অনেক ভূসম্পত্তি সঞ্চয় পূর্ব্বক বিশেষ বিখ্যাত হইয়া পড়েন। পিতার জীবদ্দশায়ই উপযুক্ত পুত্রগণ জমীদারীর উন্নতিকল্পে যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করেন।

এই সমৃদ্ধিশালী মিঞাগণের আদিপুরুষ সাজেদাঁ একজন ফকির ছিলেন। যখন স্বনামপ্রসিদ্ধ খাঞ্জেআলি এদেশে আগমন পূর্ব্বক বিবিধ লোকহিতকর কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন, তখন সাজেদাঁ ফকির তাঁহার সহচর ছিলেন। এই উভয়ের মধ্যে অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ ছিল, এবং উভয়ই অত্যন্ত সদাশয় ও পরোপকারী ছিলেন। খাঞ্জেআলির সহিত সাজেদাঁ এদেশে আগমন করিয়া বাগেরহাটের অন্তর্গত হাবেলী গ্রামে বাসস্থান স্থাপন করেন। এই স্থানে তাঁহার সন্তানসন্ততিগণও ফকিরি করিতেন। কতিপয় বৎসর পরে ঐ বংশের সাহাবদ্দিন রায়েরকাঠীতে চাকরী করিতে আরম্ভ করেন, এবং তাঁহার সময় হইতেই ইহাদের জমীদারীর পত্তন হয়।

এই বংশের দ্রোহতুল্লা ও আবদুল আজিজ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন, তাঁহাদের বিবিধ কার্য্যাবলী এখনও এ জিলার অনেক স্থানে প্রচলিত আছে। এই মুসলমান পরিবার বরিশাল জিলায় বিশেষ সম্মানিত; সায়েস্তাবাদের সম্ভ্রান্ত মীরগণের সহিত ইহাদের বৈবাহিক ক্রিয়াদি হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে বিবি মেহেরেন্নেছা খাতুণের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ইনি নিজ গ্রামের অনেক উন্নতি সাধন করিয়া বহুলোকের আশীর্ব্বাদের পাত্রী হইয়াছেন। ইঁহারই যত্নে ও অর্থব্যয়ে সাতুরিয়ায় পোষ্টাফিস, স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইঁহার জামাতা, সায়েস্তাবাদের জমীদারবংশের অন্যতম বংশধর সৈয়দ ওবেদুল্লা সাতুরিয়ায় বাস করিতেছেন। ইনি পরোপকারী, বিনয়ী ও শিক্ষিত।



কালাচাঁদ বিগ্রহ—(পোনাবালিয়া)।

৫। হাবিলী সেলিমাবাদ।

এই পরগণা পূর্ব্বে সেলিমাদের অন্তর্গত ছিল। মিঃ বেভারিজ্ লিখিয়াছেন—This has evidently been formed out of pargana Selimabad. The word *havili* implies that the tract was stipendiary or demesne land of the Zemindar--that is, it was the land appropriated to his own use. অর্থাৎ তল্লে হাবিলী সেলিমাবাদ, সেলিমাবাদ হইতে গঠিত হইয়াছে। জমীদারের নিজ ব্যয় নির্ব্বাহার্থ এই স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। অদ্যাপি ইহার নয় আনা অংশ সেলিমাবাদের জমীদারীর অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে।* অবশিষ্ট সাত আনা মূল সেলিমাবাদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র পরগণায় পরিণত হইয়াছে।

সৈদপুর পরগণা পূর্ব্বে হাবিলী সেলিমাবাদের অন্তর্গত ছিল। ভগীরথ সিং নামক জনৈক কাননগুই কর্ত্তৃক ইহা পৃথকীভূত হইয়া গিয়াছে।† অন্যথা এই পরগণার আকার দ্বিগুণ অপেক্ষাও বৃহৎ হইত। ইহার বার্ষিক রাজস্ব ১১০৫৫ ॥৶৬ পাই মাত্র।

ভারতপ্রথিত ত্র্যম্বকেশ্বর শিবলিঙ্গ ‡ এই পরগণায় শ্যামরাইল বা

* See partition papers of 1180 B. S.

† The pargana of Syedpur is said to have been formerly included in Havili Selimabad, and to have been separated from it through the influence of Bhagirath Singh, who was a kanungo.—Beveridge's History of Bakarganj, p. 124.

‡ ৬৫ পৃঃ দেখ। এই শিবলিঙ্গ নির্ম্মল কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত, দেখিতে বড়ই সুন্দর; কাশীধামেও নাকি এইরূপ সুশ্রী শিব দেখা যায় না। পোনাবালিয়া শিববাড়ী ৫১ পীঠের অন্তর্গত :—

সুগন্ধায়াং নাসিকামেদেবস্ত্র্যম্বকভৈরবঃ।
সুন্দরী সা মহাদেবী সুনন্দা তত্র দেবতা॥

অনেকের বিশ্বাস শিকারপুরের উগ্রতারাই এই শিবের শক্তি, স্থানীয় জমীদারগণ বলেন ইহার শক্তি তারা নহে, ষোড়শীর অন্তর্গত "সুন্দরী"।

প্রায় বিশ বৎসর হইল গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্রাহ্মণ এই স্থানে পাষাণময়ী কালিকামূর্ত্তি স্থাপন করেন। মাঘী সপ্তমী ও শিবরাত্রি প্রভৃতি পর্ব্বোপলক্ষে এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

আদি জমীদার নরেন্দ্র গুপ্ত চৌধুরীর সময়ে ব্রহ্মানন্দ গিরি নামক এক সন্ন্যাসী এই স্থানে বাস করিতেন। কেহ কেহ বলেন তিনিই ত্র্যম্বকেশ্বরের প্রকাশকর্ত্তা। তাহার দ্বাদশটী গোপাল ছিল। পোনাবালিয়া ও বাদুরপুরের কালাচাঁদ এবং কলসকাঠীর নীলমাধব এই দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। ব্রহ্মানন্দের পরবর্ত্তী কালে অনেক সাধুসন্ন্যাসী শিববাড়ীতে অবস্থান করিতেন, তন্মধ্যে পুরান গিরি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি এইস্থানেই দেহত্যাগ করেন।

হাজরাগাতি নামক স্থানে অবস্থিত। এই স্থান "পোনাবালিয়া শিববাড়ী" বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহারই প্রান্ত বিধৌত করিয়া সুগন্ধানাম্নী গঙ্গাস্রোতঃ প্রবাহিত ছিল। বহুকাল হইল এই নদীর অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে, কিন্তু পোনাবালিয়া শ্যামরাইল প্রভৃতি স্থান অদ্যাপি সোন্দারকূল বলিয়া পরিচিত। সম্ভবতঃ প্রাচীন "সোন্দারকূল" পরগণা এই সমস্ত স্থান ও সুগন্ধাগর্ভোৎপন্ন ভূখণ্ড লইয়া গঠিত হইয়াছিল। সেলিমাবাদ সৃষ্ট হইলে এই পরগণার নাম বিলুপ্ত হইয়া সেলিম্যাবাদভুক্ত হইয়া থাকিবে।

বাদসাহী আমলে নরেন্দ্র রায় গুপ্ত চৌধুরী নামক জনৈক বৈদ্যসন্তান তপ্পে হাবিলী সেলিমাবাদের চারি আনা জমীদারী লাভ করিয়া ঝালকাঠীর অধীন পোনাবালিয়া গ্রামের সন্নিহিত আতাকাঠী নামক স্থানে আগমন করেন।* আতাকাঠী এখনও তাঁহার কীর্ত্তিকলাপের ভগ্নাবশেষ বক্ষে ধারণ করিয়া অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। তিনি এই স্থানের অরণ্য পরিষ্কৃত করিয়া সুবৃহৎ অট্টালিকা, নির্ম্মল সলিলা দীর্ঘিকা, প্রশস্ত রাজবর্ত্ম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। গুপ্তচৌধুরীর বাটীর ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। ইহারই সিংহদ্বার হইতে দেউরী গ্রামের নামোৎপত্তি। গুপ্ত-চৌধুরীর দীঘী এই দেউরী গ্রামে অবস্থিত। এই দীঘী এইক্ষণে ভরিয়া গিয়াছে, ইহার দক্ষিণ তীর হইতে শিববাড়ী, চাঁদপুরা, সেওতা, খুলনার মধ্য দিয়া দক্ষিণ পূর্ব্বে বহুদূর একটী রাস্তা বিস্তৃত রহিয়াছে, উহা "গুপ্ত-চৌধুরীর জাঙ্গাল" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

নরেন্দ্র চৌধুরীর দৌহিত্রবংশোদ্ভব কুলকাঠী ও পোনাবালিয়ার চৌধুরীগণের বংশতালিকা দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার সময় হইতে বর্ত্তমানে (১৯০৪ খৃঃ অব্দ) একাদশ পুরুষ (generation) অতিক্রান্ত হইয়া দ্বাদশ পুরুষ চলিতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঐতিহাসিকগণ এক পুরুষে ত্রিশ বৎসর গণনা করেন। ১১ × ৩০ = ৩৩০ ; এই হিসাবে ১৯০৪ − ৩৩০ = ১৫৭৪ খৃঃ অব্দ নরেন্দ্র চৌধুরীর জন্মকাল হয়।

---

* Gupta Chaudhuri was the first Zemindar.—Beveridge's Bakarganj, p. 124.

১৬৫৩ খৃঃ অব্দে রচিত রামকান্তদাশ কবিকণ্ঠহারকৃত সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকায় গুপ্তচৌধুরীর সম্পূর্ণ নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়।

একাচ তনয়া জাতা পরিণীতা চ কন্যকা।
নরেন্দ্র রায় গুপ্তেন সিলিমাবাদবাসিনা ॥ ৫৭ পৃষ্ঠা।

অরবিন্দকুলসম্ভূত রামকান্ত দাশ কবিকণ্ঠহার ১৫৭৫ শকে * অর্থাৎ ১৬৫৩ খৃঃ অব্দে সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা প্রণয়ন করেন। নরেন্দ্র ইহার তিন পুরুষ (generation) পূর্ব্ববর্ত্তী, † ইহাতে ৩০ × ৩ = ৯০ বৎসর ধরা যায়। এই হিসাবে ১৬৫৩ − ৯০ = ১৫৬৩ খৃঃ অব্দ নরেন্দ্র চৌধুরীর সময় হয়। অতএব ১৫৬৩—৭৪ খৃঃ অব্দ নরেন্দ্র চৌধুরীর আবির্ভাব কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

১৬০৩ খৃঃ অব্দ হইতে ১৬০৫ খৃঃ অব্দের মধ্যে সেলিমাবাদ সৃষ্ট হয় ‡ তন্মে হাবিলী সেলিমাবাদ সেলিমাবাদ হইতে গঠিত, অতএব ইহার সৃষ্টি ১৬০৫ খৃঃ অব্দের কিয়ৎকাল পরে হইয়াছে বলিতে হইবে। ১৬৫৩ খৃঃ অব্দে রচিত সদ্বৈদ্য কুলপঞ্জিকায় নরেন্দ্র গুপ্ত "রায়" ও "সেলিমাবাদবাসী" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।§ অতএব গুপ্তচৌধুরী ১৬০৫ হইতে ১৬৫৩ খৃঃ অব্দের মধ্যে হাবিলী সেলিমাবাদের জমীদারী (চারি আনা) লাভ করিয়া অস্মদ্দেশে আগমন করেন ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।¶ সেই

---

* কবিণা কণ্ঠহারেণ মাতুলোদিত বর্ত্মনা।
পঞ্চসপ্ততিথৌ শাকে ক্রিয়তে কুলপঞ্জিকা। ১ম পৃষ্ঠা।

† কণ্ঠহার ৫৪ পৃষ্ঠা (চতস্রঃ কন্যকাঃ ইত্যাদি)।

‡ ২২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। সেলিমাবাদ সরকার ফতিয়াবাদের অন্তর্গত ছিল (Beveridge's Bakarganj p. 51, 110) কিন্তু আবুলফজেল প্রণীত আইন-ই-আকবরিতে ফতিয়াবাদের মহালগুলির যে তালিকা আছে তাহাতে সেলিমাবাদের উল্লেখ নাই। অতএব সেলিমাবাদ উক্ত গ্রন্থ প্রণয়ণের পরে সৃষ্ট হইয়াছে সন্দেহ নাই।

§ নরেন্দ্র রায় গুপ্তেন সিলিমাবাদবাসিনা। ৫৭ পৃষ্ঠা, কণ্ঠহার।

¶ "বাখরগঞ্জের ইতিহাস" প্রণেতা ঘোসাল বাবু একটী কিম্বদন্তী অবলম্বনে নরেন্দ্র গুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তী আরও দুইজন জমীদারের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার মতে উহারা নরেন্দ্রের পিতা ও পিতামহ, এবং এই শেষোক্ত ব্যক্তিই হাবিলী সেলিমাবাদ জমীদারীর প্রতিষ্ঠাতা। নরেন্দ্র গুপ্তের আবির্ভাব কাল অনুমান ১৫৬৩—১৫৭৪ খৃঃ অব্দ, তাঁহার পিতামহ তখন অবশ্য বৃদ্ধ ছিলেন অতএব তিনি ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সেলিমাবাদ এই সময়ের এক শতাব্দী পরে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সৃষ্ট হয়। তন্মে হাবিলী সেলিমাবাদ আরও পরে গঠিত হয় ইহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, তখন নরেন্দ্র গুপ্তের পিতামহ জীবিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। ঐতিহাসিক-প্রবর বেভারিজ্ গুপ্তচৌধুরী নামক একজন জমীদারের অস্তিত্বের কথা লিখিয়াছেন (Gupta Chaudhari was the first Zemindar)। বৈদ্যকুলপঞ্জিকাতেও একমাত্র নরেন্দ্র গুপ্ত ব্যতীত অপর কোন সেলিমাবাদবাসী গুপ্ত চৌধুরীর উল্লেখ নাই।

সময়ে সুতালড়ীর ঘোষ চৌধুরিগণ তিন আনা অংশ প্রাপ্ত হ'ন। অবশিষ্ট নয় আনা রায়েরকাঠীর রাজবংশের অধীন ছিল। উত্তরকালে নরেন্দ্র গুপ্ত চৌধুরীর দৌহিত্র-তনয় রামভদ্র রায় চৌধুরী ঘোষ, চৌধুরিগণের অংশ গ্রহণ করায় গুপ্ত চৌধুরীর দৌহিত্রবংশ সাত আনা জমীদারীর মালিক হইলেন।

নরেন্দ্র চৌধুরী উচলিবংশীয় শ্রীনায়কাখ্য শ্রীরাম রায়ের কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। তাঁহার তিনটী কন্যা সন্তান থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। * তাহার এক কন্যার সহিত উচলিবংশোদ্ভব রমানাথ সেনের পুত্র রামচন্দ্র সেনের বিবাহ হয়। শিবদা ও সারদা নাম্নী অপর দুই কন্যা রোষবংশোদ্ভব রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণব বিবাহ করেন। রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণব হইতেই পোনাবালিয়া, কুলকাঠী, বারইকরণ, দেউরী ও কেওরার চৌধুরী বংশের উদ্ভব হইয়াছে।

---

* খোসাল বাবু বোধ হয় একটী কিম্বদন্তী অবলম্বনে লিখিয়াছেন (বাখরগঞ্জের ইতিহাস, ১১৪—১১৫ পৃষ্ঠা) যে নরেন্দ্র চৌধুরীর এক কন্যা ও দুই নাবালক পুত্র ছিল। রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণবের নিকট চৌধুরী কন্যাকে বিবাহ দেন। ঘটনাচক্রে (সুরুচির অনুরোধে ঘটনাটী উল্লিখিত হইল না) একটী বালক হত হইল অন্যটী (নাম শ্রীরাম রায়) সাহাজাদপুরে পলায়ণ পূর্ব্বক স্থানীয় জমীদারবংশে বিবাহ করিয়া তথায় বদ্ধমূল হ'ন।

ঐতিহাসিকপ্রবর বেভারিজ্‌ উল্লিখিত কিম্বদন্তীর বিন্দুবিসর্গও অবগত নহেন। ১৬৫৩ খৃঃ অব্দে রচিত কণ্ঠহারকৃত সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকার উচলি প্রকরণে লিখিত আছে :—

চতস্রঃ কন্যকাঃ কালীচরণো রামচন্দ্রতঃ।
অশ্বগুপ্ত নরেন্দ্রস্য সিলিমাবাদবাসিনঃ।
দৌহিত্রাঃ কন্যয়োর্ণাথৌ শিবাব্জি মদনাবুভৌ ॥ ৫৪ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ উচলিবংশীয় রামচন্দ্র হইতে চারি কন্যা ও কালীচরণ (পুত্র) জন্মগ্রহণ করে। ইহারা সিলিমাবাদবাসী গুপ্তবংশোদ্ভব নরেন্দ্রর দৌহিত্র। এতদ্দারা স্পষ্টই জানা যায় যে রামকৃষ্ণের পত্নী ব্যতীত নরেন্দ্রের আরও কন্যা ছিল। তাঁহার সহিত উচলিবংশীয় রামচন্দ্র সেনের বিবাহ হয় এবং তাঁহার গর্ভে এক পুত্র ও চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ইহার মধ্যে দুইটী কন্যার বিবাহের কথা পর্য্যন্ত অবগত হওয়া যায়। কণ্ঠহার তাহাদের স্বামীর নাম দিয়াছেন। কুলকাঠী ও পোনাবালিয়ার চৌধুরিগণ রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণবের সন্তান ও নরেন্দ্রের দুহিতৃকুলজাত, ইহা খোসালবাবুও অবগত আছেন (বাঃ ইঃ ১১৪ পৃঃ) কিন্তু তাঁহারা নরেন্দ্রের এক কন্যার বংশধর নহেন। কুলকাঠীর চৌধুরিগণ বলেন তাঁহারা নরেন্দ্র গুপ্তের জ্যেষ্ঠা কন্যা শিবদার বংশধর, পোনাবালিয়া ও কেওরার চৌধুরিগণ গুপ্ত চৌধুরীর সারদা নাম্নী কনিষ্ঠা কন্যার বংশধর। চৌধুরিগনের গয়ায় পিণ্ডদানের বহিতে শিবদা ও সারদার নামোল্লেখ আছে। রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণব এই উভয় কন্য বিবাহ করিয়াছিলেন। নরেন্দ্র চৌধুরীর এক কন্যা থাকার কথা অমূলক। তাঁহার তিন কন্যা ছিল এবং কন্যাগণ

ধন্বন্তরি বংশোদ্ভব রাজা শ্রীহর্ষ সেন, রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণবের আদি পুরুষ। রাজা শ্রীহর্ষ বর্ত্তমান মানভূম জিলার অন্তঃপাতী সেনভূমে কাঞ্চীগাঁ নগরে

প্রত্যেকেই পুত্রবতী ছিলেন। অত্রাবস্থায় নরেন্দ্র চৌধুরীর দুইটী নাবালক পুত্র থাকিলে কন্যাদের মধ্যে কাহারও তাহাদিগকে অপসারিত করিয়া পৈত্রিক সম্পত্তির অধিশ্বরী হইবার সম্ভাবনা ছিল না। বাদসাহী আমলে জমীদারগণ রাজস্ব আদায়কারী কর্ম্মচারীস্বরূপ ছিলেন। রীতিমত রাজস্ব আদায়ে অক্ষম হইলে বড় বড় জমীদার গণেরও জমীদারী যাইত। অত্রাবস্থায় নাবালকের জমীদারী রক্ষা অসম্ভব। (তৎকালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও কোর্ট অব ওয়ার্ড ছিল না।) অতএব নরেন্দ্র চৌধুরীর নাবালক পুত্র থাকিলে তাহাদের অপসারিত না করিয়াও অভিভাবকগণ রাজস্ব প্রদান করিয়া নিজ নিজ নামে নবাবের নিকট হইতে সম্পত্তি লাভ করিতে পারিতেন।

নরেন্দ্র চৌধুরীর শ্বশুরের নাম কোথাও শ্রীনায়কাখ্য শ্রীরাম রায়, কোথাও বা কেবল শ্রীরাম রায় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে—

শ্রীনায়কাখ্যঃ শ্রীরাম রায় স্তিস্রশ্চকন্যকাঃ।
ত্রিপুরানন্দতো জাতা দত্তজাগর্ত্তসম্ভবাঃ॥
কায়ু ভবানন্দ সুতা জগন্নাথস্য কন্যকা।
শ্রীনায়কস্য ভাগ্যেদ্ধে গোপীনাথঃ সুতোঽভবৎ॥
একাচ্ তনয়াজাতা পরিণীতা চ কন্যকা।
নরেন্দ্র রায় গুপ্তেন সিলিমাবাদবাসিনা॥
মহেশ সেনজাভর্ত্তু র্গোপীনাথাৎ সুতোঽভবৎ।
চাটীগ্রাম মসৌর্নাতো বলান্বয়চমূচন্দ্রিঃ॥ কণ্ঠহার ৫৬।৫৭ পৃঃ
জগন্নাথাদ্ভবৌ গদাধরশ্চ মধুসূদনঃ।
কন্যৈকা বিষ্ণুসেনস্য দৌহিত্রাস্তনয়াস্তুচ।
শ্রীনায়কাখ্য শ্রীরামরায়স্তাং পরিণীতবান্॥ ১৪০ পৃঃ
ভবানন্দ সুতো জাতৌ গোবিন্দ হরিগুপ্তকৌ।
তিস্রশ্চকন্যকাজাতা দাশশ্রীধরজা সুতাঃ॥
নারসিংহো বিষ্ণুদাশো গোপীনাথাখ্য সেনকঃ।
শ্রীনায়কাখ্যঃ শ্রীরামরায়ঃ জামাতরঃ স্মৃতাঃ॥ ১৭৬ পৃঃ
বিদ্যানন্দান্মহোশোঽভূৎ হরিদাসসুতা সুতঃ।
তস্মাজ্জাতে উভে কন্যে তয়োরেকং ব্যুবাহচ॥
শ্রীরামরায় তনয়ো গোপীনাথোঽপরাং সুতাং।
হরগৌরীদাস দাশো মহেশোঽভূদপুত্রকঃ॥ ২৭ পৃঃ

অতএব নরেন্দ্রের শ্রীরাম রায় নামে কোন পুত্র থাকিলে মাতামহ দৌহিত্রের এক নাম হয়। বলা বাহুল্য এইরূপ ঘটনা অস্মদ্দেশস্থ হিন্দু সমাজে অসম্ভব। পোনাবালিয়ার চৌধুরিগণের পূর্ব্বপুরুষ শ্রীরাম রায় নরেন্দ্র চৌধুরীর দৌহিত্র, ইহার পুত্র রামভদ্র রায়, পৌত্র শ্রীকৃষ্ণ রায় অদ্যাপি এই নামে জমীদারী চলিতেছে। নরেন্দ্রের শ্রীরাম নামে কোন পুত্র থাকিলে সাক্ষাৎ মাতুল ও ভাগিনেয়ের এক নাম হয়। ইহাও অসম্ভব। কণ্ঠহার ৫৭ পৃষ্ঠায় দেখা যায় সেলিমাবাদবাসী জমীদার নরেন্দ্র

রাজত্ব করিতেন। * তাঁহার দুই পুত্র কমল ও বিমল। জ্যেষ্ঠ কমল পিতৃরাজ্য লাভ করেন, বিমল মহারাজ বল্লাল সেন প্রদত্ত কৌলীন্য গ্রহণ করিয়া রাঢ়দেশে আগমন করেন; তৎপুত্র বিনায়ক সেন গৌড়েশ্বর হইতে গজ, কনকছত্র এবং বহুবিধ রত্ন প্রাপ্ত হইয়া ভাগীরথী তীরস্থ মালঞ্চ গ্রামে বাসস্থান নির্দ্ধারণ করেন। † বিনায়কের তিন পুত্র রোষ, ২য় ধন্বন্তরি, কাপড়ি। ‡ রাঢ়ীয় বৈদ্যগণের কুলগ্রন্থে লিখিত আছে যে মহামতি রোষ কুলেশীলে, গুণে বৈদ্য জাতির শীর্ষস্থানীয় ছিলেন :—

পিতেব বৈদ্যেষু বভূবমুখ্যঃ কুলেন শীলেন গুণৈঃ শ্রিয়াচ।
যো রোষসেনোঽস্য মহামহিম্নঃ বংশাবলীং শ্রীভরতো জগাদ॥ (রত্নপ্রভা ২৬ পৃঃ)

বিনায়কস্য পুত্রো যো জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠো ভিষক্‌কুলে।
রোষসেনোঽত্র মালঞ্চে তদ্বংশ্যাঃ সুপ্রতিষ্ঠিতা॥ (চন্দ্রপ্রভা ১৬ পৃঃ)

গুপ্তের "রায়" উপাধি ছিল। তৎকৃত দীর্ঘী, বাটী এবং জাঙ্গাল ও বেভারিজের গ্রন্থ "চৌধুরী" উপাধি ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু সাহাজাদপুরবাসী শ্রীরাম বংশধরগণের রায় কি চৌধুরী উপাধি নাই। নবাবী আমলে বাদসাহদত্ত বংশোপাধি (রায়, চৌধুরী, মজুমদার, দস্তিদার, সরকার প্রভৃতি) কেহই পরিত্যাগ করিত না। রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণবের বংশধরের মধ্যে যাহারা স্থানচ্যুত এবং জমীদারীভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারাও "চৌধুরী" পদবী ত্যাগ করেন নাই (যথা কেওয়ার চৌধুরীগণ)।

* কণ্ঠহার বিনায়ক বংশ।

† রত্নপ্রভা ৭ পৃষ্ঠা।

‡ বিনায়কস্য সেনস্য জজ্ঞিরে তনয়াস্ত্রয়ঃ।
রোষসেনস্তদীয়াগ্র্যো ধন্বন্তরিরথাপরঃ॥
পরঃ কাপড়ি সেনোঽমী ত্রয় এব মহাকুলাঃ।
ত্রিস্রোধারা ইবোদ্ভূতা ভগীরথসমুদ্ভবাঃ॥ রত্নপ্রভা ৭ পৃঃ

[প্রচলিত কণ্ঠহারে বিনায়ক প্রকরণের প্রারম্ভে লিখিত আছে যে বিনায়কের দুই পুত্র ধন্বন্তরি ও শুক; রোষ ধন্বন্তরির পুত্র ও গাওেয়ির অগ্রজ ভ্রাতা। কিন্তু কণ্ঠহার অগ্রে গাওেয়িবংশ লিখিয়া পরে রোষবংশ লিখিয়াছেন। তিনি রোষকে ধন্বন্তরির পুত্র এবং গাওেয়ির অগ্রজ ভ্রাতা বলিয়া জানিলে কখনই এইরূপ করিতেন না, কারণ তিনি সর্ব্বত্র জ্যেষ্ঠানুক্রমে বংশাবলী লিখিয়াছেন, রামসেন পিতৃ-শাপে কৌলীন্যহীন হইলেও জ্যেষ্ঠত্ব নিবন্ধন অগ্রে তাঁহার বংশ লিখিয়া, পরে মহাকুল লক্ষ্মণ, কন্দর্প প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের বংশ লিখিয়াছেন, জয়দাশ অকুলীন হইলেও তাহার বংশ লিখিয়া তৎপরে তদনুজ মহাকুল বিষ্ণুদাশ বংশ লিখিয়াছেন। চন্দ্রপ্রভা, রত্নপ্রভা প্রভৃতি অন্যান্য বৈদ্যকুলপঞ্জিকা গুলিতে রোষ ধন্বন্তরির ভ্রাতা এবং শুক ধন্বন্তরির পুত্র ও গাওেয়ির অগ্রজ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন (রত্নপ্রভা ২৬ পৃষ্ঠা)। তদনুযায়ী বিনায়কাৎ সুতৌ জাতৌ ধন্বন্তরি শুকাহ্বভৌ স্থলে বিনায়কাৎ সুতৌ জাতৌ ধন্বন্তরি রোষাহ্বভৌ করিলে কণ্ঠহারের ক্রমভঙ্গদোষ নিরাকৃত হয়, কুলপঞ্জিকাগুলির মধ্যেও কতক ঐক্য স্থাপিত হয়।]

রোষের পুত্র নারায়ণ, তৎ পুত্র সাণ্ডু সেন। * সুবিখ্যাত বৈদ্যকগ্রন্থ চক্রদত্তের সংগ্রহ-তত্ত্বচন্দ্রিকা নামক টীকাকার রোষকুলপঙ্কজ শিবদাস সেন নিজ পূর্ব্বপুরুষগণের যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে সাণ্ডু সেন (সাহিসেন) শিখরভূমির রাজসভায় এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন, তিনি সার্ব্বভৌম কবিকে পরাভূত করিয়া প্রভূত যশ অর্জ্জন করেন।† তাঁহার কুমার, কাকুৎস্থ প্রভৃতি চারি পুত্র জন্মে। কুমারের পৌত্র কৃষ্ণখাঁ ও হরিহরখাঁ বংশপ্রভব রোষসেনগণ অদ্যাপি রাঢ়দেশে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর কুলীন বলিয়া সম্মানিত। কাকুৎস্থকেও কবি কণ্ঠহার "কুলভূষণ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।‡ তাঁহার পুত্র লক্ষ্মীধর (লক্ষ্মীপতি), তৎপুত্র শুভঙ্কর, শুভঙ্করের পুত্র মদন সেন। কুলকাঠীর চৌধুরিগণের মতে ইনিই রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণবের পিতামহ মদনানন্দ সেন কবিভূষণ। § মদন সেনের পুত্র ভবানন্দ কবিচন্দ্র। ভবানন্দের সহধর্ম্মিণী কমলা দেবীর গর্ভে রামবল্লভ ও রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণব জন্মগ্রহণ করেন।

রাঢ়ীয় বৈদ্যগণের কুলগ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে বিনায়ক হইতে কাকুৎস্থ পর্য্যন্ত রামকৃষ্ণের পূর্ব্বপুরুষগণ ভাগীরথী তীরস্থিত মালঞ্চ নগরে বাস করিতেন।¶ শিবদাস সেন কৃত চক্রদত্ত টীকায় লিখিত

---

* রত্নপ্রভা ৭ পৃষ্ঠা।

† আসীৎ সভায়াং শিখরেশ্বরস্য লব্ধপ্রতিষ্ঠঃ কিলসাহিসেনঃ।
বাণীবিলাসং কবিসার্ব্বভৌমং বিজিত্য যঃ প্রাপ যশঃ সমুদ্রং॥

‡ সাহিসেনস্য তনয়ঃ কাকুৎস্থ কুলভূষণং। কণ্ঠহার ১০২ পৃঃ

§ কণ্ঠহার বলেন রোষবংশীয় শুভঙ্করের দুই পুত্র বলভদ্র ও মদন, (১০৪ পৃঃ) ১৬৭ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন 'রোষকুলজ মদন ত্রিপুরবংশীয় সূর্য্যগুপ্তের কন্যা বিবাহ করেন বৈতরণীর পাণ্ডা গয়ালীদের ও গয়াপিণ্ডদানের বহিতে রামকৃষ্ণবিদ্যার্ণবের পিতা ভবানন্দ ও পিতামহ মদনানন্দ সেনের নাম পাওয়া যায়। পোনাবালিয়ার চৌধুরিগণের একখানি বংশতালিকায় লেখা আছে মদনানন্দ ত্রিপুর সূর্য্যগুপ্তের কন্যা বিবাহ করেন। অতএব কণ্ঠহারকথিত মদন ও বিদ্যার্ণবের পিতামহ মদনানন্দ একই ব্যক্তি মনে হয়।

¶ বিনায়কস্য পুত্রো যো জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠো ভিষককুলে।
রোষসেনোঽত্র মালঞ্চে তদ্বংশ্যাঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ॥ ১৬ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা
তস্যৈব রোষসেনস্য বংশে মহতি সাগরে।
সাণ্ডুসেনোঽভবৎ চন্দ্রো বিখ্যাত ভুবনত্রয়ে॥ ১৬ পৃঃ
সাণ্ডুসেনস্য চত্বারঃ কুমারাদয় আত্মজাঃ।
কুলোজ্জ্বলাঃ যে তদ্বংশ্যাঃ সর্ব্বে মালঞ্চবাসিনঃ॥ ১৪ :

আছে কাকুৎস্থপুত্র লক্ষ্মীধরও মালঞ্চ নিবাসী ছিলেন। * লক্ষ্মীধরের কনিষ্ঠ পুত্র শুভঙ্কর ও তৎপুত্র মদন কোন স্থানে বাস করিতেন তাহা নিশ্চিত জানা যায় না। প্রবাদ যে মদনানন্দ বিক্রমপুরান্তর্গত কাঁচাদিয়া গ্রামে বাস করিতেন। পরে তথা হইতে তদীয় পৌত্র রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণব অস্মদ্দেশে আগমন করেন। অনেকে ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন লক্ষ্মীধরেব জ্যেষ্ঠ পৌত্র বিদ্যাধরের সন্তানগণ বিক্রমপুরে গমন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মদনানন্দপ্রমুখ রোষসেনগণের বিক্রমপুরবাসের কোন প্রমাণ নাই। কণ্ঠহারও লিখিয়াছেন—

বিক্রমপুরেহি তিষ্ঠন্তি বিদ্যাধরকুলোদ্বহাঃ।
অন্যেচ রোষকুলজা নানাস্থানমুপাগতাঃ॥

পোনাবালিয়ার চৌধুরিগণের কুলপুরোহিত নাগপাড়ার চক্রবর্ত্তীগণ রাঢ়দেশ (বাঁশবেড়ে) হইতে সমাগত। কুলকাঠীর চৌধুরিগণের গুরুগণও (যশোহরের কাজুলিয়া) উক্ত প্রদেশ হইতে আগমন করিয়াছেন। অতএব পোনাবালিয়া ও কুলকাঠীর চৌধুরিগণের পূর্ব্বপুরুষ রামকৃষ্ণের রাঢ় হইতে আগমন অসম্ভব নহে।

রামকৃষ্ণ এদেশে আগমন করিয়া নরেন্দ্র চৌধুরীর শিবদা ও সারদা নাম্নী কন্যাদ্বয়ের পাণিগ্রহণ করেন। শিবদার গর্ভে গোপীবল্লভ, সারদার গর্ভে রাজীবলোচন, শ্রীরাম, রামজীবন ও গোবিন্দ এই পাঁচ পুত্র জন্মে।

নরেন্দ্র চৌধুরীর স্বর্গারোহণের পর তাঁহার দৌহিত্রগণ তদীয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন। গোপীবল্লভ জ্যেষ্ঠত্ব নিবন্ধন এক আনা অংশ প্রাপ্ত হইয়া বারইকরণ গ্রামে বাসস্থান নির্দ্ধারণ করেন। অবশিষ্ট তিন আনা অন্যান্য ভ্রাতৃগণের মধ্যে সমভাগে বিভক্ত হয়। যতদূর জানা যায় রাজীবলোচন, শ্রীরাম, রামজীবন ও গোবিন্দ দেউরী গ্রামে বাস করিতেন।

কাকুৎস্থ সেনস্তনয়স্ততোঽভূৎ ততোপি লক্ষ্মীধরসেননামা।
তস্মাদভূদুদ্ধরণস্তনুজ তস্যাপ্যনন্ত স্তনয়োথ জজ্ঞে॥
মালঞ্চিকাগ্রামনিবাসভূমেঃ গৌড়াবনি পালভিষগ্বরস্য।
অনন্তসেনস্য সুতোবিধত্তে টীকামিমাং শ্রীশিবদাসসেনঃ॥ (চক্রদত্ত টীকা)

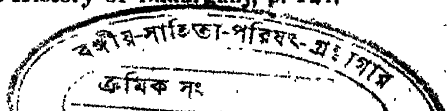
পোনাবালিয়ার রোষগণ অনন্তের সন্তান বলিয়া প্রবাদ আছে। প্রকৃতপক্ষে অনন্তের সন্তানগণ পূর্ব্ববঙ্গে আগমন করেন নাই।—(চন্দ্রপ্রভা ৩৬ পৃষ্ঠা—"গতা স্ত্রয়োঽমী রদীপুরাদুত্তর গঙ্গরাঢ়াম্; বসন্তি তত্রৈব তদীয় বংশ্যাঃ")।

শ্রীরামের কীর্ত্তিকলাপের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।* তাঁহার স্বর্গারোহণের পর তৎপুত্র রামভদ্র রায় চৌধুরী অতি যোগ্যতার সহিত পৈত্রিক সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তখনকার দিনে এইরূপ কার্য্য নিতান্ত সহজ ছিল না, কারণ এই সময়ে বঙ্গীয় জমীদারকুলের কৃতান্ত স্বরূপ নবাব মুর্শিদকুলিখাঁ সুবেবাঙ্গলার মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে যে দৃঢ়নীতি অবলম্বন করেন তাহাতে হাবিলী সেলিমাবাদের জমীদারবর্গের মধ্যে অনেকেই জমীদারী ইস্তাফা দিতে বাধ্য হ'ন। গুপ্ত চৌধুরীর দৌহিত্রবংশে কেবল গোপীবল্লভের পুত্র শিবরাম এবং শ্রীরামতনয় রামভদ্র রায় নিজ নিজ সম্পত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নবাব রামভদ্রের শৌর্য্য, বীর্য্য ও কার্য্যদক্ষতায় প্রীত হইয়া শিবরাম ও তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর জয়কৃষ্ণের এক আনা অংশ ব্যতীত গুপ্ত চৌধুরীর দৌহিত্র বংশের অপর তিন আনা অংশ তাঁহাকে প্রদান করেন; সুতালড়ীর ঘোষ চৌধুরিগণের তিন আনাও এই সময়ে রামভদ্রের প্রতি অর্পিত হয়। এইরূপে রামভদ্র পরগণার প্রায় সমুদয় অংশের আধিপত্য লাভ করিলেন। তিনি দেউরীর সন্নিহিত কিসমৎ নবরঙ্গপুরে বাটী প্রস্তুত করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইহাই বর্ত্তমান পোনাবালিয়া। এই সময় হইতেই পোনাবালিয়া হাবিলী সেলিমাবাদের রাজধানী স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল।†

উল্লিখিত ঘটনার পর রামভদ্র রায় চৌধুরী সেলিমাবাদ হইতে নিজ সম্পত্তি পৃথক করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। শিবরামের কনিষ্ঠ পুত্র জগন্নাথ এই কার্য্য সাধনার্থ মুর্শিদাবাদে গমন করেন। রায়েরকাঠীর পক্ষ হইতে দেওয়ান মহাত্মা কৃষ্ণরাম সেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাশীরাম সেন প্রেরিত হইলেন। অসাধারণ বুদ্ধিবলে জগন্নাথ নিজ কার্য্যোদ্ধারে সমর্থ হইলেন। ফলে তপ্পে হাবিলী সেলিমাবাদের সাত আনা অংশ (রামভদ্রের ছয় আনা শিবরাম ও জয়কৃষ্ণের এক আনা) মূল পরগণা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র পরগণায় পরিণত হয়। পোনাবালিয়ার অদূরবর্ত্তী মধিপুর গ্রামে রামভদ্র কাছারীবাটী সংস্থাপিত করেন।

* See page 66.

† Ponaballa was formerly the headquarters of the zamindar of the pargana. —H. Beveridge's History of Bakarganj, p. 124.



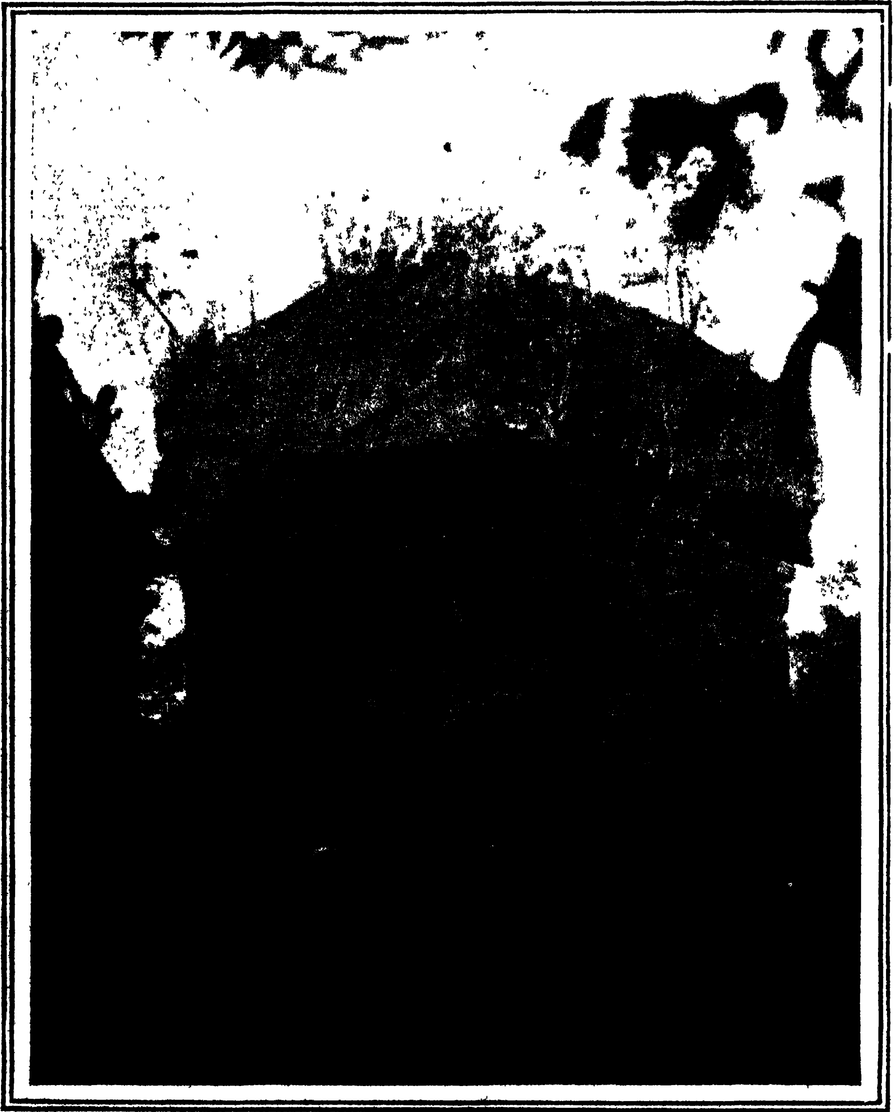
মহামতি রামভদ্র জমীদারীর উন্নতিকল্পে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন পরগণার অধিবাসী সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল। বহুস্থল পদ্মবনসমাকীর্ণ সলিলরাশি অথবা হিংস্র-শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে আচ্ছন্ন ছিল। রামভদ্র ও তৎপুত্র শ্রীকৃষ্ণ রায় বাঁশবেড়ে, হরিষণা প্রভৃতি স্থান হইতে বহু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থসন্তান আনয়ন পূর্ব্বক অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন দেউরীর জ্ঞাতিবর্গকে তালুকাদি প্রদান করিয়া তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে চৌষট্টি খানি তালুক সৃষ্ট হয়। রামভদ্র ও তৎবংশধরগণ ত্রম্বক ভৈরবের নিয়মিত সেবার জন্য যে সকল দেবোত্তর প্রদান করিয়াছিলেন তাহা এখনও বর্ত্তমান আছে।

রামভদ্রের জীবনের শেষভাগে অস্মদ্দেশে বর্গীর হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। যখন দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয় দস্যুগণের অত্যাচারে নিম্নবঙ্গ প্রায় উৎসাদিত, অধিবাসিগণ বর্গীর ভয়ে স্ত্রীপুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ রক্ষার্থ অরণ্য মধ্যে লুক্কায়িত হইত, তখন রামভদ্র রায় অকুতোভয়ে এই দুর্ব্বৃত্তদিগের সহিত সম্মুখ সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে সোন্দারকূল হইতে বিদূরিত করিয়া দিয়াছিলেন। * আজকাল আমরা ভীরু এবং অকর্ম্মণ্য বলিয়া পরিচিত, কিন্তু আমাদিগের পিতৃপুরুষগণের ইতিহাস এবং কীর্ত্তি সমালোচনা করিলে বোধ হয় প্রতীয়মান হইবে যে বাঙ্গালী পূর্ব্বে ভীরু এবং অকর্ম্মণ্য ছিল না; তখন তাহাদিগের বাহুতে শক্তি এবং হৃদয়ে সাহস ছিল। রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয়, শিখ, গুর্খা প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য মহাজাতির যে কারণে অধঃপতন হইয়াছে, বাঙ্গালীর প্রতিও সেই কারণ উপলব্ধি হইতে পারে, তবে রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয়াদি জাতির পতন আরম্ভ হইয়াছে বটে কিন্তু বাঙ্গালীর অবস্থা পাইতে এখনও বিলম্ব আছে।

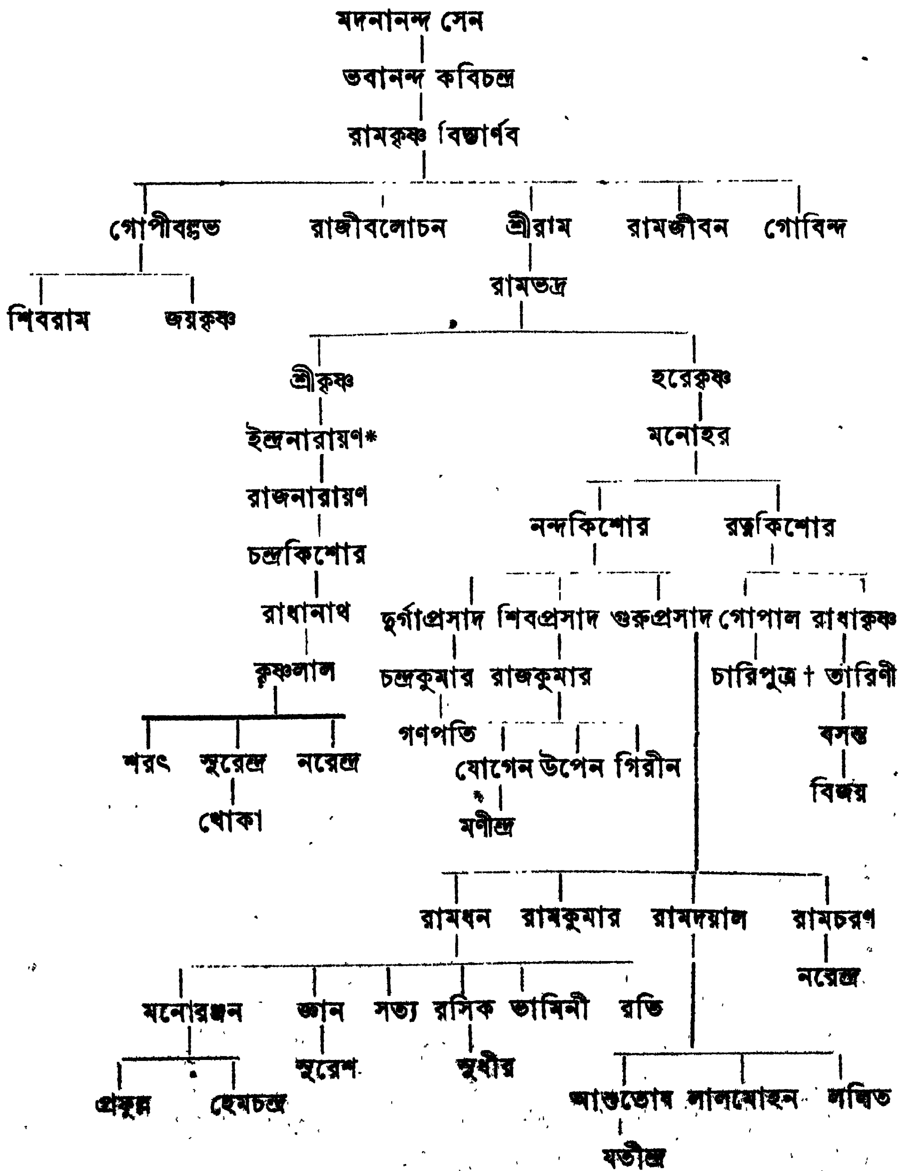
রামভদ্র রায়ের কর্ম্মবহুল জীবনের অনেক বিষয় অদ্যাপি অপরিজ্ঞাত, হাবিলী সেলিমাবাদের জমীদারগণ মধ্যে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; তাঁহার পত্নী সুন্দরী দেবী পুণ্যবতী রমণী ছিলেন। রামভদ্রের সংক্ষিপ্ত বংশতালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

---

* Rambhadra Rai is said to have fought with the Mahrattas or Bargis, and to have defeated them near Ponabalia,—Beveridge's Bakarganj, p 124.



রামভদ্ররায়ের প্রতিষ্ঠিত মন্দির—(পোনাবালিয়া)।



* ইন্দ্রনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র প্রাণনারায়ণের পুত্র দীননাথ তৎপুত্র নিবারণ ও শরচ্চন্দ্র; ইন্দ্রের ২য় ভ্রাতা প্রেমনারায়ণের পুত্র কীর্ত্তিনারায়ণ। তৎপুত্র বৃন্দাবন ও হরচন্দ্র, বৃন্দাবনের পুত্র জানকীনাথ; হরচন্দ্রের পুত্র গোলক ও ঈশান। গোলকের পুত্র প্রসন্নকুমার, ঈশানের পুত্র শরৎকুমার।

† গোপালকৃষ্ণের পৌত্রগণমধ্যে রামকানাইর পুত্র রজনীকান্ত, চন্দ্রকান্তের পুত্র নিবারণচন্দ্র এবং নিলকমলের পুত্র শশীকমল উল্লেখযোগ্য।

রামভদ্র রায়ের দুই পুত্র শ্রীকৃষ্ণ রায় ও হরেকৃষ্ণ রায়। হরেকৃষ্ণ পিতার স্বর্গারোহণের অত্যল্পকাল পরেই মানবলীলা সম্বরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ রায় দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া হাবিলী সেলিমাবাদের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। কার্য্যদক্ষতা ও বিষয়বুদ্ধিতে তিনি পিতা অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার সময়ে শিববাড়ীর অনেক অরণ্য পরিষ্কৃত হইয়া লোকালয়ে পরিণত হয়। বিখ্যাত কালাচাঁদ বিগ্রহের নিয়মিত সেবা নির্ব্বাহার্থ অনেক দেবোত্তর প্রদত্ত হয়। সেলিমাবাদের বৈদ্য জমীদারগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ রায়ই সর্ব্বপ্রথম কুলক্রিয়া আরম্ভ করেন। *

হরেকৃষ্ণের স্বর্গারোহণকালে তদীয় পুত্র মনোহর কিশোরবয়স্ক ছিলেন। হরেকৃষ্ণের পত্নী জানকী দেবী সম্ভবতঃ পতির পূর্ব্বেই লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠতাত এবং এক ধাত্রী ভিন্ন পিতৃমাতৃহীন বালকের আপনার বলিতে কেহই ছিল না। একদা শ্রীকৃষ্ণ রায় জ্ঞাতি ও কর্ম্মচারীবর্গের সাক্ষাতে বলিলেন "আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, শীঘ্রই আমাকে ইহধাম পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমার ইচ্ছা যে আমার পাঁচ পুত্র (ইন্দ্রনারায়ণ, প্রেমনারায়ণ, কৃষ্ণকিঙ্কর, শিবচন্দ্র ও রাজচন্দ্র) এবং মনোহর স্বর্গীয় পিতৃদেবের সম্পত্তি সমভাগে বিভক্ত করিয়া ভোগ করে।" মনোহর জ্যেষ্ঠতাতের বাক্য শ্রবণ করিয়া নতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন কুলকাঠীর

শুকদেবাৎ (অরবিন্দ) সুতোজজ্ঞে রঘুনাথশ্চকন্যকা।
কন্যামেনামুপযেমে সিলিমাবাদবাসিনঃ।
শ্রীকৃষ্ণস্ত রোষবংশপ্রসূতস্ত সুতঃ কৃতী॥
মহলানবীশাখ্যস্ত শ্রীকৃষ্ণস্য তন্মুস্তবাং।
রমানাথ (হিজু পীতাম্বর) স্তোপযেমে উভে কন্যে চতুঃ সুতাঃ
তয়োরাত্মামুদবহৎ শ্রীকৃষ্ণরোষপুত্রকঃ॥
* * * রামাকিশোর সেনকঃ (প্রভাকর)।
বাণেশ্বরদাশাকন্যাং পরিণিন্যে গুণান্বিতাং।
তস্যাং মৃতায়াং দুর্দৈববাধিতঃ পরিণীতবান্॥
রোষবংশসমুদ্ভূত শ্রীকৃষ্ণস্যাত্মজাত্মজাং।
সিলিমাবাদবাসীয় কুলদেবপ্রসাদতঃ॥

[শ্লোকগুলি হড় ঠাকুর প্রণীত কণ্ঠহার-পরিশিষ্ট হইতে উদ্ধৃত]

জগন্নাথ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র রুদ্রনারায়ণ বলিলেন "মনোহর, যদি আমাদের কাহারও সহিত পরামর্শ করা অভিপ্রেত হয় তবে আগমন করিতে পার।" শ্রীকৃষ্ণ রায়ের ভ্রু কুঞ্চিত হইল, কিন্তু তিনি মনোহরকে রুদ্রনারায়ণের সঙ্গে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। মনোহর হরেকৃষ্ণের একমাত্র পুত্র, জমীদারীর অর্দ্ধাংশের অধিকারী, তিনি কেন ষষ্ঠাংশ গ্রহণ করিবেন? রুদ্রনারায়ণ মনোহরকে ইহাই বুঝাইতে লাগিলেন। লস্কর বংশীয় বৃদ্ধ দেওয়ান ও কুলপুরোহিত রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী * রুদ্রনারায়ণের বাক্য অনুমোদন করিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রায় তখন সর্ব্বেসর্ব্বা, কাহার সাধ্য তাহার ইচ্ছার প্রতিবন্ধক হয়? মনোহরের অন্তঃকরণ চিন্তাভার-ক্লিষ্ট হইল, তিনি পোনাবালিয়ার শিকদারগণের † সাহায্যে জাহাঙ্গীর নগরে (ঢাকা) গমন করিলেন। জাহাঙ্গীর নগরে গমনের পর ঘনশ্যাম সেন তাঁহার প্রধান পরামর্শ দাতা হইলেন। ইহারই বুদ্ধিবলে এবং খলিশাকোটার রায়গণের সাহায্যে মনোহর সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। রাজ অনুগ্রহে তিনি শীঘ্রই তাঁহার প্রাপ্য অর্দ্ধাংশের অধিকার লাভ করিয়া পোনাবালিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মহামানী শ্রীকৃষ্ণ রায় ভ্রাতুষ্পুত্রকে তুল্যাংশের অধিকার প্রদান করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অবশেষে মনোহর জ্যেষ্ঠতাতকে এক আনা অংশ জ্যেষ্ঠোত্তর প্রদান করিলে বিবাদের মীমাংসা হয়।

শ্রীকৃষ্ণ রায় এই ঘটনার পর কতকাল জীবিত ছিলেন বলা যায় না। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে প্রেমনারায়ণ বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। কুলক্রিয়া উপলক্ষে মহারাজ রাজবল্লভের সহিত প্রেমনারায়ণের বিরোধ উপস্থিত হয়, এই বিবাদে প্রেমনারায়ণ জয়ী হইয়াছিলেন। রাজবল্লভ ক্রুদ্ধ হইয়া চৌধুরিগণের সহস্রাধিক টাকা জমা বৃদ্ধি করেন। শ্রীকৃষ্ণরায়ের বংশধর-গণের ভূসম্পত্তি বর্ত্তমান সময়ে ঢাকার নবাব বাহাদুরের হস্তগত হইয়াছে।

---

* ইহার পূর্ব্বনিবাস বাঁশবেড়ে। শ্রীকৃষ্ণ রায় ইহাকে তথা হইতে আনয়ন করিয়া ডোয়াতলা, তৎপরে শিববাড়ীতে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। বর্ত্তমানে ইহার বংশধরগণ নাগপাড়ায় বাস করিতেছেন। রামচন্দ্রের প্রপৌত্র গদাধর ও রামসন্তোষের সময় নাগপাড়ায় একটী টোল ছিল। রুক্মিণীকান্ত ন্যায়ভূষণ অধ্যাপনা করিতেন।

† শিকদারগণ ব্রাহ্মণকুলসম্ভূত। ইঁহারা চৌধুরিগণের কালাচাঁদের সিংহাসন বহন করিতেন।

জ্যেষ্ঠতাতের সহিত বিরোধের মীমাংসা করিয়া মনোহর চৌধুরী বাড়ীর দক্ষিণাংশে নূতন বাড়ী প্রস্তুত করেন। বাল্যে পিতৃমাতৃহীন হইয়া তিনি যেরূপ ধৈর্য্য ও সাহসের সহিত জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা সবিশেষ প্রশংসনীয়। দুরন্ত কাল কীট যৌবনেই তাঁহার জীবন কুসুম ছিন্ন করিয়া দিল, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই নিজ সম্পত্তির সর্ব্বত্র সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। রামভদ্র বংশে একমাত্র তাঁহার অংশই নবাবের করকবলিত হয় নাই। তিনি অনেক সুরম্যহর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বড় হিস্যার কালাচাঁদ মন্দির এবং ছোট হিস্যার দুর্গামন্দির তাঁহারই সময়ে নির্ম্মিত হয়। এই মন্দিরগুলির কারুকার্য্য বিশেষ প্রশংসনীয় কিন্তু বর্ত্তমানে ইহাদের পূর্ব্বশ্রী বহুলাংশে বিনষ্ট হইয়াছে।

দেবী দিনমণির গর্ভে মনোহর রায়ের নন্দকিশোর ও রত্নকিশোর নামক দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। কন্যার সহিত পয়োগ্রাম নিবাসী প্রভাকর বংশোদ্ভব কৃষ্ণচন্দ্র সেনের বিবাহ হয়।

নন্দকিশোর রায় পোনাবালিয়ার বড় হিস্যার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি অতীব শান্ত ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার বদান্যতা প্রসিদ্ধ ছিল। অদ্যাপি এদেশবাসিগণ বলিয়া থাকেন ঃ—

নন্দকিশোর রায় দানে কল্পতরু।
তনয় যাহার দুর্গা, শিব, গুরু ॥

নন্দকিশোর সরলতা, বদান্যতা প্রভৃতি সৎগুণে বিভূষিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে দৃঢ়তা ও তেজস্বিতার কিঞ্চিৎ অভাব পরিলক্ষিত হইত। সহধর্ম্মিণী জগদীশ্বরী চৌধুরাণী অতীব বুদ্ধিমতী ও তেজস্বিনী ছিলেন। তিনি বিষয় কার্য্যে প্রখর বুদ্ধির পরিচয় দিয়া সর্ব্বত্র যশস্বিনী হইয়াছিলেন। নন্দকিশোরের সময়ে তাঁহার পুত্র দুর্গাপ্রসাদ, শিবপ্রসাদ ও গুরুপ্রসাদ একটী সুন্দর জলযান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উহার সম্মুখভাগে অপূর্ব্ব কারুকার্য্যখচিত একটী দারুময় মকরমূর্ত্তি সংযোজিত ছিল। এই জলযান বহুদিন হইল ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু মকরটী বর্ত্তমান রহিয়াছে।

দুর্গাপ্রসাদ, শিবপ্রসাদ ও গুরুপ্রসাদ ইহারা তিনজনেই উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন, সর্ব্বদা শাস্ত্রীয় আলাপ এবং সঙ্গীতচর্চ্চা করিতে ভাল-

বাসিতেন। পার্সী ও সংস্কৃত ভাষায় ইহাদের অসাধারণ অধিকার ছিল। কনিষ্ঠ গুরুপ্রসাদ ১৭৯৪ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং নিজ চরিত্রগুণে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ঘোষবংশের উজ্জ্বলরত্ন মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক ঘোষ, ধ্বন্বন্তরি ও কাপড়ি বংশ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

অদ্যাপি যেষাং বর্ত্তন্তে বংশ্যাঃ সর্ব্বত্রভূষিতাঃ।
সদ্ধর্ম্মকর্ম্মনিপুণা কুলকার্য্যপরায়ণাঃ॥ (রত্ন ভা ৭ পৃঃ)

গুরুপ্রসাদের চরিত্রে ঘোষবংশোচিত গুণরাশির অপূর্ব্ব সমাবেশ দৃষ্ট হইত। অস্মদ্দেশে শারদীয়া মহাপূজার সময় মহিষাদি পশুর প্রতি যে দারুণ নির্ম্মমতা প্রদর্শিত হইয়া থাকে তাহা পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। করুণ-হৃদয় গুরুপ্রসাদের প্রাণে ইহা সহ্য হইত না। তিনি পোনাবালিয়া চৌধুরী বাটীতে পশুবলি রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। অদ্যাপি গুরুপ্রসাদের এই আজ্ঞা প্রতিপালিত হইয়া থাকে। ১২৪৭ সালে সেলিমাবাদ পরগণার জমীদার ভূকৈলাসনিবাসী স্বর্গীয় রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর মহারাজ-গঞ্জে আগমন করিলে স্থানীয় ভূম্যধিকারিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। গুরুপ্রসাদও এই সময়ে রাজসকাশে গমন করেন। রাজাবাহাদুর গুরুপ্রসাদের লোকোত্তর চরিত্রের বিষয় অবগত হইয়া একখানি যোগাবশিষ্ঠ রামায়ণ উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। কথিত আছে রাজাবাহাদুর চৌধুরী মহাশয়কে ঝালকাঠী বন্দর তালুকস্বরূপ প্রদান করিতে চাহিলে গুরুপ্রসাদ বলিয়াছিলেন, "মহাশয়, আমার পূর্ব্বপুরুষগণ এক সরকার বাহাদুর ব্যতীত অপর কাহারও অধীনতা স্বীকার করেন নাই, অতএব আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলাম না।"

গুরুপ্রসাদ রায়ের "কুলকার্য্যপরায়ণ"তার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। তিনি স্বয়ং সেনহাটী নিবাসী অরবিন্দ বংশোদ্ভব রামচন্দ্র দাশের কন্যা হর-সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা রাসমণি ও ভ্রাতুষ্পুত্রী চাঁদমণি ও ব্রজমণির সহিত যথাক্রমে পয়োগ্রাম নিবাসী প্রভাকর বংশোদ্ভব গৌরিদাস সেন, কালিমোহন সেন ও হরনাথ সেনের বিবাহ হয়। মধ্যমা কন্যা নিস্তারিণীর সহিত সেনদিয়া নিবাসী বিষ্ণুদাশ বংশোদ্ভব কালিমোহন মজুমদার এবং কনিষ্ঠা কন্যা সৌদামিনীর সহিত সেনহাটী নিবাসী অরবিন্দ বংশোদ্ভব বিষ্ণুচন্দ্র মজুমদারের বিবাহ হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামধন

বেন্দানিবাসী ঘটকবিশারদ বংশোদ্ভব গুরুচরণ দাশের কন্যা বামাসুন্দরী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে চৌষট্টি বৎসর বয়সে গুরুপ্রসাদ রায় সজ্ঞানে জাহ্নবী-জলে দেহত্যাগ করেন।

মহামতি গুরুপ্রসাদ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী (শিবপ্রসাদের কন্যা) প্রাতঃস্মরণীয়া চাঁদমণি দেবীই একান্ন পীঠের অন্তর্গত শ্যামরাইলের ত্র্যম্বকভৈরবের প্রসিদ্ধ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। উহা জীর্ণ হইলে, ঢাকার নবাব বাহাদুরের নায়েব বিক্রমপুর নিবাসী আনন্দচন্দ্র চৌধুরী একটী নূতন মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

মনোহর রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রত্নকিশোর অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। কথিত আছে ইনি সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের ন্যায় কদাপি পরস্ত্রীর মুখাবলোকন করিতেন না। ইহার পুত্রই স্বনামখ্যাত গোপালকৃষ্ণ রায়। গোপালকৃষ্ণ যেরূপ বিক্রমের সহিত চৌধুরীবংশের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা হাবিলী সেলিমাবাদের ইতিহাসে চির স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

গৃহবিবাদ চৌধুরীবংশের কালস্বরূপ উপস্থিত হইয়া তাহাদের ভাগ্য-লক্ষ্মী বিদূরিত করিয়া দিল। যে পর্য্যন্ত অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ছিল ততকাল পর্য্যন্ত তাহাদের অখণ্ড প্রতাপে সমগ্র পরগণা কম্পিত হইত। কথিত আছে মহারাজ রাজবল্লভের তিরোধানের পর বৈদ্য সমাজে এই চৌধুরী বংশই সৎক্রিয়ান্বিত, কুলীন সমাজের সহিত আদান প্রদান, তুলা, চন্দন প্রভৃতি নিষ্পন্ন করিয়া সমাজে বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন।*

ঢাকার স্বনামখ্যাত নবাব বাহাদুর শ্রীকৃষ্ণরায়ের বংশধরগণের চারি আনা ও ছোট হিস্যার কতক অংশ দেনডিক্রীতে খরিদ করিয়াছেন। এই জমীদারীর অংশ দখল উপলক্ষে গোপালকৃষ্ণ রায়ের সঙ্গে নবাব

* বৈদ্য ঘটকগণের কুলগ্রন্থে লিখিত আছে :—

রোষে চৌধুরীর বংশ পোনাবালিয়ায়।
পুরিলা আপন গ্রাম কুলীন সংখ্যায়॥
পোনাবালিয়ার রোষ বহু ক্রিয়াবান্।
কুলীন আশ্রম সদা বিশেষ সম্মান॥ ডাকের ৫৪ পৃষ্ঠা।
অতি দীর্ঘকাল বংশ বহু ক্রিয়াবান্।
জপসা পোনাবালিয়া রাজনগর সমান॥ ৭৮ পৃষ্ঠা।

সাহেবের অনেক বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। গোপালকৃষ্ণ যেরূপ তেজস্বী তদ্রূপ কার্য্যদক্ষ ছিলেন। শুনিয়াছি যে অনেক সময়ে গোপালকৃষ্ণের বুদ্ধিকৌশলে নবাবকে বিচলিত হইতে হইয়াছিল। অবশেষে নবাবের দেওয়ান বাসণ্ডার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী কালিকুমার সেন মহাশয়ের চেষ্টায় এই বিবাদ মীমাংসা হয়।

গুরুপ্রসাদ রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামধন রায় চৌধুরী মহাশয়ের কল্যাণে নন্দকিশোরের জমীদারী অদ্যাপি অক্ষুন্ন রহিয়াছে। তিনি ১২২৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং পিতার চরিত্র হইতে ধর্ম্মপ্রাণতা, সংস্কৃতানুরাগ প্রভৃতি সমস্তগুণই লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে পোনাবালিয়ার চৌধুরিগণের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। চারি আনা ও ছোট হিস্যার জমীদারীর একতৃতীয়াংশ পরহস্তগত, বড় হিস্যার জমীদারগণও ঋণজালে জড়িত হইয়াছিলেন। রামধন ঋণ পরিশোধপূর্ব্বক আদায় তহশীল প্রভৃতির উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত করিয়া বড় হিস্যার জমীদারী রক্ষা করেন। শ্রীকৃষ্ণ রায়ের সম্পত্তি পরহস্তগত হইলেও গোপালকৃষ্ণ ও রামধন বায়ের প্রতিজ্ঞা বলে মনোহরের সম্পত্তি রক্ষা পাইল।*

১৩০৫ সালে ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে রামধন রায় চৌধুরী স্বর্গারোহণ করেন। তিনি ভগবানের কিরূপ একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন তাহা তাঁহার মৃত্যু বিবরণেই স্পষ্টীকৃত হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি দারুণ রোগ যন্ত্রনায় কষ্ট পাইতেছিলেন। বিশে ফাল্গুন শুক্রবার রাত্রে তিনি ভ্রাতা পুত্র পৌত্র প্রভৃতিকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন "আমার আর সময় নাই, শীঘ্র নারায়ণক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া আমাকে তথায় লইয়া যাও।" কেহ কেহ বলিলেন "মৃত্যু লক্ষণ প্রকাশের পূর্ব্বে কিরূপে নারায়ণ ক্ষেত্রে লওয়া যাইতে পারে"। চৌধুরী মহাশয় তখন অবিলম্বে আদেশ পালন করিতে বলিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইলে নারায়ণক্ষেত্রে মৃগচর্ম্ম দেখিয়া বলিলেন "মৃগচর্ম্ম এ সময়ে উপযোগী নহে, কুশাসন আনয়ন কর।" কুশাসন আনীত হইলে তদুপরি উপবেশন পূর্ব্বক দারুণ রোগযন্ত্রণাসত্ত্বে অবিচলিতভাবে ভগবদারাধনায় নিমগ্ন হইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার

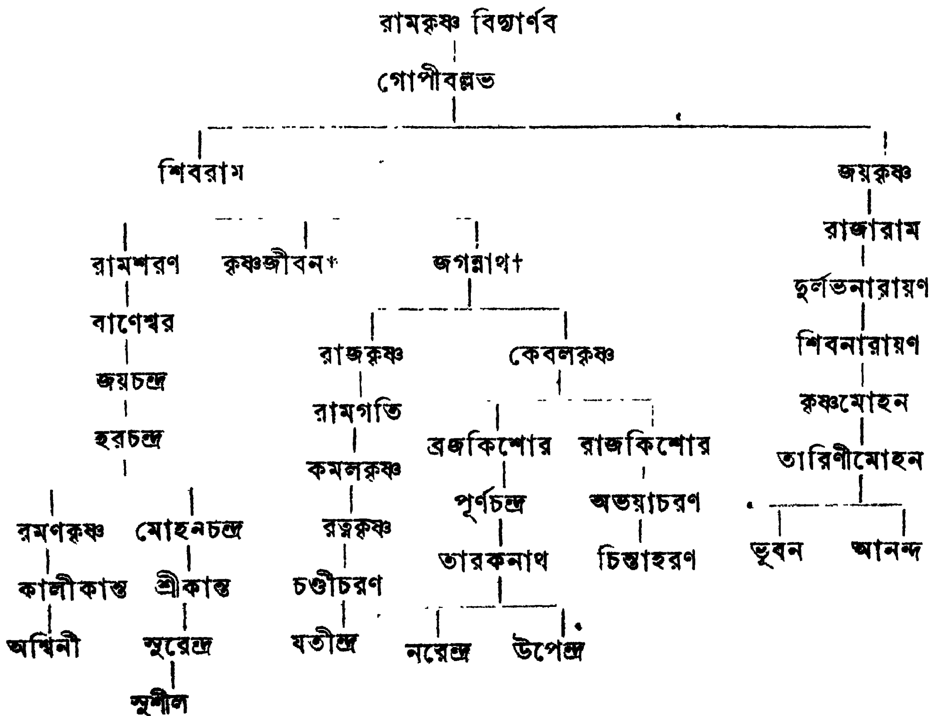
---

* রামধনরায়ের সময় চৌধুরীবাড়ীতে "..র আশা" নামে একটী উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া কিছুদিন চলিয়াছিল।

অমর আত্মা নশ্বর দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া পরম পুণ্যময়ের পবিত্র ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিল। কুলকাঠী নিবাসী চিকিৎসক তারকনাথ রায় মহাশয় তৎকালে সেস্থানে উপস্থিত ছিলেন; তিনি বলেন "মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার অশেষ যন্ত্রণা হইয়াছিল, সেরূপ যন্ত্রণা লোকের সচরাচর হইতে দেখা যায় না। যত যন্ত্রণা অধিক হইতে লাগিল, ততই যেন দৃঢ়তার সহিত তিনি ঈশ্বরমুখী হইতে লাগিলেন। সেই ভীষণ যন্ত্রণা যেন তাঁহার ঈশ্বর প্রেমের সাহায্য করিয়াছে। এরূপ ঈশ্বর ভক্তির দৃঢ়তা আর দেখি নাই।"

বর্ত্তমানে হাবিলী সেলিমাবাদের চারি আনা নবাবের এবং প্রায় দুই আনা চৌধুরী বংশের দখলে আছে। অবশিষ্ট এক আনার অর্দ্ধাংশ কুলকাঠীর চৌধুরী এবং অপর অংশ বারইকরণের চৌধুরীদিগের অধিকারে ছিল।

(কুলকাঠী ও বারইকরণের চৌধুরী বংশ)



* কৃষ্ণজীবনের তৃতীয় পুত্র বিখ্যাত জয়নারায়ণ; জয়নারায়ণের পুত্র প্রাণদুর্লভ, তৎপুত্র শম্ভুনাথ, শম্ভুর পুত্র অভয় চৌধুরী প্রভৃতি।

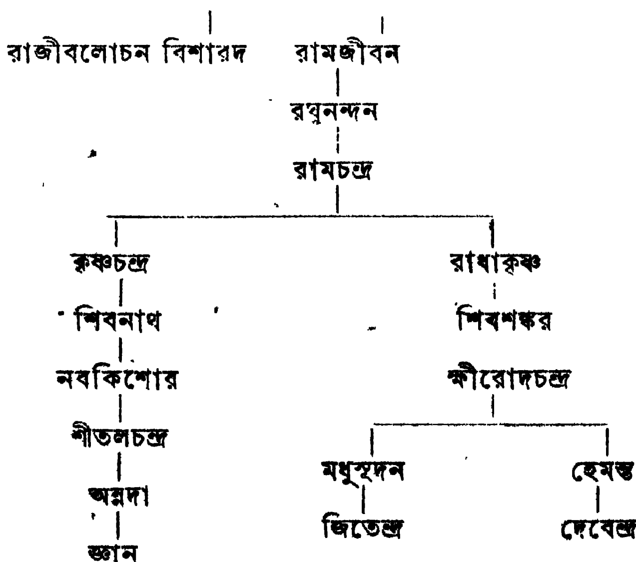
† জগন্নাথের পাঁচ পুত্র—রুদ্রনারায়ণ, রাজকৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণ, কেবলকৃষ্ণ ও গঙ্গাগোবিন্দ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণবের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপীবল্লভ মাতামহের সম্পত্তির এক আনা অংশ প্রাপ্ত হইয়া বারইকরণ গ্রামে গমন করেন। তাঁহার দুই পুত্র, শিবরাম ও জয়কৃষ্ণ। শিবরাম কুলকাঠী গ্রামে বাসস্থাপন করেন, জয়কৃষ্ণ বারইকরণেই বাস করিতে লাগিলেন। ইহারাই কুলকাঠী ও বারইকরণের চৌধুরিগণের আদিপুরুষ। বর্ত্তমানে ইহাদের সম্পত্তির অধিংকাশ পোনাবালিয়া ও কেওরার চৌধুরী এবং অন্যান্য অনেক ভূম্যধিকারীর হস্তগত হইয়াছে। এই বংশের চণ্ডীচরণ বি, এল ; চিন্তাহরণ এম, এ ; এবং আনন্দমোহন এল্, এম, এস, বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বারইকরণ গ্রামে সর্ব্বপ্রথম এই জিলার রাজধানী স্থাপিত ছিল এবং সিভিল জজগণ তথাকার প্রধান রাজপুরুষ ছিলেন। তৎপরে মিডল্টন সাহেব উহা বাখরগঞ্জে স্থানান্তরিত করেন। বারইকরণে পূর্ব্বে একটী নীলকুঠী ছিল। কলভিন সাহেব এই কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন। নীলকরগণ দেশীয় প্রজাপুঞ্জের প্রতি যে প্রকার অত্যাচার করিতেন, কলভিনের অত্যাচার তদপেক্ষা কম ছিল না, স্বর্গগত ন্যায়বান পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ জেমস্ রেইলীর যত্নে প্রজাপুঞ্জ অনেকটা নিরাপদ ছিল।

(দেউরীর চৌধুরী বংশ)

রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণব



রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণবের পুত্রগণ মধ্যে রাজীবলোচন বিশারদ ও রামজীবন দেউড়ী গ্রামে বাস করিতেন। রাজীবলোচনের প্রপৌত্রতনয় দীনবন্ধু চৌধুরী বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার পুত্র রত্নকিশোরের সহিত বিশারদের বংশ লোপ হইয়াছে। রামজীবনের বংশধরগণের মধ্যে মাত্র দুই ঘর বর্ত্তমান।

বিদ্যার্ণবের বংশে একমাত্র গোবিন্দের সন্তানগণ কেওরা গমন করতঃ বুদ্ধিবলে নূতন ভূসম্পত্তি লাভ করিয়া প্রণষ্ট গৌরব উদ্ধারে বহুল পরিমাণে কতকার্য্য হইয়াছেন। গুপ্তচৌধুরীর উচলিবংশীয় দৌহিত্র কালীচরণের বিষয় বিশেষ কিছু জানা যায় না। মুর্শিদকুলি খাঁর কঠোর শাসনে জমীদারী ইস্তাফা প্রদান কয়িয়া তিনি বেন্দা গ্রামেই বাস করিতে থাকেন।

তপ্পে হাবিলী সেলিমাবাদের তালুকদারগণের মধ্যে পোনাবালিয়ার মজুমদারগণই প্রধান। ইহাদের আদিপুরুষ যাদবেন্দ্র সেন হরিষণা হইতে চৌধুরিগণ কর্ত্তৃক এই স্থানে আনীত হন। ইহার বংশধরগণ পোনাবালিয়া জমীদার সরকারে কার্য্য করিয়া কৃষ্ণজীবন সেন ও রামদেব সেন নামক তালুক লাভ করেন। কথিত আছে রামবল্লভ দেব নামক এক ব্যক্তি বাকাই হইতে আগমন করিয়া নিজ নামে "রামদেব" তালুকপ্রাপ্ত হইয়া এই পরগণার মালুহার গ্রামে বাস করেন; এই সময়ে মজুমদার বংশীয় রামদেব সেনের পিতা পোনাবালিয়ার দেওয়ান ছিলেন। তিনি রামবল্লভ দেবের পরিবর্ত্তে তৎপুত্র রামদেব সেন নামে পাট্টা গ্রহণ করেন এবং নবাবের নিকট হইতে এই তালুক (পরগণার প্রায় চতুর্থাংশ) খারিজ করিয়া লইলেন। তৎপর রামবল্লভ দেবের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ মজুমদার বংশের গুরু শ্রীকান্ত সিদ্ধান্তের * শরণাগত হইয়া তাঁহার ব্রহ্মোত্তরের অধীনে ভাটারা-কান্দার উত্তর চরকাঠী মৌজা ওসৎ তালুক লইয়া সেই স্থানে বাস করেন। এই প্রবাদ কতদূর সত্য বলা যায় না। মজুমদারগণ বলেন যে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের বুদ্ধিবলে রামভদ্র রায় সুতালড়ীর ঘোষ চৌধুরি-গণের জমীদারী ও কালাচাঁদ বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত রামভদ্র রায় সন্তুষ্ট হইয়া উল্লিখিত তালুক পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে প্রদান করেন।

আশ্রয়দাতা জমীদার চৌধুরিগণের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে মজুমদারদিগেরও পূর্ব্বগৌরব অস্তমিত হইয়াছে।

২৮। পোনাবালিয়া গ্রামস্থ ভট্টাচার্য্যগণের পূর্ব্বপুরুষ।

৬। তপ্পে হাবিলী।

এই পরগণাও সেলিমাবাদের ক্ষুদ্রতম অংশ, কিন্তু কোন সময়ে কাহার দ্বারা পৃথকীভূত হইয়াছে তাহা জানিতে পারা যায় না। কিন্তু ইহা যে তপ্পে হাবিলী সেলিমাবাদ হইতে আধুনিক তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়ে এই পরগণার যাবতীয় ভূমি নলছিটী এবং বাখরগঞ্জ থানার অধীনে অবস্থিত।

এই পরগণার জমীদারী দুই ভাগে বিভক্ত; ইহার এক ভাগ দশ আনা এবং অপর ভাগ ছয় আনা লইয়া গঠিত হইয়াছে। চরামদ্দি নিবাসী প্রবল প্রতাপান্বিত জমীদার আছ্‌মত আলি খাঁ চৌধুরী ও ফজল আলি খাঁ চৌধুরী এবং বাকাইর ঘোষ ও বামরাইলের বসুবংশীয় জমীদারগণ দশ আনা অংশের অধিকারী। অপর অংশ উল্লিখিত আছ্‌মত আলি খাঁ সাহেব এবং গৌরনদী থানার অন্তর্গত পিঙ্গলাকাঠী গ্রামের ব্রাহ্মণ ভূস্বামিগণ ভোগ করিতেছেন। এই পরগণার রাজস্ব ৬৪৪৷৶১০ মাত্র।

আছ্‌মত আলি খাঁ সাহেব এই জিলার মুসলমান জমীদারগণের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। বর্ত্তমানে তাঁহার পুত্র ইস্‌মাইল খাঁ চৌধুরী জমীদারী কার্য্যভার পরিচালন করিতেছেন।

৭। ইদিলপুর।

ইদিলপুর * বাকলার একটী প্রাচীন এবং বিখ্যাত পরগণা। অদ্যাপি এই স্থানে বহু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের বাসভূমি বর্ত্তমান। ইহার অন্তর্গত দেবাইখালী নামক গ্রামে উৎকৃষ্ট কোষ নৌকা প্রস্তুত হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে এই পরগণার কিয়দংশমাত্র বাখরগঞ্জ জিলায় অবস্থিত, অপর অংশ ফরিদপুর জিলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইদিলপুরের পূর্ব্বপ্রান্ত বিধৌত করিয়া মহানদী মেঘনা প্রবাহিত। ইহার ভূমি বাখরগঞ্জের অনেক স্থানের তুলনায় অতিশয় উচ্চ এবং অরণ্যসঙ্কুল। প্রশস্ত রাজবর্ত্ম অতিশয়

* সংস্কৃত গ্রন্থে এই পরগণা ইন্দিলপুরী বলিয়া অভিহিত, যথা :—

মেঘনানদী পূর্ব্বভাগে পশ্চিমে চ বলেশ্বরী।
ইন্দিলপুরী যস্য সীমা দক্ষিণে সুন্দরবনং ॥—(দিগ্বিজয় প্রকাশ বিবৃতি)।

বিরল, ক্ষুদ্র প্রবাহিনীও অধিক দৃষ্টিগোচর হয় না। পূর্ব্বকালে এই পরগণা দস্যুগণের প্রিয় বাসস্থান বলিয়া পরিচিত ছিল।

অস্মদ্দেশের মধ্যে ইদিলপুর পরগণা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট বিশেষ ভাবে পরিচিত। এই স্থলেই বঙ্গেশ্বর মহারাজাধিরাজ কেশব সেনের সুবিখ্যাত তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। * মহারাজ কেশব সেন ঈশ্বর দেবশর্ম্মাকে কতিপয় গ্রাম ব্রহ্মোত্তর প্রদান করেন; তিনি চণ্ড-ভণ্ড-দিগকে শাসন করিয়া এই সম্পত্তি ভোগ করিবেন। উক্ত তাম্রশাসন হইতে ইদিলপুরের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা এবং শাসনপ্রণালী কতক অনুমান করা যাইতে পারে।

মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্বে, ইদিলপুর প্রভৃতি নিম্নবঙ্গান্তর্গত ভূখণ্ড প্রবল পরাক্রান্ত সেন নৃপতিগণের শাসনাধীন ছিল। তৎকালে এই সকল স্থানে চণ্ড-ভণ্ডাদি ক্রূরকর্ম্মা অনার্য্য জাতি সমূহ বাস করিত। এই সকল দুর্দ্দান্ত জাতিকে শাসনে রাখিবার জন্য সেনরাজগণ বিলক্ষণ কষ্ট স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন। ভুবনবিখ্যাত রোমানগণ দুর্দ্দান্ত ইতালীয় জাতিসমূহকে বশীভূত রাখিবার নিমিত্ত যে প্রকার ইতালীর স্থানে স্থানে রোমান উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেনবংশীয় হিন্দু-নরপতিগণও বোধ হয় তদনুরূপ নীতির অনুবর্ত্তন করিয়া চণ্ড-ভণ্ডাদি অনার্য্য জাতিকে দমন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বঙ্গের সর্ব্বত্র পাঠানের অর্দ্ধ-চন্দ্রলাঞ্ছিত পতাকা সগর্ব্বে উড্ডীন হইয়াছিল। এই সময়ে চণ্ড-ভণ্ডাদি অনার্য্যগণ দলে দলে হিন্দুদ্বেষী পাঠানের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজের নিষ্পীড়ন হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ এই হেতু নিম্ন বঙ্গে নিকৃষ্ট জাতির মধ্যে মুসলমানগণের সংখ্যা এত অধিক দৃষ্ট হয়। ইদিলপুরে যুদ্ধবিগ্রহ এবং দুর্গাদির বহু চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

ইদিলপুর, শ্রীরামপুর, সাহাজাদপুর, এবং ইস্‌মাইলপুর এই মহাল চতুষ্টয়ই মহারাজ টোডরমল্লের সময়ে সুরকার বাকল বলিয়া অভিহিত হইত। অধ্যাপক ব্লকম্যান বলেন এই পরগণার প্রকৃত নাম আদিলপুর। আদিল শব্দের অর্থ ন্যায়পরায়ণ। বিখ্যাত পাঠান সম্রাট্ সেরসাহের পুত্র ইস্‌লাম

* তৃতীয় অধ্যায়—প্রাচীনতত্ত্ব সংগ্রহ ৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সাহের মৃত্যুর পর তদীয় শ্যালক মহম্মদ সাহসুর "আদিল" উপাধি ধারণ পূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ আদিল, ইব্রাহিম সুর কর্ত্তৃক পরাজিত এবং উত্তরভারত হইতে বিতাড়িত হইয়া বঙ্গ-বিহারে রাজত্ব করিতে থাকেন। এই আদিলের সহিত আদিলপুর অর্থাৎ ইদিল-পুরের কোন সংশ্রব আছে কি না তাহা অবগত হইতে পারি নাই। তবে ইহা সত্য যে এই মহাল আইন-ই-আকবরি প্রণয়নের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল। কত পূর্ব্বে তাহা অবশ্য নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

রঘুনন্দন চৌধুরী ইদিলপুরের কায়স্থ জমীদারগণের পূর্ব্বপুরুষ, তিনি চাঁদরায়-কেদার রায়ের সেনাপতি ছিলেন। ইদিলপুরের চৌধুরীবংশের ইতিহাস অতি বিচিত্র। এই প্রাচীন জমীদারবংশের সহিত, বাকলার অন্যান্য প্রসিদ্ধ জমীদারবংশের অনেক বিষয়ে বৈসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ইদিলপুরের চৌধুরিগণ কায়স্থ জাতীয়; কিন্তু ইঁহারা মাধবপাশা এবং রায়েরকাঠীর কায়স্থ রাজগণের ন্যায় সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন নাই। কথিত আছে যে ইঁহারা পরস্বাপহারক দস্যুগণের আনুকূল্য করিতেন। *

১৭৬৪ খৃঃ অব্দে রামবল্লভ রায় এই পরগণার অধীশ্বর ছিলেন। ইহার চতুর্দ্দশ বৎসর পর হইতেই ইদিলপুরের রাজস্ব সম্বন্ধীয় গোলযোগের সূত্র-পাত হয়। প্রথমতঃ কোম্পানী বাহাদুর মাণিকবসু নামক এক ব্যক্তিকে সাত বৎসরের জন্য জমীদারী পত্তন প্রদান করেন। তাহাতেও রাজস্বের কোন সুবন্দোবস্ত হইল না দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট পুনরায় চৌধুরীবংশীয় কৃষ্ণ-বল্লভ রায়, নরসিংহ রায় প্রভৃতির সহিত বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু গোলযোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মহানদী মেঘনার আক্রমণে পরগণার বহুস্থান নদীগর্ভে নিমজ্জিত হওয়ায় রাজস্বের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। শুধু তাহাই নহে, বহু প্রজা ইদিলপুরের অনুর্ব্বর উচ্চ ভূমি পরিত্যাগ করিয়া মেঘনাবক্ষস্থিত অত্যুর্ব্বর দ্বীপপুঞ্জে বাসস্থান স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইল। ফলে, পরগণার অধিকাংশ স্থান দুর্গম অরণ্যে আচ্ছন্ন হইয়া হিংস্র শ্বাপদ এবং তদধিক হিংস্র দস্যুগণের আলয়ে পরিণত হইতে থাকে।

* The Chaudhuries of Idilpur ... ... did not bear a good character, as they ware accused of harbouring dacoits. Doubtless the jungly condition of the pargana encouraged bad characters to resort to it

H. Beveridge's History of Bakarganj, page 125.

অষ্টাদশ শতাব্দীর অবসানে এক ভীষণ মহামারী আবির্ভূত হইয়া ব্যাপার আরও গুরুতর করিয়া তুলিয়াছিল। প্রতিদিন শত শত নরনারী এই দুরন্ত ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অকালে কালকবলে পতিত হইতে লাগিল। সর্ব্বেশ্বর পাল নামক জনৈক বণিকের গৃহেই সপ্তদশ জন এই মহামারীর করাল গ্রাসে পতিত হইয়াছিল।

কলেক্টর আর্মষ্ট্রং সাহেব কোন বিষয়েরই সুবন্দোবস্ত করিতে পারিলেন না। এই সময়ে তিনি পদত্যাগ করিলে মিঃ ম্যাছি কলেক্টর নিযুক্ত হইয়া আগমন করেন। ১৮০৪ খৃঃ অব্দে চৌধুরিগণ বাকী রাজস্ব প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিলে পর, গবর্ণমেণ্ট পুনরায় তাহাদের সহিত বন্দোবস্ত করিতে অভিলাষী হ'ন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এই সাধুচেষ্টা ব্যর্থ হইল। অবশেষে ১৮১২ খৃঃ অব্দে ইদিলপুরের জমীদারী নীলাম হইলে সুবিখ্যাত মোহিনীমোহন ঠাকুর এই পরগণা ক্রয় করেন। ইহার তিন বৎসর পরে ঠাকুর মহাশয়ের সহিত পূর্ব্বজমীদারগণের বহু দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হয়, এই নিমিত্ত ইদিলপুর পরগণা ঢাকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাখরগঞ্জ এবং তৎপরে ফরিদপুরের এলাকাভুক্ত হইয়াছে। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুরবংশীয়েরাই ইদিলপুর পরগণার বর্ত্তমান ভূম্যধিকারী। এই পরগণায় ১১৯ খানি তালুক বর্ত্তমান এবং ইহার রাজস্ব ৬৫৯০৪।১১ মাত্র।

৮। তপ্পে নাজিরপুর।

এই পরগণার বহু অংশ সরকার বাজুহার অন্তর্গত ছিল, কিন্তু হাণ্টার সাহেব বলেন যে তপ্পে নাজিরপুর পূর্ব্বে সেলিমাবাদের অন্তর্গত ছিল। *

গাজিপুর নিবাসী আল্ফত্ গাজি † নামক জনৈক উজির সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সময়ে রাজকার্য্য উপলক্ষে এই দেশে আগমন করিয়া জাহাঙ্গীরনগরে (বর্ত্তমান ঢাকা) বাস করেন। তিনি কোন বিশেষ কার্য্যে বাদসাহের মনোরঞ্জন করাতে পুরস্কার স্বরূপ এই পরগণা প্রাপ্ত হন। আল্ফত্ গাজি নিজ নামে সনন্দ গ্রহণ করিয়া সমগ্র পরগণা অধিকার করেন। কিন্তু সেলিমাবাদ হইতে এই পরগণা কেন বিচ্ছিন্ন করা হইল, এবং কে ইহা পৃথক্ করিলেন তাহা জানিতে পারা যায় না।

* Sir W. W. Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. V, page 224.

† ইনি সম্রাট্ সাহজাহানের সময়ে জনৈক উজির ছিলেন বলিয়া প্রবাদ।

আল্‌ফতের সন্তান সন্ততিগণ বহুকাল পর্য্যন্ত অতীব সম্মান এবং সমৃদ্ধির সহিত এই জমীদারী ভোগ করিতেছিলেন; কিন্তু সৌভাগ্য কাহারও চিরস্থায়ী হয় না; কমলা চঞ্চলা নামের সার্থকতা করিতে যেন সর্ব্বদা ব্যস্ত হইয়া পড়েন। ১৮১৯ খৃঃ অব্দে বাকী রাজস্বে এই পরগণা নীলামে বিক্রীত হইলে, পাথুরিয়াঘাটার সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুরগণ ইহা ক্রয় করেন। নিম্নে আল্‌ফত্‌ গাজির সংক্ষিপ্ত বংশতালিকা প্রদত্ত হইল।

আল্‌ফত্‌ গাজি
|
সৈয়দজান
|
হোসেনজান
|
আইনউদ্দিন
|
সামসুদ্দিন
|
হোসেনউদ্দিন
|
ইমামউদ্দিন
|
সিরাজউদ্দিন
|
মীর মমতাজউদ্দিন

গাজিবংশোদ্ভব মুসলমান ভূম্যধিকারিগণের বিশেষ কোন কার্য্য দৃষ্ট হয় না, তবে অনেক মুসলমান এখনও তাঁহাদের প্রদত্ত চেরাকী ভূমি ভোগ দখল করিতেছেন।

সৈয়দজান পিতার মৃত্যুর পর, ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া তেরচর নামক স্থানে বাসস্থান স্থাপন করেন। তাঁহার পৌত্র আইনুউদ্দিন সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া নলচিড়া গ্রামে আবাস ভবন নির্ম্মান করেন। অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ সেই গ্রামে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের অবস্থা বর্ত্তমান সময়ে বড়ই শোচনীয়; অতি সামান্য আয়ের ভূসম্পত্তি দ্বারা কোন প্রকার গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। প্রকাণ্ড সৌধগুলি প্রায় পতনোন্মুখ, দুই একটী ইষ্টকালয় ভূমিস্মাৎ হইয়াছে, প্রকাণ্ডকায় বট অশ্বত্থ বৃক্ষগুলি অট্টালিকা বেষ্টন করিয়া সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক যেন শাখা প্রশাখা সঞ্চালন দ্বারা এই জমীদারবংশের অতীত সৌভাগ্যের পরিচয়

প্রদান করিতেছে। সরকারী কাগজে প্রকাশ যে, দক্ষিণ সাহাবাজপুরের কতক অংশ পূর্ব্বে নাজিরপুরের অন্তর্গত ছিল ; এবং রতন্দি কালিকাপুর, নাজিরপুর হইতেই সম্পূর্ণ সৃষ্ট হইয়াছে। প্রবাদ যে উজিরপুর গ্রাম আল্‌ফত্ গাজি কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল।

হোসেনউদ্দিনেব সময়ে জমীদারী নিলামে বিক্রয় হয়। স্বর্গীয় কানাইলাল ঠাকুর প্রথমতঃ ইহার চৌদ্দ আনা অংশ ক্রয় করেন, তৎপরে ঢাকা নিবাসী পানিহাটী সাহেব হইতে বাকী দুই আনা অংশ ১৮৩০ খৃঃ অব্দে খোস কবলা দ্বারা ক্রয় করিয়া সম্পূর্ণ মালিক হইলেন। এই পরগণার বর্ত্তমান রাজস্ব ২৮৭৮৩/৪॥ পাই মাত্র।

৯। রতন্দি কালিকাপুর।

এই পরগণার প্রাচীন ইতিহাস চন্দ্রদ্বীপের সঙ্গে জড়িত। মহারাজ কন্দর্পনারায়ণ ও তৎপুত্র বীরবর রামচন্দ্রের শরীররক্ষক সুপ্রসিদ্ধ মল্ল রামমোহনের বংশধর কর্ত্তৃক এই পরগণা স্বতন্ত্রভাবে স্থাপিত। এই স্থান তৎসময়ে ও তাহার অনেক পরেও চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তৎপরে তপ্পে নাজিরপুরের অন্তর্গত হয়, ১৭৪২ খৃঃ অব্দে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ ইহা পৃথক্ করেন, এবং নবাব মীরকাশিম, স্বতন্ত্র ভাবে ইহার রাজস্ব বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এই পরগণা নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে ; জমীদারগণের প্রতাপে ও উদ্যোগে বিশেষ লাভজনক হইয়াছিল। ইহার রাজস্ব -৫২৩৭॥৶৩ পাই।

রামমোহনের প্রপৌত্র রত্নেশ্বর রায় চৌধুরী নিজ নামে এই পরগণার নামকরণ করিয়া উজিরপুর গ্রামে বাসস্থান স্থাপন করেন। ইহাদের পূর্ব্ব নিবাস জগদ্বল। ইহারা কায়স্থ কুলসম্ভূত।

উজিরপুর সুগন্ধানদীর চরোৎপন্ন, পূর্ব্বে এই স্থান জলাকীর্ণ ও জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় ছিল। কথিত আছে যে ফকির মাহমুদ নামক জনৈক মুসলমান এই স্থানে বাস করিতেন, তিনি পূর্ব্বে উজিরি করিতেন বলিয়া এই স্থানের নাম উজিরপুর হইয়াছে। বেভারিজ্ সাহেব অনুমান করেন যে মোগল শাসন সময়ে উজির আল্‌ফত্ গাজি এই স্থানে বাস করিতেন, তদনুসারে উজিরপুর নাম হইয়াছে।

এই জমীদারী সৃষ্টি সম্বন্ধে একটী কিম্বদন্তী আছে। প্রথিতনামা সাধক দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য্য মাধবপাশার রাজাদের কুলগুরু ছিলেন।

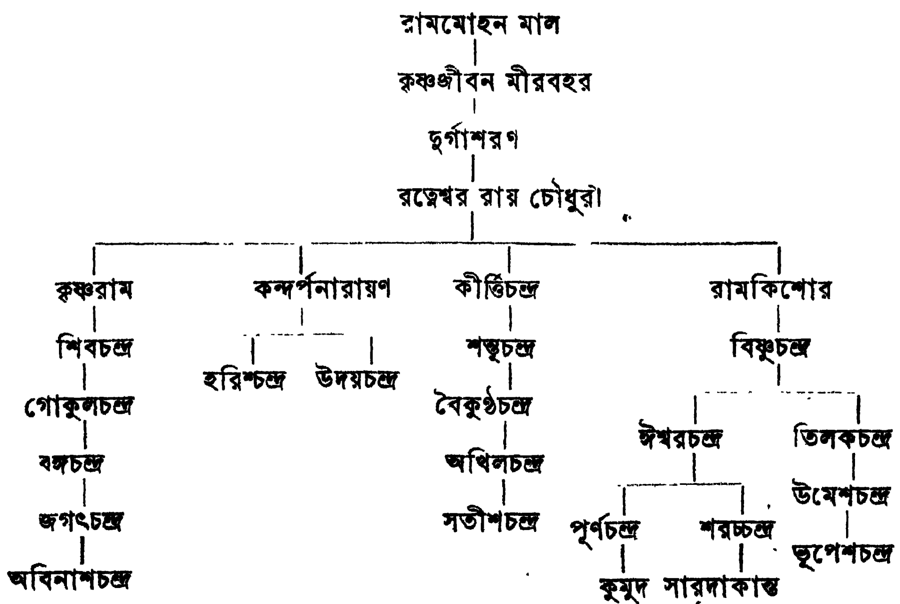
একদিন রাজাকে দীক্ষা প্রদান করিতে আগমন করিয়া তিনি তাম্বুল চর্ব্বন করিতেছিলেন, রাজার মনে তাহাতে একটু অভক্তি জন্মিল ; ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহা বুঝিতে পারিয়া রাজবাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন। তখন রাজবাড়ীর বহির্ব্বাটীস্থ পুষ্করিণীতে রামমোহন মালের পৌত্র দুর্গাশরণ স্নান করিতেছিলেন ; মহাপুরুষ তাহাকেই মন্ত্রগ্রহণ করিতে বলিলেন। নিকটে রামমোহন দণ্ডায়মান ছিলেন, তিনি গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া রাজাকে মন্ত্র না দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। গুরুদেব বলিলেন "রাজা মূর্খ, তাই নিজের বুদ্ধির দোষে সর্ব্বনাশ করিল। আমাকে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে দেখিয়া অভক্তি প্রকাশ করিয়াছে। তোমার পৌত্রকে দীক্ষা দিব।"

রামমোহন বলিলেন "যদি কৃপা হইয়া থাকে তবে আমার পুত্রকেও দীক্ষিত করুন, সেও অদীক্ষিত আছে।" মহাপুরুষ তখন উভয়কেই দীক্ষা মন্ত্র প্রদান করিয়া বলিলেন যে, তাঁহাদের সন্তানসন্ততিগণ অতি শীঘ্র অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া নিজ নামে জমীদারী প্রতিষ্ঠা করিবে।

এই দুর্গাশরণের পুত্রই স্বনামখ্যাত রত্নেশ্বর রায় চৌধুরী। একদা রাজনগর রাজবাড়ী কোন শ্রাদ্ধোৎসব উপলক্ষে উপস্থিত হইবার জন্য জমীদাবর্গের নিকট নিমন্ত্রণ-লিপি প্রেরিত হইলে চন্দ্রদ্বীপাধিপতি স্বীয় কর্ম্মচারী রত্নেশ্বর রায় সহ নানাবিধ উপঢৌকন লইয়া রাজনগর উপস্থিত হইলেন। উৎসব-দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে শত শত লোক অভুক্ত অবস্থায় প্রতিগমন করিতেছে দেখিয়া রত্নেশ্বর রায়, উপঢৌকন জন্য নীত খাদ্যসামগ্রী অভুক্ত দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। এই ঘটনায় রত্নেশ্বর রায়ের সুখ্যাতি প্রচারিত হইল। রাজা রাজবল্লভ তচ্ছ্রবণে রত্নেশ্বর রায়কে তৎসমীপে উপস্থিত হইবার জন্য লোক পাঠাইলেন। রত্নেশ্বর রাজসমীপে উপনীত হইয়া অতি বিনম্র বচনে বলিলেন "মহারাজ! ক্ষুধার্ত্ত সাধারণ দর্শকবৃন্দ আপনার নিন্দাবাদ করিয়া অভুক্ত অবস্থায় গমন করিতেছিল, আপনার জন্য আনীত খাদ্য সামগ্রী দ্বারা আমি তাহাদিগকে ভোজন করাইয়া আপনারই কাজ করিয়াছি।" ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা রাজবল্লভ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি রত্নেশ্বর রায়কে ইহার উপযুক্ত পুরস্কার প্রদানের ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে মুর্শিদাবাদ নবাব

সরকারে উপস্থিত হইতে বলিলেন। রত্নেশ্বর রায় নির্দ্দিষ্ট তারিখে তথায় উপস্থিত হইলে রাজা রাজবল্লভের অনুরোধে আলিবর্দ্দি খাঁ তাঁহাকে ১১৪৯ বঙ্গাব্দে তাম্রপাতে জমীদারী সনদ প্রদান করেন। রত্নেশ্বর রায় নবাব প্রদত্ত জমীদারী এবং পূর্ব্বাধিকৃত স্থানগুলি এক পৃথক পরগণায় বিভক্ত করেন। এই পরগণার নামের 'আদি'তে নিজ নাম রাখিয়া ৺ কালিকা দেবীর নামে পরগণা সৃষ্টি করেন, তাহাতেই পরগণার নাম "রতন্দি কালিকাপুর" হইয়াছে।

এই কিম্বদন্তীর সত্যাসত্য পাঠক বিবেচনা করিবেন, রত্নেশ্বর রায়ের বংশধরগণ কিন্তু এখনও দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য্যবংশের মন্ত্রশিষ্য।



রত্নেশ্বরের পুত্র কৃষ্ণরাম যখন এই পরগণা প্রাপ্ত হ'ন, তখন কতিপয় দেশের হিতকাজ করিবেন বলিয়া তিনি নবাব আলিবর্দ্দিখাঁর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; তন্মধ্যে প্রজাদের সুখ শান্তির জন্য রাস্তা নির্ম্মাণ ও জলাশয় প্রভৃতি খনন এবং চুরি-ডাকাতি নিবারণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জনৈক রাজপুরুষ কৃষ্ণরামের সঙ্গে আসিয়া উজিরপুর গ্রামে কিছুকাল বাস করিতে লাগিলেন, পরওয়ানায় যে সমস্ত বিষয় লিখিত ছিল সেই অনুসারে কাজ কর্ম্ম হয় কি না তাহা দেখাই উদ্দেশ্য ছিল। যদি কোন

অংশে ক্রটী হয় তাহা হইলে তিনি কৃষ্ণরামের জমীদারী খাসে আনিবেন, নবাব এরূপ আদেশ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণরামের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই পরগণার শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তৎকালে এই জমীদারগণের প্রবল প্রতাপে চতুর্দ্দিক বিকম্পিত হইত; এমন কি সুদূর যশোহর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানেও ইহাদের যশঃ ও প্রতাপ ঘোষিত হইত।

গৃহ-বিসম্বাদ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা এই জমীদারগণের পূর্ব্বশ্রী ধ্বংস করিয়া-দিয়াছে। এই বংশের মধ্যে যেমন কেহ কেহ সৎকীর্ত্তি দ্বারা প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, আবার কেহ কেহ কুকার্য্য দ্বারা নরকের পথ তদ্রূপ উন্মুক্ত করিয়াছেন। তারপর যে সমস্ত লোক এই জমীদারগণের আশ্রয়ে থাকিয়া ইহাদের অন্নে শরীর পুষ্ট করিয়াছেন, তাহারাও আবার সর্ব্বনাশ সাধনের ক্রটী করেন নাই।

রত্নেশ্বর রায়ের জমীদারী ছয়টী তালুকে বিভক্ত হয়, তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণরামের চারি আনি ও মধ্যম পুত্র কন্দর্পনারায়ণের চারি আনি অংশে আবার দুই দুইটী পৃথক তালুক হয়। এই পরগণা এখন বহু অংশে বিভক্ত হইয়াছে, নিম্নে ইহার একটী তালিকা প্রদত্ত হইল।

তৌজী নং	অংশ		মালিক
৩২৫৩	৵০ আনা		মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরী (চৌদ্দরশি)।
৩২৫৪	৵০ "		রামচন্দ্রপুরের গুহ চৌধুরিগণ।
৩২৫৫	৵০	৲১৮।/ ৲৭৷৷	মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরী (চৌদ্দরশি)।
		৲৭৷৷	রাজেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী "
		৲৩।/	বাসণ্ডার মহলানবীশগণ।
		৲৩।/	রামচন্দ্রপুরের গুহ চৌধুরিগণ।
৩২৫৬	৵০		স্বর্ণময়ী চৌধুরাণী প্রভৃতি।
৩২৫৭	।০	/১১৶/৷৷	বাসণ্ডার মহলানবীশগণ।
		/৮৲/৷৷	রামচন্দ্রপুরের গুহ চৌধুরিগণ।
		/০	বরহানদ্দিন চৌধুরী (দেউলা)।
৩২৫৮	।০	৵০	ঐ ঐ
		/১।	বাসণ্ডার মহলানবীশগণ।
		৲১৮৶	রামচন্দ্রপুরের গুহ চৌধুরিগণ।

জমীদারগণের অর্দ্ধভগ্ন ইষ্টকালয়, অত্যুন্নত মন্দির এবং সুবৃহৎ দীর্ঘিকা-সমূহ প্রাচীন গৌরবের সামান্য স্মৃতিটুকু জাগাইয়া দিতেছে। এই জমীদার-গণের সকল বংশধর উজিরপুর গ্রামে নাই, কেহ কেহ বা বারপাইকা, রাকুদিয়া, শিকারপুর, বারৈখালী প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে বসবাস করিতেছেন।

এই পরগণায় কয়েকজন ক্ষণজন্মা পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের লোকাতীত কীর্ত্তিতে এই দেশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে অনেকের স্মৃতি বিলোপ হইয়াছে। তাঁহাদের জীবনচরিত যাহা পাওয়া যায় তাহাও কিম্বদন্তী পূর্ণ।

১০। উত্তর সাহাবাজপুর।

পরগণে উত্তর সাহাবাজপুর ইদিলপুরের দক্ষিণে মেহেন্দিগঞ্জ থানায় অবস্থিত। ইহার এক ক্ষুদ্র অংশ মেঘনা বক্ষস্থিত দক্ষিণ সাহাবাজপুর নামক বিশাল দ্বীপে বর্ত্তমান। উভয় অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া মেঘনার শাখা মহানদী ইল্‌সা প্রবাহিত হইতেছে।

মোগল-শাসনসময়ে সাহাবাজপুর সরকার ফতিয়াদের অন্তর্গত একটী মহাল বলিয়া পরিগণিত হইত। কথিত আছে সাহাবাজ খাঁ নামক জনৈক সেনানী হইতে এই পরগণার নামকরণ হইয়াছে।* যখন পর্ত্তুগীজ এবং মগ দস্যুগণের অত্যাচারে নিম্ন বঙ্গ প্রায় উৎসাদিত, তখন এই দুর্ব্বৃত্তদিগের দমনার্থ মোগল সম্রাট তাঁহাকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন।† এই সাহাবাজ খাঁ কখন বাঙ্গালায় আগমন করিয়াছিলেন এ বিষয় বিস্তর মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন এই সাহাবাজ খাঁ এবং খাঁ আজিম মির্জ্জার পরবর্ত্তী বাঙ্গালার সুবেদার সাহাবাজ খাঁ কুম্ব একই ব্যক্তি। সাহাবাজ খাঁ কুম্ব ১৫৮৪ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৮৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ছিলেন; কিন্তু পাঠান এবং মোগল জায়গীরদারগণের বিদ্রোহদমনে অসমর্থ হইয়া রাজরোষে পতিত হন। সম্রাট্ আকবরসাহ তাহাকে আগ্রার কারাগারে অবরুদ্ধ করিয়া খাঁ হেরেবিকে বাঙ্গালার সুবেদার পদে নিযুক্ত করিলেন। অধ্যাপক ব্লকম্যান বলেন যে সাহাবাজপুর-স্থাপয়িতা সাহাবাজ খাঁ, সম্রাট্

* It is said to derive its name from one Shahbaz Khan, a Mogul general in old times.—H. Beveridge's History of Bakarganj, Pp. 183-184.

† প্রাচীন তত্ত্ব সংগ্রহ—তৃতীয় অধ্যায়—১৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

আকবরের পূর্ব্বের লোক। কিন্তু ঐতিহাসিকপ্রবর বেভারিজ্ যখন সাহাবাজপুর-স্থাপয়িতাকে স্পষ্টভাবে মোগলসম্রাট-প্রেরিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং মোগলসম্রাট-প্রেরিত সেনানিগণ মধ্যে যখন সাহাবাজ খাঁ কুম্ব ব্যতীত অপর কোন সাহাবাজ খাঁর নাম দৃষ্ট হয় না, তখন সাহাবাজপুর-স্থাপয়িতা এবং সাহাবাজ খাঁ কুম্ব এক ব্যক্তি নহেন ইহা বলা যায় না।*

বাঙ্গালার সুবেদার পদে নিযুক্ত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই সাহাবাজ খাঁ বঙ্গদেশে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তখন ইনি ক্ষত্রিয় চূড়ামণি মহারাজ টোডরমল্লের অধীনে কার্য্য করিতেন। পরে খাঁ আজিম বঙ্গের সুবেদার পদে নিযুক্ত হইলে ইনি ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত ভূভাগ মোগলের করায়ত্ব করিয়াছিলেন।† সম্ভবতঃ এই সময়েই সাহাবাজপুর স্থাপিত হয়।

সম্রাট আকবর তুষ্ট হইয়া এই সমরকুশল সেনানায়ককে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রদান করিলেন। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালার সুবেদার পদ তাদৃশ সুখকর ছিল না। পাঠানেরা তখনও সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হয় নাই। দায়ূদ সাহের মৃত্যুর পর নবাব কতলু খাঁর অধীনে তাহারা বঙ্গদেশ পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া মোগলদিগকে ব্যতিবস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। মোগলগণ কিছুতেই এই অক্লিষ্টকর্ম্মা দুর্দ্ধর্ষ জাতির আক্রমণ ব্যর্থ করিতে পারিল না। এই সময়েই আবার মোগল জায়গীরদার-গণের বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। মজঃফর, টোডরমল্ল, খাঁ আজিম, কেহই বঙ্গদেশে শান্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে এই গুরুতর কার্য্যের ভার সাহাবাজ খাঁর স্কন্ধে অর্পিত হইল। সাহাবাজ খাঁ প্রথমে শাসনকর্ত্তা হইতে স্বীকৃত হন নাই কিন্তু পরিশেষে এই পদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরে বিদ্রোহদমনে অক্ষম হইয়া, বিদ্রোহীদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলে বাদসাহ তাহাকে পদচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিলেন। এইরূপে সাহাবাজ খাঁর কর্ম্ম-জীবনের যবনিকাপাত হইল।

সম্রাট জাহাঙ্গীর এবং তৎপুত্র সাহজাহানের রাজত্বে উত্তর সাহাবাজপুরে

* আইন-ই-আকবরিতে সাহাবাজ খাঁর নাম দৃষ্ট হয়। ৭৫ পৃষ্ঠায় ফুটনোটে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা অবাস্তব।

† After Khan Azim had assumed the command of the Imperial army, Shahabazkhan subdued the country as far as the banks of the Burhampooter—Stewart's History of Bengal, (Bangabashi Edition) page 204.

বিশেষ কোনও যুদ্ধ বিগ্রহের কথা শুনা যায় না। বৃদ্ধ সম্রাট সাহজাহানকে কারারুদ্ধ করিয়া মোগলকুলপাংশুল ঔরঙ্গজেব, যখন দারা, সুজা প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের সহিত দিল্লীর সিংহাসন লইয়া যুদ্ধে ব্যাপৃত, তখন সুযোগ পাইয়া মগ ও পর্ত্তুগীজ দস্যুগণ পুনরায় সাহাবাজপুর প্রভৃতি মেঘনা নদীর তীরবর্ত্তী স্থানে লোমহর্ষণ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল। ঔরঙ্গজেব তাহাদিগের দমনার্থ বৈদ্যবংশোদ্ভব মহাবীর সংগ্রাম সাহকে পূর্ব্ববঙ্গে প্রেরণ করেন। সংগ্রাম সাহাবাজপুর প্রভৃতি স্থলে বহু সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া দস্যুদলনে প্রবৃত্ত হইলেন। সাহাবাজপুর পরগণার অন্তর্গত গান্ধীয়া গ্রামের অনতিদূরে মেঘনার শাখা ইলসা নদীর তীরে সংগ্রামের কেল্লা বর্ত্তমান ছিল। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হইল এই দুর্গ ইলসার বিশাল গর্ভে বিলীন হইয়াছে।

সংগ্রামসাহের কর্ম্মবহুল জীবনের অধিকাংশ ঘটনাই বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। তিনি বৈদ্যকুলে শালঙ্কায়ন গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নিজ শৌর্য্যপ্রভাবে বহুযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বাদসাহ ঔরঙ্গজেবের নিকট রাজা উপাধি এবং মন্সবদারের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সম্রাট মধ্য বাঙ্গলায় ভূষণা, মামুদপুর এবং কালিয়ার অন্তর্গত নাওরা প্রভৃতি স্থান তাঁহাকে জায়গীর অর্পণ করেন।

সংগ্রাম ভূষণা পরগণার অন্তর্গত মথুরাপুর নামক স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মথুরাপুর গ্রামে একটা প্রকাণ্ড স্তম্ভ আছে, উহা "সংগ্রামের দেউল" বলিয়া প্রসিদ্ধ। সংগ্রাম ও তদ্বংশীয়গণের পরেই ভূষণা সীতারাম রায়ের হস্তগত হয়। ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারে ১৬৮৪ খৃঃ অব্দে যোধপুর রাজ্যে যে ভীষণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল তাহাতেও বাঙ্গালী বীর সংগ্রাম সাহ অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। সংগ্রাম মোগল সেনার অধিনায়ক ছিলেন। তাঁহার রণকৌশলে পরাজিত হইয়া রাঠোরগণ সন্ধির নিমিত্ত প্রধান চারণকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, উদারহৃদয় সংগ্রাম সাহ তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া সন্ধি স্থাপন করিলেন। মহামতি টড সাহেব রাজস্থানে লিখিয়াছেন—সংগ্রাম যে কোন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা যায় না, তবে তাঁহার হৃদয় যেরূপ উচ্চ ছিল তাহাতে তিনি মহদ্‌বংশজাত ছিলেন, সন্দেহ নাই।

সংগ্রাম রাজা এবং মন্সবদার হইয়াছিলেন বটে কিন্তু স্বজাতি-সমাজে তাদৃশ সম্মানলাভে কৃতকার্য্য হন নাই। ইহার কারণ এই যে তিনি অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর (শালঙ্কায়ন) বৈদ্য ছিলেন। উচ্চ শ্রেণীর বৈদ্যগণ স্বেচ্ছায় তাঁহার সহিত আদান-প্রদান করা দূরে থাকুক, তাঁহাকে বৈদ্য বলিয়াই স্বীকার করিতেন না; তাঁহারা তাহাকে "হাম বৈদ্য" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। বীরহৃদয় সংগ্রাম, সমাজের অত্যাচার অগ্রাহ্য করিবার মানসে সিদ্ধবংশীয় বৈদ্যগণের সহিত কার্য্য করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি বাণীবহ গ্রামবাসী শক্তি মাধববংশীয় সদাশিব সেনের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র রাধাকান্ত ও মণিরাম যথাক্রমে ধন্বন্তরি আদিত্যবংশীয় কাশীনাথ সেনের কন্যা এবং ত্রিপুর গোবিন্দ গুপ্তের কন্যা বিবাহ করেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার ছয়টী কন্যা ধন্বন্তরি উচলি বিশ্বনাথ সেন ও রঘুনাথ সেন, আদিত্য রঘুনাথ সেন, বিকর্ত্তন রামচন্দ্র সেন, শক্তি গণবংশীয় দুর্গাদাস সেন ও আত্মগোত্রীয় রঘুনাথ মজুমদারের সহিত পরিণীতা হয়। সংগ্রাম কেবল অর্থব্যয়ে কার্য্য সুসিদ্ধ করিতে না পারিয়া অনেক স্থলে বল প্রয়োগ করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। কণ্ঠহার লিখিয়াছেন—

দুর্দ্দৈবাশনিসম্পাতাদ্রঘুনাথো যুবামৃতঃ।
সংগ্রামসাহতনয়া পাণিগ্রহণ পীড়িতঃ॥

সংগ্রামের কার্য্যাবলী দ্বারা বৈদ্যসমাজে যে ভীষণ বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল তাহার ফল অদ্যাপি অনেকে ভোগ করিতেছেন। বাণীবহ, কালিয়া, মামুদপুর প্রভৃতি স্থানের বৈদ্য সমাজ অদ্যাপি সংগ্রামসাহ-দোষে হীনপ্রভ হইয়াছে। সংগ্রামসাহ বাকলায় যে সকল কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে "সংগ্রামনীল" নামক গ্রাম ও "সংগ্রামনীলের খাল" ব্যতীত আর সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে। *

বৈদ্যকুলোদ্ভব প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী চাঁদরায় সংগ্রামসাহের একজন বিশ্বস্ত সহকারী ছিলেন। তিনি মগ ও পর্ত্তুগীজদিগের সহিত যুদ্ধকালে সংগ্রামের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। সম্রাট তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সাহাবাজপুর পরগণা জমীদারী প্রদান করেন। তিনি সাহাবাজপুরের অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামে অত্যুচ্চ মঠ ও বাসুদেব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন,

* ৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

তাহা অদ্যাপি দর্শকগণের নয়ন তৃপ্তি জন্মাইয়া থাকে। চাঁদ রায়ের বংশধরগণের মধ্যে শ্রীরাম রায়ই নানাগুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লালরাম চৌধুরী এই পরগণার জমীদার ছিলেন। ঢাকার তৎকালীন এটর্নী পিট সাহেবের দুর্ব্বৃত্ততায় লালরামকে বহুতর লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল।* পরবর্ত্তী কালের ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে কালীনাথ রায় এবং রাসমণি চৌধুরাণীই বিশেষ প্রসিদ্ধ। উত্তর সাহাবাজপুরের অন্তর্গত দাদ্‌পুর গ্রামে বৈদ্যবংশীয় কয়েক ঘর প্রাচীন ভূস্বামী বাস করিতেছেন।

১১। দক্ষিণ সাহাবাজপুর।

এই পরগণা বাদসাহী আমলে সরকার ফতিয়াবাদের অন্তর্গত ছিল। সরিদ্বরা ইলসা এবং তেতুলিয়া ইহাকে বাখরগঞ্জের অপর ভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। এই বিশাল দ্বীপের পূর্ব্ব প্রান্ত বিধৌত করিয়া মেঘনার শাখা সাহাবাজপুর নদী প্রবাহিত। এই নদীর পূর্ব্বে হাতীয়া দ্বীপ; পরগণে দক্ষিণ সাহাবাজপুরের এক অংশ এই হাতীয়া দ্বীপে অবস্থিত।

কথিত আছে, পূর্ব্বকালে দক্ষিণ সাহাবাজপুর, রতন্‌দি কলিকাপুর, সায়েস্তানগর প্রভৃতি পরগণার মধ্য দিয়া বেতুয়া নাম্নী এক মহাবেগবতী স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইত। ইহার কিঞ্চিৎ পশ্চিমে ও পূর্ব্বে দুইটী ক্ষুদ্র প্রবাহিনী বর্ত্তমান ছিল। কালক্রমে মহানদী বেতুয়ার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইলে ক্ষুদ্র প্রবাহিনীদ্বয় উত্তাল তরঙ্গময়ী মহানদীরূপে পরিণত হইয়া দক্ষিণ সাহাবাজপুরকে বাখরগঞ্জ এবং হাতীয়া দ্বীপ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রবলবেগে সাগরাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। এই মহানদীদ্বয়ই যথাক্রমে তেতুলিয়া এবং সাহাবাজপুর নদী বলিয়া পরিচিত।†

---

* The zaminder of Uttar Shahbazpur was one of those who suffered from the aggressions of Mr Peat, an attorney, who had been Mr Justice Hyde's clerk. Among other things, he shot a native for trying, as he said, to resist his authority.—H. Beveridge's History of Bakarganj, Page 134.

† It seems that formerly Dakhin Shahbazpur pargana was bounded on the west by a large river called the Betua: that west of this river were the lands of Ratandi Kalikapur, Uttar Shahbazpur, Shaistanagar and Baikanthpur, &c.; and that west of them was the Ilsa or Titulia, which was then a small river. Now the Betua has been dried up, and much of the land in the centre of the island is

দক্ষিণ সাহাবাজপুরের অধিবাসিগণ প্রায়ই মুসলমান। হিন্দুগণ অধিকাংশ "হালিয়াদাস" শ্রেণীর অন্তর্গত। মুসলমান-শাসনসময়ে এই স্থান মগ ও পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণের দুর্ব্বিসহ অত্যাচারে অত্যন্ত বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই কারণে হিন্দু "হালিয়াদাস"গণ জাতিচ্যুত এবং ইসলাম্ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল বলিয়া এই দ্বীপে মুসলমানের সংখ্যা এত অধিক লক্ষিত হয়।*

মগ ও ফিরিঙ্গীদিগকে দমন করিবার জন্য সাহাবাজপুরের প্রতিষ্ঠাতা সাহাবাজ খাঁ দিল্লীশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। সাহাবাজ খাঁর কিয়ৎকাল পরেই দুর্দ্ধর্ষ পর্ত্তুগীজগণ পুনরায় মেঘনার মোহানায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্দ্বীপের মোগল শাসনকর্ত্তা ফতে খাঁ বহু রণপোতসহ তাহাদিগকে দক্ষিণ সাহাবাজপুরের নিকটে আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এই জলযুদ্ধে ফতে খাঁ পরাজিত এবং নিহত হন; বিজয়ী পর্ত্তুগীজগণ গঞ্জালেকে সেনানী পদে বরণ করিয়া সন্দ্বীপ অধিকার করেন। পর্ত্তুগীজ-নায়ক গঞ্জালে হইতেও সন্তুষ্ট হইল না। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন দক্ষিণ সাহাবাজপুর বাকলা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞ পর্ত্তুগীজ-সেনাপতি এইক্ষণে বাকলা-রাজকৃত উপকার বিস্মৃত হইয়া সাহাবাজপুর দ্বীপও স্বরাজ্যভুক্ত করিল।†

এই সময়ে সেখ আলাউদ্দিন ইস্‌লাম খাঁ সুবেদার পদ প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। মহামতি ইসলাম খাঁ রাজমহল হইতে ঢাকায়

---

situated in its old bed, and was resumed by Government, while the Titulia has become a very large river The river between Hattia and Dakhin Shahbazpur was also small in old times, and there is still a small portion of Dakhin Shahbazpur pargana in Hattia.—H. Beveridge's History of Bakarganj, Page 140.

* When the Mugs began to give trouble, most of the Hindus who remained in Bakargnaj probably became voluntary converts to Mahomedanism, and there is little doubt that the process was hastened by the fact that the mere circumstance of their living side by side with Mugs, Portuguese and Mahomedans was sufficient to tarnish their caste in the eyes of Hindus of other districts, and so to deprive them of the social advantages of Hinduism.—H. Beveridge's History of Bakarganj, Page 252.

† Although he was under great obligations to the Raja of Batecala (Bacala) who had first given refuge to the Portuguese in their distress; he ungratefully seized upon the islands of Shahbazpur and Potelbanga, which belonged to that chief. Stewart's History of Bengal, P. 235 (Bangabashi Edition).

রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া পর্ত্তুগীজদিগকে বিদূরিত করিয়া দিলেন। ইসলাম খাঁর মৃত্যুর পর পর্ত্তুগীজ এবং আরাকানবাসীদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে আরাকানরাজ ওলন্দাজগণের সাহায্যে পর্ত্তুগীজদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া সাহাবাজপুর অধিকার করেন। অতঃপর মগ দস্যুগণ পঙ্গপালের ন্যায় দক্ষিণ সাহাবাজপুর এবং তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশে পতিত হইয়া নগর গ্রাম প্রভৃতি উৎসাদিত করিতে লাগিল। এই সময়ে কত শত সহস্র বঙ্গবাসী নরনারীর তপ্ত অশ্রু মেঘনা এবং বঙ্গসাগরের বক্ষ প্লাবিত করিয়াছিল তাহা কে বলিতে পারে? ১৬৩২ খৃঃ অব্দে হুগলীর সমরে পর্ত্তুগীজ-শক্তি বিধ্বস্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু মগের অত্যাচার কিছুতেই নিবারিত হইল না।* মোগল রাজধানী ঢাকা নগরীর অধিবাসিগণ পর্য্যন্ত এই দস্যুগণের পরাক্রমে সর্ব্বদা সভয়ে কালযাপন করিত।

অবশেষে ১৬৬৪ খৃঃ অব্দে নবাব সায়েস্তা খাঁ ঔরঙ্গজেব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বঙ্গে আগমন করেন। এই সময়ে হতাবশিষ্ট পর্ত্তুগীজগণ মগদিগের সহিত সমবেত হইয়া বাঙ্গালার দক্ষিণ-পূর্ব্ব-প্রদেশ বিধ্বস্ত করিতেছিল। পর্ত্তুগীজদের অত্যাচার-কাহিনী ফরাসী পরিব্রাজক বর্ণিয়ে অতি তেজস্বিনী ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন। "They consisted of such as had abandoned their monasteries; had been twice or thrice married, murderers, and the like. Their usual trade was robbery and piracy. They not only scoured the sea-coasts, but entered the rivers, especially the Ganges, and often penetrating forty or fifty leagues up the country, surprised and carried away whole towns and villages of people, with great cruelty, and burning all which they could not carry away. They ransomed the old people; but the young ones they made rowers of, and such Christians as they were themselves; boasting that they made more converts in one year, than the missionaries, through the Indies, did in ten.†

* Such was the extent of depredations that the inhabitants of Dacca trembled when they heard the names of the Mugs whose general practice was to kill the men and to carry off the women and children as slaves.—Stewart's History of Bengal, Page 326 (Bangabashi Edition).

[† Quotation from Modern Universal History Vol. VI]

এই সমস্ত অত্যাচার-কাহিনী সায়েস্তা খাঁর কর্ণগোচর হইলে নবাব স্বীয় পুত্র বোজরগউমেদ খাঁ এবং সেনাপতি হোসেন বেগকে বহু সৈন্য এবং রণপোতসহ মেঘনার মোহানায় প্রেরণ করিলেন। মোগলগণ বহুযুদ্ধে আরাকানবাসিদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া দক্ষিণ সাহাবাজপুর, সন্দ্বীপ এবং চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত অধিকার করিলেন। এইরূপে নিম্নবঙ্গে "মগের মুলুকের" অবসান হইলে পুনরায় শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল।

মগ এবং ফিরিঙ্গী অপেক্ষা সহস্রগুণে ভয়ঙ্কর আর এক প্রবল শত্রুর আক্রমণে দক্ষিণ সাহাবাজপুর বহুবার শ্মশান ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। এই ভীষণ শত্রু স্বয়ং সমুদ্র। বাঙ্গালা ১২৮৩ সনে (১৮৭৬ খৃঃ অঃ ৩১শে অক্টোবর) যে ঝটিকাবর্ত্ত সংঘটিত হয়, তাহার ফলে মেঘনা ও বঙ্গোপসাগরের সলিলরাশি বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া প্রায় তিন লক্ষ মনুষ্য, বহু সংখ্যক গবাদি জন্তু ও অনেক নৌকা এবং গৃহ বিনষ্ট করে। এই মহাঝড়ে দক্ষিণ সাহাবাজপুরের অন্তর্গত দৌলত খাঁ এবং তৎ পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।*

মগ এবং পর্ত্তুগীজগণ সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হইলে ভুলুয়ায় বিজয়-নারায়ণ মজুমদার এবং আসান উল্লা শিকদার এই পরগণায় জমীদারী প্রাপ্ত হইয়া যথাক্রমে বিজয়পুর এবং আসানি নামক গ্রামদ্বয়ে বাসস্থান স্থাপন করেন, কিন্তু তাঁহারা নিয়মিত রাজস্ব প্রদানে পরাঙ্মুখ হইলে পর নবাব আবু সৈয়দ নামা জনৈক ফকিরকে এই পরগণা প্রদান করিলেন। আবু সৈয়দ স্বীয় পত্নী সরতাজ বিবির নামে এই জমীদারী গ্রহণ করিয়া শ্রীরাম-পুর নিবাসী কৃষ্ণরাম চক্রবর্ত্তীকে দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন। আবু সৈয়দ এবং কৃষ্ণরাম ভূমির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ হাওলাদারদিগকে প্রদান করিয়া তাহা-দিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন। ইহাদিগের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই বিশাল দ্বীপের অনেক অরণ্য পরিষ্কৃত হইয়া শস্যশালিনী হইল।

আবু সৈয়দ এবং সরতাজ বিবির তিরোধানের পর কতিপয় বৎসর অতীত হইলে ইহাদিগের পৌত্র মির্জ্জা আহম্মদজান সমগ্র পরগণার অধীশ্বর হইলেন। মির্জ্জা জানের খোদাবক্স নামে এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিল।

---

* দ্বিতীয় অধ্যায় ২২।২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সম্পত্তি লইয়া উভয় ভ্রাতার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে গৃহ বিবাদের বিষময় ফল শীঘ্রই ফলিল। ১৭৮০ খৃঃ অব্দে বাকী রাজস্বে এই পরগণার সাত আনা অংশ বিক্রীত হইল, ঢাকা নিবাসী খাজে মাইকেল নামক জনৈক আর্ম্মানী ইহা ক্রয় করেন। ১৭৮৬ খৃঃ অব্দে মাইকেল এই পরগণার অবশিষ্ট নয় আনা অংশও খরিদ করিলেন, কিন্তু ইহার দুই বৎসর পরে সদাশয় কলেক্টর ডগলাস সাহেব মির্জ্জা জানকে তিন আনা দেড় গণ্ডা এক ক্রান্তি অংশ প্রত্যর্পণ করিয়া দুঃস্থ জমীদারবংশের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দেন। অদ্যাপি এই অংশ মির্জ্জা জানের বংশধর ঢাকার মির্জ্জা সাহেবগণ ভোগ করিতেছেন।

আর্ম্মানীবংশের সৌভাগ্য-লক্ষ্মীও অধিককাল স্থায়ী হইল না। মাইকেলের পুত্র খাজে আরতুনের মৃত্যুর পর হইতে এই বংশের অধঃপতন আরম্ভ হয়। অধুনা মাইকেলের বিশাল সম্পত্তি তদীয় বংশধরগণ ব্যতীত ষ্টিকেন্স, হার্নি, লুকস্, কগ্রাম প্রভৃতি আরও অনেক অংশীদারের হস্তগত হইয়াছে।

মির্জ্জাজান এবং খাজে মাইকেলের সময়ে দক্ষিণ সাহাবাজপুর লবণের কারখানার নিমিত্ত বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে ঢাকার শাসনকর্ত্তা (Chief) বিখ্যাত বারওয়েল সাহেব (Richard Barwell) খাজে মাইকেল এবং খাজে কাওর্কের নিকট হইতে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে কারখানার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, পরে আর এক ব্যক্তির নিকট হইতে আর এক লক্ষ টাকা গ্রহণ করিয়া তাহাকেই ঐ ভার প্রদান করেন।* এই সকল কারণে ডিরেক্টরগণ (Court of Directors) কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া বারওয়েল যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন তাহা বড়ই কৌতুকাবহ। "If I am mistaken in my reasoning, and the wish to add to my fortune has warped my judgment in a transaction that may appear to the Board [of Directors] in a light different to what I view it in, it is past; I cannot

* Khajah Kaworke complained that after Mr Barwell had let him the farms, and taken a lac and Rs 25,000 from him on this account, he dispossessed him and relet the farms to another person for another lac of rupees.—H. Beveridge's History of Bakarganj, P. 136.

recall it, and I rather choose to admit an error than deny a fact." উত্তরে ডিরেক্টরগণ বলিয়াছিলেন "The extraordinary caution, and the intricate contrivances with which his share in this transaction is wrapped up, form a sufficient proof that he was not altogether misled in his judgment, and though there might be some merit in acknowledging an error before it was discovered, there could be very little in a confession produced by previous detection." *

১৮৪৫ খৃঃ অব্দে দক্ষিণ সাহাবাজপুরে মহকুমা স্থাপিত হয় এবং মেহেন্দীগঞ্জের মুন্সেফী দৌলতখাঁয় পরিবর্ত্তিত হয়। সর্ব্ব প্রথমে এই দ্বীপ ঢাকা জেলালপুরের অন্তর্গত ছিল। পরে ক্রমান্বয়ে বাখরগঞ্জের এবং নোয়াখালীর এলাকাভুক্ত হইয়া ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে পুনরায় বাখরগঞ্জের অন্তর্ভূত হইয়াছে। ১২৮৩ সনে মহাঝড়ে দৌলত খাঁ ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে ভোলায় হেড কোয়াটার স্থাপিত হয়।

২। তপ্পে কৃষ্ণদেবপুর।

দক্ষিণ সাহাবাঁজপুরের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত কৃষ্ণদেবপুর বাখরগঞ্জের একটী প্রসিদ্ধ পরগণা। পূর্ব্বে ইহা উত্তর সাহাবাজপুরের অন্তর্গত ছিল, সুপ্রসিদ্ধ গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শাসনকালে এই জমীদারী সৃষ্ট হয়। ইহার সরকারী রাজস্ব ৮১৬ টাকা মাত্র।

সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ এই পরগণার প্রথম জমীদার। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বঙ্গদেশের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক ছিলেন। তিনি রাজা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বাটীতে অধ্যাপনা করিতেন, এবং প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ বুদ্ধিবলে তাঁহার মনোরঞ্জনে সমর্থ হন। এই সময়ে গঙ্গাগোবিন্দ বঙ্গদেশের দেওয়ানপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অসীম প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; স্বয়ং হেষ্টিংস তাঁহার হস্তের ক্রীড়নক ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেওয়ান বাহাদুরের পরামর্শ ব্যতীত রাজস্ব এবং জমীদারী সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ই মীমাংসিত হইত না, তাঁহার অখণ্ড প্রতাপে সমগ্র দেশ কম্পিত হইত। তাঁহারই অনুগ্রহে কৃষ্ণদেব স্বনামে জমীদারী লাভ করেন।

* H. Beveridge's History of Bakarganj, pp. 138-39.

জমীদারী প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। তাঁহার সন্তান সন্ততিগণ বহুকাল অতীব সম্মান ও সমৃদ্ধির সহিত এই জমীদারী ভোগ করিতেছিলেন। কিন্তু চিরদিন কখনও সমান যায় না। বর্ত্তমানে এই পরগণা কৃষ্ণদেবের বংশধরগণের দখলে নাই। ইহার কতক অংশ বালিয়াটির সাহগণ ক্রয় করিয়াছেন। অপর অংশ মৈমনসিংহের জনৈক ভূম্যধিকারীকে পত্তন প্রদান করা হইয়াছে।

১৩। তপ্পে আলিনগর।

তপ্পে আলিনগর দক্ষিণ সাহাবাজপুরের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। এই ক্ষুদ্র পরগণাও উত্তর সাহাবাজপুর হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। নাম দৃষ্টে মনে হয় এই স্থল মুসলমান কর্ত্তৃক স্থাপিত, কিন্তু কখন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জন কুরজন (Mr. John Courjon) নামক এক ব্যক্তি এই ক্ষুদ্র পরগণার একমাত্র ভূম্যধিকারী ছিলেন। ইহার সরকারী রাজস্ব ১৫৭৮ টাকা মাত্র।

১৪। রামনগর।

এই পরগণা মহারাজ রাজবল্লভের জমীদারী হইতে উৎপন্ন। বাখরগঞ্জের অধিকাংশ পরগণাই এককালে স্বনামপ্রসিদ্ধ মহারাজের অধীন ছিল। তিনি যে সময়ে ঢাকা নগরে নায়েব-নাজিম পদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন রামনারায়ণ সেন নামক কায়স্থবংশজ জনৈক কর্ম্মচারী তাঁহার অধীনে কার্য্য করিতেন। রামনারায়ণের পিতার নাম অনন্তরাম সেন, পিতামহের নাম রত্নগর্ভ সেন, জন্মস্থান কোথায় তাহা জানা যায় নাই, তবে তিনি রাঢ় দেশবাসী ছিলেন বলিয়াই অনুমিত হয়। কারণ রায়েরকাঠীর দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ-রাজগণের ন্যায় রামনারায়ণের বংশধরগণ মহাত্মা গঙ্গাধর সেন এবং নরপতি সেনের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। রায়েরকাঠীর রাজগণের সহিত রামনগরের পূর্ব্ব জমীদারবংশের জ্ঞাতিত্ব থাকাই সম্ভব।

যখন রামনারায়ণ মহারাজ রাজবল্লভের অধীনে কার্য্য করিতেন তখন রাজ-কন্যার বিবাহোপলক্ষে সপ্তবিংশতি লক্ষ মুদ্রাস্থলে দ্বাত্রিংশত লক্ষ

মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে বলিয়া কর্ম্মচারিগণ প্রকাশ করিল। রাজা রাজবল্লভ ইহার নিকাশ বুঝিয়া লইবার জন্য রামনারায়ণকে নিয়োজিত করিলে; কর্ম্মচারিগণ তাঁহার নিকট নিকাশ দিতে অসম্মত হন ও তাঁহাকে অপমান করেন। মহারাজের নিকট একথা প্রকাশ হইলে, তিনি সেই কর্ম্মচারীদিগকে কারারুদ্ধ করিলেন। অবশেষে কর্ম্মচারিগণ রামনারায়ণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ নগদ দশ সহস্র মুদ্রাসহ হিসাব নিকাশ পরিষ্কার করিয়া দিয়া অব্যাহতি লাভ করেন। রামনারায়ণ কাগজপত্র এবং মুদ্রাগুলি লইয়া রাজা রাজবল্লভের নিকট উপস্থিত হন। রাজা কর্ম্মচারীর সততা দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকেই ঐ মুদ্রা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। রামনারায়ণ বিনীতভাবে উত্তর করিলেন "মহারাজ, আমার বসতবাড়ীর স্থান নাই, টাকা লইয়া কি করিব ?" তখন রাজা, রামনারায়ণকে বাসোপযোগী ভূমি প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া ইদ্রাকপুর পরগণার জমীদারের প্রতি তাঁহার জন্য বাটী নির্ম্মাণের আদেশ করিলেন। রামনারায়ণ ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন "মহারাজ, আমি রাঢ়দেশীয়, বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজে কিরূপে প্রচলিত হইব ?" তদুত্তরে রাজবল্লভ বলিলেন "তোমার কোন চিন্তা করিতে হইবে না, চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের নেতা, তাঁহাদের দ্বারা তোমাকে এই সমাজে প্রচলিত করিব।" তখন রামনারায়ণ চন্দ্রদ্বীপের রাজ-বাটীর নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে বাটী নির্ম্মাণ করা স্থির করিয়া ঘণ্টেশ্বরের পার্শ্বলগ্ন সাহাজিরা নামক মৌজায় চারি দ্রোণ পরিমিত ভদ্রাসন ঠিক করিলেন।

অনন্তর কতিপয় বৎসর অতীত হইলে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ রাজবল্লভের কতক হিসাব-কাগজ তলপ করায় রাজা বিশ্বাসী রামনারায়ণ কর্ত্তৃক কাগজ প্রস্তুত করাইয়া পাঠাইয়া দিলেন। নবাব সেই কাগজ দর্শন করিয়া অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিলে, রাজবল্লভ রামনারায়ণকে ষষ্টি সহস্র মুদ্রা আয়ের জমীদারী পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিলেন। উত্তর সাহাবাজপুর, চন্দ্রদ্বীপ, আজিমপুর, রতনদি কালিকাপুর, বাঙ্গরোড়া প্রভৃতি অনেক পরগণা হইতে সাতাশিটী কিস্‌মত বাহির করিয়া এই পরগণা গঠন করা হয়। রামনারায়ণ তাঁহার পুত্র রামদাস সেন নামে এই পরগণার সনন্দ প্রাপ্ত হন; এবং রামদাসের নামানুসারে এই পরগণার নাম রামনগর হয়।

রামনারায়ণ পুত্রের উপর জমীদারীর ভার অর্পণ পূর্ব্বক স্বয়ং রাজবল্লভের কৃপায় নবাবসরকারে কার্য্য প্রাপ্ত হইয়া মুর্শিদাবাদে বাস করিতে লাগিলেন। পূত-সলিলা ভাগীরথী-বিধৌত বঙ্গের পূর্ব্ব রাজধানী মুর্শিদাবাদ নগরেই তাঁহার জীবলীলা সাঙ্গ হয়। তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার জামাতা ইদিলপুর জমীদার বংশীয় কেশব রায়কে কেশবপুর নামক ভূসম্পত্তি প্রদান করেন।

রামনারায়ণের পুত্র রামদাস সেন, ঘোষ, বসু প্রভৃতি কুলীন কায়স্থ-দিগের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া কায়স্থ-সমাজে মহাপাত্র বলিয়া আদৃত ও পরিচিত হন, এবং নানা দেশ হইতে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ এবং নবশায়ক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোক আনয়ন করিয়া তাহাদিগের বাসস্থান সংস্থাপন করিয়া দেন। তিনি সাওয়ার মজুমদারবংশীয় রঘুদেব তর্ক-পঞ্চাননকে গুরুরূপে বরণ করেন এবং ভূসম্পত্তি দান করিয়া উক্ত গ্রামেই স্থাপন করেন। তথাকার ভট্টাচার্য্যগণ উক্ত তর্কপঞ্চানন মহশয়েরই সন্তান।

১২৮৭ সালে রামদাসের পৌত্র বিষ্ণুদাস রায়ের সময়ে এই জমীদারী নীলাম হওয়ায় শিবদয়াল ত্রিবেদী ইহা খরিদ করেন; কিন্তু জমীদারী দখল করিতে অসমর্থ হওয়ায় উহা পুনরায় নীলাম করিয়া দেওয়া হইলে, ঢাকার কৌলীপাড়ার জমীদার বংশ বার আনি, এবং মাধবপাশার মুন্সী-জমীদারগণ অপর চারি আনি অংশ ক্রয় করেন। রামনগরের পূর্ব্ব জমীদারবংশ অতি শোচনীয় অবস্থায় সাহাজিরা গ্রামে বাস করিতেছেন; জীর্ণ অট্টালিকা, বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা অতীত গৌরবের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

১৫। তরফ রামহরিচর।

রামহরিচর মহানদী মেঘনার মোহানায় কলমি দ্বীপের কিঞ্চিৎ উত্তরে অবস্থিত। ১৭৮৫ খৃঃ অব্দে সুন্দরবনের স্বনামধন্য শাসনকর্ত্তা মহামতি টিলমান্ হেঙ্কেল নাজিরপুরের মুসলমান জমীদারবংশোদ্ভব সিরাজউদ্দিনের পত্নী দোর্দ্দনাখানম্ এতেমন্নেসাকে এই নব গঠিত "তরফ" অর্থাৎ ক্ষুদ্র পরগণা প্রদান করেন। উক্ত মহিলার নামানুসারেই এই পরগণার "দোর্দ্দনাখানম্" নামক তালুকের নামকরণ হইয়াছে। পট্টি, মায়, নাঙ্গলা, এই তিনটী ক্ষুদ্র দ্বীপ লইয়া এই তালুক গঠিত। "দোর্দ্দনাখানম্"ই রাম-হরিচরের একমাত্র তালুক, এতদ্ভিন্ন ইহার অন্তর্গত অন্য কোন তালুক নাই।

১৬। কল্‌মিচর ও তরফ।

কল্‌মিচর মহানদী মেঘনার মোহানায় অবস্থিত একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ মাত্র। ইহার একদিকে অনন্ত নীল সিন্ধু, অপর তিনদিকে সমুদ্রতুল্য মহানদী। এই দ্বীপের অধিবাসিগণ অধিকাংশই মুসলমান; কৃষিকার্য্য এবং মহিষ-পালন ইহাদের প্রধান ব্যবসায়। ইহারা কুক্রী, মুক্রী প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী দ্বীপ সমূহে সচরাচর মহিষ চড়াইতে গমন করে; এতদ্ব্যতীত বাখরগঞ্জের অন্যান্য স্থলে ইহারা কদাচিৎ যাতায়াত করিয়া থাকে।

কথিত আছে, বদনআলি খাঁ নামক এক ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে এই দ্বীপে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করে। যৎকালে মহামতি টিলমান্ হেঙ্কেল দোর্দ্দনা-খানম্ তালুক প্রদান করিয়াছিলেন তখন এই কল্‌মি দ্বীপও বৈদ্যনাথ সেন নামক এক ভদ্রসন্তানকে পত্তন প্রদান করেন। বৈদ্যনাথ প্রকৃতপক্ষে একজন বেনামীদার মাত্র। নাজিরপুরের প্রসিদ্ধ মুসলমান জমীদার মহাত্মা আল্‌ফত গাজির বংশধর সিরাজউদ্দিনই প্রকৃত ভূস্বামী।

অস্মদ্দেশের ইংরাজ শাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যে মহাত্মা হেঙ্কেলই এই দ্বীপে প্রথম পদার্পণ করেন। হেঙ্কেল অতীব সদাশয় এবং কার্য্যদক্ষ লোক ছিলেন। কথিত আছে তাহার সদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া সুন্দরবনবাসী মলঙ্গিগণ তাহার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া অর্চ্চনা করিত। "A strong proof that the natives of this country are sensible of kind treatment and easily governed without coercive measures"* মহামতি হেঙ্কেলের পর বাখরগঞ্জের প্রথম কলেক্টর স্বনামধন্য হাণ্টার সাহেব এই দ্বীপ পরিদর্শন করেন। তৎকালে সিরাজউদ্দিনের বিধবা পত্নী এতেমন্নেসার অধীনস্থ মতিউল্লা খাঁ নামক জনৈক তালুকদার এই দ্বীপের প্রধান ভূম্যধিকারী ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কল্‌মিচর, ইমদাদ্ আলি মুন্সী এবং চব্বিশ পরগণার এক ঘোষ পরিবারের হস্তগত হয়। ইহাদিগের সময়েই (১৮৭৪ খৃঃ অঃ) মহাত্মা বেভারিজ্ এই দ্বীপে গমন করিয়া ইহার ইতিবৃত্ত এবং প্রাকৃতিক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

---

* H. Beveridge's History of Bakarganj, Page—145.

১৭। সুলতানাবাদ।

পরগণে সুলতানাবাদ বাউফল এবং বাখরগঞ্জ থানায় অবস্থিত। এই পরগণার কি নিমিত্ত সুলতানাবাদ নাম হইল তাহা সম্যক্‌রূপে অবগত হওয়া যায় না। বঙ্গদেশের কোনও সুলতানের নামানুসারে এই পরগণার নামকরণ হইয়াছে ইহা এক প্রকার নিশ্চিত। কিন্তু এই সুলতান কে তাহা সঠিক জানিবার কোন উপায় নাই। বাঙ্গালার স্বাধীন পাঠান নৃপতিগণ সকলেই সুলতান উপাধি ধারণ করিতেন। হইতে পারে, ইহাদিগের কাহারও সময়ে সুলতানাবাদ সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আমরা সুলতানাবাদকে এত প্রাচীন বলিয়া মনে করি না; এই পরগণা যে পাঠানযুগের বহু পরে, সম্রাট আকবরেরও পরবর্ত্তীকালে গঠিত হইয়াছে এরূপ বিবেচনা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। আকবরের রাজত্বকালে বাখরগঞ্জের তদানীন্তন মহালগুলি সরকার ফতিয়াবাদ এবং সরকার বাকলার অন্তর্গত ছিল। আবুল ফজেলের গ্রন্থে ফতিয়াবাদ এবং বাকলার অন্তর্গত মহাল সমূহের যে তালিকা আছে তাহাতে সুলতানাবাদের কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ সম্রাট আকবরের রাজত্বকালেও মুসলমান সাম্রাজ্য বর্ত্তমান বাউফল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় নাই। অতএব সুলতানাবাদ আকবরের পরেই গঠিত হইয়াছে ইহা মনে করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

আকবরের পরবর্ত্তী বঙ্গের সুবেদারগণের মধ্যে সম্রাট সাহজাহানের মধ্যম পুত্র সুজা সুলতান উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। সুলতান সুজা আরাকানবাসী দস্যুগণের দমনার্থ নিম্নবঙ্গে আগমন করিয়া বাখরগঞ্জের বহুস্থলের অরণ্য পরিষ্কার করিয়া লোকালয় স্থাপন এবং দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই শাসনকালে মোগল সম্রাজ্য মোরাদখানা অর্থাৎ বর্ত্তমান পটুয়াখালী বিভাগের উত্তরভাগে অবস্থিত মুরাদিয়া এবং তৎ সন্নিহিত প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করে। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস মুরাদিয়ার অনতিদূরবর্ত্তী সুলতানাবাদও এই সময়ে সৃষ্ট হয় এবং সুলতান সুজা হইতেই ইহার নামকরণ হইয়াছে।

সুলতানাবাদের জমীদারগণ সকলেই মুসলমান। ঢাকার নবাব বাহাদুর এই পরগণার সর্ব্ব প্রধান অংশীদার। অপর অংশ সৈয়দ আবদুল্লা চৌধুরী,

মেহেরন্নেসা খানম্, আসানমির এবং তোজম্মল আলি প্রভৃতির বংশধরগণ ভোগ করিতেছেন।

১৮। কাশিমনগর জোয়ার দাসপাড়া।

কাশিমনগর জোয়ার দাসপাড়া পটুয়াখালী বিভাগের অন্তঃপাতী বাউফল থানায় অবস্থিত। বাউফল পুলিশ ষ্টেশনের অনতিদূরবর্ত্তী "দাসপাড়া" নামক গ্রাম লইয়াই এই "জোয়ার" অর্থাৎ ক্ষুদ্র পরগণা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহাত্মা বেভারিজের সময়ে হামিদোন্নেছা খাতুন এই স্থলের সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী ছিলেন।

১৯। খাঞ্জা বাহাদুরনগর।

এই ক্ষুদ্র পরগণাও বাউফল থানার অন্তর্গত। ইহা কোন সময়ে কাহার কর্ত্তৃক স্থাপিত হয় তাহা জানা যায় না। কেহ কেহ বলেন বিখ্যাত খাঞ্জে আলি ইহার প্রতিষ্ঠাতা এবং তাহার নামানুসারেই এই স্থলের নাম-করণ হইয়াছে; কিন্তু এই কথা কতদূর সত্য তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। একমাত্র নামের সাহায্য ব্যতীত এ বিষয়ে অন্য কোনও প্রমাণ বর্ত্তমান নাই। মৌলবী মহম্মদ ফজেল মহাত্মা বেভারিজের সময়ে এই পরগণার প্রধান অংশীদার ছিলেন।

২০। শ্রীরামপুর।

বাকলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর অতি প্রাচীন পরগণা। মহানদী মেঘনার তরঙ্গাভিঘাতে ইহার বহুস্থল অতল জলে নিমজ্জিত হইয়াছে। যতটুকু অবশিষ্ট আছে তাহা বাখরগঞ্জের উত্তর প্রান্তস্থিত মেহেন্দীগঞ্জ থানার অন্তর্গত।

দিল্লীশ্বর আকবর বাদসাহের রাজত্বকালে শ্রীরামপুর সরকার বাকলার একটি প্রসিদ্ধ মহাল বলিয়া পরিগণিত হইত। এই পরগণার নাম দৃষ্টে সহজেই অনুমান হয় যে ইহার আদিম জমীদারগণ হিন্দু ছিলেন, পরিশেষে ইহা মুসলমান ভূম্যধিকারিগণের করায়ত্ত হয়। এই ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে বোসানউল্লা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৭৫৯ খৃঃ অব্দে সুবিশাল দক্ষিণ সাহাবাজপুর দ্বীপ ইহার বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তির অন্তর্গত ছিল। কিন্তু মহানদী মেঘনার ভীষণ আক্রমণে শ্রীরামপুরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে।* সুতরাং এই প্রাচীন পরগণার অতীত গৌরবের চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান নাই।

বর্ত্তমান সময়ে ঢাকার মির্জ্জা সাহেবগণ এই পরগণার প্রধান ভূম্যধিকারী। মির্জ্জা সাহেবগণ দক্ষিণ সাহাবাজপুরের ভূতপূর্ব্ব জমীদার মির্জ্জা আহম্মাদ জানের বংশধর।

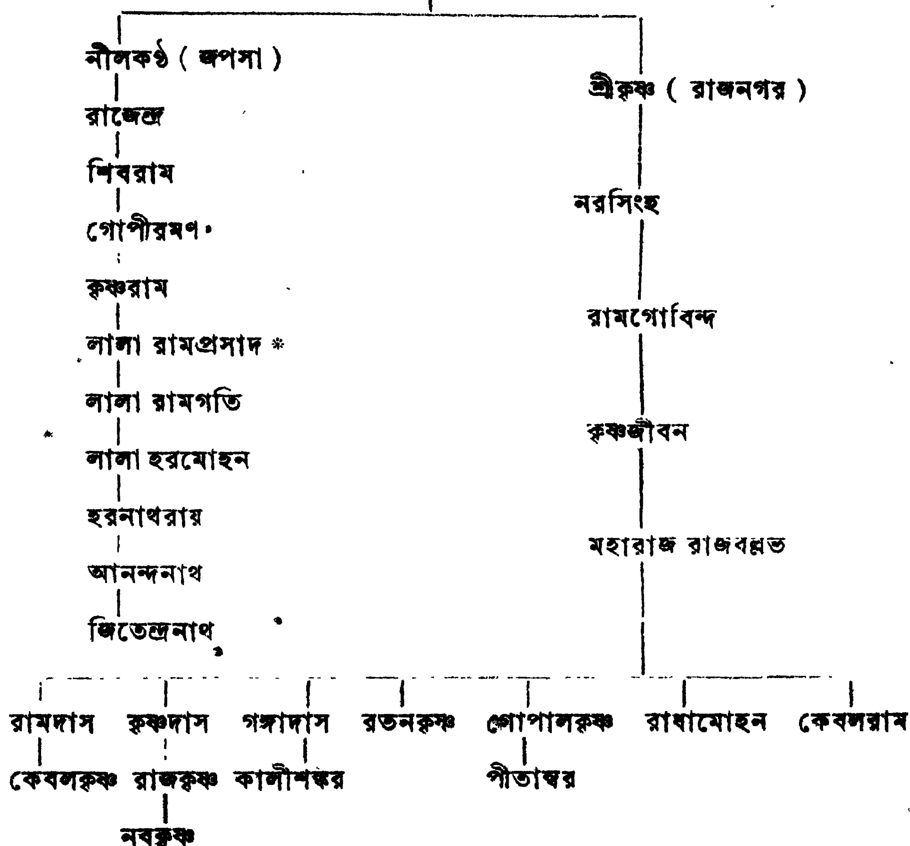
২১। তপ্পে আবদুল্লাপুর।

এই পরগণা পূর্ব্বে সুবিশাল সেলিমাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল; সেলিমাবাদের সার্দ্ধ চারি আনি অংশ লইয়াই এই পরগণার সৃষ্টি হয়। ফরিদপুরের অন্তঃপাতী জপসা গ্রামের প্রসিদ্ধ বৈদ্য জমীদারগণ ইহার অদ্বিতীয় অধীশ্বর ছিলেন। এই জমীদারগণ বাখরগঞ্জবাসী না হইলেও এতদ্দেশের সহিত ইহাদিগের বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। অতএব এস্থলে ইহাদিগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বোধ হয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ধন্বন্তরিকুলোদ্ভব মহাত্মা গোপীরমণ সেন এই জমীদার বংশের স্থাপয়িতা। ইহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ বেদগর্ভ সেন বিদ্যাধ্যয়ন জন্য যশোহর জিলান্তর্গত ইতনা হইতে বিক্রমপুরে আগমন করিয়া সুপ্রসিদ্ধ রাজনগর গ্রামে গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বেদগর্ভের দুই পুত্র, নীলকণ্ঠ ও শ্রীকৃষ্ণ। এই শ্রীকৃষ্ণের বংশেই বৈদ্যকুল-প্রদীপ মহারাজ রাজবল্লভ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গোপীরমণ শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ নীলকণ্ঠের প্রপৌত্র। গোপীরমণের বংশধরগণের যশঃ সৌরভে এক সময়ে সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ আমোদিত হইত। আমরা নিম্নে ইহাদিগের সংক্ষিপ্ত বংশতালিকা প্রদান করিলাম।

---

* Pargana Srirampur which was one of the four original Parganas of sarkar Bakla, has been nearly all washed away by the Meghna, and the Zemindars of it have long since disappeared. H. Beveridge's History of Bakarganj. P. 61.



গোপীরমণের পুত্র কৃষ্ণরাম এবং রামমোহন যথাক্রমে "দেওয়ান" এবং "ক্রোড়ী" উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। কৃষ্ণরাম দেওয়ানের পুত্র রামপ্রসাদ বহু কুলক্রিয়া এবং অন্যান্য সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বজাতি-সমাজে অশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। জপসার জমীদারবংশে তিনিই সর্ব্বপ্রথম গৌরবাত্মক "লালা" উপাধি প্রাপ্ত হন। লালা রামপ্রসাদের পাঁচ পুত্র, তন্মধ্যে মহাত্মা রামগতি রায় নানাগুণে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ, উদার, ধার্ম্মিক এবং বিদ্যানুরাগী তৎকালে অধিক দৃষ্টিগোচর হইত না। "মায়াতিমিরচন্দ্রিকা" এবং "যোগকল্পলতিকা"

* লালা রামপ্রসাদের পাঁচ পুত্র; লালা রামগতি, লালা জয়নারায়ণ, লালা কীর্ত্তিনারায়ণ, লালা রাজনারায়ণ ও লালা নরনারায়ণ।

নামক গ্রন্থদ্বয় তাঁহার অসামান্য বিদ্যানুরাগের আংশিক পরিচায়ক মাত্র। নব্বই বৎসর বয়ঃক্রমে উক্ত মহাপুরুষ কাশীধামে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। রামগতির বিদুষী কন্যা আনন্দময়ী এবং মধ্যম সহোদর জয়নারায়ণের কবিত্ব শক্তিও অসামান্য ছিল। তাঁহারা "হরিলীলা" এবং "চণ্ডীকাব্য" নামক গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। তাঁহাদিগের প্রতিভাবলে জপসা একটি সারস্বতকুঞ্জে পরিণত হইয়াছিল। তখন এই ক্ষুদ্র পল্লী, বিক্রমপুর অঞ্চলে সর্ব্বপ্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত এবং সমাদৃত হইত।

ব্রহ্মপুত্র মহাতীর্থ পূর্ব্বেতে প্রচার
পশ্চিমেতে পদ্মাবতী বিদিত সংসার।
মধ্যেতে বিক্রমপুর রাজ্য মনোহর
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত তাহে সদ্‌জ্ঞানী বিস্তর।
বিশিষ্ট অম্বষ্ঠশ্রেণী বসতির স্থান
জপসা নামেতে গ্রাম তথায় প্রধান।*

রামগতি রায়ের তিরোধানের পর হইতেই জপসার ভাগ্যাকাশ নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন হইল।

২২। তপ্পে কাদিরাবাদ।

এই ক্ষুদ্র পরগণা মেহেন্দীগঞ্জ থানার অন্তর্গত। "তপ্পে" এই শব্দ দৃষ্টে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে এই স্থল নিকটবর্ত্তী কোন বৃহৎ পরগণা হইতে গঠিত হইয়াছে।† ঐতিহাসিকগণ বলেন সেলিমাবাদ এবং তদুপকণ্ঠস্থিত পরগণা গুলি ব্যতীত বাখরগঞ্জস্থিত অন্যান্য যাবতীয় পরগণা চন্দ্রদ্বীপ হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে।‡ অতএব মনে হয় কাদিরাবাদও চন্দ্রদ্বীপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র পরগণায় পরিণত হইয়াছে।

এই ক্ষুদ্র পরগণা প্রথমে মুসলমান জমীদারগণের অধীন ছিল বলিয়াই বোধ হয়। বর্ত্তমানকালে ঢাকা জিলার অন্তর্গত কৌলিপাড়ার ব্রাহ্মণবংশীয় ভূম্যধিকারিগণ ইহার একমাত্র স্বত্বাধিকারী।

---

* রাজা রামগতি রায়কৃত "মায়াতিমিরচন্দ্রিকা" হইতে উদ্ধৃত।

† It is generally understood that the word *toppe* prefixed to the name of a tract of country implies that it has been formed out of part of a pargana. —H. Beveridge's History of Bakarganj P. 65.

‡ Chandradwip included the whole of the modern Zilla of Bakarganj with the exception of Mahal Selimabad.—Dr. James Wise's *Eastern Bengal*.

২৩। তপ্পে আজিমপুর

এই পরগণা চন্দ্রদ্বীপ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু কোন সময়ে কাহার কর্ত্তৃক পৃথকীভূত হয় তাহা নিরূপণ করা সহজ নহে। ঢাকার মোগল রাজপ্রতিনিধিগণের মধ্যে আজিম নামধারী তিন জনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রথম আজিম ১৬৩৩ খৃঃ অঃ হইতে ১৬৩৭ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত সুবেদারপদে নিযুক্ত ছিলেন। ইহার শাসন সময়ে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই দৃষ্ট হয় না, পরন্তু ইহার আলস্য এবং কর্ত্তব্য কার্য্যে ঔদাসীন্য দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাট সাহজাহান শীঘ্রই ইহাকে পদচ্যুত করেন। দ্বিতীয় আজিম স্বয়ং সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মধ্যমপুত্র, ইনি ১৬৭৮ খৃঃ অব্দে সুবেদার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহার কিয়ৎকাল পরেই রাজস্থানে পিতৃশিবিরে গমন করেন। তৃতীয় আজিম সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পৌত্র প্রসিদ্ধ নবাব আজিম ওসান। আজিম ওসান ১৬৯৬ খৃঃ অব্দে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং পাঠান বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে দমন করিয়া দীর্ঘকাল কৃতিত্বের সহিত বঙ্গদেশ শাসন করেন। ইহার শাসন সময়ে দেওয়ান জাফর খাঁ (মুর্শিদকুলি) বাঙ্গালার রাজস্ব এবং জমা-জমীর অভিনব বন্দোবস্ত আরম্ভ করেন এবং ইহারই নামানুসারে হুগলীর বাজার এবং পাটনা নগরের পূর্ব্বনাম পরিবর্ত্তিত হইয়া যথাক্রমে "আজিমগঞ্জ" এবং "আজিমাবাদ" বলিয়া খ্যাতি লাভ করে। তপ্পে আজিমপুরও এই সময়ে সৃষ্ট হয় এবং জাফর খাঁর বন্দোবস্তের ফলেই চন্দ্রদ্বীপ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। বর্ত্তমানে এই পরগণার অবস্থিতি নির্ণয় করা বড় দুরূহ, কারণ ইহার ভূমি অতিশয় বিক্ষিপ্ত। বাখরগঞ্জ হইতে বরিশাল, গৌরনদী এমন কি সুদূর বিক্রমপুর পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃতি। গৌরনদী থানার অন্তর্গত পিপড়াকাঠী গ্রামের সমদ্দারগণ এই পরগণার সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী ছিলেন। এই সমদ্দারগণ ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত, ইঁহারা বহুকাল অতীব সম্মানের সহিত এই ভূ-সম্পত্তি ভোগ করিতেছিলেন কিন্তু ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে ইঁহাদিগের সম্পত্তির অধিকাংশ এখন পরহস্তগত। বর্ত্তমানে চরামদ্দি নিবাসী আছমাতালি খাঁ চৌধুরী সাহেব এবং লাকুটীয়ার প্রসিদ্ধ রায় বংশই ইহার প্রধান অংশীদার; জাহাপুরের দত্তগণও কতক অংশের মালিক।

২৪। জাহাপুর।

মেহেন্দীগঞ্জ থানার অন্তর্গত জাহাপুর একটী সুপ্রাচীন পরগণা। এই স্থল মহানদী আড়িয়ালখাঁর শাখা ডাকাতিয়া নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। ইহার সরকারি রাজস্ব ৮৯৬৸৵৯ মাত্র।

জাহাপুর গ্রামের দত্তগণ এই পরগণার ভূম্যধিকারী। ইঁহারা অতি প্রাচীন কাল অবধিই বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত এই জমীদারী শাসন-সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু বাকলার অন্যান্য বহু প্রাচীন জমীদার বংশের ন্যায় ইঁহাদিগেরও সৌভাগ্য-সূর্য্য বহুদিন অস্তমিত হইয়াছে। সর্ব্বগ্রাসী আড়িয়ালখাঁ দত্তগণের কালস্বরূপ উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের সম্পত্তির অধিকাংশ স্বীয় বিশাল উদরে প্রেরণ পূর্ব্বক 'ডাকাতিয়া' নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। বর্ত্তমানে দত্তগণের কীর্ত্তি, দিঘীতি সকলই ডাকাতিয়া নদীর কুক্ষিতে অবস্থান করিতেছে।

২৫। ইদ্রাকপুর।

পরগণে ইদ্রাকপুর বাখরগঞ্জ জিলার উত্তর প্রান্তে গৌরনদী এবং মেহেন্দীগঞ্জ থানায় অবস্থিত। মহানদী আড়িয়ালখাঁ ইহার মধ্যস্থল বিদীর্ণ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই পরগণার কতকগুলি জমি এজমালী, ইহাদিগের রাজস্বের অর্দ্ধভাগ ইদ্রাকপুরে এবং অপরভাগ রসুলপুরে প্রদত্ত হয়।

১৭৮৪ খৃঃ অব্দে ইমামউদ্দিন চৌধুরী নামক এক ব্যক্তি এই পরগণা ক্রয় করিয়াছিলেন। এই ইমামউদ্দিনের কোনই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহার কৃত কার্য্যাবলীও বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে।

ঢাকা নগরীর খাতুনবংশীয় আমিরন্নেছা, আবেদন্নেছা এবং করিমন্নেছাই ঐতিহাসিকপ্রবর বেভারিজের সময়ে এই পরগণার সর্ব্বপ্রধান অংশীদার ছিলেন। নলচিড়ার নিকটবর্ত্তী সরিকল এবং গচুয়া নামক গ্রামদ্বয়ে ইহাদিগের কাছারী সংস্থাপিত। লোহজঙ্গের প্রসিদ্ধ কুণ্ডগণ এই পরগণার তিন আনা অংশ ক্রয় করিয়াছেন। কার্ত্তিকপুরের নাজিমউদ্দিন চৌধুরী সাহেবও ইহার কতক অংশের স্বত্বাধিকারী।

২৬। রসুলপুর।

রসুলপুর বাকলার একটী অতি প্রাচীন পরগণা। এই পরগণা বঙ্গদেশে মোগলসাম্রাজ্য স্থাপিত হইবার বহু পূর্ব্বে গঠিত হইয়াছে। সম্রাট আকবর সাহের রাজত্বকালে ইহা সরকার ফতিয়াবাদের অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ মহাল বলিয়া পরিগণিত হইত। তৎকালে ইহার রাজস্ব ১০৩৭৬৭ ডাম অর্থাৎ প্রায় ২৫৯৪ টাকা ছিল। বর্ত্তমানে এই পরগণার অন্তর্গত কোন জমীদারীই বাখরগঞ্জে অবস্থিত নহে।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অংশীদারগণের বেবন্দোবস্তে এই জমীদারীর অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়াছিল। তখন গবর্ণমেণ্ট জৈনউদ্দিন নামক একজন অংশীদারকে সমগ্র সম্পত্তির অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন। জৈনউদ্দিন যেমন শান্তিপ্রিয় তদ্রূপ বিচক্ষণ ছিলেন। পূর্ব্ব বন্দোবস্তের দোষে জমীদারীমধ্যে যে সমস্ত বিশৃঙ্খলা ছিল, তিনি তৎ সমুদয় নিরাকৃত করিয়া তদানীন্তন কলেক্টর ডগলাস সাহেবের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন

২৭। বাঙ্গরোড়া।

গৌরনদী থানার অন্তঃপাতী বাঙ্গরোঁড়া অতীব প্রাচীন এবং বিখ্যাত পরগণা। এই পরগণায় গৈলা-ফুল্লশ্রী, শোলোক, বাটাজোড়, মাহিলাড়া প্রভৃতি বহু সমৃদ্ধিশালী গ্রাম বিদ্যমান। বাদসাহী শাসনে ইহা ফতিয়াবাদের অন্তর্গত ছিল :—

রাজার পালনে প্রজা সুখে ভুঞ্জে নিত্ত
মুল্লুক ফতিয়াবাদ বাঙ্গরোড়া তক্‌সিম।

বাঙ্গরোড়া শব্দ সেলিমাবাদ, ইদিলপুর প্রভৃতির ন্যায় যাবনিক নহে, পরন্তু বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের ন্যায় সংস্কৃতমূলক। কথিত আছে বখ্‌তিয়ার খিলিজিকর্ত্তৃক নবদ্বীপ বিজয়ের পর তরুণ, অরুণ, হরি, বিজয়, অশোক প্রভৃতি সেনবংশীয় রাজন্যগণ পূতিতুণ্ডকুলশেখর পণ্ডিত গোবর্দ্ধনাচার্য্য সমভিব্যাহারে এই স্থানে আগমন করিয়া কথঞ্চিত সম্মান ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই বঙ্গাধিপগণের আশ্রয়স্থান বলিয়াই ইহা বাঙ্গরোড়া (বাঙ্গ + আরূঢ়) নামে খ্যাত হয়।

তরুণ, অরুণ প্রভৃতি রাজপুত্রগণের শৌর্য্য বীর্য্য এবং কীর্ত্তি সকলই সময়স্রোতের ভীষণ ঘূর্ণীপাকে অনন্তে মিশিয়া গিয়াছে। কেবল তাহাদিগের স্বনামাভিহিত জনপদ এবং সরোবরগুলি হিন্দুস্বাধীনতার যুগের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়া দর্শকগণের নয়নতৃপ্তি সম্পাদন করিতেছে। গৈলা-ফুল্লশ্রীর অনতিদূরে ফটকস্থল নামক একটী গ্রাম দৃষ্ট হয়। স্থানীয় প্রবাদ যে এই স্থানেই রাজপুত্রগণের সেনানিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল।

পূতিতুণ্ডকুলশেখর মহাত্মা গোবর্দ্ধনাচার্য্য যে স্থানে বাসভূমি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন সেই স্থান অদ্যাপি গোবর্দ্ধন বলিয়া খ্যাত। ইহাঁর বংশধরগণ এখন বামরাইল, শোলোক, নলচিড়া প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন। প্রতিভাসম্পন্ন কুলীন পূতিতুণ্ড বাকলা ভিন্ন অন্যত্র দেখা যায় না। এই নিমিত্ত হুগলী নিবাসী লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় "সম্বন্ধ-নির্ণয়" গ্রন্থে পূতিতুণ্ডের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারেন নাই।

সেনরাজন্যগণের শেষ আশ্রয়স্থল বাঙ্গরোড়া চন্দ্রদ্বীপের ন্যায় বহুকাল স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই এই স্থল পাঠানসাম্রাজ্যের কুক্ষিগত হইল। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে বর্ত্তমান লস্করপাড় এবং সিহিপাশা নামক গ্রামদ্বয়ে মুসলমান লস্কর এবং সিপাহিগণের স্কন্ধাবার সংস্থাপিত হইয়াছিল। গৈলার মধ্যেই মুসলমান রাজপুরুষগণের গোলাবারুদ-খানা ছিল বলিয়া তাঁহার নাম 'গোলারপাড়'।

রাজনীতিক্ষেত্রে চন্দ্রদ্বীপের ন্যায় অতুল কীর্ত্তি স্থাপনে অসমর্থ হইলেও বাঙ্গরোড়া অতি প্রাচীন কালেই বিদ্যাচর্চ্চার একটী প্রধান স্থল বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এইস্থানেই কবীন্দ্র ত্রিলোচন দাশ গুপ্ত এবং সাধকপ্রবর বিজয়গুপ্ত আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও এই পরগণায় বহু প্রতিভাবান্ মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া অস্মদ্দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

সাধকপ্রবর মহাত্মা বিজয় গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত ভগবতী মনসাদেবীর মন্দির এই পরগণার অন্তর্গত ফুল্লশ্রী গ্রামে অবস্থিত। মন্দিরের নিকটে পদ্মপুষ্পে সুশোভিত মনসাকুণ্ড নামক একটী সরোবর বর্ত্তমান, পূর্ব্বকালে মনসা পঞ্চমী তিথিতে এই সরোবরতীরে লোকারণ্য হইত। নানা দিগ্দেশ হইতে

অসংখ্য নরনারী এইস্থানে আগমন করিয়া ভক্তিভরে বিষহরির অর্চ্চনা করিত। এমন কি অনেক মুসলমান-সন্তানও রোগ-মুক্তি অথবা অন্য কোন প্রকার শ্রীবৃদ্ধি-কামনায় দেবীকে দুগ্ধ, ফল, পুষ্প প্রভৃতি প্রদান করিত। তৎকালে ফুল্লশ্রীই শ্রীশ্রীমনসা পূজার লীলা-নিকেতন ছিল। মনসা-কল্পিত স্থান বলিয়া ফুল্লশ্রীর অপর নাম মানসী। কথিত আছে শিবের কাশী, কৃষ্ণের বৃন্দাবনের ন্যায় মানসীও মনসার প্রিয় স্থান— ।

শিবস্য চ যথা কাশী, বিষ্ণোর্বৃন্দাবনং যথা।
মানসী মনসা দেব্যা স্ত্রীপুর্য্যা স্ত্রিপুরংতথা॥

মনসা দেবীর ঘট সম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা প্রথমে এই ঘট নির্ম্মাণ করেন। স্বয়ং মহাদেব ব্রাহ্মণ-বেশ ধারণপূর্ব্বক এই ঘট মর্ত্ত্যে আনয়ন করিয়াছিলেন। লাটিক নামক একজন চণ্ডাল সর্ব্বপ্রথমে উহা প্রাপ্ত হয়। লাটিকের বংশধরগণ অদ্যাপি বিষহরির সন্তান বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কালক্রমে ঐ ঘট মনসাকুণ্ডে অন্তর্হিত হয়। কিয়ৎকাল অতীত হইলে পূতিতুণ্ড-কুলশেখর মহাত্মা গোবর্দ্ধনাচার্য্য ঐখানে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে সাধকপ্রবর বিজয় গুপ্ত আবির্ভূত হন। বিজয়ের তিরোধানের পর ঐ ঘট পুনরায় অন্তর্হিত হয়। বিজয় গুপ্তের প্রায় দুই শত বৎসর পরে ভবদাশ-বংশোদ্ভব রায় কাশীনাথ দাশ মজুমদারের পুত্র কৃষ্ণকিঙ্কর দাশ মহাশয় দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হইলে ডিংসাইবংশোদ্ভব কালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী কুণ্ডে অবতরণ পূর্ব্বক ঘট উত্তোলন করেন। কৃষ্ণকিঙ্কর ঐ ঘট স্থাপন এবং অর্চ্চনাদ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন। তদবধি ঐ ঘট অর্চ্চিত হইয়া আসিতেছে। কথিত আছে—

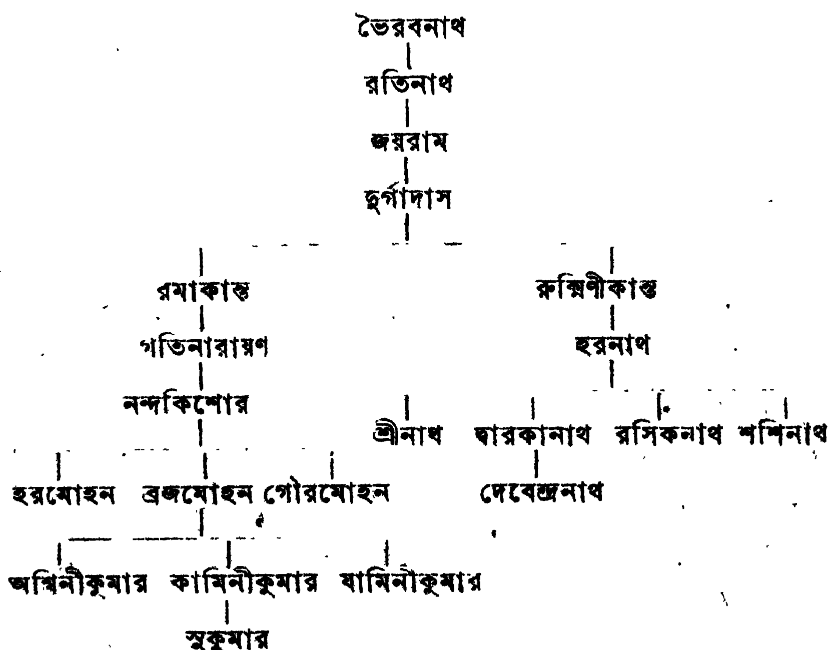
"ফুল্লশ্রী নগরে রম্যে কলৌ জাগর্ত্তি পন্নগী।"

ফুল্লশ্রীর প্রান্ত বিধৌত করিয়া ঘাঘর এবং ঘণ্টেশ্বর নামক মহানদদ্বয় প্রবাহিত ছিল। প্রবাদ যে চন্দ্রপতি সওদাগর প্রভৃতি বণিকগণ এই নদীপথে বাণিজ্যে গমন করিত। গমন কালে তাহারা যে স্থানে পূজা [illegible] তাহা অদ্যাপি জাহাজঘাটা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। নৈসর্গিক কারণে এই মহানদদ্বয়ের অস্তিত্ব এখন বিলুপ্ত প্রায়। নদগর্ভে বহুযোজনবিস্তীর্ণ বিলের উদ্ভব হইয়াছে।

লক্ষ্মণকাঠীর প্রসিদ্ধ মহাবিষ্ণুমূর্ত্তি এই পরগণার অন্তর্গত আটকগ্রামে পুষ্করিণী খনন কালে আবিষ্কৃত হইয়াছে।* এই মহাবিষ্ণু চারিহস্ত পরিমিত, গরুড়বাহন, চতুর্ভুজ পাষাণময় মূর্ত্তি। উহার এক হস্তে কমলে-কামিনী, দ্বিতীয় হস্তে চতুর্ভুজ চক্রধর, তৃতীয় হস্তে চতুর্ভুজ গদাধর এবং চতুর্থ হস্তে চতুর্ভুজ শাঙ্গ‍র্ধর, কিরীটোপরি যোগাসনারূঢ় চতুর্ভুজ মূর্ত্তি। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে দুরাত্মা কালাপাহাড়ের ভয়ে এই মূর্ত্তি আটকের চৌধুরিগণ কর্ত্তৃক দীর্ঘিকাগর্ভে লুক্কায়িত হইয়াছিল।

বাঙ্গরোড়ার তালুকদারগণের সংখ্যা অনেক হইবে। হয়তস্নেছা খাতুন নামক এক ব্যক্তি ঐতিহাসিকপ্রবর বেভারিজের সময়ে এই পরগণার জমীদার ছিলেন। বর্ত্তমান ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে বাটাজোড়ের দত্তবংশ, শোলোকের মজুমদার, গৈলার দাশবংশ ও বার্থীর বকসিগণই প্রধান।

বাটাজোড়ের দত্ত বংশ।



* ১২৯৪ সালে ১৭ই চৈত্র মঙ্গলবার এই মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়।

বাটাজোড়ের দত্তগণ এই পরগণার পুরাতন ও প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী। ইহারা পুরুষোত্তম দত্তের সন্তান। কথিত আছে যে মহারাজ আদিশূর দত্তবংশীয়দিগকে বাসস্থান স্থাপন জন্য বাটাজোড় গ্রাম অর্পণ করেন। পুরুষোত্তম দত্তের অব্যবহিত পরবর্ত্তী বংশধরগণের বিশেষ কোনও ঐতিহাসিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তবে ইহা নিশ্চিত যে তাহার বংশসম্ভূত। দত্তগণ মুসলমান রাজত্বের সময় হইতেই বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া মজুমদার আখ্যা প্রাপ্ত হন।

সুপ্রসিদ্ধ ভৈরবনাথ দত্ত প্রথমে বাটাজোড় গ্রামে বাসস্থান স্থাপন করিয়া সপরিবারে বাস করিতে আরম্ভ করেন। স্বনামখ্যাত ব্রজমোহন দত্ত তাঁহার সপ্তম পুরুষ অধস্তন। ব্রজমোহন ১৮২৫ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে তিনি স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাগুণে বরিশালে মুন্সেফী পদ প্রাপ্ত হন। তৎপূর্ব্বে এই জিলার কোন হিন্দুসন্তান বিচারকের পদে নিযুক্ত হন নাই। তাঁহারই ঐকান্তিক যত্নে পটুয়াখালীতে সবডিভিসন স্থাপিত হয়। তিনি একসঙ্গে মুন্সেফ ও ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট-ডেপুটিকলেক্টরের কার্য্য করিতেন। তৎপরে কিছুদিন তিনি কৃষ্ণনগরে জজের পদে নিযুক্ত ছিলেন। সুদীর্ঘ পয়ত্রিশ বৎসর কাল গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিয়া ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চমাসে ৬০ বৎসর বয়সে তিনি অবসর গ্রহণ করেন; এবং জুন মাসে বরিশাল সহরে একটী এণ্ট্রান্স স্কুল স্থাপন করেন। এই স্কুল তাঁহার সুযোগ্য পুত্র স্বনামপ্রসিদ্ধ অশ্বিনীকুমার কর্ত্তৃক "ব্রজমোহন ইনিষ্টিটিউসন" নামে উচ্চ কলেজে পরিবর্ত্তিত হওয়ায় অনেক দরিদ্র ভদ্রসন্তানের শিক্ষার পথ সুগম হইয়াছে।

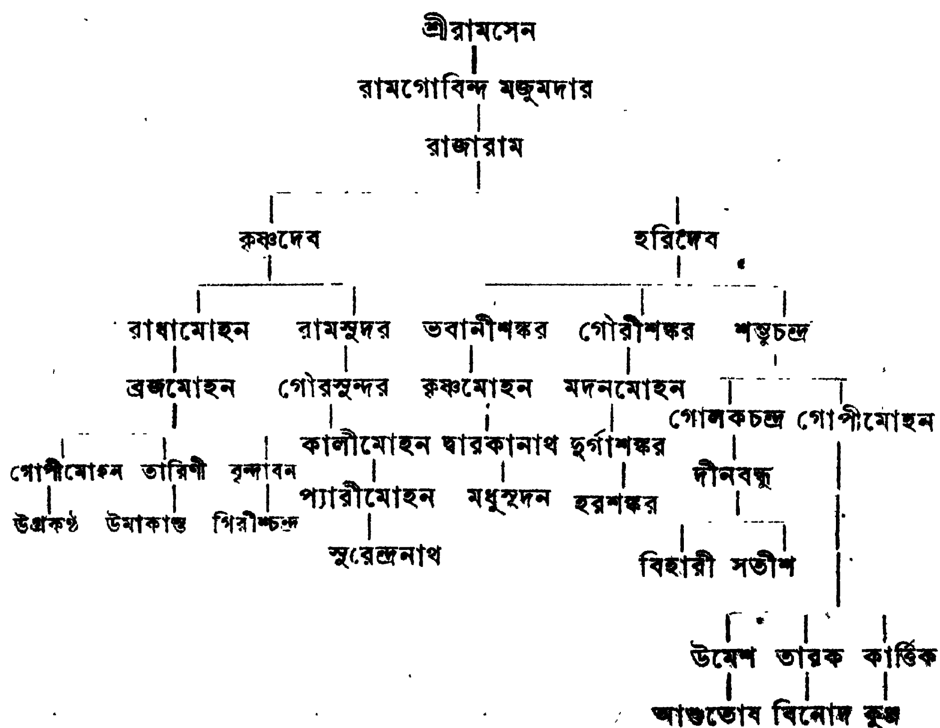
ব্রজমোহন স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এই জন্যে তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করিতেন। তাঁহার প্রযত্নে বাটাজোড় গ্রামেও একটী এণ্ট্রান্স স্কুল স্থাপিত হয়। যশোহরের লোন অফিস ও বারলাইব্রেরী তাঁহার কর্ত্তৃকই স্থাপিত হয়। ব্রজমোহন একষষ্ঠি বৎসর বয়সে স্ত্রী, তিন পুত্র এবং দুই কন্যা রাখিয়া পরলোকে গমন করেন।

সুপ্রসিদ্ধ অশ্বিনীকুমার ব্রজমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র; ইঁহার আত্মত্যাগ ধর্ম্মনিষ্ঠা, স্বদেশহিতৈষিতা, তেজস্বিতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতি সদ্গুণাবলী বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র পরিচিত। ইঁহার কর্ম্মবহুল জীবনের বিস্তৃত বিবরণ

পরে বিবৃত হইবে। মধ্যম কামিনীকুমার ইংরাজী, বাঙ্গালা ও পার্শি ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

দুর্গাদাসের পৌত্র হরনাথ দত্তও একজন প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন, তিনি গ্রামের বিবাদ মীমাংসা করিয়া শান্তি সংস্থাপন করিতেন। হরনাথের পুত্র দ্বারকানাথ একজন প্রতিপত্তিশালী উকিল ছিলেন। তিনি বরিশালের মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান এবং ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁহার প্রযত্নে জগদ্ধাত্রী পূজোপলক্ষে বাটাজোড় গ্রামে একটী মেলা সংস্থাপিত হইয়াছিল।

শোলোকের মজুমদার বংশ।



শোলোক একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম; কিম্বদন্তী এই যে পুরাকালে এখানে বহুতর পণ্ডিতের বাসহেতু সংস্কৃতকাব্যের অনুশীলন হইত বলিয়া গ্রামের নাম "শোলোক" (শ্লোক) হইয়াছে। এখানকার বৈদ্য-মজুমদারবংশ চিরপ্রসিদ্ধ ও সম্মানিত। এই জিলার অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পুরুষানুক্রমে ইঁহাদের প্রদত্ত বৃত্তি-ব্রহ্মোত্তর দ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

কথিত আছে ইঁহাদের আদিপুরুষ শ্রীরামসেন রাঢ়দেশ হইতে এই জিলায় আগমন করেন, তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের অধীনে সৈনিক বিভাগে কার্য্য করিতেন। তখন মহারাষ্ট্রীয় দস্যুগণ পুনঃপুনঃ বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়া নীরিহ গ্রামবাসীদিগকে নিষ্ঠুরভাবে প্রপীড়িত করিয়া যাবতীয় ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন পূর্ব্বক লইয়া যাইত।

শ্রীরামসেন সুবিখ্যাত তীরন্দাজ ছিলেন, কোন এক যুদ্ধে বর্গীরা শ্রীরামসেন কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করে; সেই কারণে নবাব তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া পুরস্কার দিতে চাহেন, তখন শ্রীরাম অবসর বুঝিয়া ভূমি প্রার্থনা করেন। নবাব বাহাদুর প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া সনন্দ প্রদান পূর্ব্বক তদানীন্তন ঢাকার শাসনকর্ত্তার উপর সুন্দরবন হইতে উপযুক্ত ভূমি প্রদান করিবার জন্য পরোয়ানা দেন। নবাবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ঢাকার শাসনকর্ত্তা শ্রীরামকে বাখরগঞ্জের দক্ষিণে সুন্দরবন আবাদ করিয়া ভূমি গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন। তদনুসারে শ্রীরাম সেন আপন পরিবার ও কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীকৃষ্ণ সেনকে সঙ্গে লইয়া রাঢ়দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বরিশালের নদীর পূর্ব্বে বুহৈনগর নামক গ্রামে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। শ্রীরাম, সহোদর শ্রীকৃষ্ণকে রত্নদীর (আধুনিক গলাচিপা) চারি আনি অংশ ছাড়িয়া দিবার জন্য একমাত্র পুত্র রামগোবিন্দ সেনকে আদেশ করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। বুহৈনগরের জলবায়ু স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হওয়ায় রামগোবিন্দ খুল্লতাত শ্রীকৃষ্ণকে চন্দ্রহার গ্রামে স্থাপন করিয়া নিজে হোসনপুর নামক গ্রামে সপরিবারে বাস করেন। উক্ত রামগোবিন্দই নবাব সরকার হইতে "মজুমদার" উপাধি প্রাপ্ত হন। শ্রীকৃষ্ণের বংশধর এখন চন্দ্রহারে বিদ্যমান আছেন।

এই সময়ে শোলোকে 'মলুয়ারাজা' বলিয়া এক ব্যক্তি ঢাকার শাসনকর্ত্তার তহশীলদার ছিলেন। তিনি এখানে 'মলুয়ার দীঘী' নামক এক প্রকাণ্ড জলাশয় খনন করেন, আজিও তাহা অব্যবহার্য্য অবস্থায় বর্ত্তমান আছে। মলুয়ারাজ মাধবরামই হোসনপুর হইতে রামগোবিন্দ মজুমদারকে শোলোক আনয়ন করেন।

রামগোবিন্দের পুত্র রাজারাম সেন মজুমদার স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন,

তাঁহার কীর্ত্তিগাথা আজও এই জিলার বহুস্থানে বর্ত্তমান আছে। তিনি স্বীয় গুরুদেব ও কতিপয় অনুচর সঙ্গে লইয়া পিতৃসম্পত্তি সুন্দরবনে উপস্থিত হন। গুরুদেব সুন্দরবন আবাদের পূর্ব্বে দেবীর অর্চ্চনা করতঃ একটী যজ্ঞ করেন এবং সেই যজ্ঞকাষ্ঠ দ্বারাই অরণ্যে অগ্নি প্রদান করেন। দেখিতে দেখিতে প্রচণ্ড অনল হুহু শব্দে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হিংস্রজন্তুসমাকুল নিবির অরণ্য ভস্মসাৎ করিল, অনায়াসে আবাদের কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। অবশেষে রাজারাম বহুঅর্থ ব্যয় করিয়া নানা দিগ্দেশ হইতে বিভিন্ন জাতীয় প্রজা আপন তালুকের মধ্যে সংস্থাপিত করেন। ৺ দয়াময়ীর নিত্য-নৈমিত্তিক পূজার জন্য দৈনিক ১৲ টাকা হিসাবে ৩৬৫৲ টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি দেবোত্তর ও ইষ্টদেব তর্কবাগীশ মহাশয়কেও বাৎসরিক ৩৬৫৲ টাকা আয়ের নিষ্কর হাওলা প্রদান করেন। রাজারাম প্রাচীর বেষ্টিত, ইষ্টক নির্ম্মিত দয়াময়ীর মন্দির ও শিবালয় নির্ম্মাণ করিয়া মহাসমারোহে শিব প্রতিষ্ঠা করেন; এবং সুচারুরূপে দৈনিক পূজাদির সুবন্দোবস্তের জন্য প্রচুর পরিমাণে ভূমি ব্রহ্মোত্তর দান করিয়া তথায় পূজক ব্রাহ্মণ-পরিবার স্থাপন করেন। রাজারামের এই সমস্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ পটুয়াখালী সবডিভিসনের অন্তর্গত চিক্নীকান্দি গ্রামে আজও বর্ত্তমান আছে। এখনও সেখানে প্রত্যহ দেবীর পূজা হয়। যথারীতি নীলচণ্ডী, দোলোৎসব প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ আজও অতীতের সাক্ষ্য দিতেছে। প্রতি বৎসর মাঘীপূর্ণিমার দিন মন্দির সম্মুখে প্রকাণ্ড মেলা বসিয়া থাকে।

রাজারামের স্বর্গারোহণের পর তদীয় দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণদেব সেন মজুমদার জ্যেষ্ঠত্বের হিসাবে সম্পত্তির নয় আনি ও কনিষ্ঠ হরিদেব সেন মজুমদার সাত আনি অংশ প্রাপ্ত হন। দুই সহোদরও অনেক ব্রহ্মোত্তর দান করেন, কৃষ্ণদেব “ছোট দীঘী” নামক জলাশয় খনন করেন। কৃষ্ণদেবের তিন পুত্র, রাধামোহন, রামসুন্দর ও শ্যামসুন্দর।

হরিদেবের তিন পুত্র; ভবানীশঙ্কর, গৌরীশঙ্কর, শম্ভুচন্দ্র। ভবানীশঙ্কর ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি প্রভূত অর্থব্যয়ে শোলোকে ইষ্টক নির্ম্মিত দ্বাদশ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, এবং “নয়াদীঘী” নামে সুবৃহৎ জলাশয় খনন করেন। ভবানীশঙ্করের মৃত্যু হইলে তাঁহার সহধর্ম্মিণী রাজেশ্বরী সহমৃতা হইলেন। ভবানীর কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণমোহন সুবিখ্যাত

গোরাচাঁদ শিরোমণির অধ্যক্ষতায় বাঙ্গোরোড়ার উপাধিধারী পণ্ডিতদের বিদায়ের শ্রেণী বিভাগ করিয়া দেন, সেই অনুসারে এই জিলার সর্ব্বত্রই পণ্ডিতদের বিদায়ের হার নির্দ্দিষ্ট হয়। হরিদেবের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র শম্ভুচন্দ্র বহুব্যয়সাধ্য পঞ্চাগ্নি, তুলাট প্রভৃতি মহাপুণ্যকার্য্য ও শিবপ্রতিষ্ঠা করেন। শম্ভুর দুই পুত্র গোলকচন্দ্র ও গোপীমোহন। গোলোকচন্দ্রের পুত্র দীনবন্ধু; ইনি, সর্পাঘাতের একজন সুবিখ্যাত চিকিৎসক, ফণাধারী বিষধর কর্ত্তৃক দংশিত কালকূটে জর্জ্জরিত সংজ্ঞাহীন অনেক রোগীকে মন্ত্রবলে আরোগ্য করিয়াছেন। দীনবন্ধু সর্ব্বদা ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়া থকেন, একাদিক্রমে অনাহারে, অনিদ্রায় সপ্তাহাধিক অতিবাহিত করিতে পারেন। ইনি সামান্য বাঙ্গালা লেখাপড়া জানেন, অথচ পাটীগণিত কি বীজগণিতে এমন অঙ্ক খুব কমই আছে যে আপন মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভাবিত নিয়মের বলে উত্তরে পৌঁছিতে না পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক উপাধিধারী ব্যক্তি দীনবন্ধুকে পরীক্ষা করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন।

২৮-২৯। পরগণে বীরমোহন ও তপ্পে বীরমোহন।

পরগণে বীরমোহন ও তপ্পে বীরমোহন গৌরনদী থানায় অবস্থিত। ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে যে ভীষণ জলপ্লাবন হয় তাহাতে এই অঞ্চল একেবারে জনশূন্য হইয়া পড়ে। ফলে এই বিশাল ভূখণ্ডের অনেকস্থল নিবিড় অরণ্যানী পরিব্যাপ্ত হইয়া হিংস্র শ্বাপদগণের আবাসভূমিতে পরিণত হয়। এই স্থলে ব্যাঘ্রের উৎপাত এক সময়ে এতদূর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, কোন ব্যক্তি দিনে দ্বিপ্রহরেও এই স্থলে আগমন করিতে সাহসী হইত না। স্বয়ং কলেক্টর বাহাদুর ইহার প্রতীকারকল্পে বঙ্গের নানাস্থান হইতে শিকারীদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। অনেক বৎসর অতীত হইলে এই পরগণা পুনরায় লোকালয়ে পরিণত হয়।

বীরমোহনের প্রাচীন জমীদারগণ ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত। তাহারা বীরমোহনের চৌধুরী বলিয়া খ্যাত। বর্ত্তমান সময়ে এই পরগণার কতক অংশ মাত্র চৌধুরিগণের ভোগদখলে আছে। অবশিষ্ট অংশ যশোহর জিলার অন্তর্গত নড়াইলের জমীদারগণ ক্রয় করিয়াছেন।

৩০। হবিবপুর।

এই পরগণা অতিশয় ক্ষুদ্র। ইহার যাবতীয় ভূমি গৌরনদী এবং স্বরূপকাঠী থানার অধীনে অবস্থিত। মীর্ হবিবের নামানুসারে এই পরগণার নাম সৃষ্টি হয়। মীর হবিব খাঁ নবাব মুর্শিদকুলিখাঁর দৌহিত্রী-পতি (ঢাকার শাসনকর্ত্তা) মুর্শিদখাঁর অমাত্য, ধনলুব্ধ, ক্রুর আগাবাখরের বন্ধু ছিলেন। যৎকালে বেভারিজ্ সাহেব বাখরগঞ্জের কলেক্টর পদে অধিষ্ঠিত, তখন বিক্রমপুর নিবাসী লক্ষ্মীকান্ত ভূঁইয়া প্রধান অংশীদার ছিলেন। এই পরগণায় বহুসংখ্যক তালুক বর্ত্তমান। তালুকদারগণের মধ্যে কেশবকাঠীর সরকার বংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৩১। মৈজরদি।

মৈজরদি বা মৈজদ্দি মেহেন্দীগঞ্জ থানার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র পরগণা। ইহার অনেক স্থল সর্ব্বগ্রাসী মেঘনার অতলজলে নিমজ্জিত, এই নিমিত্ত বর্ত্তমান সময়ে এই পরগণার আয়তন পূর্ব্বাপেক্ষা বহুল পরিমাণে হ্রস্বতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

গোলাম গফুর নামক জনৈক মুসলমান ভদ্রসন্তানই সর্ব্বপ্রথমে এই পরগণার স্বত্বাধিকার লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই জমীদারী অধিককাল ভোগ করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার স্বত্বাধিকার প্রাপ্তির অত্যল্পকাল পরেই এই পরগণার অধিকাংশ স্থল বিদেশী ভূস্বামিগণের হস্তগত হয়; তন্মধ্যে শ্রীনগরের জমীদার, ঢাকার মির্জ্জাসাহেব এবং তুঙ্গিবাড়ীর চক্রবর্ত্তীবংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৩২। জালালপুর।

পরগণে জালালপুরের কিয়ংদশ মাত্র বাখরগঞ্জ জিলায় অবস্থিত। ইহার প্রধানভাগ ফরিদপুর ও ঢাকা জিলার অন্তর্গত। ১৭৮৭ খৃঃ অব্দের জলপ্লাবনে এই পরগণা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিল। ইহার তিন বৎসর পরে ঢাকার তদানীন্তন কলেক্টর মিঃ ডগলাস এই সম্বন্ধে রেবেনিউ বোর্ডে যে রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"Mr Day did not send down his proposed plan of settlement for upwards of six months after this district

[Dacca Jalalpur, which included Faridpur and Bakarganj] had been visited by the most dreadful calamity ever remembered by the oldest inhabitant of the district, and which deprived it (by Mr Day's calculation) of upwards of 60,000 of its inhabitants, who either miserably perished, or were reduced to the painful necessity of forsaking their habitations in search of a precarious subsistence. Mr Day visited some of the parganas when the famine raged with the greatest violence, and had ocular proofs of the extreme misery to which the wretched inhabitants were reduced. He saw the parganas inundated, whole crops destroyed, and cultivation totally neglected. He had the mortification of beholding hundreds of the poor wretched inhabitants daily dying without the means of affording them the smallest relief. *

এই পরগণায় বহু তালুক বর্ত্তমান। ১৭৯৪ খৃঃ অব্দে ইহার অন্তর্গত তালুকগুলির সংখ্যা প্রায় দুই সহস্র ছিল। তালুকদারগণের মধ্যে অনেকের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। পূর্ব্ব বর্ণিত ভীষণ দুর্যোগের পর রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হইলে তালুকদারগণ অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন। অনেকে গৃহ, বাটী, বিষয়-সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া দূরদেশে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মহাশয় ডগলাস সাহেবের সুবন্দোবস্তের ফলে ইহাদিগের দুর্গতির কতকটা লাঘব হইয়াছিল।

৩৩। সায়েস্তাবাদ

পরগণে সায়েস্তাবাদ বরিশাল নগরীর অনতিদূরে অবস্থিত। বাদসাহী ও নবাবী আমলে এইস্থল চাকলা যশোহরের অধীন এবং সরকার খলিফতাবাদের অন্তর্গত ছিল।

কথিত আছে যে বাঙ্গালার সুবিখ্যাত মোগল-রাজপ্রতিনিধি নবাব সায়েস্তা খাঁর নামানুসারেই এই পরগণার নামকরণ হইয়াছে। সায়েস্তা খাঁ সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের ভ্রাতুষ্পুত্র, এবং বাদসাহদিগের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। যৎকালে মহারাষ্ট্রবীর শিবাজী দাক্ষিণাত্যে হিন্দু-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে ভীষণ সমরানল প্রজ্জলিত করিয়াছিলেন, তখন এই

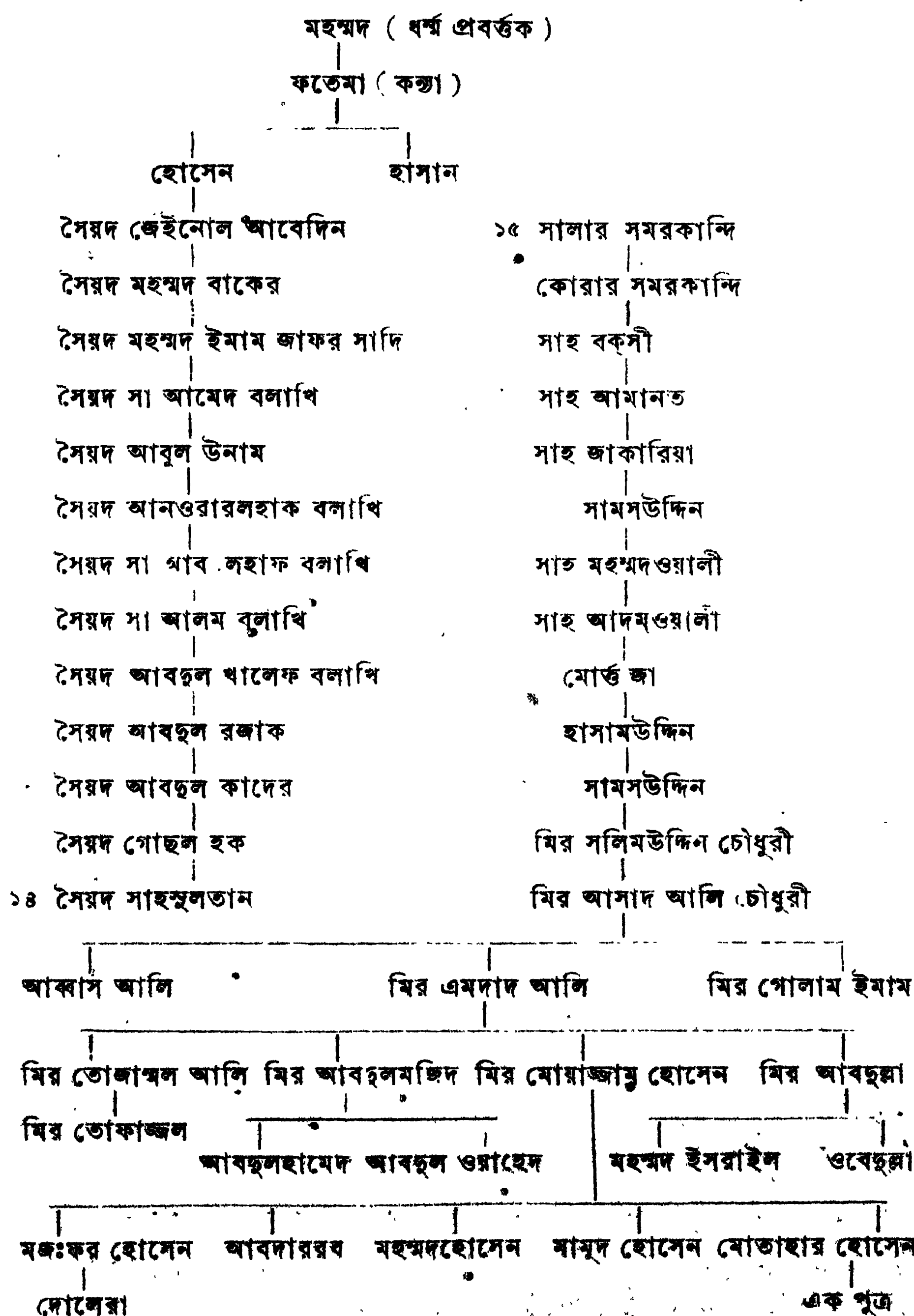
* H. Beveridge's History of Bakarganj,—Page 312.

নবদৃপ্ত মহারাষ্ট্র-শক্তি সমূলে নির্ম্মূল করিবার নিমিত্ত বাদসাহ ঔরঙ্গজেব সায়েস্তা খাঁকে দক্ষিণাপথে প্রেরণ করেন। মহারাষ্ট্র-বীরের অপূর্ব্ব রণ-কৌশলে বিপর্য্যস্ত হইয়া সায়েস্তা খাঁ শীঘ্রই সম্রাট সমীপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সম্রাট তখন তাহাকে চিরশান্তিপ্রিয় বাঙ্গালী জাতির শাসনভার অর্পণ করেন। সায়েস্তা খাঁ ঔরঙ্গজেব কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া দুইবার সুবাবাঙ্গলার নবাবপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং মগ ও ফিরিঙ্গী আততায়িগণের উপযুক্ত দণ্ড বিধানের নিমিত্ত বন্দুবায় নিম্নবঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন। তাহারই অনুজ্ঞাক্রমে চন্দ্রদ্বীপের কিয়দংশ লইয়া সায়েস্তাবাদ পরগণা গঠিত হয়।

নবাবের অনুচরবর্গের মধ্যে ইবাব খাঁ নামক একজন সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। ইবাব খাঁ কোন বিশেষ কার্য্যে নবাব বাহাদুরের মনোরঞ্জন করিয়া পুরস্কার স্বরূপ এই পরগণা প্রাপ্ত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় কন্যা ওমদৎ উন্নিসা সমগ্র বিষয়ের অধিকারিণী হইলেন। ওমদৎ নবাব-পরিবারে বিবাহিতা হইয়া "বহু বেগম" নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

বহুবেগমের জীবনবৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হওয়া যায় না। সুবিখ্যাত মহম্মদ হানিফ চৌধুরী সাহেব তাহার নিকট হইতেই সায়েস্তাবাদের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহম্মদ হানিফ চৌধুরী দীর্ঘকাল অতি কৃতিত্বের সহিত জমীদারী শাসন-সংরক্ষণপূর্ব্বক আমিনা খাতুন নাম্নী বিধবা পত্নী ও একটী মাত্র কন্যা রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

মহম্মদ হানিফ চৌধুরীর মৃত্যুর পর তদীয় বিধবা পত্নী আমিনা খাতুন, ঢাকা জিলার অন্তর্গত মাকিমপুর গ্রামনিবাসী মির সলিম উদ্দিনের সহিত কন্যার বিবাহ প্রদান করিয়াছিলেন। মির সলিমউদ্দিন চৌধুরী সাহেবই সায়েস্তাবাদের প্রসিদ্ধ মুসলমান জমীদারবংশের আদিপুরুষ। এই সলিমউদ্দিন ভুবন-বিখ্যাত সৈয়দবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সৈয়দগণ মুসলমান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ মহম্মদের কন্যা ফতেমার বংশীয়। এই বংশ অতীব সম্ভ্রান্ত এবং মুসলমানদিগের মধ্যে আভিজাত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই সুপ্রসিদ্ধ বংশসম্ভূত হাসামউদ্দিন সিন্ধুদেশ পরিত্যাগ করিয়া ঢাকা জিলার অন্তঃপাতী মাকিমপুরে আগমনপূর্ব্বক গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহারই পৌত্র মির সলিমউদ্দিন, হানিফ চৌধুরীর কন্যা বিবাহ করিয়া সায়েস্তাবাদে আগমন করেন; আমরা নিম্নে ইহার বংশতালিকা প্রদান করিলাম।


মহম্মদ (ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক)
ফতেমা (কন্যা)
হোসেন
হাসান
সৈয়দ জেইনোল আবেদিন
সৈয়দ মহম্মদ বাকের
সৈয়দ মহম্মদ ইমাম জাফর সাদি
সৈয়দ সা আমেদ বলাখি
সৈয়দ আবুল উনাম
সৈয়দ আনওয়ারলহাক বলাখি
সৈয়দ সা খাব লহাফ বলাখি
সৈয়দ সা আলম বুলাখি
সৈয়দ আবদুল খালেক বলাখি
সৈয়দ আবদুল রজাক
সৈয়দ আবদুল কাদের
সৈয়দ গোছল হক
১৪ সৈয়দ সাহসুলতান
১৫ সালার সমরকান্দি
কোরার সমরকান্দি
সাহ বক্সী
সাহ আমানত
সাহ জাকারিয়া
সামসউদ্দিন
সাহ মহম্মদওয়ালী
সাহ আদমওয়ালী
মোর্ত্তজা
হাসামউদ্দিন
সামসউদ্দিন
মির সলিমউদ্দিন চৌধুরী
মির আসাদ আলি চৌধুরী
আব্বাস আলি
মির এমদাদ আলি
মির গোলাম ইমাম
মির তোজাম্মল আলি
মির আবদুলমজিদ
মির মোয়াজ্জাম হোসেন
মির আবদুল্লা
মির তোফাজ্জল
আবদুলহামেদ
আবদুল ওয়াহেদ
মহম্মদ ইসরাইল
ওবেদুল্লা
মজঃফর হোসেন
আবদারব্ব
মহম্মদহোসেন
মামুদ হোসেন
মোতাহার হোসেন
দোলেরা
এক পুত্র

মির সলিমউদ্দিনের পুত্র আসাদ আলি ১১৭১ বঙ্গাব্দে মতামহীর নিকট এই পরগণার জমীদারীর দানপত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ পুত্রদ্বয় নিঃসন্তান পরলোক গমন করিলে মধ্যম এমদাদ আলির বংশধরগণই সমগ্র সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। সুলতানাবাদ এবং আয়েলা-ফুলঝুরীতে ইহাদের জমীদারী আছে।

মহাত্মা এমদাদ আলির তৃতীয় পুত্র স্বনামধন্য নবাব সৈয়দ মির মোয়াজ্জাম হোসেন তেজস্বী এবং বিচক্ষণ পুরুষ ছিলেন। তিনি স্মল-কজ-কোর্টের জজের কার্য্য করিয়া নবাব উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মোতাহার হোসেন ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। বাকলার মুসলমান জমীদারগণের মধ্যে এই বংশই প্রধান।

৩৪। সায়েস্তানগর।

বর্ত্তমান বাখরগঞ্জের পুলিশষ্টেসনের অন্তর্গত এই পরগণা অবস্থিত; ইহা অন্যান্য পরগণা হইতে ছোট, কিন্তু বড় আধুনিক নহে। সমুদ্রোপকূল-স্থিত যাবতীয় স্থান তৎকালে গভীর অরণ্যানীতে পরিণত ছিল; ইহার অনেক প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়। পুষ্করিণী ইত্যাদি খনন করিবার সময়ে বৃহৎ বৃহৎ অনেক সুন্দরীবৃক্ষের মূল ও তৎসহ অন্যান্য বৃক্ষেরও অনেক বড় বড় কাণ্ড পাওয়া গিয়াছে।

নবাব সায়েস্তা খাঁর নামের সঙ্গে এই পরগণার কোন সংশ্রব আছে কিনা জানা যায় নাই; তবে সায়েস্তা খাঁর শাসন সময়ে এদেশের অনেক জঙ্গল আবাদ হইয়া মনুষ্য-বাসোপযোগী উর্ব্বরা ভূখণ্ডে পরিণত হইয়াছিল। স্থানীয় প্রাচীন অধিবাসিগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে তাঁহারই আদেশ ক্রমে তদীয় অনুচর দ্বারা এই স্থানের জঙ্গল আবাদ হয়; এবং স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তদীয় নামকরণে এই স্থানের নাম হইয়াছিল। কিন্তু জনশ্রুতি ব্যতীত ইহার আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

রামগোপাল নামক জনৈক ব্রাহ্মণ এই জমীদারীর স্থাপয়িতা। ইঁহার পিতা রামবল্লভ সমদ্দার, জনৈক মুসলমান ফৌজদারের অধীনে সামান্য রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, এবং বিশ্বস্তরূপে কর্ত্তব্যকার্য্য পালন করিতেন। রামগোপাল তাহার একমাত্র সন্তান।

রামগোপাল প্রাপ্তবয়স্ক হইলে পিতার নিকটে থাকিয়া তাঁহার কার্য্যের সহায়তা করিতেন। তৎকালে ঢাকা অথবা জাহাঙ্গীরনগরে বঙ্গের রাজধানী ছিল। রামগোপাল প্রায়ই কার্য্যোপলক্ষে ঢাকায় গমন করিতেন, এই সূত্রে তত্রত্য প্রধান রাজকর্ম্মচারীর সহিত তাহার বিশেষ পরিচয় হইল। একদিন রামগোপাল রাজসংক্রান্ত কোন একটী বিশেষ জটিল কার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পাদন করিলেন। নবাব তাহার এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও কার্য্য-তৎপরতা দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাহাকে পুরস্কার স্বরূপ ১০৭৬ সালে সায়েস্তানগরের জমীদারী সনন্দ প্রদান করিলেন।

জমীদারী সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া রামগোপাল সায়েস্তানগরের জঙ্গলগুলি পরিষ্কার করাইয়া তথায় লোকালয় স্থাপন করিতে লাগিলেন। বালিগাঁ নামক স্থানে নিজের বাসস্থান স্থাপন করিয়া তথায় দীর্ঘিকা, প্রকাণ্ড বর্ত্ম প্রভৃতি প্রস্তুত করিলেন। অদ্যাপি বালিগাঁ গ্রামে তাঁহার কীর্ত্তিসমূহের ভগ্নচিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে।

অতি প্রাচীন বয়সে রামগোপালের মৃত্যু হয়। তাঁহার এক কন্যা ও ছয়পুত্র, রামগোবিন্দ, রামভদ্র, রামচন্দ্র, রামনারায়ণ, গঙ্গাধর এবং জানকী-বল্লভ। এই জানকীবল্লভ স্বকীয় অসাধারণ বুদ্ধিবলে যে বিস্তীর্ণ ভূ-সম্পত্তি লাভ করিয়া বিশাল বংশ-তরু রোপণ করিয়াছেন তাহার সম্যক ইতিহাস পরবর্ত্তী পরগণার ইতিবৃত্তে বর্ণিত হইবে।

রামগোপালের মৃত্যুর পর রামগোবিন্দ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ বালিগাঁ পরিত্যাগ করিয়া গাড়ুড়িয়া নামক স্থানে বাসস্থান স্থাপন করেন। এই গ্রাম তখন অত্যন্ত অরণ্যসঙ্কুল ছিল; পরিষ্কার করিবার সময় শৈবালাদি পরিপূর্ণ একটী বৃহৎ দীর্ঘিকা আবিষ্কৃত হইল। এই দীঘীর জল বড় পরিষ্কার ও সুপেয়, বর্ত্তমান সময় ইহার গভীরতা দশ বার হাতের কম নহে। এই দীর্ঘিকা কে খনন করিয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

রামগোবিন্দের তিন পুত্র, মধুসূদন, কৃষ্ণরাম ও হরিদেব। ইঁহাদের সন্তান সন্ততিগণের মধ্যে কালিকাপ্রসাদ, গঙ্গাপ্রসাদ, কৃষ্ণবন্ধু, দীননাথ, মনোমোহন প্রভৃতি নানাপ্রকার সদনুষ্ঠান দ্বারা বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে গঙ্গানন্দ, দক্ষিণাকুমার, শশিকান্ত প্রভৃতি

উত্তরাধিকারীসূত্রে এখনও গাড়ুড়িয়ায় বাস করিতেছেন। ইঁহাদের পূর্ব্বাবস্থা এখন আর নাই; কাহার কাহার অবস্থা এমন শোচনীয় হইয়াছে যে, তাঁহারা অতিকষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিতেছেন।

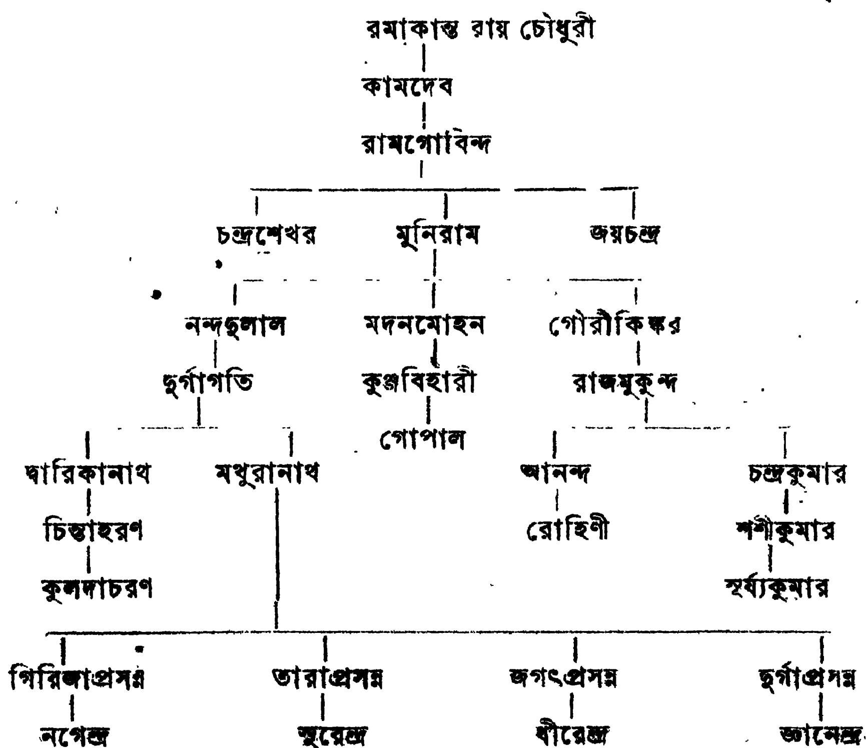
৩৫। সাহাজাদপুর

নলছিটী থানার অন্তর্গত সাহাজাদপুর অতিশয় প্রাচীন পরগণা। এই পরগণা পূর্ব্বে সুবিশাল বাকলা রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল। মোগলকুল-তিলক সম্রাট আকবরসাহের রাজত্বকালেও এই ভূখণ্ড সরকার বাকলার অংশবিশেষ বলিয়া পরিগণিত হইত।

এই মহাল কোন্ সময় কাহা কর্ত্তৃক প্রথম গঠিত হয় তাহা নির্ণয় করা বড়ই দুরূহ। সাহাজাদপুর যাবনিক নাম, অতএব এই পরগণা যে বাকলায় মুসলমানাগমনের পরে সৃষ্ট হইয়াছে ইহা নিশ্চিত। ১৪৯১ খৃঃ অব্দে প্রসিদ্ধ হাবসী বীর বার্ব্বেক সুলতান সাহজাদা নাম গ্রহণ পূর্ব্বক বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করে কিন্তু কিয়দ্দিবসের মধ্যেই তাহাকে ঘাতকহস্তে প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল, সুতরাং তাহার রাজত্বকালে এই স্থান স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। মুসলমান ভূপতিগণের জ্যেষ্ঠপুত্রগণ সাহজাদা আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন। ইহাদিগের কাহারও নামানুসারে এই পরগণার নামাকরণ হইয়া থাকিবে। বিখ্যাত নলছিটী বন্দর সাহাজাদপুর পরগণায় অবস্থিত। মহারাজ রাজবল্লভের পৌত্র পীতাম্বর সেন এই বন্দর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

সিদ্ধকাঠীর চৌধুরিগণ সাহাজাদপুরের স্বত্বাধিকারী। ইহারা বৈদ্যবংশ-সম্ভূত, এই জমীদারগণ বরিশাল জিলায় বিশেষ সম্মানিত; এবং কুলমর্য্যাদা, ধর্ম্মরক্ষা, বিনয়, সমদর্শিতা এবং দানশীলতা প্রভৃতি গুণাবলী দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ রমাকান্ত রায় সাহাজাদপুর পরগণার জমীদারী ক্রয় করেন। খুলনা জিলান্তর্গত মূলঘর গ্রামে রমাকান্তের পূর্ব্বনিবাস ছিল। জমীদারী ক্রয় করিয়া পৈতৃক ভবন পরিত্যাগ করতঃ তিনি সিদ্ধকাঠী বাসস্থান স্থাপন করেন। কিছুকাল পরে তিনি বাসভূমির অনতিদূরে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করতঃ কালী প্রতিষ্ঠা করেন এবং দৈনন্দিন পূজা-ব্যয় নির্ব্বাহার্থ স্বীয় জমীদারীর কতিপয় সম্পত্তি দেবোত্তর প্রদান করেন।

রমাকান্তের পুত্র কামদেব ও পৌত্র রামগোবিন্দের কোন উল্লেখযোগ্য বিবরণ জানা যায় না। রামগোবিন্দের পুত্র চন্দ্রশেখর অতিশয় তেজস্বী এবং শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন, কথিত আছে যে তিনি দস্যুদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। রামগোবিন্দের মধ্যমপুত্র মুনিরামের তিন পুত্র; নন্দদুলাল, মদনমোহন ও গৌরীশঙ্কর। তিন ভ্রাতাই সুপণ্ডিত ছিলেন, জ্যেষ্ঠ নন্দদুলাল পার্শিভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, অপর দুই ভ্রাতার সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল বলিয়া তাঁহারা যথাক্রমে কবিরত্ন ও কবিকঙ্কণ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।



নন্দদুলালের পুত্র দুর্গাগতি রায় চৌধুরী অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও ধর্ম্ম-নিষ্ঠার ফলে জমীদার শ্রেণীর মধ্যে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি যখন জমিদারী কার্য্য পরিচালন করিতেন, তখন ইহার সত্যনিষ্ঠায় মোহিত হইয়া অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গ তাহাদের বিষয়ভার ইহার হস্তে ন্যস্ত করেন। দুর্গাগতি রায় চৌধুরী ষোল আনা সম্পত্তির সর্ব্বময় কর্ত্তা

হইয়াও জ্ঞাতিদের প্রতি যে সব অভিন্ন ভাবের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা শক্তিসম্পন্ন বিষয়ী মাত্রেরই শিক্ষার স্থল। ইনি অনেক সম্পত্তি দান করিয়া স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহাদির নিয়মিত সেবার বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। আত্মরক্ষার জন্য গ্রামস্থ নীচশ্রেণীর লোকদিগকে লাঠীখেলা ও মল্লযুদ্ধে ইনি উৎসাহ দিতেন। দেশী ও বিদেশী ব্রাহ্মণদিগকে ইনি অনেক দেবোত্তর সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন এবং জমিদারীর আয় অনেক বৃদ্ধি করিয়াছেন।

দুর্গাগতি রায় চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র মথুরানাথ; পিতৃবিয়োগের পর তাঁহার হস্তেই দুর্গাগতি রায় চৌধুরীর ত্যজ্য অর্দ্ধসম্পত্তির বিষয় ভার ন্যস্ত হয়। এই সময় তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী পৃথকভাবে কর্ত্তৃত্ব-পরিচালন করিতেছিলেন। প্রজাদের উপর তাঁহার এত প্রভুত্ব ছিল যে, তাঁহার সঙ্গে মথুরানাথ প্রতিযোগিতা করিয়া যে পিতার ন্যায় একাধিপত্য বিস্তার করিতে পারিবেন, এরূপ আশা অনেকেই তখন হৃদয়ে স্থান দিতে পারেন নাই। মথুরানাথ সহৃদয় বিনয়ী ও পরহিত-ব্রতী ছিলেন। একদিকে দ্বারকানাথের কঠোর শাসন, অপরদিকে মথুরানাথের সত্য, প্রেম, ত্যাগ প্রভৃতি শান্তিপ্রদ গুণগ্রামের আকর্ষণ। ভদ্র ও প্রজামণ্ডলী মথুরানাথের সেই গুণগ্রামে আকৃষ্ট হইয়া দ্বারকানাথের শাসনদণ্ডের ভয় পরিত্যাগ করিল। শারীরিক বল যে ধর্ম্মবলের নিকট অকিঞ্চিৎকর; প্রেম, ত্যাগ, সরলতা যে কঠোর শাসন অপেক্ষাও লোকচিত্ত-জয়ের অমোঘ পন্থা, মথুরানাথ কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণকরিয়াই বিষয়-কার্য্যে তাহা সপ্রমাণ করিলেন।

সিদ্ধকাঠীর দক্ষিণে একজন প্রাচীন ভূম্যধিকারী ছিলেন। দেনার দায়ে তাঁহার জমীদারী নিলাম হইয়া যায়। গ্রাসাচ্ছাদনের উপায়স্বরূপ তাঁহার ভদ্রাসন ও কয়েকখানি খানাবাড়ী মাত্র সম্বল থাকে। উক্ত জমীদারের বাটীর চতুর্দ্দিকস্থ সম্পত্তির মালিক বাখরগঞ্জ জিলার অন্য এক জমীদার। তিনি উক্ত পুরাতন জমীদারকে নিঃসহায় দেখিয়া তদীয় ভদ্রাসন ও খানাবাড়ী করায়ত্ত করিতে অভিলাষ করেন। উক্ত নিঃসহায় জমীদার নিতান্ত বিপদাপন্ন হইয়া মথুরানাথের আশ্রয়প্রার্থী হন। মথুরানাথ তাঁহার ন্যায্য সম্পত্তি রক্ষার জন্য সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন।

এই উপলক্ষে উক্ত লোভী জমীদার ও নিঃসহায় ভূম্যধিকারীর মধ্যে মনোমালিন্য এতদূর ঘনীভূত হয় যে, উভয় পক্ষ দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। নিঃসহায় ভূম্যধিকারী উদরান্নের সংস্থানেই অসমর্থ, তাহার পক্ষে উক্ত মোকদ্দমার ব্যয় নির্ব্বাহ অসম্ভব হওয়ায় মথুরানাথ তাহাকে অর্থসাহায্য করেন। মথুরানাথ বরিশাল-আদালতে এই মোকদ্দমা উপলক্ষে যে সব সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, দয়াদাক্ষিণ্যাদির পরিচয় পাইয়া উকীল, মোক্তার ও বিচারকগণ তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। তিনি প্রবল শক্তিসম্পন্ন জমীদারের হস্ত হইতে নির্ধন ভূম্যধিকারীকে রক্ষা করিবার জন্য বিবাদ করিতে গিয়া যখন যেটুকু আইনের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন, সত্যের প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য জবানবন্দীর সময়ে তাহা অকপট চিত্তে বিচারালয়ে প্রকাশ করিয়া স্বীয় দোষ স্বীকার করিয়াছেন।

মথুরানাথের হৃদয় দয়ার আধার ছিল। নলছিটীর কোন এক মহাজনের কারবার দেনার দায়ে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা হয়। মহাজন পরোপকারী মথুরানাথের নিকট আশ্রয়প্রার্থী হয়। মথুরানাথ সুদ গ্রহণ না করিয়া তাহাকে প্রায় ছয় হাজার টাকা বিনা খতে ধার দেন। দেশের অনেক ভদ্র ও ইতর লোক তাঁহার কাছে অর্থ সাহায্য পাইয়াছে কিন্তু তিনি কখনও টাকা আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি করেন নাই।

পূর্ব্বে সিদ্ধকাঠীর রাস্তাঘাট সুগম ছিল না। তিনি স্বব্যয়ে স্থানে স্থানে রাস্তা নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী খনন ও বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া গ্রামবাসীদের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। মথুরানাথ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি অনেকের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয়-ভার বহন করিতেন। যে সব বালক লেখা-পড়ায় মনোযোগ প্রদান করিয়া বিশেষত্ব দেখাইতে পারিত, মথুরানাথ তাহাদিগকে বড়ই স্নেহ করিতেন। তাঁহার জন্মভূমি সিদ্ধকাঠী তাঁহার চেষ্টাতেই সৌন্দর্য্যপূর্ণ ও ভদ্রলোকের বাসোপযোগী হইয়াছে।

"গৃহলক্ষ্মী" "বঙ্কিমচন্দ্র" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা স্বনামপ্রসিদ্ধ গিরিজা-প্রসন্ন মথুরানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। গিরিজাপ্রসন্ন হাইকোর্টের একজন উদীয়মান উকীল ছিলেন; ইহার বিস্তৃত জীবনী পরে বিবৃত হইবে।

৩৬। তপ্পে বাহাদুরপুর।

তপ্পে বাহাদুরপুর বাখরগঞ্জ থানার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র পরগণা। এই পরগণার উল্লেখযোগ্য প্রাচীন তত্ত্ব কিছু নাই বলিলেই হয়। খাজে নিকাস খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন।

৩৭। অরঙ্গপুর।

এই পরগণা বাদসাহী আমলে সরকার বাজুহার অন্তর্গত ছিল। বাকলা হইতে চন্দ্রদ্বীপের সৃষ্টি হইলে ইহাকে চন্দ্রদ্বীপ হইতে পৃথক করা হয়। * কাহার সময়ে এবং কোন সনে এই অরঙ্গপুর সৃষ্ট হয় তাহা জানা যায়না। প্রথিতনামা বাদসাহ ঔরঙ্গজেরের নামানুসারে ইহার নাম হইয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। ইতিহাসে দেখিতে পাই যে সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব তাঁহার দীর্ঘ রাজত্বের প্রায় একচতুর্থাংশ সময় ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া নানাবিধ যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট ভাগ এইরূপ কাটাইয়া, তিনি শেষে দাক্ষিণাত্যে মানবলীলা সম্বরণ করেন ‡।

নবাব সায়েস্তা খাঁ যখন শেষবার বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসেন, তাহার কয়েক বৎসর পরে ঔরঙ্গজেব সসৈন্যে নিম্নবঙ্গে আগমন করিয়া কয়েকদিন স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়াছিলেন। কিম্বদন্তী যে সম্রাট্ এই পরগণার কোন স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন; সায়েস্তা খাঁ বাদসার এই শুভাগমন চিরস্মরণীয় করিবার জন্য নবসৃষ্ট পরগণা তন্নামেই অভিহিত করিলেন।

এই কিম্বদন্তীর মধ্যে সম্রাটের এই দেশে আগমনের সত্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। ইতিহাসে দেখা যায় যে সায়েস্তা খাঁর শাসন সময়ে এই দেশে মগ ও ফিরিঙ্গীদের পুনরায় অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছিল। এই সকল দস্যুদমনার্থ তাঁহাকে বিশেষ যুদ্ধোদ্যম করিতে হইয়াছিল। সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব অত্যন্ত সন্দিগ্ধ প্রকৃতির লোক ছিলেন, পিতা, পুত্র, স্ত্রী;

* H. Beveridge's History of Bakarganj P, 154,

‡ Elphinstone's History of India (chapter IV), p. p. 668—672.

কন্যা প্রভৃতি কাহাকেও তিনি বিশ্বাস করিতেন না। যে স্থানে যুদ্ধ-বিগ্রহাদি উপস্থিত হইত তাহা অল্পে দমিত না হইলে সম্রাট্ স্বয়ং কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন। তাঁহার কার্য্যের এবম্প্রকার উদাহরণ ইতিহাসের বহু স্থানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই সমস্ত কারণে ঔরঙ্গজেবের অস্মদ্দেশে আগমন নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

সায়েস্তানগরের জমীদারী-স্থাপয়িতা রামগোপালের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র মহাত্মা জানকীবল্লভ এই পরগণার জমীদার। এই মনস্বী পুরুষ শত্রু-কর্ত্তৃক যথেষ্ট উৎপীড়িত হইয়া স্বীয় অসাধারণ অধ্যবসায় ও প্রতিভার বলে যে প্রকারে এই জমীদারীলাভ করিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

রামগোপালের জ্যেষ্ঠপুত্র রামগোবিন্দ জমীদারীর সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। কনিষ্ঠগণ বৈষয়িক যাবতীয় কার্য্য তাঁহার প্রতি ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন; কিন্তু স্বার্থপর ধূর্ত্ত রামগোবিন্দ অজানিতভাবে ভ্রাতৃগণের নামলোপ করিয়া তাঁহার নিজের নামে জমীদারী পত্তন করিলেন। এই প্রকারে কতিপয় বৎসর অতীত হইল। একদা দুষ্ট রামগোবিন্দ তাঁহার ভ্রাতৃগণকে স্পষ্টই বলিলেন যে এই পৈত্রিক জমীদারীতে তাহাদের কোন স্বত্ব নাই, নবাব সমস্তই তাঁহাকে দিয়াছেন।

নিরুপায় ভ্রাতৃগণ তখন মহাবিপদে পড়িলেন; তাঁহাদের এমন অর্থ-বল ও জনবল ছিলনা—যাহাদ্বারা স্বীয় স্বীয় স্বত্ব উদ্ধার করিতে পারেন। তখন তাঁহারা জ্যেষ্ঠের নিকট হইতে কতক কতক ভূসম্পত্তি গ্রহণ করিয়া পৈত্রিক বাসভবন পরিত্যাগ করিলেন এবং বেবাজ, নারাঙ্গল, ভাতারি-কাঠী প্রভৃতি গ্রামে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। তাঁহাদের বংশধরগণ এখনও এই সমস্ত গ্রামে বাস করিতেছেন।

সর্ব্বকনিষ্ঠ তেজস্বী জানকীবল্লভ জ্যেষ্ঠের এই পৈশাচিক আচরণে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং বিনাদোষে অবৈধরূপে পিতৃস্বত্ব হইতে কেন বঞ্চিত হইবেন তজ্জন্য তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। ইহাতে বালক জানকী-বল্লভের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার চলিতে লাগিল। মর্ম্মাহত জনকী-বল্লভ জ্যেষ্ঠের এই পাশবিক ব্যবহারে অপর ভ্রাতৃগণের ন্যায় নিজস্বত্ব প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইলেন।

দুরাচারের কিন্তু ইহাতেও মনস্তুষ্টি হইল না। জানকীবল্লভের বাল্যকাল হইতেই অসাধারণ প্রতিভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বালকের তেজস্বিতা, ন্যায়পরায়ণতা ও উদারতা অতি অল্পকাল মধ্যেই তাহাকে সর্ব্বজন প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। পাপিষ্ঠ রামগোবিন্দ বালকের এবম্বিধ গুণ ও সর্ব্বোপরি সর্ব্বজনপ্রিয়তা দর্শন করিয়া পূর্ব্ব হইতেই হৃদয়মধ্যে এক পৈশাচিক সঙ্কল্প পোষণ করিতেছিলেন। বর্ত্তমানে যখন তিনি দেখিলেন যে অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়াও বালক পৈত্রিক বাসভূমি পরিত্যাগ করিতেছে না, তখন সেই পূর্ব্বকৃত পৈশাচিক সঙ্কল্প তাঁহাকে আবার উত্তেজিত করিয়া তুলিল। সকলের অগোচরে কনিষ্ঠকে হত্যা করিয়া, পাপ লুক্কায়িত করিবেন এই ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন।

রামগোবিন্দের সহধর্ম্মিণী ভবানীদেবী শৈশবকাল হইতেই জানকীবল্লভকে স্বীয় গর্ভস্থ সন্তানের ন্যায় পালন করিয়াছিলেন। তিনি দেবরের সমূহ বিপদ জানিতে পারিয়া সুযোগমত একদা নিশীথ সময়ে তাহাকে সকল কথা বলিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সুদূরে পলায়ন করিতে উপদেশ দিলেন। জানকীবল্লভের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; তাঁহার সরল হৃদয়ে এবম্বিধ সন্দেহের ছায়া কখনও পড়ে নাই, তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইলেন। তাঁহার সহোদর বিনা দোষে—এত ভক্তি শ্রদ্ধার বিনিময়ে, তাঁহাকে গোপনে হত্যা করিয়া জমীদারী নিষ্কণ্টক করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন, ইহা সহজে তাঁহার বিশ্বাস হইল না। কিন্তু মাতৃস্বরূপা ভ্রাতৃজায়ার অশ্রুপূর্ণ লোচন দেখিয়া তাঁহার কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। জানকীবল্লভ তখন ভ্রাতৃজায়ার পদধূলি গ্রহণ করিয়া পলায়নোদ্দেশে বহির্গত হইলেন। শৈশবের লীলাভূমি জন্মস্থান হইতে বিদায় লইবার সময়ে তাঁহার হৃদয়কোণে অজানিত ভাবে একটী উচ্ছ্বাস উঠিয়া আবার মিশিয়া গেল।

বিপন্ন জানকীবল্লভ ঘূর্ণ্যমান অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তনে স্বীয় বাসভূমি হইতে সাত আট মাইল পশ্চিমে অভয়নীল নামক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহার এক আশ্রয়স্থান মিলিল। রামগোপাল নামক জনৈক কায়স্থ তাঁহাকে বিপন্ন দেখিয়া স্বীয় গৃহে আশ্রয় দিলেন। এই কায়স্থসন্তানের কাছে অযাচিতরূপে আশ্রয় পাইয়া জানকীবল্লভ

কয়েকদিন তথায় বাস করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাহার সমভি-ব্যাহারে ঢাকায় গমন করিলেন।

ঢাকায় উপস্থিত হইয়া জানকীবল্লভ তাঁহার সদ্‌গুণাবলী দ্বারা অনেকের প্রিয়পাত্র হইলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার দুঃখের কাহিনী অনেক রাজপুরুষের কর্ণগোচর হইল। এতমাদ খাঁ নামক জনৈক প্রাচীন রাজ-পুরুষ নিঃসন্তান ছিলেন। জনকীবল্লভের সৌম্যমূর্ত্তি এবং সৌজন্য দর্শন করিয়া খাঁ সাহেবের বড়ই স্নেহ জন্মিল। নবাব সায়েস্তা খাঁ তখন নিম্নবঙ্গের শাসনকর্ত্তা ছিলেন; এতমাদ খাঁ জানকীবল্লভকে লইয়া তাঁহার নিকট সমস্ত বিবৃত করিলেন। সায়েস্তা খাঁর মনে দয়া হইল; তিনি গোপনানুসন্ধান দ্বারা প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া যৎপরোনাস্তি মর্ম্মাহত হইলেন। অত্যল্প কাল মধ্যে সায়েস্তা খাঁর অনুগ্রহে ও এতমাদ খাঁর একান্ত যত্নে, জানকীবল্লভ ১১০৬ সনে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সুবেদার সুলতান আজিম ওসমানের নিকট হইতে সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের পাঞ্জাযুক্ত এক সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। এই সনন্দে অরঙ্গপুর পরগণার সম্পূর্ণ অধিকার তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। এতমাদ খাঁ তখন তাঁহার স্নেহের নিদর্শন-স্বরূপ নিজনামে তপ্পে এতমাদপুর পরগণা অরঙ্গপুরের সনন্দভুক্ত করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন।

রাজানুগ্রহে জানকীবল্লভ অনেক ধনসম্পত্তি ও লোকজন সমভি-ব্যাহারে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। দেশে আসিয়া প্রথম পৈত্রিক বাসভূমি বলিগাঁ গ্রামে বাসস্থান স্থাপন করিলেন। নানাপ্রকার অসুবিধা বশতঃ ১১০৯ বঙ্গাব্দে কলসকাঠী গ্রামে বাসস্থান স্থির করিয়া অত্যল্পকালমধ্যেই অরঙ্গপুর ও এতমাদপুর পরগণাদ্বয় অধিকার করিলেন। এই সময় সায়েস্তানগর পরগণারও অধিকাংশ অরঙ্গপুর ও এতমাদপুর পরগণাভুক্ত হয়।

জানকীবল্লভের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরগণারও শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। কলসকাঠীতে উচ্চ অট্টালিকা, প্রশস্ত দীর্ঘিকা, ইষ্টক নির্ম্মিত বৃহৎ রাজবর্ত্ম প্রভৃতি অচিরে নির্ম্মিত হইল। চতুর্দ্দিক হইতে বনিকগণ নানাপ্রকার ব্যবসা করিবার জন্য তথায় আসিয়া বাসস্থান স্থাপন করিতে লাগিলেন। অনেক দেবমন্দির ও বহুবিধ বিগ্রহ স্থাপিত হইল; নীলমাধব

নামক বিগ্রহ মূর্ত্তি তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, এই মূর্ত্তি এখনও কলস কাঠীর জমীদার-বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত আছেন। জানকীবল্লভের বংশধরগণ ইঁহাকে কুলদেবতাজ্ঞানে বিশেষ ভক্তি করিয়া থাকেন।

অরঙ্গপুর তৎকালে উত্তরে রূপাতীলি ও সদবপুর এবং দক্ষিণে-বর্ত্তমান কলসকাঠী হইতে তিন মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এতমাদ-পুর পরগণা বর্ত্তমানে অরঙ্গপুর পরগণাভুক্ত। পূর্ব্বে ইহা দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, পরে ১১৭১ সাল হইতে ১১৮৭ সাল পর্য্যন্ত ইহার রাজস্বের হার বৃদ্ধি হওয়া উপলক্ষে কোম্পানি কাউন্সিলের সঙ্গে অনেক মোকদ্দমা হয়। তাহাতে দক্ষিণের অধিকাংশ ভূমি কোম্পানি-সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়।

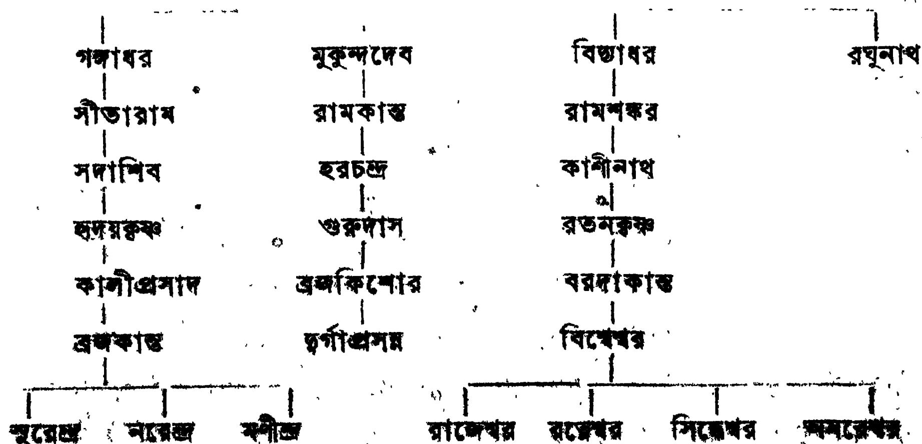
এতমাদপুর পরগণা লাউকাঠী গ্রাম হইতে আবাদ আরম্ভ হয়, কিন্তু যে দিবস প্রথম কাজ আরম্ভ হয় সেই দিবস এক অপূর্ব্ব শালগ্রাম-শিলা উত্থিত হইয়াছিল। জানকীবল্লভ সেই শালগ্রাম-চক্র লাউকাঠী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার পূজার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তিনি স্বীয় জমীদারী রক্ষার্থ আমড়াজুরী হইতে রূপরাম সরকার নামক জনৈক কায়স্থকে প্রধান কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত করিলেন এবং রাধাকান্ত রুদ্র নামক অপর ব্যক্তিকে মুহুরীর পদে নিযুক্ত করিলেন। মুর্শিদাবাদ হইতে প্রত্যাগমন কালে ইনি রামচন্দ্র তর্কলঙ্কার নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে পৌরহিত্য পদ প্রদান করেন ও তাঁহার আশ্রয়দাতা রামগোপাল নাগকে জমীদারীর অধীনে এক তালুক ও নিয়মিত প্রভৃত বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তিনি অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও আত্মীয়-কুটুম্বদিগকে জমীদারীর অধীনে ব্রহ্মোত্তর ও বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া স্বীয় গ্রামে স্থাপন করেন। সেই বৃত্তি-ব্রহ্মোত্তর আজ পর্য্যন্তও তাঁহাদের বংশধরগণ ভোগ করিতেছেন।

জমীদারী-প্রাপ্তির বিশ বৎসর পরে রাজস্বের হার লইয়া রাজকর্ম্মচারি-গণের সহিত জানকীবল্লভের বিবাদ উপস্থিত হয়। এই বিবাদে নবাবের শতাধিক লোক হত হয়। পরে বহুসহস্র ফৌজ লইয়া তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য রাজকর্ম্মচারিগণ আগমন করেন, কিন্তু জানকীবল্লভ তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র ভীত না হইয়া তাহাদিগকে উৎকোচ দানে বশীভূত করেন। এই সংবাদ মুর্শিদাবাদে পৌঁছিলে নবাব তাহার জমীদারী ক্রোক করিয়া

তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য এক পরওয়ানা প্রেরণ করিলেন। ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন থাকিলে কিছুতেই বিপদ আসিতে পারে না। এই সময়ে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যু হওয়ায় আলিবর্দ্দী খাঁর সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বে যে গোলযোগ উপস্থিত হয়, সেই সুযোগে সুচতুর জানকীবল্লভ, রাজকর্ম্মচারী ও ফৌজদিগকে প্রভূত অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া নিরাপদে স্বদেশে উপস্থিত হন।

জানকীবল্লভ কয়েক বৎসর পরে জমীদারীর সনন্দ তাঁহার তৃতীয় পুত্র বিদ্যাধরের নামে পরিবর্ত্তন করেন, কিন্তু আবার ১১৫১ সালে নিজনামে বন্দোবস্ত করেন। সেই বন্দোবস্ত-পত্রের শেষ ভাগে লেখা আছে—"সন ১১৫১ সাল বদসাহ দিন মহম্মদ সাহ আলম বন্দোবস্ত হুজুর চৌধুরাই শ্রীজানকীবল্লভ রায়।"

জানকীবল্লভের প্রথম একটী কন্যা জন্মে, তিনি স্বীয় প্রাণদাত্রী ভ্রাতৃজায়ার নামানুসারে তাহার নাম 'ভবানী' রাখেন। তারপর তাঁহার আর চারিটী পুত্র ও চারিটী কন্যা জন্মে। তিনি শেষজীবনে পুত্রদের হস্তে জমীদারী অর্পণ করিয়া মানবলীলা শেষ করেন। তাঁহার সকল পুত্রই কার্য্যদক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বংশতালিক. প্রদত্ত হইল।



জানকীবল্লভের লোকান্তরের পর তাঁহার পুত্রগণ নির্ব্বিবাদে পুরাতন কর্ম্মচারিগণের সহায়তায় জমীদারী কার্য্য সুচারুরূপে চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র রঘুনাথ প্রায়ই ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে যাতায়াত করিতেন। পরে মহারাজ রাজবল্লভের অনুগ্রহ-দৃষ্টিতে পতিত হওয়ায় তাঁহার বোজরগউমেদপুর পরগণার গোলাবাড়ী নামক কাছারীতে এক প্রধান কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত হন। এই গোলাবাড়ীর কাছারী কলসকাঠী হইতে দুই মাইল দূরে নন্দপাড়া নামক গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ছিল। রঘুনাথ রায়ের ধর্ম্মানুরাগ ও সৌজন্য তাঁহার চরিত্রের মহৎ গুণ ছিল। কর্ম্মদক্ষতা ও মহানুভবতার বলেই তিনি মহারাজ রাজবল্লভের চিত্তাকর্ষণ করেন।

একদা রঘুনাথ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া রাজবল্লভের নিকট উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুর, তুমি সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিয়া কপালে তিলক পর না কেন?" রঘুনাথ তখন উত্তর করিলেন "মহারাজ, কি প্রকারে পরের মাটি দিয়া তিলক পরিব? এখানে আমার নিজস্ব কিছুই নাই।" মহারাজ এই কথায় একটু লজ্জিত হইলেন এবং কয়েকদিন পরে কচুয়া প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রাম একখানা খারিজা তালুকভুক্ত করিয়া রঘুনাথকে প্রদান করিলেন। এই তালুকের আয় সেই সময় বার হাজার টাকা ছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমানে ইহা রঘুনাথের উত্তরাধিকারিগণের হস্তচ্যুত হইয়াছে।

পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার কিঞ্চিৎকাল পরে রঘুনাথ হয়বৎপুর মালোয়ার প্রভৃতি কতিপয় গ্রাম বলপূর্ব্বক হস্তগত করিয়া নিজনামে একটী পরগণা করেন, এবং হয়বৎপুরগ্রামে একটী দীর্ঘিকা খনন এবং কালী-প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং অন্যান্য জাতি স্থাপন করেন। দেবীর অর্চ্চনার জন্য কতক জমিও বৃত্তিরূপে নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। কিন্তু দেবালয়ের কার্য্যাদি সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত না হওয়ায় কলসকাঠী নিবাসী তারিণীচন্দ্র রায় মহাশয়, পণ্ডিত অভয়াচরণ বিদ্যালঙ্কার এবং অন্যান্য লোকজন সমভিব্যাহারে হয়বৎপুর গ্রামে গমন করিয়া মন্দির-সংস্কার এবং প্রতিমা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রঘুনাথপুর পরগণায় ইহাদের প্রদত্ত তিন শত যাইট কেতা ব্রহ্মোত্তর এবং অনেক নিষ্কর ভূমি অদ্যাপি অনেকে ভোগ করিতেছেন।

১১৬৩ সালে রঘুনাথ রায় নিজবাড়ীতে ইষ্টক নির্ম্মিত এক দেবালয় প্রস্তুত করেন, উহাতে নিম্নলিখিত শ্লোকটী খোদিত আছে—

বস্বদ্রিষট্ চন্দ্রমিতে শকাব্দে
বৈশাখ মাসস্য গতেন রাশেঃ।
প্রাচীকবচ্ছ্রী রঘুনাথ শর্ম্মা
বিষ্ণোগৃহং রামধনাভিধেন।

১৬৭৮ শকাব্দায় বৈশাখ মাসের শেষভাগে শ্রীরঘুনাথ শর্ম্মা রামধন নামক জনৈক রাজমিস্ত্রি দ্বারা এই বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

জানকীবল্লভের পুত্রগণের মধ্যে সৌভ্রাত্রের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ইহারা এবং ইহাদের পুত্রগণও একই কর্ম্মচারী দ্বারা জমীদারী-কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন করেন। ১২৯৭ সালে জমীদারী ও অন্যান্য তালুক ইত্যাদি যাবতীয় সম্পত্তি নির্ব্বিবাদে বণ্টন করা হয়। ইহার পরে পুনরায় মালিকগণের প্রার্থনামত ১২৪৬ সালে কলেক্টর কর্ত্তৃক আমিন নিযুক্ত হইয়া বাটোয়ারা কার্য্য আরম্ভ হয় এবং ১২৪৬ সালে শেষ হয়। অরঙ্গপুরের জমীদারী নয় আনী ও সাত আনী এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়। নয় আনী জমীদারী আবার আটটী নম্বরে বিভক্ত হয়।

জানকীবল্লভের বংশধরের মধ্যে অনেকেই স্বধর্ম্মনিরত ক্রিয়াবান তেজস্বী এবং বিচক্ষণ ছিলেন। ইহারা স্বীয় স্বীয় কন্যা কুলীন-পাত্রস্থা করিয়া জামতাকে প্রভূত বৃত্তি দান করিতেন; ইহাদের প্রদত্ত বৃত্তি-ব্রহ্মোত্তর অনেকে এখনও ভোগ করিতেছেন। এই বংশের বরদাকান্ত একজন নিষ্ঠাবান গোঁড়া হিন্দু ছিলেন; সৌজন্য, বদান্যতা ও সর্ব্বোপরি ব্রহ্মণ্যগুণে তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাহার প্রযত্নে কলসকাঠীতে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং গণেশ পূজোপলক্ষে একটী মেলা সংস্থাপিত হয়। বরদাকান্ত একজন সৌভাগ্যশালী পুরুষ ছিলেন, তিনি তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধে নবদ্বীপ, কাশী, কাঞ্চী, মিথিলা প্রভৃতি দূরদেশাগত নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে প্রভূত ধনদান করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

কলসকাঠীর জমীদারগণের অবস্থা বিশেষ উন্নত, ইহাদের মধ্যে ব্রজকান্ত রায় চৌধুরী, বিশ্বেশ্বর রায় চৌধুরী, দুর্গাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

৫৮। সৈদপুর।

এই পরগণা বাখরগঞ্জের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে অবস্থিত, ইহার অধিকাংশ ভূমি হিংস্র জন্তু সমাকুল সুন্দরবনে আচ্ছন্ন ছিল। ইহার পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা জানা যায় নাই। ভূতত্ত্ববিৎগণ মৃত্তিকাভ্যন্তর পরীক্ষা দ্বারা এই স্থির করিয়াছেন যে, কোন সময়ে এই ভূভাগ সমুদ্র-গর্ভে নিহিত ছিল।

এই ভূভাগের কি কারণে সৈদপুর নাম হইল তাহা সম্যকরূপে জানা যায় নাই, তবে অনেকে অনুমান করেন যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট হইতে সুন্দরবনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লইয়া যে ফকীরের সাহায্যে প্রথম আবাদ করা হয়, সম্ভবতঃ তাহার নামানুসারেই পরগণার নাম সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাও দেখা যায় যে এই পরগণাস্থিত কতক জমী টাকীর জমীদার দেবনাথ রায় কর্তৃক আবাদ হওয়ায় উক্ত জমী দেবনাথপুর নামে অভিহিত হইয়াছে।

এই পরগণা পূর্ব্বে পোনাবালিয়ার চৌধুরিগণের জমীদারীর অধীন ছিল। ঢাকানিবাসী লালা মিত্রজিৎ সিংহ ও ব্রজরতন দাসের উত্তরাধিকারিগণ বর্ত্তমান সময়ে এই পরগণার জমীদার। ভগীরথ সিংহ নামক কোন পশ্চিমদেশীয় লোক এই সিংহ-পরিবারের স্থাপয়িতা। ভগীরথ গবর্ণমেন্টের কাননগুই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাহারই ষড়যন্ত্রে এই পরগণা পোনাবালিয়ার চৌধুরিগণের হস্তচ্যুত হইয়াছে।

গবর্ণমেন্টের তুষখালী নামক খাসমহাল এই পরগণা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। টাকীর জমীদার বাবুগণের সহিত মোকদ্দমায়, গবর্ণমেন্ট প্রায় উনিশ হাজার বিঘা জমি তুষখালীর অন্তর্ভুক্ত করেন।

এই পরগণায় কোন স্থানীয় জমীদার নাই, যে সকল জমীদার এই পরগণা ভোগ করেন তন্মধ্যে টাকীর বাবুগণ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য! টাকীর বাবুগণ গুহ বংশোদ্ভব কুলীন কায়স্থ, ইঁহারা প্রবলপ্রতাপ মহারাজ প্রতাপ আদিত্যের খুল্লতাত-ভ্রাতা (রাজা বসন্ত রায়ের পুত্র) কচুরায়ের বংশধর।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ইংরাজ-রাজত্ব।

বৈদ্যকুল-প্রদীপ অতুল দিধীতিসম্পন্ন প্রবলপ্রতাপ মহারাজ রাজবল্লভের নায়েব-দেওয়ান পদ প্রাপ্তি হইতেই ইংরাজ রাজ্যের সূচনা আরম্ভ; নবাব আলিবর্দ্দীর মৃত্যু, তৎপর তদীয় দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলার সিংহাসনারোহণের এক বৎসর পরেই অর্থাৎ ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশ-রাজত্বের পাষাণবৎ স্থায়ী ভিত্তি সংস্থাপিত হইল। তারপর এক মীরকাসেম ব্যতীত যে কয়জন নবাব বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, সকলেই ইংরাজগণের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী; ফলে ইংরাজই রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা, নবাব উপলক্ষমাত্র ছিলেন। কেবল ইংরাজের মন যোগাইয়া তাঁহারা নবাবী করিতেন, এবং ইংরাজের রোষ-কটাক্ষে আবার পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হইতেন।

ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য নবাব অপেক্ষা, মীরজাফরের জামাতা মীর কাসেম একটু স্বাধীনচেতা ও তেজস্বী ছিলেন। তিনি নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেখিলেন যে, একমাত্র কর আদায় ব্যতীত, রাজ্যসম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্যই ইংরাজগণের করে ন্যস্ত, তিনি মাত্র প্রজাপীড়ন করিয়া অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক ইংরাজের প্রাপ্য টাকা শোধ করিবেন, ইহা তাঁহার সহ্য হইল না। গুরগণ খাঁ নামক জনৈক আর্ম্মাণী সেনাপতির সাহায্যে তিনি নূতন গোলন্দাজ সৈন্য, কামান, বন্দুক প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন; ভাবিয়াছিলেন, এই মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া ব্রিটিশ-সিংহকে তাড়াইয়া দিয়া আবার মুসলমান রাজ্য স্থাপন করিবেন। এই সময়ে ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ এবং তাহাদিগের অনুগৃহীত দেশীয় বণিকগণও কোম্পানীর নামে বাদসাহী সনন্দবলে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহাদিগের আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া নবাব মীরকাসেম অন্তর্বাণিজ্যের শুল্ক একেবারে উঠাইয়া দিলেন। ইহাতে দেশীয় বণিকগণের সুবিধা হইল

বটে, কিন্তু ইংরাজ বণিকগণের বিশেষ ক্ষতি হইল ; সুতরাং তাঁহারা বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া, নবাবকে এই আজ্ঞা রহিত করিবার জন্য বলিলেন। নবাব সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া রাজ্যস্থিত ইংরাজগণের গতিবিধি সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিহান হইলেন। উভয় পক্ষই গোপনে গোপনে যুদ্ধসজ্জা করিতে প্রবৃত্ত হইল। ফলে নবাব প্রথমতঃ গড়িয়া, তারপর কাটোয়ার যুদ্ধে পরাভূত হইয়া অযোধ্যার নবাবের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পর বৎসর অর্থাৎ ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে বক্‌সারের যুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া নিরুদ্দেশ হইলেন। কেহ কেহ বলেন যে, মীরকাসেম ফকীরি গ্রহণ পূর্ব্বক ভারতবর্ষ হইতে মক্কা গমন করিয়াছিলেন। মীরকাসেমের অধঃপতনের পর আবার মীরজাফর খাঁ নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। *

১৭৬৫ খৃঃ অব্দে ১২ই আগষ্ট লর্ড ক্লাইব, তদানীন্তন দিল্লীশ্বর সম্রাট সাহ আলমকে বার্ষিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিবার অঙ্গীকারে. বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ গ্রহণ করিলেন। ইহাই ইংরাজ রাজত্বের মূল দলিল বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। ফলতঃ সেই সময় হইতেই প্রকৃতরূপে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নামে ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় জর্জ্জ এই দেশের রাজা হইলেন, এবং সেই সময় হইতেই ইংরাজরাজ এই দেশে রাজ্য পত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইংরাজের তেজস্বিতা, ন্যায়পরতা, সদ্বিচার প্রভৃতি অবলোকন করিয়া দেশবাসিগণ কায়মনোবাক্যে তাহাদের সাহায্য করিতে লাগিল।

এক রাজার রাজ্য গত হইয়া অন্য রাজার রাজ্য পত্তন হইবার পূর্ব্বে যে সময়টুকু থাকে, তাহাতে দস্যুভীতি, দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার প্রভৃতি অরাজকতা চিরপ্রসিদ্ধ। অস্মদ্দেশ যে এই অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল তাহা নহে। তবে প্রবলপ্রতাপ ইংরাজ-রাজের সুশাসনে কতিপয় বৎসর মধ্যেই এই অত্যাচার প্রশমিত হইয়াছিল।

"যার লাঠি, তার মাটি" এই কথাটি দেশপ্রসিদ্ধ ; ফলতঃ সেই অরাজকতার সময়ে ইহার সার্থকতা অক্ষরে অক্ষরে সম্পাদিত হইয়াছিল। সবল ভূম্যধিকারিগণ, দুর্ব্বল ভূস্বামীর জমীটুকু কাড়িয়া লইতেন। নীচ জাতীয় হিন্দুমুসলমান দলবদ্ধ হইয়া দেশের মধ্যে লুঠপাট করিত।

---

* Siyar-ul-Mutaakhirin vol II.

এই সময় হইতে অনেক লোক স্বাধীনভাবে লবণের জ্বাল দিতে আরম্ভ করে; তাহারা এই কার্য্যের জন্য অনেক নিরীহ লোককে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আটক করিত। কেহ আপত্তি করিলে, অথবা প্রতিবন্ধক হইলে, তাহার দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না। লবণের জ্বাল অনেক বৎসর হইল উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাদের বংশধরগণ অদ্যাপি "মলঙ্গী" নামে জনসমাজে পরিচিত। ইংরাজ-রাজ্য পত্তন হইবার পূর্ব্ব হইতেই নৌ-দস্যুতা এত প্রবল হইয়াছিল যে, তজ্জন্য দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী ইংরাজ-রাজকেও ত্রাসিত এবং সতর্ক হইতে হইয়াছিল; এমন কি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পণ্যদ্রব্য, যাত্রীর নৌকা প্রভৃতিও লুণ্ঠিত হইয়াছিল।*

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ তাহাদের নামে রাজ্যশাসন-ভার গ্রহণ করিয়া ১৭৭২ খৃঃ অব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। হেষ্টিংস যে প্রকার বুদ্ধিমান, তদ্রূপ কর্ম্মঠ ছিলেন। তিনি নূতন রাজ্য পত্তন সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য, অনন্যমনে তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কলিকাতায় রাজধানী স্থাপন করিয়া, মুর্শিদাবাদ হইতে রাজ-কোষ এবং অন্যান্য কার্য্যালয় তথায় উঠাইয়া আনিলেন। এই সময় হইতে "জিলা" গঠিত হয় এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্য্যালয় স্থাপিত হয়। কলেক্টর দেওয়ানীকার্য্য করিতেন, একজন মুসলমান কাজী দ্বারা ফৌজদারী বিচার নির্ব্বাহ হইত।

লর্ড ক্লাইভ কর্ত্তৃক বিজিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজ্য, দিন দিন শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন দেখিয়া মহামান্য ব্রিটিশ পার্লিয়েমেন্ট ১৭৭৩—১৭৭৪ খৃঃ অব্দে রেগুলেটিং য়্যাক্ট (Regulating Act) নামক আইন প্রচার করিলেন।

---

* A sloop returning from Dacca to Calcutta, had been attacked by dacoits near Serampur, who had plundered the crew of what they had and murdered five of them, after having cut the rigging, sails, cables etc. Having information also of several sloops and boats being on the way from Calcutta to Dacca, and that as the ways between this and Bakergunge are greatly infested with dacoits, it was agreed that a party of ten men with a surgeant, corporal, and ten Baxeries, be sent down as far as Bakergunge and convey hither all vessels belonging to the English.—India Office Records, 4th June 1745.

In 1764, we find, that an English gentleman named Mr. Rose was murdered by dacoits near Bakarganj.—H. Beverige's Hisotry Bakarganj, Page 308.

এই আইনানুবলে, ওয়ারেণ হেষ্টিংস সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় ব্রিটিশ রাজ্যের গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইলেন; এবং কলিকাতায় "সুপ্রিম কোর্ট" নামক সর্ব্বপ্রধান স্বাধীন বিচারালয় সংস্থাপিত হইল।* ইহার পর হইতেই বঙ্গদেশান্তর্গত যাবতীয় জিলায় রীতিমত কাছারী স্থাপিত হইয়া নিয়মিত কার্য্য আরম্ভ হইল। এই জিলার সর্ব্বপ্রথম বর্ত্তমান ঝালকাঠী থানার অন্তর্গত বারইকরণ গ্রামে সরকারি কার্য্যালয় স্থাপিত হয়। মিঃ বেভারিজ্ তৎপ্রণীত ইতিহাসে ইহার কোন সন তারিখ নির্ণয় করেন নাই।† তথায় স্থানে স্থানে এখনও ভগ্ন ইষ্টকসমূহ প্রভৃতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে স্থানে পূর্ব্বে কাছারী ছিল, স্থানীয় প্রাচীন অধিবাসিগণ বলেন যে, তাহার অধিকাংশ এখন নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে; তবে পূর্ব্বথানার চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান দেখা যায়।

১৭৯২ খৃঃ অব্দে বারইকরণ হইতে বাখরগঞ্জে সরকারি আফিসাদি স্থানান্তরিত করা হয়। তখন মিডল্‌টন্ সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট্, সম্ভবতঃ তিনিই সর্ব্বপ্রথম স্থানীয় শাসনকর্ত্তা; জজ এবং ম্যাজিষ্ট্রেট্ এই উভয়ের যাবতীয় কার্য্যই তাঁহার একা দ্বারা নির্ব্বাহ হইত।

১৮০১ খৃঃ অব্দে বাখরগঞ্জ হইতে রাজধানী উঠাইয়া বর্ত্তমান বরিশালে

---

* The Regulating Act came into operation in 1774 though it had been passed in 1773. It laid down some wise laws about the appointment of the Directors of the East India Company in London; its most important provisions immediately affecting India were the following :—

(1) That the Governor of Bengal should henceforth be the Governor General; and with his council should be supreme over all the British possession in India.

(2) That a Supreme Court of Judicature should be established in Calcutta, consisting of a Chief justice, and two other Judges, all Barristers, appointed by the English Ministers of State, and independent of the Company.

In consequence of this act Mr. Hastings became Governor General of India, as well as Governor of Bengal, in October 1774.—Sir R Lethbridge's History of Bengal, pp. 104-105.

† Local tradition points to Baraikaran as the old headquarters of the district, and this is supported by a reference in the decree for the resumption of Baraikaran *Char* to a piece of land therein which had originally been Mr. Christopher Keating's *Cutchery*. * * * The ancient importance of Baraikaran is also shown by the fact that it was the site of the Police station, which was not removed from it to Nalchiti until 1824.—H. Beveridge's History of Bakarganj, P. 308.

স্থাপিত হয়। তখন মিঃ উইন্টেল সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট্। বর্ত্তমান সময়েও জিলার যাবতীয় রাজকার্য্য এই স্থানে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

বেভারিজ্ সাহেব বলেন যে, বারইকরণের পর বোজরগউমেদপুরে কলেক্টরী আফিস স্থাপিত ছিল, এবং জিলা সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্যও সেখানে নির্ব্বাহ হইত। বাখরগঞ্জে জিলা পরিবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে মিঃ লজ্ বোজরগউমেদপুরে কলেক্টর ছিলেন; চন্দ্রদ্বীপ, সেলিমাবাদ, জাফরাবাদ, সৈদপুর, অরঙ্গপুর এবং আজিমপুর, বোজরগউমেদপুর জিলার অধীনে ছিল। ১৭৮২ খৃঃ অব্দে উহা ঢাকা-কলেক্টরীর তৌজিভুক্ত হয়।*

স্যার হান্টার বলেন যে ইংরাজকর্ত্তৃক বঙ্গরাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইবার পর হইতে ১৮১৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কলেক্টরী সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য ঢাকা-কলেক্টরীর তৌজিভুক্ত ছিল।†

ঢাকা হইতে কলেক্টরী পৃথক হইলে হাণ্টার সাহেব প্রথম কলেক্টর নিযুক্ত হইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ পৃথক রহিলেন, তাহাকে রাজস্ব সম্বন্ধে কোন কার্য্য করিতে হইত না। সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হইবার প্রায় সাত বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৭৮১ খৃঃ অব্দে মফস্বলে সিবিল কোর্ট স্থাপিত হইবার আইন লিপিবদ্ধ হইল। তখন ইংরাজশাসিত বঙ্গদেশ মধ্যে অষ্টাদশটী জিলার নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে বাখরগঞ্জ অন্যতম; কিন্তু কোন্ বৎসর প্রথমে সিবিলকোর্ট এই জিলায় সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না। সম্ভবতঃ বারইকরণ হইতে বাখরগঞ্জ জিলা স্থানান্তরিত হইবার দুই তিন বৎসর পরে সিবিলকোর্ট স্থাপিত হইয়া থাকিবে। তৎকালে বাখরগঞ্জের যে সীমা ছিল, তাহা দেখিলে অবাক

* Mr Lodge also held the office of Collector of Buzurgumedpur, which was a zilla or collectorate district long before Bakarganj. It appears from a letter of Mr. Lodge, dated the 12th August 1786, which is preserved in the office of the Board of Revenue that the Pargannas of Chandradwip, Selimabad, Jaffarabad, Syedpur, Arangpur and Azimpur were attached to the zila of Buzrugumedpur. Buzrugumedpur apparently remained a separate charge till 1787, when it was annexed to the Collectorate of Dacca.—H. Beveridge's History of Bakarganj, Page 311.

† From the time of the acquisition of Bengal by the British, up to the end of 1817, Backergunja formed a part of Dacca Collectorate.—Sir, W. W. Hunter's Statistical Account of Bengal (Backergunj), Page 217.

হইতে হয়। তখন ঢাকা বিভাগস্থ গঙ্গা এবং কালীগঙ্গার দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে মেঘনা, চাঁদপুর এবং সমুদ্রের পশ্চিম পর্য্যন্ত ভূখণ্ড বাখরগঞ্জের অধীনে ছিল। ইহার পশ্চিম সীমায়, ভূষণা, যশোর এবং রাজমঙ্গল (রায়মঙ্গল ?) নদীর মোহানা পর্য্যন্ত যতগুলি দ্বীপ ঢাকার অধীনে ছিল, একমাত্র সন্দ্বীপ এবং তদধীনস্থ দ্বীপ ব্যতীত সমস্তই বাখরগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত ছিল।*

ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, বাখরগঞ্জ সাধারণ স্থান ছিল না। বর্ত্তমান জিলায় যেটুকু সীমা দৃষ্ট হইয়া থাকে উল্লিখিত সীমা তদপেক্ষা দ্বিগুণ অথবা ততোধিক হইবে। এক জন ম্যাজিষ্ট্রেট্ দ্বারা সুশাসন না হওয়ায় ইহার অনেক স্থান পর্শ্ববর্ত্তী জিলাভুক্ত হইয়াছে। ফরিদপুর, খুলনা, নোয়াখালী প্রভৃতি পার্শ্ববর্ত্তী জিলাসমূহ একরূপ বাখরগঞ্জের ভূমি দ্বারা গঠিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে ইংরাজ রাজ্য পত্তন হইলেই অতি সত্বর এই জিলা স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার দুইটী কারণ উপলব্ধি হয় ; প্রথমতঃ এই দেশে প্রচুর পরিমাণে শস্য, পাট, নারিকেল, সুপারী প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, এই সকল উৎপন্ন সামগ্রীর মূল্য অল্প অথচ দ্রব্য উৎকৃষ্ট ; দ্বিতীয়তঃ বাণিজ্য করিবার অত্যন্ত সুবিধা, কেননা জলপথে পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করা যেরূপ সুখসাধ্য তদ্রূপ অল্প ব্যয়সাধ্য। বিশেষতঃ তৎকালে সাহাবাজপুর, বোজরগউমেদপুর, সেলিমাবাদ প্রভৃতি পরগণায় একরূপ উৎকৃষ্ট

* "The Board, taking into consideration the present state of the administration of civil and criminal justice throughout the provinces, pass the following resolution: That to remedy the inconveniences, occasioned by the too extensive jurisdiction of the Mofussil Dewany Adalats established by the resolutions of 28th March 1780, and thereby promote the more rapid and effectual administration of justice, the following Courts of Civil Justice, including those now existing, be established throughout the provinces." Then follow the names of eighteen courts, among which Jessore appears under the name of Moorly. The boundaries given of Bakarganj are as follows: "The jurisdiction of Backergunje consisting of that portion of Dacca Province lying on the south-west of Ganges or Padma and the Cali-Ganges, and to the west of the Meghna from Chandpur to the sea ; having its western limits the eastern frontier of Boosna and Jessore, down to the mouth of the River of Raj Mangal, including also all the islands belonging to and situated on the coast of the Dacca Province, except the pargana of Sandwip and its dependencies. —Sixth Report of the House of Commons, Page 889. (quoted from the appendix of Mr. Beveridge's History of Bakarganj. Pp 442)

লবণ প্রস্তুত হইত যে তদ্রূপ দ্রব্য নিম্নবঙ্গে কোথাও হইত না। পর্ত্তুগীজ বণিকগণ প্রথমতঃ এই বাণিজ্যের আকাঙ্ক্ষায় এদেশে আগমন করেন, এবং তন্মধ্যে কেহ কেহ বিস্তর লাভবান হইয়াছিলেন।*

বাখরগঞ্জ হইতে বরিশাল জিলা স্থানান্তরিত হইলে নৌ-দস্যুতা অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি হইল। মিঃ মিড্‌ল্টন্ তখন ম্যাজিষ্ট্রেট্; তিনি আলিয়ার খাঁ নামে জনৈক দক্ষ গোয়েন্দাকে দক্ষিণ সাহাবাজপুর অঞ্চলে চোর, ডাকাইত প্রভৃতি ধৃত করিতে প্রেরণ করিলেন। আলিয়ার খাঁ প্রায় তিন শত লোক ধৃত করিয়া আনয়ন করিলেন; বিচারে তাহাদের যথারীতি শাস্তি হইলে পর সেই হইতে দস্যুতা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইল। বরিশালে পৃথক কলেক্টরী স্থাপিত হইলে ফৌজদারী এবং দেওয়ানী কার্য্য অনেক বাড়িয়া গেল; এই সময়ে মহকুমা করিবার প্রস্তাব হইল। তদনুসারে বাখরগঞ্জে পিরোজপুর, পটুয়াখালী, দৌলতখাঁ তিনটী মহকুমা স্থাপিত হয়। ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে পিরোজপুর, ১৮৭১ খৃঃ অব্দে পটুয়াখালী, এবং ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে দৌলতখাঁয় মহকুমার কার্য্য আরম্ভ হয়। বিগত ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে মহাঝড়ে দৌলতখাঁ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে তথাকার মহকুমা পর বৎসর ভোলায় স্থানান্তরিত হইল। আজকাল যেমন স্থানে স্থানে থানা এবং পুলিশ-ফাঁড়ি স্থাপিত দেখা যায়, আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন এই জিলায় মাত্র নলছিটি, গৌরনদী, বাউফল, আঙ্গারিয়া, গলাচিপা এবং কেওয়াড়ি এই ছয়টী থানার নাম দেখিতে পাই। বর্ত্তমান সময়ে এই স্থানে ষোলটী থানা এবং দশটী ফাঁড়ি হইয়াছে।

খুলনা জিলার অন্তর্গত বাগেরহাট মহকুমাধীন যত স্থান, তাহা পূর্ব্বে এই জিলাভুক্ত ছিল; বিগত ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে খুলনার অন্তর্ভুক্ত হয়। তাহার দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে মাদারিপুর এবং কোটালী-পাড়া ফরিদপুরভুক্ত হইল। মহকুমা স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে বাখরগঞ্জ থানার অধীন কোটেরহাট, বাউফল, কাউখালী ও মেহেন্দিগঞ্জে মুন্সেফী চৌকী ছিল। তথায় এক এক জন মুন্সেফ দেওয়ানী বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। পটুয়াখালীতে মহকুমা স্থাপিত হইলে কোটেরহাট ও বাউফলের মুন্সেফী চৌকী উঠিয়া মহকুমার অন্তর্গত হয়। সেই প্রকার

* Portuguist Travellers in India.

কাউখালী, পিরোজপুরে, এবং মেহেন্দিগঞ্জ প্রথমে দৌলতখাঁয়, পরে ভোলায় মহকুমাভুক্ত হইল।

এই সময়ে আইন প্রভৃতির বড় কড়াকড়ি ছিল না; জমীদারগণ, অথবা স্থানীয় প্রধানগণই দেওয়ানী ও ফৌজদারীর বিচার নির্ব্বাহ করিতেন। ১৮৬০ সালে ফৌজদারী দণ্ডবিধি-আইন প্রচলিত হয়। ইহার পর শাসন-কার্য্য বিশেষ দৃঢ়তার সহিত আরম্ভ হইল। বর্ত্তমান সময়ে হত্যাকারিগণের প্রাণদণ্ড জেলের মধ্যেই হইয়া থাকে, কিন্তু বহুপূর্ব্বে সেরূপ নিয়ম ছিল না। যে স্থানে নরহত্যা হইত, অপরাধীকে সেই স্থানেই ফাঁসি দেওয়া হইত। ইহা দ্বারা অন্যান্য সকলের মনে একটা বিকট আতঙ্ক উপস্থিত হইত, তদ্রূপ একটা উদাহরণও থাকিত। ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে নিলামী আইন জারি হয়; নির্দ্দিষ্ট দিনে কলেক্টরীতে দেয় রাজস্ব দাখিল না করিলে সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় হইত। এই আইন জারি দ্বারা ভূম্যধিকারী-সাধারণের ক্ষমতা অনেক হ্রাস হইল। এই অনুসারে বহু প্রাচীন জমীদারী এবং তালুকের অস্তিত্ব লোপ হইয়া পরস্বত্ব হইয়াছে। বাকলা চন্দ্রদ্বীপ, সেলিমাবাদ, ইদিলপুর প্রভৃতি পরগণাই তাহার দেদীপ্যমান প্রমাণ।

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিকের সময়ে সতীদাহ এবং গঙ্গাসাগরে পুত্রকন্যা বিসর্জ্জন-প্রথা রহিতকর আইন লিপিবদ্ধ হয়; ইংরাজ রাজত্বের সময় হইতে এই আইন জারির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই জিলায় (যে পর্য্যন্ত হিসাব রাখা হইয়াছে) ১৬০টী সতীদাহ হইয়াছে।* ১৮২৯ খৃঃ অব্দে এই আইন লিপিবদ্ধ হইয়া, তৎপর বৎসর ইহা প্রচলিত হয়। মিঃ গ্যারাট্ তখন এই জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন।

লর্ড ডেলহাউসীর শাসনসময়ে ভারতবর্ষের অনেক বিষয়ের উন্নতি সাধিত হয়; তন্মধ্যে সাধারণের সুবিধার জন্য পূর্ত্ত বিভাগ, পোষ্টাফিস সংক্রান্ত সুবিধাজনক কার্য্যপ্রণালী এবং সর্ব্বাপেক্ষা পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারই শাসন সময়ে কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। জিলায় জিলায় গভর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ ব্যয়ানুকূল্যে উচ্চ বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা আরম্ভ

* India Office Records.—(ইহার পরও কয়েকটী সতীদাহ হইয়াছে, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়।)

হয়। আমাদের বরিশাল জিলা-স্কুলও এই সময়ে স্থাপিত হয়। বিগত ১৮১৪ খৃঃ অব্দে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল ; ইহার পূর্ব্বে এই জিলায় আর কোন স্থানেই ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল না।

লর্ড ক্যানিং মহোদয়ের শাসনসময়ে ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে সিপাহী-বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই মহাবিদ্রোহে যে কালাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, প্রতাপান্বিত ব্রিটিশরাজ তখন বদ্ধপরিকর হইয়া এই দেশ রক্ষা না করিলে, যে কি সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইত, তাহা ধারণা করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ঢাকা লালবাগস্থ হতাবশিষ্ট সিপাহিগণ বরিশাল আক্রমণ করিবে এরূপ জনরব হইলে, নাগরিকগণের অন্তঃকরণে বিষম ভয় উপস্থিত হইল। ভদ্র অধিবাসিগণ স্ত্রী-পুত্র-পরিবার লইয়া কেহ নৌ-যানে, কেহ বা তট-পন্থায় পলায়ন করিতে লাগিলেন। স্থানীয় ইংরাজগণ বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্রাদি লইয়া স্ত্রীপুত্রাদিসহ, বর্ত্তমান যে দালানে ইষ্টার্ণ মরগেজ্ কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ বাস করেন, সেই স্থানে সমবেত হইলেন। চতুর্দ্দিকে সঙ্গিনধারী পুলিশ কনেষ্টবল পাহারায় নিযুক্ত রহিল। ভাগ্যক্রমে বিদ্রোহী-দল এদিকে আসিল না ; নচেৎ মুষ্টিমেয় কনেষ্টবল এবং সিবিলিয়ানগণ তাহাদের পাশবিক অত্যাচারে নিশ্চয়ই হত হইত। বাখরগঞ্জের কোন কোন ভূম্যধিকারী এই বিদ্রোহিগণের সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া শত্রুগণ মিথ্যা রটনা করিয়া দেয় ; তজ্জন্য তাঁহারা বিশেষরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে ১লা নবেম্বর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্থলে, এই ভারতসাম্রাজ্য, মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যান্তর্ভুক্ত হইল। সেই সময় হইতে রাজকীয় যাবতীয় কার্য্য মহারাণীর স্বনামে আরম্ভ হয়।

ইহার অল্প দিন পরে খাজানা বিষয়ক ১০ আইন এবং কারেন্সী নোট প্রচারিত হইল। পূর্ব্বে অস্মদ্দেশীয় জমীদারগণ খাজানা আদায় সম্বন্ধে আইনের কোন ধার ধারিতেন না ; প্রজার শস্য দ্বারা অথবা তাহাদের ধরিয়া আনিয়া প্রাপ্য খাজানা আদায় করিতেন। ১০ আইন এবং ৪৫ আইন (দণ্ডবিধি) জারি হইলে তাহাদের ক্ষমতা বড়ই খর্ব্ব হইয়া গেল। প্রজাগণও খাজানা আদায় সম্বন্ধে জমীদারের বড় ধার ধারিত না ; কারণ ১০ আইন দ্বারা খাজানা আদায় করা কোন কোনও সময়ে ভূম্যধিকারীর পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য হইত। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে ষ্ট্যাম্প আইন এবং

১৮৬৫ খৃঃ অব্দে রেজিষ্ট্রি আইন জারি হয়। ১৮১৩ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৬৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কাজীর রেজেষ্ট্রি ছিল, ইহার পূর্ব্বে দেশীয় কাগজেই যাবতীয় দলিলাদি লিখিত হইত। কোন কোন সম্পন্ন জমীদার দানপত্র প্রভৃতি তাম্রফলকে লিখিয়া দিতেন। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে প্রথমতঃ অস্ত্র আইন জারি হইল। সাধারণ প্রজাবর্গ তখন বন্দুকাদি ইচ্ছামত প্রস্তুত এবং ব্যবহার করিতে পারিত; কেবল ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে জানাইতে হইত। বিগত ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে এই জিলার সমস্ত বন্দুক গবর্ণমেণ্ট কাড়িয়া লইয়াছেন। গভীর রাত্রিকালে বন্দুক দ্বারা গুপ্ত নরহত্যাই ইহার উল্লেখ-যোগ্য কারণ; তবে নরহত্যাকারিগণের মধ্যে প্রায় সকলেই নীচজাতীয়।

প্রজারক্ষা রাজার সনাতন ধর্ম্ম; তাই গবর্ণমেণ্ট সমগ্র অধিবাসিগণকে নিরস্ত্র করিয়াছেন; কিন্তু ধর্ম্মভীরু ভদ্রসন্তান এবং নিরীহ প্রজাগণের অন্ততঃ হিংস্র জন্তু এবং দস্যু হইতে আত্মরক্ষার উপায় সম্বন্ধে একটু দৃষ্টি করিলে বোধ হয় ভাল হইত। ১৮১২ খৃঃ অব্দে ১৬ই ফেব্রুয়ারী বরিশাল নগরীতে একটী ছোট-খাট বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে জেলখানা যে প্রকার সুদৃঢ় উচ্চ প্রাচীর এবং বৃহৎ অট্টালিকসমূহ দ্বারা বেষ্টিত, সে সময়ে তাহা ছিল না। চতুর্দ্দিকে সুদৃঢ় সুন্দরী কাঠের বেড়া এবং কয়েদি-গণের বাসোপযোগী কয়েকখানি কারাগৃহ ছিল। কয়েদিগণ উত্তেজিত হইয়া গৃহগুলিতে অগ্নি দিয়া সামান্য বেড়া উল্লঙ্ঘন করতঃ "মার" "মার" শব্দে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল। কতকগুলি নীচ জাতীয় মুসলমানও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল। তখন মিঃ বেটিয়া এই জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্; সুবেদার ও পুলিশ-কনেষ্টবলগণের সাহায্যে তিনি জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্রোহিগণের আকস্মিক আক্রমণে তাঁহাকে অনেক স্থানে আঘাত পাইতে হইয়াছিল। সুবেদার সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছিল। বিদ্রোহিগণের মধ্যে দশ বার জন হত হইলে, তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

মহামতি লর্ড রিপণের সময়ে স্বায়ত্তশাসন আইন প্রচলিত হয়। সেই সময়ে বঙ্গকুলগৌরব মহামনস্বী রমেশ চন্দ্র দত্ত, বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন; তখন হইতেই অস্মদ্দেশে স্বায়ত্তশাসন আরম্ভ হইল। জিলা-বোর্ডের অধীনে প্রত্যেক মহকুমায় স্থানীয় বোর্ড সংস্থাপিত হইল।

লর্ড ডফরিণের সময়ে বিগত ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে ১লা নবেম্বর প্রজা-ভূম্যধিকারী সংক্রান্ত নূতন আইন প্রচলিত হয়। এই আইন দ্বারা ভূম্যধিকারিগণ অপেক্ষা প্রজাগণের বিশেষ সুবিধা পরিলক্ষিত হইতেছে। স্থানীয় অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী, প্রজাগণের কাছে খাজানা আদায় করিবার জন্য হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছেন।

১৮৮৩—৮৪ খৃঃ অব্দে বরিশাল সদরে প্রথম টেলিগ্রাফ আফিস প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং অনতিবিলম্বে ঝালকাঠী, নলছিটি, পিরোজপুর, গৌরনদী, সাহেবগঞ্জ, বাটাজোড় এবং রহমতপুর পোষ্টাফিসের সঙ্গে টেলিগ্রাফ আফিস স্থাপিত হইল।

কলিকাতা, ঢাকা প্রভৃতি হইতে এ জিলায় গমনাগমনের জন্য পূর্ব্বে নৌকার বন্দোবস্ত করিতে হইত; ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড স্থাপিত হইলে ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে প্রথমতঃ বরিশাল হইতে খুলনা পর্য্যন্ত প্লোটিলা কোম্পানী ষ্টীমার চালাইতে আরম্ভ করে। কলিকাতার ঠাকুর বাবুগণ এই কোম্পানীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া খুলনা পর্য্যন্ত আর একখানি ষ্টীমার চালাইতে আরম্ভ করেন। উভয় দলে কয়েকদিন বিলক্ষণ প্রতিযোগিতা হওয়ায় এক সময় বরিশাল হইতে খুলনা পর্য্যন্ত মাত্র চারি আনা ভাড়া হইয়াছিল। অল্পদিন পরে, ঠাকুর বাবুগণ, প্লোটিলা কোম্পানী হইতে কয়েক সহস্র টাকা গ্রহণ করিয়া লাইন ছাড়িয়া দিলেন; তদবধি প্লোটিলা কোম্পানীর একাধিপত্য স্থাপিত হইল। বর্ত্তমান সময়ে ধনকুবের আর, এস্, এন্ কোম্পানী (Rivers Steam Navigation Company) লাইন গ্রহণ করিয়া বরিশাল নগরীতে প্রবীণ ষ্টেশন, এবং কারখানা স্থাপন করিয়া আসাম, ডিব্রুগড় পর্য্যন্ত সুদূর দেশে বিনা ক্লেশে এবং অল্পব্যয়ে গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা এবং বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিয়াছেন। লাখুটিয়ার স্বনামধন্য জমীদার রাজচন্দ্র রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাখালচন্দ্র রায়, এবং জলাবাড়ীর খ্যাতনামা জমীদার বৈকুণ্ঠনাথ বিশ্বাস এবং তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ, কয়েক মাস যাবৎ যাত্রী-ষ্টিমার চালাইয়াছিলেন।

একমাত্র গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত ইংরাজী বিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন একটী মধ্যবাঙ্গালা বিদ্যালয় ব্যতীত, এই জিলায় উচ্চশিক্ষার উপযোগী আর কোন ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল না। বাটাজোড় নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত

রাজকর্ম্মচারী সুবিখ্যাত ব্রজমোহন দত্ত বিগত ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে ২৭শে জুন বরিশালে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তদীয় পুত্র স্বনামধন্য অশ্বিনী কুমারের অদম্য উৎসাহ এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে দিন দিন বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে এই বিদ্যালয় দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত হইল। বর্ত্তমান সময়েও এই কলেজ এবং তৎসংক্রান্ত স্কুল নিম্নবঙ্গে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। অশ্বিনী কুমারের এই মহৎ কার্য্যে বরিশালবাসী জনসাধারণ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। অধিক বলিতে কি, সাধারণের হিতকর সমস্ত কার্য্যেই তিনি অগ্রণী। ব্রজমোহন-বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার চারি বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে লাখুটিয়ার জমীদার বিহারীলাল রায়, তদীয় পিতৃদেব রাজচন্দ্রের নামে একটী উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন, ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে উহাও কলেজে পরিণত হয়। উক্ত কলেজে আইন-শিক্ষা-বিভাগ থাকায় উহা প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত হইল। দুঃখের বিষয় এই যে, উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের শিথিলতায় কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় উহা উঠাইয়া দিয়াছেন। উল্লিখিত সদ্দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া বর্ত্তমান সময়ে এই জিলাস্থ অনেক সমৃদ্ধিশালী গ্রামে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

বিগত ১৮৯০ খৃঃ অব্দে গৈলা নিবাসী লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল রজনীকান্ত দাশগুপ্তের যত্নে বরিশালে টেক্‌নিকেল স্কুল (পুর্ত্ত কার্য্য-শিক্ষাবিষয়ক বিদ্যালয়) স্থাপিত হইয়া, ম্যাজিষ্ট্রেট্, মহাত্মা বেল্ সাহেবের চেষ্টায় শিবপুরস্থ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শাখা শ্রেণীভুক্ত হইল। এই বিদ্যালয় হইতে প্রতিবৎসর বহু সংখ্যক ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতেছে।

অতি অশুভক্ষণে ভয়ঙ্করী প্লেগ (মহামারী) রাক্ষসী বোম্বাই নগরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। এই নরশোণিতলোলুপা পিশাচী ধীরে ধীরে ভারতের প্রায় স্থানেই ইহার সংহারিণী মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া নরকুল ক্ষয় করিতেছে। আমাদের এই ক্ষুদ্র ভূখণ্ডও ইহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। এই রোগ বিগত ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে নলছিটি থানার অন্তর্গত সিদ্ধকাঠী গ্রামে আবির্ভূত হইয়া, "গৃহলক্ষ্মী", "বঙ্কিমচন্দ্র" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা জমীদার গিরিজাপ্রসন্নকে প্রথম আক্রমণ করিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় নবীনা সহধর্ম্মিণী ও পুত্রশোকাতুরা বৃদ্ধা জননীকে গ্রাস করিয়া, সিদ্ধকাঠী

এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম ছড়াইয়া পড়িল। তখন মহামতি এন্, ডি, বিট্‌সন্ বেল্, এই জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট্। এই মহাপুরুষ স্বীয় জীবনের মমতা পরিত্যাগ করিয়া মহামারীর করাল কবল হইতে এই দেশকে যে ভাবে রক্ষা করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।

প্লেগাক্রমণ শুনিয়া সাহেব বাহাদুর, তৎক্ষণাৎ সিবিল সার্জ্জন ও অন্যান্য ডাক্তার সমভিব্যাহারে স্বয়ং সিদ্ধকাঠী গমন করিলেন। এদিকে মহামারী নিকটবর্ত্তী গ্রামেও ছড়াইয়া পড়িল; অধিবাসিগণ মহাতঙ্কে স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া চতুর্দ্দিক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মহাত্মা বেল্ তথায় পৌঁছিয়া যে সমস্ত ইতর পল্লীতে এই মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সমস্ত স্থানের যাবতীয় স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা প্রভৃতিকে পৃথক পৃথক নৌকায় রক্ষা করিয়া, সকলকে উপযুক্ত আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ছোট ছোট বালকবালিকাগণের জন্য, খেলার সামগ্রী, কখন কখন বা উৎকৃষ্ট মিঠাই আনিয়া দিতেন। ইতিমধ্যে জনৈক শঙ্খবণিক উক্ত মহামারীতে গৃহমধ্যে মৃতাবস্থায় পড়িয়া রহিল; ভয়ে কেহ তাহার সৎকার করিতে গেল না; মৃত ব্যক্তির একমাত্র স্ত্রী, সেই শবদেহ কোলে করিয়া রহিল। এই ভীষণ ঘটনা বেল্ সাহেবের কর্ণগোচর হইলে তিনি স্বয়ং তথায় গমন পূর্ব্বক মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর সাহায্যে তাহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাধা করিলেন। তিনি স্বীয় জীবনের মমতা পরিত্যাগ করিয়া যে ভাবে বিপন্নদিগকে সাহায্য করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নাম বাখরগঞ্জবাসিগণের হৃদয়স্থ অস্থিপঞ্জরে চিরখোদিত থাকিবে। এই মহাত্মা তখন উক্ত দুরন্ত রোগ দমনের জন্য এবম্বিধ চেষ্টা না করিলে, বোধ হয় প্লেগ-রাক্ষসী অর্দ্ধাধিক অধিবাসিগণকে উদরসাৎ করিত।

অস্মদ্দেশে পূর্ব্বে সাধারণের হিতকর কোন সভা-সমিতি ছিল কিনা তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। বিগত ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে অথবা তৎপর বৎসর ইষ্ট বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েসন্ (East Bengal Land Holders' Association) নামক সভার একটী শাখাসভা বরিশাল নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। কীর্ত্তিপাশার জমীদার প্রসন্নকুমার সেন, বাসণ্ডার জমীদার সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্রনাথ সেন, সায়েস্তাবাদের নবাব সৈয়দ মীর মোয়াজ্জাম হোসেন্ খান্ বাহাদুর, লাখুটিয়ার জমীদার রাখালচন্দ্র রায়

এবং বিহারীলাল রায় প্রভৃতি ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। দুই তিন বৎসর সভার কার্য্য কোন প্রকারে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল; কিন্তু দেশীয় অন্যান্য ভূম্যধিকারিগণ যোগ না দেওয়ায় শীঘ্রই ইহার অস্তিত্ব লোপ হইল। এইরূপ সাধারণ-হিতকল্পসভা রীতিমত চলিলে, তদ্বারা দেশের মহৎ কল্যাণ সাধিত হইত, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই সভা থাকিলে, বোধ হয়, অস্মদ্দেশীয় কয়েকটী পুরাতন সমৃদ্ধিশালী জমীদার দরিদ্রভাবাপন্ন হইতেন না; অথবা জমীদারগণ পরস্পরের সম্পত্তি গ্রহণেচ্ছায় আইন-জীবিগণের বিশাল উদর পূর্ণ করিতে হৃতসর্ব্বস্ব হইতেন না।

১৮৭০ খৃঃ অব্দে মুদ্রাযন্ত্র প্রথমতঃ বরিশাল নগরীতে বাসণ্ডা নিবাসী সূর্য্যচন্দ্র গুপ্ত স্বনামে স্থাপিত করেন। "পরিমল বাহিনী" নামক একখানি পাক্ষিক সংবাদপত্র সেই মুদ্রাযন্ত্রে ছাপা হইত। কয়েক বৎসর পরে উভয়েরই অস্তিত্ব লোপ হইয়া যায়। পরে ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে মাগুরা নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র কর, "সত্যপ্রকাশযন্ত্র" নামে এক মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। এই যন্ত্রে, "বরিশাল-বার্ত্তাবহ" "হিতসাধিনী" "বানরঞ্জিকা" "সত্যপ্রকাশ" "বঙ্গদর্পণ" নামক কয়েকটী পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। একমাত্র বরিশাল-বার্ত্তাবহ ব্যতীত, অন্যান্য সংবাদ পত্রগুলি অল্পদিন মধ্যেই লোপ পাইল। বরিশাল-বার্ত্তাবহ পাঁচ ছয় বৎসরের অধিক স্থায়ী ছিল না। কাশীপুর নিবাসী অসাধারণ অধ্যবসায়ী প্রতাপ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিগত ১৮৮১ খৃঃ অব্দে "কাশীপুরনিবাসী" নামক একখানি পাক্ষিক পত্র প্রচার করেন। তিনি প্রথমতঃ হাতে লিখিয়া উক্ত সংবাদপত্র প্রচার করেন; পরে স্বয়ং মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়া পত্রিকা প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করিলেন। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তও উক্ত পত্রিকা অতি সুন্দররূপে পরিচালিত হইতেছে। মফঃস্বলে এত দীর্ঘকাল অন্য কোন বাঙ্গালা সংবাদপত্র স্থায়ী হইতে দেখা যায় না। প্রতাপচন্দ্রের এই দেশহিতকর কার্য্য বিশেষ প্রশংসনীয়। বর্ত্তমান সময়ে বরিশাল নগরীতে "বিকাশ" এবং "বরিশাল হিতৈষী" নামক আরও দুইটী সংবাদ পত্র এবং তৎসহ দুইটী মুদ্রাযন্ত্র আছে।

"বাখরগঞ্জ হিতৈষিণী" নাম্নী আর একটী সভার অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান আছে; বিগত ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে এই সভা প্রথমতঃ স্থাপিত হয়। অন্তঃপুরস্থ

রমণীদের শিক্ষার উন্নতিই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। খলিশাকোটা নিবাসী উকীল চন্দ্রকান্ত সেন, উজিরপুর নিবাসী মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কয়েকজন কৃতবিদ্য মাতৃসেবক এই সভার চালক এবং পৃষ্ঠপোষক। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তও এই সভার কার্য্য ধীরভাবে চলিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এই জিলার এক চতুর্থাংশ অধিবাসীরও ইহার উন্নতিকল্পে তাদৃশ সহানুভূতি দৃষ্ট হয় না।

ধর্ম্মবীর রাজা রামমোহন রায় প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্ম ধীরে ধীরে এদেশেও প্রবেশাধিকার পাইল। প্রথমতঃ হাইকোর্টের স্বনামখ্যাত উকীল দুর্গামোহন দাস এবং জগচ্চন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি এই ধর্ম্ম-প্রচারের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তখন অনেকে গুপ্তভাবে এই ধর্ম্মে যোগদান করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় লাখুটিয়ার জমীদারগণ প্রকাশ্যরূপে পৈতৃক হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যজ্ঞোপবীত ত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। এই উপলক্ষে এই জিলাস্থ হিন্দুসমাজ বাত্যাবিতাড়িত সাগরোর্ম্মির ন্যায় যেরূপভাবে সংক্ষুভিত হইয়াছিল, তাহাতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সেই উর্ম্মিমালার ভীমগর্জ্জন মধ্যে মধ্যে শ্রুত হওয়া যায়। এই সমস্ত নবদীক্ষিত ধনশালী ব্রাহ্মগণের অর্থব্যয়ে অচিরাৎ একটী ব্রাহ্ম-ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মিত ও কিছুদিন পরে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হইল।

ইংরাজ রাজ্যের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ধীরে ধীরে খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-যাজকগণ ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তখন এই দেশীয় লোক কেহই বড় একটা অগ্রসর হইত না। মিঃ গেরেট্‌ যখন এই জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ ছিলেন, তখন দুই একজন করিয়া এই দেশীয় লোক খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে আরম্ভ করে, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর ইতর লোক ব্যতীত ভদ্র-বংশজাত কেহ এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন কিনা এরূপ জানা যায় না। রোমান্‌ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্টদের জন্য তখন দুইটী ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ করা হয়। গ্যারেট্‌ সাহেবের আমলে এই কার্য্য আরম্ভ হইয়া চারি পাঁচ বৎসর মধ্যেই প্রোটেষ্টাণ্ট চার্চ্চ নির্ম্মিত হইল। এই ধর্ম্মমন্দির, অতি সুন্দর এবং উচ্চ। বিগত ১৮৪০ খৃঃ অব্দে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা হয়। অস্মদ্দেশীয় সাধারণ ইংরাজীশিক্ষিত যুবকগণ, তৎকালে হুজুগে মাতিয়া কেহ কেহ ব্রাহ্ম, কেহ কেহ বা খৃষ্টান হইতে আরম্ভ করিল।

এই হঠকারিতায় যে কি বিষময় ফল, তাহা তখন তাহাদের বিকৃত মস্তিষ্কে স্থান লাভ করে নাই। অনেক নিষ্ঠাবান্ বৃদ্ধ হিন্দু মাতাপিতা অশ্রুজলে বক্ষস্থল প্লাবিত করিতে করিতে ধর্ম্মের জন্য একমাত্র পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; অনেক যুবতী, শ্বশুরশাশুড়ী মাতাপিতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্রুমোচন করিতে করিতে বিকৃতমস্তিষ্ক স্বামীর অনুগামিনী হইয়াছিল। ইহার ভাবী ফল যাহা ঘটিয়াছে তাহা বাখরগঞ্জের হিন্দু পাঠককে বুঝাইতে হইবে না। এই সমস্ত সামাজিক অভাব এবং ধর্ম্মবিপ্লব হইতে সনাতন ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য কতিপয় ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু অতি শুভক্ষণে বরিশাল নগরীতে "ধর্ম্মরক্ষিণী সভা" নামক একটী সভা স্থাপন করেন। বিক্রমপুর নিবাসী স্বধর্ম্মনিরত জয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমতঃ এই গুরুতর কার্য্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি কর্ম্মোপলক্ষে বরিশালবাসী হইয়া যে প্রকার শারীরিক ও আর্থিক ক্লেশ স্বীকার করতঃ এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহাতে এই দেশবাসী হিন্দুমাত্রেই তাঁহার নিকট আজীবন কৃতজ্ঞ থাকিবে। গাভা নিবাসী উকীল নন্দকুমার ঘোষ, চাঁদশী নিবাসী উকীল অম্বিকা চরণ গুহ, গৈলা নিবাসী স্বনামখ্যাত উকীল রজনীকান্ত দাশগুপ্ত প্রভৃতি এই লোকহিতকর কার্য্যের উদ্যোক্তা। এই সকল মহাত্মার মধ্যে ভূতপূর্ব্ব সব্‌জজ নফরচন্দ্র ভট্টের নামও বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ইহাদের উদ্যোগে এবং দেশীয় হিন্দু-সন্তানদের সাহায্যে বিগত ১২৯৫ বঙ্গাব্দে এই সভার জন্য একখানি ধর্ম্মভবন নির্ম্মিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে দরিদ্রদিগের বিনাব্যয়ে চিকিৎসার কোন বন্দোবস্ত ছিল না; দেশীয় ভূম্যধিকারিগণের অর্থ সাহায্যে বিগত ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক একটী বৃহৎ দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে ইহার অবস্থা বেশ উন্নত; বহুসংখ্যক গরীব দুঃখী বিনাব্যয়ে ঔষধ-পথ্য দ্বারা জীবন লাভ করিতেছে।

বিগত ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে বরিশাল নগরীতে প্রথমে সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপিত হয়। তদানীন্তন ইংরাজ অধিবাসিগণই ইহার স্থাপন সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই এই পুস্তকালয় বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, স্থানীয় অধিবাসিগণ এখন আর ইহার উন্নতিকল্পে তাদৃশ যত্নবান নহেন।

বর্ত্তমান সময়ে এই জিলায় যত ফৌজদারী ও দেওয়ানী সংক্রান্ত মোকদ্দমা হয়, তাহার অধিকাংশই ভূমির পরিমাণ, হকিয়ত, খাজানা এবং সীমা লইয়াই হইতেছে, গবর্ণমেণ্টের এরূপ বিশ্বাস। সেইজন্য চন্দ্রদ্বীপের অন্যতম জমীদার কলিকাতাস্থ পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী রাজা সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুরের প্রার্থনায় বিগত ১৯০২ খৃঃ অব্দে এই দেশে সার্ভে-সেটেলমেণ্ট আরম্ভ হইয়াছে। ইহা দ্বারা কালে শুভফল হইবে, কি অশুভফল হইবে, তাহা সেটেলমেণ্ট বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারিগণও বলিতে পারেন না। কত বৎসরে যে এই কার্য্য সম্পন্ন হইবে, তাহাও নির্ণয় করা দুঃসাধ্য; তবে বর্ত্তমান সময়ে প্রজা ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে জমাজমী লইয়া অসংখ্য মোকদ্দমা উদ্ভূত হইয়াছে। মহামতি বেল্ এই বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী; তিনি যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অদম্য উৎসাহে প্রকৃতি-পুঞ্জের হিতার্থে ন্যায়পরতার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাহাতে এ দেশবাসী সেটেলমেণ্ট ও জরিপের শুভফল কামনা করিয়া থাকেন।

মুসলমান-রাজত্বের সঙ্গে বর্ত্তমান ইংরাজ-রাজত্বের তুলনা করিতে গেলে অনেক পার্থক্য লক্ষিত হয়। মুসলমান নরপতিগণের মধ্যে দুই এক জন ব্যতীত সকলেই আত্মসুখপরায়ণ ছিলেন; প্রজাদের হিত, এবং সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি কাহারও বিশেষ দৃষ্টি ছিল না। এই নরপতিগণের অত্যাচারে হিন্দুগণ সর্ব্বদা মর্ম্মপীড়ায় মুহ্যমান থাকিত। তখন কোন আইন অথবা উপযুক্ত বিচারালয় ছিলনা, রাজার মুখের বাক্যই আইন এবং তাহার কার্য্যকলাপই সকলের অনুকরণীয়। রাজ্যশাসন সম্বন্ধে কেহ যদি কোন সত্য কথাও বলিত, ঘুণাক্ষরেও তাহা রাজার কর্ণগোচর হইলে, তাহার আর রক্ষা থাকিত না; হয়ত প্রাণদণ্ড, সর্ব্বস্ব রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত, অথবা চিরকারাবাস ব্যবস্থা হইত। দস্যু-তস্করের ভয়ে প্রজাপুঞ্জ সর্ব্বদা ত্রাসিত থাকিত। কেহ সুন্দরী স্ত্রীকন্যা লইয়া নির্ব্বিঘ্নে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত না। দৈবাৎ বাদসাহ অথবা তৎপ্রতিনিধির কর্ণগোচর হইলে, আর রক্ষা ছিল না; ছলে, বলে, কৌশলে, যে প্রকারেই হউক, স্বীয় পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া তাঁহারা "রক্ষকই ভক্ষক" এই দেশপ্রসিদ্ধ কথার সার্থকতা সম্পাদন করিতেন।

আমাদের সদাশয় ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্ট, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন

করিতেছেন। স্ত্রী, পুত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি এখন নিরাপদ; দস্যু-তস্কর প্রায় দেশ হইতে বিদূরিত। ক্রোড়পতি হইতে ভিক্ষাজীবী পর্য্যন্ত বিচারার্থ রাজদ্বারে উপস্থিত হইলে, ন্যায় এবং আইনানুসারে সুবিচার প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অতি পূর্ব্বে কেহ তীর্থযাত্রার জন্য দুর দেশে গমন করিলে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে তুমুল আতঙ্ক উপস্থিত হইত; কেননা তখন পথ বড় বিপদসঙ্কুল ছিল, অনেকেই আর বাড়ী ফিরিতে পারিতেন না। কিন্তু আমাদের ইংরাজরাজের অনুগ্রহে বাষ্পীয় পোত এবং বাষ্পীয় শকটারোহণে আমরা স্বল্প ব্যয়ে অতি দূরদেশেও অনায়াসে গমনাগমন করিতেছি। বিদেশী লোকের কোন প্রকার কষ্ট না হয়, সদাশয় গবর্ণমেণ্ট তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছেন।

মুসলমান রাজাদের সময়ে প্রজাপুঞ্জের উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে কোন কথাই পাওয়া যায় না, কিন্তু ইংরাজরাজ প্রজাগণকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য, প্রতিবৎসর প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতেছেন। রাজা যেমন বিদ্বান এবং প্রতিভাশালী, প্রজাগণকেও তদ্রূপ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। উপযুক্ত প্রজা রাজার নিকট উচ্চ পদ লাভ করিয়া রাজসম্মানে সম্মানিত হইতেছেন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, প্রজারক্ষা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য; একথা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য, কিন্তু তা বলিয়া কি প্রজাদের রাজার প্রতি একটা কর্ত্তব্য বোধ নাই? রাজা কি আমাদের নিকট হইতে ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা পাইতে অধিকারী ন'ন? ইংরাজ শাসনের কোন কোন অংশ সামান্য দোষাবহ হইলেও তৎকৃত অসীম লোকহিতকর কার্য্য এবং ন্যায়ধর্ম্মানুমোদিত শাসনে দোষের অংশটুকু ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। সুদুর সমুদ্র পার হইয়া উন্মুক্ত তরবারি হস্তে তাঁহারা এদেশে সংসারত্যাগী সংযত সন্ন্যাসী হইয়া আসেন নাই। ইংরাজরাজও আমাদের ন্যায় সংসারী, আমাদের ন্যায় তাঁহারও সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে হয়। ইংরাজরাজ বিজেতা, আমরা বিজিত; তথাপি রাজা যে আমাদের অনেকগুলি স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন, আমাদের ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার প্রভৃতির প্রতি হস্তক্ষেপ করেন নাই, ইহাতে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বিধেয়। মুসলমান-রাজত্বের সময়ে কয়জন হিন্দু-সন্তান শালগ্রাম-শিলা রক্ষা করিতে

পারিয়াছেন? কয়জন নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মোচিত ক্রিয়া-কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন? আমরা ইতিহাসে যখন হিন্দুজাতির ধর্ম্মলোপজনিত যবন-অত্যাচার পাঠ করি, তখন মনে বাস্তবিকই অতিশয় ক্লেশ এবং ক্ষোভ উপস্থিত হয়। আমাদের ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করা দূরে থাক, বরং যাহাতে ইহার ক্রমোন্নতি সাধিত হয়, প্রাচীন তীর্থস্থানে গমনাগমন করিয়া লোকের মনে যাহাতে ধর্ম্মপ্রবণতা বৃদ্ধি হয়, ইংরাজরাজ যত্নপূর্ব্বক তাহাই করিতেছেন।

প্রজাপুঞ্জের এতাদৃশ হিতানুষ্ঠান করিয়াও ব্রিটিশ-রাজ প্রজা-দিগকে আত্মরক্ষা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করিয়াছেন। নিত্যাবশ্যকীয় দা, বঁটী, খন্তা, কুড়াল ব্যতীত আমাদের আত্মরক্ষার জন্য একখানি সুদৃঢ় বংশদণ্ডও নাই। একটা ক্ষেপা শিয়াল গ্রামে আসিলে, আমরা তাহাকে বধ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারি, এরূপ অস্ত্রশস্ত্র পর্য্যন্ত আমাদের নাই। ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি বলবান জন্তু ত দূরের কথা, যদি কয়েকজন ভোজ-পুরী অথবা কাবুলী রিক্তহস্তেও আমাদের আক্রমণ করে, তবু তাহাদের হস্ত হইতে ধনধান্য মানসম্ভ্রম রক্ষা করিবার সাধ্য নাই। ব্যাঘ্র শূকর প্রভৃতির অত্যাচারে অনেক স্থান যারপরনাই উৎপীড়িত হইতেছে। গবাদি পশু অনেক স্থলে প্রকাশ্য দিবালোকে ব্যাঘ্রকবলিত হইতেছে, শস্যক্ষেত্রে শূকর ও মহিষকুল নির্ব্বিঘ্নে চরিয়া বেড়াইতেছে। অস্ত্রহীন দুর্ব্বল প্রজা দূর হইতে প্রাণোপম শস্যগুলির ধ্বংস অবলোকন করিয়া সাশ্রুনয়নে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। বঙ্গদেশস্থ অন্যান্য জিলায় অস্ত্র-আইনের এত কড়া কড়ি আইন নাই, কিন্তু এই হতভাগ্য বাখরগঞ্জবাসি-গণের প্রতি গবর্ণমেন্ট তীব্র কঠোরতা প্রকাশ করিতেছেন। কতকগুলি নীচ জাতীয় মুসলমান এবং হিন্দু দুরাচারগণের কৃতাপরাধে অন্যান্য নিরীহ প্রজাগণও দণ্ডভোগ করিতেছে। অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লওয়ায় হত্যার সংখ্যা কমিয়াছে বটে, কিন্তু নিরীহ প্রজাগণের উৎকণ্ঠা এবং ত্রাস বরং শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

কেবল যে বাখরগঞ্জে হত্যাকাণ্ড হয় এরূপ নহে। সভ্যতার লীলা-ভূমি মহানগরী কলিকাতায় বৎসরে যতগুলি হত্যা হয়, পুলিশ-কমিশনর তাহার কয়টা খোঁজ রাখেন? দুই এক টাকা ব্যয় করিলে যে

স্থানে গুণ্ডা দ্বারা অনায়াসে নরহত্যা চলে, সে স্থানের কোন কথা হইল না, কেবল হতভাগ্য বাখরগঞ্জবাসিগণই অপরাধী হইল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স্‌, আমেরিকা, জার্ম্মাণি প্রভৃতি সুসভ্য দেশের কুকাণ্ডের বিবরণ পড়িলে শরীর শিহরিয়া উঠে। এই সমস্ত দেশের সুসভ্য অধিবাসিগণ যে উপায়ে নরহত্যা, লুণ্ঠন, চুরি প্রভৃতি করিয়া ডিটেক্‌টিভগণের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি হইতে অব্যাহতি পাইতেছেন, তাহা অতীব বিস্ময়প্রদ এবং নর-বুদ্ধির অগোচর। নিউগেট্‌ ক্যালেণ্ডার (Newgate Calender) প্যারিস্‌ ম্যাগাজিন্‌ (Paris Magazine) প্রভৃতিই তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ। প্রতি বৎসর লণ্ডন নগরে, রাজসমক্ষে কতগুলি লোক অনন্তে অন্তর্হিত হয়, কে তাহার খোঁজ লয়? স্বীকার করি যে, বাখরগঞ্জে ইতরশ্রেণীস্থ অনেক লোক কলহপ্রিয়, উদ্ধতস্বভাব এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ; কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় অবিদিত রহিবে না যে, ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই অশিক্ষিত, এমন কি অনেকে স্বীয় স্বীয় নাম দস্তখত করিতেও জানে না। বিদ্যাভ্যাস দ্বারা জ্ঞানার্জ্জন করিতে না পারিলে মানুষ ও পশুতে বড় প্রভেদ থাকে না; সুতরাং অজ্ঞান মনুষ্য হিতাহিত জ্ঞানহীন পশু সদৃশ। মানবের ক্রোধ উদয় হইলেই পশুর ন্যায় জিঘাংসা বৃত্তি স্বতঃই উদিত হইয়া সাধারণ বিবেকটুকুকে ঢাকিয়া ফেলে, তাই তাহারা ভবিষ্যতান্ধ হইয়া প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়। কোন পাপাচরণ করিলে রাজ-দ্বারে দণ্ডনীয় হইতে হইবে, অথবা জগদীশ্বরের কোপে পড়িয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া কৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, জ্ঞানহীন মনুষ্য তাহা ধারণা করিতে পারে না। উপযুক্ত বিদ্যাভ্যাসসহ ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ দ্বারা যে পর্য্যন্ত মানসিক বৃত্তিসমূহের বিকাশ প্রাপ্ত না হইবে, মানুষ ততকাল পশুর ন্যায় থাকিবে। শত সহস্র রাজদণ্ডও তাহাকে কর্ত্তব্যপথে ফিরাইতে সমর্থ হইবে না। গবর্ণমেন্ট্‌ যতই কেন কঠোর আইন করুন না, যতই কেন তীব্র শাসন করুন না, যে পর্য্যন্ত মানুষের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব সমুদিত না হইবে, ততকাল কিছুতেই কিছু হইবে না। বঙ্গদেশের অন্যান্য জিলার সঙ্গে বাখরগঞ্জের নীচ জাতীয়গণের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, অস্ম-দ্দেশস্থ নীচ জাতীয় অধিবাসিগণের মধ্যে অনেকেই বিদ্যাহীন, তাই তাহারা ভালমন্দ বিচার করিতে অসমর্থ। নিরক্ষর নীচ জাতীয় অধিবাসিগণের

উন্নতি বিধান করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহাদের মানসিক সৎবৃত্তিসমূহের যাহাতে বিকাশ হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য। অবশ্য যাহারা দুক্রিয়াকারী এবং পশুস্বভাববিশিষ্ট, তাহাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র না দেওয়াই কর্ত্তব্য, কারণ তাহা হইলে অনেক নিরীহ লোকের সর্ব্বনাশ হইবে। কিন্তু যাহারা ধর্ম্মভীরু, রাজভক্ত এবং বিবেচক, তাঁহাদের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি প্রদান না করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা অস্ত্রশস্ত্র আত্মরক্ষার্থ ব্যবহার করিবেন,—জিঘাংসা বৃত্তি চরিতার্থের জন্য নহে। সাধুপ্রকৃতি ভদ্র-সন্তানগণকে শুদ্ধ আত্মরক্ষার্থ অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করিলে দেশের অনেক মঙ্গল সাধিত হয়। অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে যে, একজন উদ্ধত প্রকৃতির পঞ্চায়েৎ গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞায় অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিতেছে, হয়ত তাহার অধীনস্থ অথবা আত্মীয়স্বজন তাহা চাহিয়া লইয়া কার্য্যোদ্ধার করিতেছে; অথচ সেই স্থানের একজন শান্ত, ধার্ম্মিক, রাজভক্ত ভদ্রলোক দস্যুতস্কর হইতে স্ত্রীপুত্রাদি রক্ষা করিতে অসমর্থ। আমরা আমাদের দুঃখ রাজার নিকট জানাইয়া কাঁদিতে পারি, কেননা, রাজা প্রজার রক্ষক, রাজাই প্রজার পিতৃস্বরূপ। আমাদের মান, অপমান, জীবন, মরণ প্রভৃতির জন্য রাজাই ঈশ্বরপ্রেরিত, এবং তিনিই তজ্জন্য সম্পূর্ণ দায়ী।

পুলিশবিভাগ প্রজাপুঞ্জের ধনপ্রাণ রক্ষা এবং দেশের শান্তি-সংস্থাপন জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াছে। অত্যাচারী হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা, দস্যু-তস্কর দমন প্রভৃতি কতকগুলি গুরুতর কাজ পুলিশের প্রতি ন্যস্ত; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেক স্থলে এই কর্ম্মচারিগণকে কর্ত্তব্য-পরাঙ্মুখ এবং অলস দেখা যাইতেছে। অধিকন্তু নীচস্থ পুলিশকর্ম্মচারি-গণের নামে আরও অনেক দুর্নাম শুনা যায়। অবশ্য সকলেই যে একরূপ তাহা নহে। বাখরগঞ্জে ভূতপূর্ব্ব যে সমস্ত পুলিশকর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহাদের যোগ্যতায় এবং কার্য্যতৎপরতায় অনেক দস্যুতস্কর ধৃত হইয়া রাজদ্বারে দণ্ডিত হওয়ায় দেশের অশান্তি দূর হইয়াছে। এই কর্ম্মচারি-গণের মধ্যে গাভা নিবাসী দুর্গাচরণ ঘোষ, কৌড়িখাড়া নিবাসী মহিমচন্দ্র দাস ও বানরিপাড়া নিবাসী হরিশ্চন্দ্র গুহ ঠাকুরতার নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। বর্ত্তমান সময়েও বাখরগঞ্জ জিলায় যে কয়েকজন উচ্চপদস্থ

পুলিশকর্ম্মচারী আছেন, তাঁহাদের অদম্য উৎসাহ, অসীম বুদ্ধিমত্তা, এবং ন্যায়াচরণে অনেক দুর্ব্বৃত্ত শাসিত হইয়াছে। এই কর্ম্মচারিগণের মধ্যে স্বনামপ্রসিদ্ধ কালীকিশোর চৌধুরী, বামাচরণ ভৌমিক, রাসবিহারী দত্ত ও প্রিয়নাথ মিত্র বিশেষ ধন্যবাদযোগ্য।

বর্ত্তমান সময়ে মফঃস্বলস্থ পুলিশ বিভাগের সংস্কার করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। কারণ অনেক স্থলে এরূপ দেখা যায় যে প্রকৃত দোষীর পরিবর্ত্তে নিরপরাধী ব্যক্তি পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া রাজদ্বারে লাঞ্ছিত হইতেছে। এই সমস্ত কারণে অনেক প্রধান রাজপুরুষেরও পুলিশের কার্য্য সম্বন্ধে ততটা আস্থা পাওয়া যায় না। যে সমস্ত কর্ম্মচারির উপর প্রজাপুঞ্জের সুখদুঃখ নির্ভর করিতেছে, তাঁহাদের ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, ন্যায়বান এবং সদ্বিবেচক হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

———*———

সপ্তম অধ্যায়।



সাহিত্য ও শিল্প।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ, বাসুদেব সার্ব্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য প্রভৃতি মনীষিগণের সাধনাবলে নবদ্বীপে যে অপূর্ব্ব মহিমার বিকাশ হইয়াছিল তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রই অবগত আছেন। কিন্তু তাহার বহুশত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু রাজত্বের সময় হইতেই বাকলা পাণ্ডিত্য-গৌরবে সমগ্র ভারতে যেরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। অতি প্রাচীনকালে এই স্থান হইতে বহু ছাত্র কাশী, কাঞ্চী, মিথিলা, কান্যকুব্জ প্রভৃতি স্থানে স্মৃতি, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। আবার নানাদিগ্দেশীয় ছাত্রবৃন্দ বাকলায় আগমন করিয়া নানাশাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া উপাধিলাভ করিতেন। তৎ-কালে বৈদ্যকুলভূষণ মাধব কর যে অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার্থীদিগের অতীব আদরের সামগ্রী। পূততুণ্ড-কুলশেখর 'আর্য্যসপ্তসতী' প্রণেতা মহামতি গোবর্দ্ধনাচার্য্য যবন-বিপ্লবের পর এই বাকলা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মাধব কর নিজগ্রন্থের পরিসমাপ্তিকালে আপনাকে ইন্দ্র করের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।—

> সুভাষিতং যত্র যদস্তি কিঞ্চিৎ তৎসর্ব্বমেকীকৃতমত্রযত্নাৎ।
> বিনিশ্চয়ে সর্ব্বরুজাং নরানাং শ্রীমাধবেনেন্দ্রকরাত্মজেন ॥

মাধব করের বাটীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি গৌরনদী থানার অন্তর্গত নলচিড়া গ্রামে দৃষ্ট হয়।

হিন্দুরাজত্বের অবসান হইতে নৃপতিকুল-তিলক সুলতান হোসেন সাহের রাজত্ব পর্য্যন্ত যে সকল পণ্ডিত প্রাদুর্ভূত হইয়া সমগ্র বাকলা দেশ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিবরণ অতীতের বিস্মৃতির গর্ভে নিমগ্ন রহিয়াছে। অতি প্রাচীন কুলটের গ্রন্থে তাঁহাদিগের কিছু কিছু বিবরণ

পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা নানাবিধ কিম্বদন্তীতে পরিপূর্ণ ; তাই বাহুল্য-ভয়ে উল্লেখ করা গেল না। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাকলা বিদ্যা, জ্ঞান ও ভক্তিপ্রভাবে আবার সমগ্র বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ঘাঘর ও ঘণ্টেশ্বরের মধ্যবর্ত্তী "পণ্ডিতনগর" ফুল্লশ্রী গ্রামই তখন বিদ্যা-গৌরবমণ্ডিত বাকলার বিদ্যাশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। তৎকালে এই স্থানে যে সকল মহাত্মা আবির্ভূত হইয়া বীণাপাণির অর্চ্চনা দ্বারা অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ত্রিলোচন দাশ কবীন্দ্র, তৎ-পুত্র জানকীনাথ এবং ভাগিনেয় সাধকপ্রবর বিজয়গুপ্ত সর্ব্বপ্রধান। মহাত্মা ত্রিলোচন দাশ কবীন্দ্র কলাপব্যাকরণের "পঞ্জী" নামক টীকা প্রণয়ন করেন। অদ্যাপি এই টীকা কলাপাধ্যায়ী ছাত্রগণের ব্যাকরণ বুঝিবার পক্ষে সুগম পন্থারূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহারই পুত্র জানকীনাথ কবিকণ্ঠহার "চর্করিতরহস্য" নামক ব্যাকরণের অংশ বিশেষ যঙ্-লুগন্ত প্রত্যয় সম্বন্ধে শ্লোকপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করতঃ নীরস বিষয়কে সরস করিয়া তুলিয়াছিলেন। জানকীনাথের পুত্র ভবানীনাথ সার্ব্বভৌম ও পৌত্র রঘুরাম কবিকণ্ঠাভরণও পাণ্ডিত্য-গৌরবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। মহাত্মা বিজয়গুপ্ত ভক্তির তরঙ্গে অস্মদ্দেশ কিরূপ প্লাবিত করিয়াছিলেন তাহা স্থানান্তরে প্রদত্ত হইবে।

পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণের মধ্যে মধুসূদন সরস্বতী, গৌরীনাথ, হরনাথ, আলোক, গোলোক, রুদ্র, মঙ্গল প্রভৃতির নাম পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

মধুসূদন সরস্বতীর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে একটী শ্লোক আছে।—

পারং বেত্তি সরস্বত্যাঃ মধুসূদন সরস্বতী।
মধুসূদন সরস্বত্যাঃ পারং বেত্তি সরস্বতী॥

মধুসূদনের নিবাস কোটালীপাড়ান্তর্গত উনিশে গ্রামে। তিনি তেজস্বী, ন্যায়পরায়ণ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। মধুসূদন অতি অল্পবয়সেই সংসারের প্রতি বীতরাগ হন এবং একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া একাকী বাটী হইতে পদব্রজে কাশী যাত্রা করেন। কথিত আছে যে তিনি স্বীয় গ্রাম হইতে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে করিতে যাত্রা করিয়াছিলেন। পথে মধুমতী নদীর তীরে ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হইয়া মধুসূদন মহামায়ার স্তব করেন। কিম্বদন্তী এই যে তাঁহার স্তবে তুষ্টা হইয়া জগদম্বা সেই স্থানে

আবির্ভূতা হইয়াছিলেন এবং দেবীর বরে মধুমতীর সেই স্থান প্রকাণ্ড চড়ে পরিণত হয়। মধুসূদনের সন্তানসন্ততিগণ অদ্যাপি সেই স্থান ভোগ করিতেছেন। মধুসূদন কাশীধামে গমন করিয়া বিশ্বেশ্বরানন্দ সরস্বতীর নিকট সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কতিপয় বৎসর পরে বিশ্বেশ্বরানন্দ মধুসূদনের নিকট আগমন করিয়া দেখিলেন যে শিষ্য আরও কতিপয় শিষ্যসহ উৎকৃষ্ট, বিছানায় নানাবিধ বিলাসোপযোগী দ্রব্যসহ বসিয়া আছেন। মধুসূদনকে গুরু যথেষ্ট স্নেহ করিতেন; কিন্তু তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া গুরুর অপ্রীতি জন্মিল, এবং তৎক্ষণাৎ মধুসূদনকে অনুসরণ করিতে বলিয়া বিশ্বেশ্বরানন্দ সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। মধুসূদনও বিনাবাক্যব্যয়ে গুরুদেবের পশ্চাদনুসরণ করিলেন। গুরু শিষ্য উভয়ই চলিতে আরম্ভ করিলেন। তিন দিন পরে গুরু পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন মধুসূদন বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং সমস্ত শরীর স্বেদসিক্ত হইয়াছে। গুরু তখন আদেশ করিলেন "মধুসূদন, তুমি এই বৃক্ষমূলে বসিয়া শ্রান্তি দূর কর এবং আমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত এই স্থানে অবস্থান কর।" শিষ্য স্বীকৃত হইলে বিশ্বেশ্বরানন্দ প্রস্থান করিলেন।

দৈবাৎ জনৈক রাজা বহুদ্রব্য ও বহুলোক সমভিব্যাহারে সেই পথ দিয়া বিশ্বেশ্বরের পূজা দিতে যাইতেছিলেন। তিনি বৃক্ষমূলে মধুসূদনকে ঐভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা দ্বারা সবিশেষ অবগত হইলেন। তারপর সেই স্থানে মধুসূদনের বাসোপযোগী একটী সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। মধুসূদন সেই স্থানে বসিয়া ভগবদুপাসনা ও নানাবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সুনাম শুনিয়া সেই স্থানে বহুবিধ লোকের সমাগম হইতে লাগিল এবং সেই স্থানে হাট, বাজার, শিষ্য ও নানাপ্রকার লোকের আবাসভূমি হইল।

সন্ন্যাসী ছয় বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, শিষ্য বেশ স্বচ্ছন্দভাবে কালাতিপাত করিতেছেন। তিনি তখন শিষ্যকে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, সুখভোগ তাঁহার প্রাক্তন কিন্তু ভোগবিলাস-স্পৃহা নাই। তারপর বিশ্বেশ্বরানন্দ মধুসূদনকে লইয়া পুনরায় কাশীতে ফিরিয়া গেলেন ও তাঁহাকে পুনরায় সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তৎসহ লোকালয় পরিত্যাগ করিলেন।

মধুসূদন কতিপয় ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে বেদান্ত ও গীতার প্রাঞ্জল টীকা এবং মহিম্নস্তব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন মহাশয়ের মাতামহবংশের আদি পুরুষ। পণ্ডিত নীলকান্ত তর্কবাগীশ, বিশ্বেশ্বর তর্কভূষণ, কালীকান্ত বাচস্পতি, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি এই বংশসম্ভূত।

অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে যে সকল মহাপুরুষ বাকলার বিদ্যা-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন তন্মধ্যে নলচিড়া, উজিরপুর, বারপাইকা, শিকারপুর, মানপাশা, খলিসাকোটা, কীর্ত্তিপাশা, রায়েরকাঠী, গৈলা-ফুল্লশ্রী প্রভৃতির পণ্ডিতগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অতি প্রাচীনকালে নলচিড়া গ্রাম বিদ্বন্মণ্ডলী পরিপূর্ণ বলিয়া "নিম্ন নবদ্বীপ" আখ্যা লাভ করিয়াছিল। সুবিখ্যাত ভীষগশ্রেষ্ঠ মাধব করের অপূর্ব্ব নিদানগ্রন্থ এই স্থানেই প্রকাশিত হয়। অদ্যাপি এই স্থানের ব্রাহ্মণ-বৈদ্যগণের মধ্যে অনেকে সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন। এই গ্রামের বড় ভট্টাচার্য্য বাড়ীতে এককালে চতুর্দ্দশটী চতুষ্পাঠী ছিল।

উজিরপুর পণ্ডিতবরেণ্য মহাত্মা গৌরীনাথ তর্কবাগীশ* নীলকণ্ঠ তর্করত্ন, কৃষ্ণচন্দ্র তর্কবাগীশ, শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম, শম্ভূচন্দ্র বাচস্পতি, পূর্ণচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতির জন্মস্থান বলিয়া বাকলার গৌরব বর্দ্ধন করিতেছে। ইঁহারা প্রত্যেকেই স্বনামধন্য ও কীর্ত্তিমান্। যতদিন সংস্কৃতচর্চ্চা থাকিবে ততদিন গৌরীনাথের নাম শিক্ষার্থী ছাত্রদিগের নিকট অমর অক্ষরে লেখা থাকিবে। "গৌরীনাথীকূট"ই তাঁহাকে পণ্ডিতসমাজে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার কূট তর্কের সর্ব্বাংশ সুন্দর মীমাংসা অদ্যাপি হয় নাই। তিনি একজন ভগবদ্ভক্ত পুরুষ ছিলেন, কিন্তু বাকলার দুরদৃষ্ট বশতঃ অপরিণত বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গৌরীনাথ অল্প বয়সেই নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতে গমন করেন, এবং তথায় নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অথচ বাকচাতুর্য্যবিহীন এক নিরীহ পণ্ডিতের নিকট পাঠাভ্যাস আরম্ভ করেন। গৌরীনাথের প্রতিভাবলে তাঁহার অধ্যাপকের নাম অল্পকাল মধ্যেই চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। একদিন

---

* গৌরীনাথের বাসস্থান নলচিড়া গ্রামে বলিয়া পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে (৫০ পৃষ্ঠা), কিন্তু তাঁহার প্রকৃত বাসস্থান উজিরপুরে ; মধ্যে মধ্যে তিনি নলচিড়ায় আসিয়া অবস্থান করিতেন।

কতিপয় পণ্ডিত ঈর্ষাপরবশ হইয়া কোন এক সভায় গৌরীনাথের অধ্যাপকের সঙ্গে একটী কূট-তর্কের বিচার আরম্ভ করিলেন। গৌরীনাথ তখন সেস্থানে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি প্রবেশ করিতে না পারেন এইজন্য দ্বারদেশে প্রহরী রাখা হইল। গৌরীনাথ তাহা অবগত হইয়া দৈবাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার চেহারা অত্যন্ত কুৎসিৎ ছিল, তাই প্রহরিগণ তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। গৌরীনাথ স্বগর্ব্বে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বিচার্য্য বিষয় লইয়া পণ্ডিতগণের সহিত তর্ক আরম্ভ করিলেন, এবং অল্পকাল মধ্যেই ঈর্ষাপরায়ণ পণ্ডিতবর্গকে পরাস্ত করিয়া রাজসভায় তাঁহাদিগকে যথেষ্ট ভৎর্সনা করিলেন। রাজসভায় এইরূপ অপদস্থ হইয়া পণ্ডিতগণ গৌরীনাথকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। সমবেত পণ্ডিতবর্গের অভিশাপ সাংঘাতিক পীড়ারূপে গৌরীনাথকে আসিয়া আক্রমণ করিল। তিনি গৃহে আসিয়াই শয়ন করিলেন, আর শয্যা হইতে উঠিলেন না। গুরুর প্রতিপত্তি রক্ষা করিবার জন্য ভক্ত গৌরীনাথ অচিরে প্রাণত্যাগ করিলেন।

শম্ভূচন্দ্র বাচস্পতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অধ্যাপক ছিলেন, তিনি কলিকাতায় তাঁহাকে অধ্যাপনা করাইতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন-চরিত পাঠে তাঁহার কথা অনেক অবগত হওয়া যায়। শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম, পূর্ণচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার এবং নীলকণ্ঠ তর্করত্ন স্মার্ত্ত ও বড় নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহাদের গভীর শাস্ত্রজ্ঞানসূচক অনেক ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

মহাত্মা গৌরীনাথ তর্কবাগীশের বংশ বাকলায় বেদপঞ্চাননের বংশ বলিয়া খ্যাত। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণজীবন বেদপঞ্চানন। তাঁহারই নামে এই বংশের নামকরণ হইয়াছে। কৃষ্ণজীবন হইতে বর্ত্তমান সুপ্রসিদ্ধ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এম, এ, পর্য্যন্ত সকলই অসাধারণ কৃতবিদ্য ও দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। তন্মধ্যে মহামহোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান সময়ে সংস্কৃত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা পণ্ডিত শ্রেণীর অগ্রগণ্য হইয়া ইনি আমাদের দেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

ইনি বাল্যকালে গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠ সমাপন করিয়া বিক্রমপুরের অন্তর্গত ধাল্কুকাগ্রামে ব্যাকরণ ও কাব্য অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। এইরূপে

চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ইংরাজী স্কুলে প্রবিষ্ট হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষা সসম্মান ও বৃত্তির সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে এম, এ, উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপরে ঢাকা কলেজে এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে ত্রিংশাধিক বর্ষ অধ্যাপনা কার্য্য করিয়া পরিশেষে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল পদে উন্নীত হন। ইনি আজীবনকাল সাহিত্যের সেবা করিয়া দেশবাসী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্যের গবেষণায় অনেক সময় অতিবাহিত করিয়া এখনও ইনি কর্ম্মক্লান্ত জীবনের গৌরবমণ্ডিত সন্ধ্যায় সেই সাধনায় রত আছেন। এই বিদ্যোৎসাহী মহাত্মার চেষ্টায়ই বর্ত্তমানে মহামান্য গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি দেশীয় সাহিত্যের উন্নতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং নানাপ্রকার সাহায্য দ্বারা সাহিত্য-সেবীদিগের বিদ্যালোচনার পথ সুগম হইয়াছে।

উজিরপুরের সিদ্ধবংশের পণ্ডিতগণ চিরপ্রসিদ্ধ। নোয়াখালীতে ইহাদের আদিম বাসস্থান ছিল। এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ ঠাকুরদাস মাধবপাশার রাজাদের গুরু ছিলেন। সাধকপ্রবর দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য্য এই ঠাকুরদাসের পাঁচপুরুষ অধস্তন। তিনি বাল্যকালে সাতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন না; তাই রাজগুরু হইবার অনুপযুক্ত বলিয়া একদিন তদীয় পিতামাতা তাঁহাকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিলেন। ক্ষোভে ও অভিমানে দিগ্বিজয় একাকী কাশীধামে চলিয়া গেলেন এবং স্বীয় অসাধারণ অধ্যাবসায়বলে গভীর সাধনায় জগদম্বা কালিকার সিদ্ধিলাভ করেন। সিদ্ধ হইয়া ইনি জগদম্বার যে স্তব করিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি লিপিবদ্ধ আছে। তারপর সিদ্ধপুরুষ দিগ্বিজয় দেশে ফিরিয়া আসিয়া সর্ব্বত্র স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করিলেন। তাঁহার অলৌকিক শক্তিজ্ঞাপক দুই একটী ঘটনা এখনও এদেশে প্রচলিত আছে। শীঘ্রই তাঁহার যশোরাশি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। রহমৎপুর ও উজিরপুরের জমীদারগণ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহার শাস্ত্রে সেরূপ জ্ঞান না থাকিলেও গভীর জ্ঞান তাঁহার আয়ত্ব হইল, এবং অচিরে সর্ব্বত্রই দিগ্বিজয় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। দিগ্বিজয়ের দুই বিবাহ। দ্বিতীয়-বার দারপরিগ্রহ করিবার সময়ে উজিরপুরের জমীদার-শিষ্য রত্নেশ্বর রায় উজিরপুরে গুরুদেবের জন্য বাড়ী প্রস্তুত করিয়া, তাঁহার ও তাঁহার সন্তান-

সন্ততির বাসোপযোগী সকলপ্রকার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। নোয়াখালী হইতে আসিয়া দিগ্বিজয় জীবনের অবশিষ্ট অংশ উজিরপুরে অতিবাহিত করেন। দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য্যের পৌত্র সৃষ্টিবিজয় তর্কবাগীশ শাস্ত্রচর্চ্চা ও সাধনায় সমভাবে কৃতবিদ্য ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধেও দুই একটী অলৌকিক ঘটনা এদেশে প্রচলিত আছে। তাঁহার পুত্র ষষ্ঠীবিজয় পরম সাত্ত্বিক ও ঋষিতুল্য পুরুষ ছিলেন, এবং সর্ব্বদা বেদাধ্যয়ন ও যাগ-যজ্ঞাদি দ্বারা কালাতিপাত করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র, কালীপ্রসন্ন ও তারাপ্রসন্ন। তাঁহারা সিদ্ধবংশের উপযুক্ত বংশধর। কালীপ্রসন্ন ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি কালীঘাটে বাস করিতেন এবং সেই স্থানেই তাঁহার সমাধি হয়। কনিষ্ঠ তারাপ্রসন্ন স্মৃতিশাস্ত্রে বাকলায় একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। ইঁহার আর্য্যোচিত চেহারা, অদম্য তেজঃ, গভীর জ্ঞান এই বংশের উপযুক্তই বটে। ইঁহার কাব্য এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রেও বিশেষ দখল আছে এবং ইনি স্বীয় গুণ দ্বারা সর্ব্বত্র পরিচিত ও সকলের যশোভাজন হইয়াছেন।

উজিরপুরের দক্ষিণপার্শ্বে বারপাইকা একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম হইলেও নগণ্য পল্লী নহে। প্রাচীনকালে বারপাইকার পণ্ডিতমণ্ডলী শুধু বাকলা কেন—সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই গ্রামের পাঁচ হাবেলীর ভট্টাচার্য্যগণ এবং শ্রোত্রীবংশীয়গণ পাণ্ডিত্য-গৌরবে বিশেষ বিখ্যাত। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাঁচ হাবেলী-বংশে খ্যাতনামা পণ্ডিত গোলোকচন্দ্র ন্যায়রত্ন আবির্ভূত হন। বর্ত্তমান সময়েও নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ বলিয়া সর্ব্বজনবিদিত।

শ্রোত্রীবংশীয় পণ্ডিতমণ্ডলী বারপাইকার অতি প্রাচীন অধিবাসী নহেন। এই বংশের প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত মহাত্মা শুকদেব তর্কালঙ্কার বারপাইকায় আগমন করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তদানীন্তন ধর্ম্মপ্রাণ ভূম্যধিকারী চৌধুরিগণ তাঁহাকে বারপাইকায় বাসস্থানসহ ব্রহ্মোত্তর অর্পণ করেন। শুকদেবের সন্তানসন্ততিগণ বাখরগঞ্জের বহু সম্ভ্রান্ত বংশের কুলগুরু। গুঠিয়া, রূপসী, নাগপাড়া প্রভৃতি গ্রামে এই বংশের বংশধরগণ এখনও বাস করিতেছেন।

শুকদেব তর্কালঙ্কারের ভ্রাতা আনন্দিরাম সম্বন্ধে একটী অলৌকিক ঘটনা প্রচলিত আছে। আনন্দিরাম প্রথম যৌবনে বুদ্ধিমান্দ্য প্রযুক্ত

আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা অবজ্ঞাত হইতেন। একদা তাঁহার সহধর্ম্মিনী অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত মুষ্টিপরিমিত ছাই ভোজন-পাত্রের এক পার্শ্বে রাখিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য যে, পত্নী পতির প্রতি যথেষ্ট অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে ক্রুটী করিতেন না। সেই দিন আনন্দিরাম নিতান্ত বিষণ্ণ হৃদয়ে অনাহারে গৃহ ত্যাগ করিলেন। কতিপয় বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার আর কোন খোঁজ-খবর পাওয়া গেল না। পরিশেষে তাঁহাদের বাটীর বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্য 'যশা' আনন্দিরামের অন্বেষণার্থ নানা দেশ ভ্রমণ পূর্ব্বক নবদ্বীপে আসিয়া তাঁহার অনুসন্ধান পাইল। সায়ংকালে যশা আনন্দিরামের গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিল একটী সুন্দরী রমণী আসিয়া তাঁহার সন্ধ্যার আলো জ্বালিয়া দিল। যশা যুগপৎ আশ্চর্য্যান্বিত ও দুঃখিত হইয়া দ্বারদেশে বসিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন করিয়া আনন্দিরাম গৃহে ফিরিলেন। যশা তাঁহাকে দেখিয়া কোনরূপ হর্ষ প্রকাশ করিল না, ববং যথেষ্ট কটূক্তি করিয়া তাঁহাকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল; শেষে সকল ঘটনা বিশদভাবে বর্ণনা করিল। আনন্দিরাম তখন 'মা—মা' বলিয়া অচেতন হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। ক্ষণকাল পরে তাঁহার প্রতি স্বপ্নাদেশ হইল—"বৎস, তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও, তোমার জ্ঞানের স্ফূরণ হইয়াছে। তোমাদের ঠাকুর ঘরের মাটীর নীচে একখানি তালপাতার গ্রন্থ আছে, তাহা দ্বারাই তোমার সৌভাগ্য উদয় হইবে এবং তোমার বংশের উপর আমার অনুগ্রহ থাকিবে।" এই কথা বলিয়াই দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। আনন্দিরাম হৃষ্টান্তঃকরণে বাড়ী ফিরিলেন। কালক্রমে এই বংশে ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত তারিণীচরণ শিরোমণি জন্মগ্রহণ করেন। নবদ্বীপ ও অন্যান্য পণ্ডিত-প্রধান স্থানে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও বিচারনৈপুণ্যদর্শনে পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। আজও পণ্ডিতসমাজে তাঁহার নাম প্রসিদ্ধ আছে। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার পুত্র শশীভূষণ ভট্টাচার্য্য এম, এ, সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত এবং একজন কৃতী পুরুষ। ইনি বহরমপুর কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক।

বাকলার পীঠস্থান শিকারপুর ভারতের সর্ব্বত্র পরিচিত; কোন সময়ে এই স্থানে সংস্কৃতচর্চ্চা বিশেষ প্রবল ছিল। পূর্ব্বে এই স্থানে নানাদিগ্দেশীয়

বহু সন্ন্যাসীর সমাগম হইত। তাঁহারা এ দেশের পণ্ডিতগণের গভীর শাস্ত্র-জ্ঞানে চমৎকৃত হইতেন, এবং সময় সময় তাঁহাদের দ্বারা দুই একটী শাস্ত্রীয় জটিল সমস্যা পূরণ করিয়া লইতেন।

বর্ত্তমান কাল-স্রোত পূর্ব্বগৌরব অনেকটা হ্রাস করিয়া দিলেও সেই মহর্ষিকল্প পণ্ডিতদিগের বংশধরগণ পূর্ব্বপুরুষের পাণ্ডিত্য-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অদ্যাপি যত্নবান্। "শুম্ভ-নিশুম্ভবধ" নামক সংস্কৃত মহাকাব্য প্রণেতা পণ্ডিত কালীকান্ত শিরোমণি ও সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত রামধন ন্যায়লঙ্কার এদেশে সর্ব্বত্র পরিচিত।

মানপাশার পণ্ডিতগণ এই দেশে বহু দিন হইতে বিখ্যাত। ভট্টাচার্য্য বংশের রামনাথ সার্ব্বভৌম একজন অসাধারণ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন; তাঁহার পাণ্ডিত্য-গৌরব-মণ্ডিত শুভ্র যশোরাশি তাঁহাকে এদেশে সর্ব্বত্র পরিচিত করিয়া তুলিয়াছিল। ত্রিবেণীর সুবিখ্যাত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের নিকট তিনি ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা করেন, এবং স্বীয় ক্ষমতাবলে তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের অতীব প্রিয়পাত্র হইলেন। জগন্নাথ রামনাথকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন এবং যাহাতে রামনাথ বিভিন্ন স্থানে পরিচিত হইতে পারেন সেই জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে মহারাজ নন্দকুমার রামনাথের বিদ্যাবুদ্ধি ও অসাধারণ শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই জিলার "পণ্ডিত-জজ" নির্ব্বাচিত করেন। রামনাথ বারৈকরণের দেওয়ানী-আদালতে "পণ্ডিত-জজ" নিযুক্ত হইলেন। ফয়রা গ্রামের ভূম্যধিকারী বিজয়রাম রায় তাঁহাকে মানপাশায় আনয়ন করেন। উপযুক্ত বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া রামনাথ সেই স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। তদবধি তাঁহার বংশধরগণ মানপাশায় অবস্থিতি করিতেছেন।

রামনাথের বংশধরগণ সকলেই কৃতীপুরুষ। তাঁহার পৌত্র কালীপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত একজন প্রবীণ পণ্ডিত ছিলেন। তৎপুত্র কমল ন্যায়পঞ্চানন ও তাঁহার বংশধর নারায়ণ তর্কপঞ্চানন বাকলার বিখ্যাত পণ্ডিত। কলিকাতার সিটিকলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক (প্রফেসার) পণ্ডিত বরদাকান্ত ন্যায়রত্ন রামনাথ সার্ব্বভৌমের তিনপুরুষ অধস্তন। ইনি সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত ও বাখরগঞ্জের সর্ব্বত্র পরিচিত।

বর্ত্তমানে গোবিন্দ বিদ্যাভূষণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহার

পাণ্ডিত্য, বুদ্ধিমত্তা ও অসাধারণ প্রতিপত্তি সমগ্র বাকলায় ইঁহাকে বিশেষ পরিচিত করিয়া রাখিয়াছে।

এই গ্রামের ভট্টাচার্য্যগণ ব্যতীত আরও অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত আছেন; তন্মধ্যে শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরকুমার চট্টোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, জগচ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিশেষ বিখ্যাত।

খলিসাকোটা গ্রামেও একটী সংস্কৃতকলেজ বিদ্যমান আছে। স্থানীয় পণ্ডিত আশুতোষ কাব্যতীর্থ ইহার স্থাপয়িতা।

কাঁচনার মুখটী দ্যাকরের সন্তান শাস্ত্রজ্ঞ মহাত্মা রামকৃষ্ণ কীর্ত্তিপাশার ভট্টাচার্য্যগণের আদিপুরুষ। ইনিই স্বস্থান হইতে প্রভূত বৃত্তি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া, কীর্ত্তিপাশা গ্রামে আগমন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণোচিত পবিত্র কর্ম্মদ্বারা গৌরবের সহিত বসবাস করেন। কীর্ত্তিপাশার মজুমদারগণের আদিপুরুষ কীর্ত্তিপাশায় আসিয়া প্রথম যে বাটীতে বাস করেন, তাহার সংলগ্ন সুন্দর ভূখণ্ডে ইঁহারও বাসস্থান বিদ্যমান আছে। কীর্ত্তিপাশার মজুমদারবংশ ও ভট্টাচার্য্যবংশ উভয়ই সমসাময়িক। স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও বিদ্যোপাসনার জন্য এই বংশ এতদ্দেশে চিরপ্রসিদ্ধ। মহাত্মা রামকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র প্রাতঃস্মরণীয় যাদবেন্দ্র তর্কালঙ্কার অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন; বৈদ্যকুল-সম্ভূত পোনাবালিয়ার বিখ্যাত জমীদার, দেশীয় ভূম্যধিকারী পাহিদাস, এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত অনেক ব্রাহ্মণ-বৈদ্য ইঁহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মজুমদার-বংশীয়গণ শিষ্য না হইলেও গুরুদেবের ন্যায় ইঁহাকে ভক্তি করিতেন। রায়েরকাঠীর রাজা ও তাৎকালিক ভূম্যধিকারিগণ ইঁহাকে বৃত্তিদানাদি দ্বারা পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। কালক্রমে নিস্তেজ ও নিঃস্ব হইলেও যাদবেন্দ্রের বংশধরগণ অদ্যাপি কুলমর্য্যাদা ও কুলধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আসিতেছেন; বিদ্যোপাসনায়ও সম্পূর্ণরূপে পরাঙ্মুখ হন নাই। উল্লেখযোগ্য খ্যাতনামা অনেক সুবিজ্ঞ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া এই বংশ সমুজ্জ্বল করিয়াছেন। মহাত্মা যাদবেন্দ্রের পৌত্র নানাশাস্ত্র-পারদর্শী স্বনামধন্য রামগোবিন্দ ন্যায়পঞ্চানন পিতামহের ন্যায় সমগ্র সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়া অনেক শিষ্য-সম্পত্তি লাভ করেন। কীর্ত্তিপাশার মজুমদারবংশীয় মহামনা কৃষ্ণরাম ইঁহার বন্ধু ছিলেন। কৃষ্ণরাম যখন কারাবাসে রুদ্ধ থাকিয়া নানা যন্ত্রণায় মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, তখন ইনিই বিবিধ

কৌশলে রাজপুরুষগণের কৃপা ভিক্ষা করিয়া বন্ধুর প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কৃষ্ণরাম কারামুক্ত হইয়া বন্ধুকৃত উপকারের প্রতিদানস্বরূপ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বন্ধুর পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত বৃত্তি-সম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। অদ্যাপি কৃষ্ণরামের বংশধরগণ, রামগোবিন্দের সন্তান-সন্ততির নিকটে ভক্তিমান্ ও কৃতজ্ঞ। রামগোবিন্দের বংশধরগণও কৃষ্ণরামের বংশে প্রগাঢ় অনুরাগসম্পন্ন। এই বংশের পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণের মধ্যে সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন গঙ্গাগোবিন্দ বিদ্যারত্ন স্বীয় পাণ্ডিত্য ও প্রতিপত্তিতে সর্ব্বত্র সুপরিচিত ছিলেন। পরবর্ত্তী বংশধরগণের রামধন ভট্টাচার্য্য, গোবিন্দ বিদ্যারত্ন, বিহারীলাল বিদ্যারত্ন, বৈকুণ্ঠ কাব্যতীর্থ, নকুলেশ্বর কাব্যতীর্থ, মতিলাল স্মৃতিতীর্থের নাম উল্লেখযোগ্য।

কীর্ত্তিপাশায় ন্যায়, স্মৃতি, কাব্য, ব্যাকরণ প্রভৃতির ন্যায় আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রেরও যথেষ্ট চর্চ্চা ছিল। ধন্বন্তরিকল্প স্বনামখ্যাত পণ্ডিত প্যারী-মোহন দাশগুপ্ত কবিরঞ্জন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত-চিকিৎসক তৎকালে বাকলায় কেন—সমগ্র বঙ্গদেশে বিরল ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র উমাচরণ কবিরত্ন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া-ছিলেন। তাঁহার কাব্য এবং ব্যাকরণেও রীতিমত অধিকার ছিল। প্যারীমোহনের পুত্র অক্ষয়কুমার কবিরঞ্জন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং সুচিকিৎসক।

বহু পূর্ব্বে রায়েরকাঠীতেও বিলক্ষণ সংস্কৃতচর্চ্চা ছিল। যে সকল পণ্ডিত রাজবাড়ীর সভাপণ্ডিত ছিলেন তাঁহারা অনেকেই বাকলায় যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। রাজা শিবনারায়ণের সভাপণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত তর্কভূষণ, রাজা মাধবনারায়ণের সভাপণ্ডিত বিশ্বেশ্বর তর্কপঞ্চানন ও স্বনাম-খ্যাত বৃন্দাবন কবিরত্ন প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক পণ্ডিত স্বীয় ক্ষমতাবলে বাকলায় রায়েরকাঠীর প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এখানে সংস্কৃতচর্চ্চার উপযুক্ত চতুষ্পাঠী ছিল এবং গ্রামের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক তাহা পরিচালিত হইত। অধুনা নানা কারণে চতুষ্পাঠী উঠিয়া গিয়াছে কিন্তু সংস্কৃতচর্চ্চা লোপ পায় নাই।

বর্ত্তমানে এই গ্রামের পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বি,এ, সিটিকলেজের সংস্কৃতের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক। তিনি সুকবি ও গ্রন্থকার।

রায়েরকাঠীতে নরনারায়ণ রায়ই সর্ব্বপ্রথমে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি কাব্য, নাটক, প্রহসন প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অর্থকৃচ্ছতাবশতঃ সকল গ্রন্থ অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে "চারুপ্রবন্ধ" "কর্ত্তব্যোপদেশ", "গোপাঙ্গনাকাব্য", "সুনীতি নাটক" "শ্রীবৎস চরিত" প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে; এতদ্ভিন্ন আরও প্রায় দ্বাদশখানি গ্রন্থ পাণ্ডুলিপি অবস্থায় রহিয়াছে। তাঁহার দর্শন শাস্ত্রেও রীতিমত ব্যুৎপত্তি ছিল; তদীয় অপ্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে "শক্তি-বাদ," "অদ্বৈতবাদ", "ভক্তিবাদ" প্রভৃতি তাহার পরিচায়ক।

শিক্ষিত গ্রন্থকার নরনারায়ণের পত্নী বসন্তকুমারী অতীব বিদুষী রমণী ছিলেন। তাঁহারও কবিত্ব শক্তি প্রখর ছিল। "কবিতামঞ্জরী", "রোগাতুরা বসন্তকুমারী", "বাসন্তিকা" "বালিকা বিনোদ" ও "যোষিদ্বিজ্ঞান" প্রভৃতি তাঁহার কবিত্ব পূর্ণ গ্রন্থগুলি বঙ্গভাষার উপাদেয় সামগ্রী। তাঁহার প্রতিভা উপযুক্ত ক্ষেত্র ব্যতিরেকে অকালে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তাঁহার কন্যা কুসুমকুমারীও বিদ্বান ও বিদুষী পিতামাতার উপযুক্ত শিক্ষায় একজন বিদুষী রমণী হইয়াছিলেন। তিনিও জননীর মত "কুসুমিকা" নামে একখানি কাব্য রচনা করেন।

নরনারায়ণের সমসাময়িক যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় "সুখদায়িনী" নামে একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ গীতবাদ্যবিশারদ জিতেন্দ্র-নারায়ণ রায়ের "কলঙ্কভঞ্জন" নামে একখানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। সেইখানি কৃতিত্ব ও কবিত্ব শক্তির পরিচায়ক। অদ্বৈতনারায়ণ রায়ের "সেলিমাবাদের জমীদারীর বিবরণ" নামক একখানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থখানির জন্য তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

পাঠান যুগে ত্রিলোচন দাশ, জানকীনাথ কবিকণ্ঠহার প্রভৃতি মনীষিগণ গৈলা-ফুল্লশ্রীকে গৌরবপ্রভায় মণ্ডিত করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালের পণ্ডিতবর্গের মধ্যে শুকদেব সেন ও মদনকৃষ্ণ কবীন্দ্র উল্লেখযোগ্য। মদনকৃষ্ণ পাণ্ডিত্য ও চিকিৎসানৈপুণ্যে বঙ্গদেশে বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন। আজিও তাঁহার অনেক ছাত্র বঙ্গদেশের নানাস্থানে চিকিৎসা-

শাস্ত্রে বিপুল যশঃ অর্জ্জন করিতেছেন। উক্ত মহাত্মার পৌত্র চন্দ্রকুমার কবিভূষণ স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বরের গৃহচিকিৎসকরূপে বিশেষ সম্মানিত। বর্ত্তমান ত্রিপুরেশ্বরের অভিষেক-ব্যবস্থাতে নাম স্বাক্ষর করিয়া কবিভূষণ বৈদ্যজাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। ইঁহারই পুত্র ললিতমোহন কবি-সাগর "কবীন্দ্র কলেজ" নামে বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর আদর্শে একটী উচ্চশ্রেণীর সংস্কৃত বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেছেন। এই স্থানে আয়ুর্ব্বেদ, দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রের শিক্ষা দেওয়া হয়। এইরূপ উচ্চ শ্রেণীর সংস্কৃত বিদ্যালয় এই জিলায় আর দ্বিতীয়টী নাই।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে জগন্নাথ তর্কালঙ্কার, পীতাম্বর বিদ্যাভূষণ, রামচরণ শিরোমণির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ঝালকাঠী থানার অন্তর্গত গাবখান গ্রামে বহু পূর্ব্বে অনেক প্রধান প্রধান পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে খ্যাতনামা কালিদাস বিদ্যাবাগীশ এক সময়ে সমগ্র বাকলায় একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তৎপর কালীকিশোর বিদ্যারত্নও যশস্বী পণ্ডিত ছিলেন। বর্ত্তমানে শশিকুমার তর্কতীর্থ এই জিলার একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। ইনি কাব্য, ব্যাকরণ, নব্য ন্যায় এবং প্রাচীন ন্যায়-পরীক্ষায় গবর্ণমেণ্টের উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কীর্ত্তিপাশার সংলগ্ন তারপাশা গ্রামেও পূর্ব্বে কয়েকজন খ্যাতনামা পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহামনস্বী রামমাণিক্য বিদ্যানিধি এক-কালে স্বীয় প্রতিভাবলে ন্যায়, স্মৃতি, কাব্য ও ব্যাকরণে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। পঞ্চম বৎসর হইতেই ইনি শুধু বীণাপাণির অর্চ্চনা দ্বারা কালাতিপাত করিয়াছেন। এই গ্রামের কালীশ্বর ন্যায়পঞ্চাননও একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। বর্ত্তমানে গোপালকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ, গোপালচন্দ্র ন্যায়রত্ন, চিন্তাহরণ স্মৃতিতীর্থ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রসিদ্ধ।

জলাবাড়ীনিবাসী রাজকুমার ন্যায়রত্ন কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য-প্রতিপত্তিতে তাৎকালিক বাকলার পণ্ডিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইঁহার কবিত্ব ও বিচারশক্তি অতীব প্রখর ছিল। সুপ্রসিদ্ধা বিদুষী রমাবাই'র সহিত ইঁহার বিচার হইয়াছিল, এবং তিনি ইঁহার গভীর জ্ঞান ও বিচার-নৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন

এতদ্ভিন্ন বর্ত্তমান সময়ে রাজকুমার ন্যায়রত্নের ভ্রাতা হরকুমার তর্করত্ন, বাইশারিনিবাসী প্রসন্নকুমার শিরোমণি, কলসকাঠীনিবাসী বর্দ্ধমানের রাজ-পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় বিশ্বেশ্বর তর্করত্ন ও চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ প্রভৃতি মনীষিগণ বাকলার পূর্ব্ব পাণ্ডিত্য-গৌরব রক্ষা করিয়া বঙ্গদেশের নানাস্থানে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

ন্যায়, স্মৃতি, আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্রে পারদর্শী সংস্কৃতজ্ঞ, পণ্ডিতগণই বাকলার একমাত্র গৌরব-স্থল নহেন। বাকলাবাসিগণ মাতৃভাষার আলোচনায়ও পরাঙ্মুখ ছিলেন না। আমরা এই স্থানে কবি বিজয়গুপ্তপ্রমুখ মাতৃভাষার সাধকগণের ও কয়েকজন শিল্পীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়া এই অধ্যায় শেষ করিব।

করুণাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে শক্তি উপাসনার প্রাধান্য ছিল বলিয়া অনুমান হয়। সত্য বটে, বৌদ্ধ-বিপ্লবের পর বঙ্গে শিবোপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল; কিন্তু নির্গুণ চিদানন্দরূপ শিব অপেক্ষা সগুণ জয়দুর্গা, মঙ্গলচণ্ডী, কালী, শীতলা, মনসা প্রভৃতি দেবীর মাতৃভাবে উপাসনাই ভাবপ্রবণ বঙ্গবাসীর অধিক প্রিয় ছিল। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য কর্ত্তৃক বৈষ্ণবধর্ম্মের বহুল প্রচারের পূর্ব্বে অস্মদ্দেশীয় হিন্দুগণের মধ্যে শক্তি-উপাসনার একাধিপত্য ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাকলায় বিষহরি বা মনসা পূজার বড় প্রাদুর্ভাব ছিল। এই সময় 'রয়ানী' বা মনসা-সংকীর্ত্তন দ্বারা সমগ্র দেশ মুখরিত হইত।

প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যে এক প্রতিভাশালী কবি বাকলায় জন্মগ্রহণ করিয়া ভক্তিরসপূর্ণ মধুর কবিতা-স্রোতে পূর্ব্ববঙ্গ প্লাবিত করিয়া সমগ্র বঙ্গদেশে ভক্তির উচ্ছ্বাস ছড়াইয়া দিয়াছিলেন; সেই প্রাচীন ভক্তকবি বিজয় গুপ্ত পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফুল্লশ্রী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বিজয়ের পিতার নাম সনাতন গুপ্ত ও মাতার নাম রুক্মিণী দেবী; এবং ইনি প্রসিদ্ধ ত্রিলোচন দাশের ভাগিনেয়।—

> সনাতন তনয় রুক্মিণী গর্ভজাত।
> সেই বিজয় গুপ্তেরে রাখ জগন্নাথ।

তাঁহার গ্রন্থে তদীয় সহধর্ম্মিণী জানকীদেবীরও নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়।—

জানকীনাথের বাণী শুন দেবী ব্রাহ্মণী
দাস কবি রাখিবা চরণে।

ক্রমে বিজয় গুপ্ত মনসাদেবীর একনিষ্ঠ সাধক হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তৎকালের প্রচলিত মনসা-গীতে দেবী পরিতৃপ্ত হইলেন না। সুতরাং তিনি স্বয়ং বিজয়কে একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে স্বপ্নাদেশ করিলেন।—

মুর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কাণা হরিদত্ত॥
হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে।
যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে॥
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর॥
গীতে মতি না দেয় কেহ মিছা লাফ-ফাল।
দেখিয়া শুনিয়া মোর উপজে বেতাল॥

স্বপ্নাদেশের বিবরণ বিজয় এরূপ লিখিয়াছেন।—

গা তোল আরে পুত্র কত নিদ্রা যাও।
শিয়রে মনসা তোমার চক্ষু মেলি চাও॥
মনে ভয় না করিও দেখে নাগ জাতি॥
মহাদেবের কন্যা আমি নাম পদ্মাবতী।
মোর পায়ে শুক্ত তুমি সেবক প্রধান।
স্বপ্ন উপদেশ বলি না করিও আন॥
আজ নিশি অবসানে এড়িয়া বসন।
গীত ছন্দে রচ কিছু আমার স্তবন॥

বিজয় গীত লিখিতে আদিষ্ট হইয়া এক প্রকাণ্ড ছাতিম বৃক্ষতলে বসিয়া পাঁচালী রচনা করেন। রচনা শেষ হইলে কবি মাতুল ত্রিলোচন দাশ কবীন্দ্রকে সংশোধন করিতে দিলেন। ত্রিলোচন পাঁচালী সংশোধন করিতে আরম্ভ করিলে তদীয় পুরোহিত রামহরি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কন্যা আসিয়া কবীন্দ্র কি করিতেছেন জিজ্ঞাসা করিলেন। কবীন্দ্র বলিলেন "বিজয়ের পাঁচালী সংশোধন করিতেছি।" "বিজয় গুপ্ত যাহা লিখিয়াছেন তাহাই উত্তম হইয়াছে, আপনার কোন সংশোধন করিবার প্রয়োজন নাই।" এই

বলিয়াই বালিকা চলিয়া গেলেন। বালিকার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্রিলোচন সেই কন্যার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু শেষে জানিতে পারিলেন যে প্রায় চারি-পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত চক্রবর্ত্তীর মহাশয়ের কন্যা শ্বশুরালয়ে অবস্থান করিতেছেন। এই কার্য্য স্বয়ং মনসাদেবীর, ইহা চিন্তা করিয়া ত্রিলোচন আর সংশোধন করিলেন না। বিজয়ের পাঁচালী তাঁহাকে আবার ফিরাইয়া দিলেন।

১৪০৬ শাকে বিজয় 'মনসা-মঙ্গল' বা 'পদ্মপুরাণ' রচনা করেন। তখন এই গ্রন্থ পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই ভক্তির সহিত রক্ষিত ও পঠিত হইত। শ্রাবণ মাসে ঘরে ঘরে বিষহরির উপাসনা হইত এবং তৎসঙ্গে বিজয়ের পাঁচালীও সর্ব্বত্র গীত হইত। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষেমানন্দ ও কেতকদাসের 'ভাসান' যেরূপ প্রচলিত, পূর্ব্ববঙ্গে সেইরূপ বিজয়ের 'মনসা-মঙ্গল' প্রচলিত।

বিজয় প্রকৃতই উচ্চশ্রেণীর ভক্ত-কবি ছিলেন। তাঁহার মনসা-ভক্তি সর্পভয়ক্লিষ্ট ভীরুস্বভাব মানবের ভক্তি অপেক্ষা অনেক উচ্চ। গৌরাঙ্গের হরি-ভক্তি এবং রামপ্রসাদের শ্যামা-ভক্তির ন্যায় তাঁহার বিষহরি-ভক্তিও অতুলনীয়।—

নমঃ নমঃ জগৎমাতা সর্ব্ব সিদ্ধিদায়িনী।
তুমি সূক্ষ্ম, তুমি মোক্ষ, তুমি বিশ্বজননী॥
তুমি জল, তুমি স্থল, চরাচরবন্দিনী।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি, তুমি মূলধারিণী॥
কে তোমায় পূজিতে পারে কাহার শকতি।
সেই সে পূজিতে পারে যে জানে ভকতি॥
স্থাবর জঙ্গম তুমি, তুমি চারি বেদ।
ব্রহ্মা, শঙ্কর, হরি তোমাতে নাহি ভেদ॥

—এই বন্দনা ভক্ত-হৃদয়ে অপূর্ব্ব ভক্তিস্ফুরণ।

বিজয় যে উপাখ্যান লইয়া ছন্দ রচনা করিতে বসিয়াছিলেন তাহা মহাকাব্যের অনুপযোগী নহে। চাঁদের পুরুষকার, বেহুলার অপূর্ব্ব সতীত্ব-কাহিনী প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে অতীব গৌরবের বস্তু; এবং বিজয়ের প্রাঞ্জল ভাষায় উহা ব্যক্ত হইয়া বঙ্গবাসীর অতিশয় আদরের সামগ্রী হইয়াছিল।

মনসা-মঙ্গল হইতে তাৎকালিক দেশের অবস্থা বহুল পরিমাণে অবগত হওয়া যায়। কবিবর গ্রন্থের প্রারম্ভেই শাসন-প্রণালীর একটু আভাস দিয়াছেন।—

ঋতুশূন্য-বেদ-শশী পরিমিত শক।
সুলতান হোসেন সাহ নৃপতি-তিলক॥
রাজার শাসনে প্রজা সুখ ভুঞ্জে নিত।
মুল্লুক ফতিয়াবাদ বাঙ্গরোড়া তক্‌সিম॥

কিন্তু রাজ্য সুশাসিত হইলেও ছোট-খাট অত্যাচারের বিরাম ছিলনা। কবিবর হাসেন-হোসেন সংবাদে লিখিয়াছেন।—

দক্ষিণে হোসেনহাটী গ্রামের নিকট।
তথায় যবন বসে দুই বেটা শঠ॥
হাসেন হোসেন তারা দুই ভাইর নাম।
দুই জনে করে তারা বিপরীত কাম॥
কাজিয়ালী করে তারা জানে বিপরীত।
তাদের সম্মুখে নাহি হিন্দুয়ালী রীত॥
এক বেটা হালদার তার নাম দুলা।
বড় অহঙ্কার করে হোসেনের শালা॥
সর্ব্বক্ষণ হোসেনের আগে আগে আসে।
তার ভয়ে হিন্দু সব পলায় তরাসে॥
যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাত।
হাতে গলে বান্ধি নেয় কাজির সাক্ষাৎ॥
বৃক্ষ তলে থু'য়ে তারে মারে বজ্র কিল।
পাথর প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল॥—

বিজয় তাৎকালিক বঙ্গীয় সওদাগরগণের বাণিজ্যব্যাপদেশে "চৌদ্দ ডিঙ্গা" সাজাইয়া দূরদেশ গমনের একটী সুন্দর চিত্র দিয়াছেন।—

চৌদিকে বাজনা বাজে হুলাহুলি সর্ব্ব রাজ্যে
সাধু যায় দক্ষিণ পাটন॥
আগে তোলে ধনখণ্ড স্বর্ণ তোলে ভাণ্ড ভাণ্ড
সাধু নহে ধনেতে কাতর।

হীরামণি-মাণিক্য ভরা ডিঙ্গায় তুলিল সারা
আর তোলে বিচিত্র পাথর ॥
ছোলঙ্গ জামির ফল মিষ্ট তোলে নারিকেল
গুয়ার পাকড়ী ছড়া ছড়া।
সূতার কাপড় গড়া জৈন তোলে ঘড়া ঘড়া
আরো তোলে চটের ধাপড়া ॥

* * * *

সত্বর হইয়া সাধু ডিঙ্গায় চলিল।
একে একে চৌদ্দ ডিঙ্গা বাওয়াইয়া দিল ॥
প্রথমে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে মধুকর
যেই নায় চলিল লক্ষের সদাগর ॥
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে বিজ্ঞ সিজু।
গাঙ্গের দুই কুল ভাঙ্গি বেঁকা করে উজু ॥
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে গুয়ারেখী।
যার উপরে চড়ি রাবণের লঙ্কা দেখি ॥ ইত্যাদি -

* * * *

তৎকালে ফুল্লশ্রীর বিলক্ষণ বিদ্যাগৌরব ছিল; কবিবর জন্মভূমির পরিচয়ে যাহা লিখিয়াছেন তদ্দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয়।—

পশ্চিমে ঘাঁঘর নদী পূবে ঘণ্ডেশ্বর।
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিতনগর ॥
চারি বেদধারী তথা ব্রাহ্মণ সকল।
বৈদ্য জাতি বসে নিজ শাস্ত্রেতে কুশল ॥
কায়স্থ জাতি বসে তথা লিখনের সুর।
অন্য জাতি বসে নিজ শাস্ত্রে সুচতুর ॥—

মনসা-মঙ্গলে স্ত্রীলোকদিগের লেখা-পড়া শিক্ষার বিষয়ও বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। —

নানা বিদ্যা জানে বেহুলা সাহের কুমারী।
নয়নের কাজলে লিখে বোল দুই চারি ॥
আপনে পণ্ডিতা বেহুলা লিখে ভায় ভায়।
প্রথমে প্রণাম করে বাপ মায়ের পায় ॥—



স্বর্গীয় চণ্ডী চরণ সেন।

K.V. SEYNE & BROS.

মহাত্মা বিজয়গুপ্তের পর অদ্যা বধি কেহ সেরূপ ভক্তির উচ্ছ্বাসে এদেশ প্লাবিত করেন নাই। পরবর্ত্তী মোগল-রাজত্বকালে যে সকল কবি অস্মদ্দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের স্মৃতি বহুকাল লুপ্ত হইয়াছে। কবিবর বিজয়গুপ্তের মত তাঁহাদের শ্রেণীবদ্ধ কবিতাগুলি পুস্তকাকারে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। তবে তাঁহাদের ভক্তি ও গভীর ভাবপূর্ণ অনেক কবিতা পাওয়া গিয়াছে। তখন আধুনিক বঙ্গভাষার নূতন আলোক গ্রামবাসিগণের মধ্যে প্রবেশ করে নাই, তাই, অসংস্কৃত গ্রাম্যভাষায় তাঁহাদের হৃদয়ের ভাবগুলি উন্মেষিত হইয়াছিল। অনেকেই লোকচক্ষের অন্তরালে তাঁহাদের নিভৃত পল্লীর গৃহকোণে বসিয়া সরল গ্রাম্যভাষায় গান, কবিতা, হেয়ালী, ছড়া প্রভৃতি রচনা করিয়া গুপ্ত স্থানেই রাখিয়া দিতেন। সেইরূপ কয়েকটি কবিতা ও ছড়া বহু চেষ্টা করিয়া সংগ্রহ করিয়াছি। কিন্তু নানাকারণে এই সংস্করণে প্রকাশিত হইল না।

বাকলার ভূস্বামিগণের মধ্যে যাঁহারা কাব্য রচনা দ্বারা অমরত্ব লাভ করিয়াছেন তন্মধ্যে তপ্লে আবদুল্লাপুরের বৈদ্য জমীদার বংশ ও রায়েরকাঠীর রাজবংশ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মহাত্মা রামগতি রায় রচিত "মায়া-তিমির-চন্দ্রিকা" "যোগ-কল্প-লতিকা" ও জয়নারায়ণ এবং আনন্দময়ী রচিত "হরিলীলা" "চণ্ডীকাব্য" প্রভৃতির নাম পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। রায়েরকাঠীর রাজবংশের রাজা নরনারায়ণ এবং তাঁহার বিদুষী পত্নী বসন্তকুমারীর রচিত পুস্তকগুলির নাম বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুগে অস্মদ্দেশে যে সকল সাহিত্যসেবী বীণাপাণির অর্চ্চনা দ্বারা যশস্বী হইয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান কতিপয় ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করিলাম।

বাকলার বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যরথীগণের মধ্যে চণ্ডীচরণ সেনের নাম সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস ও নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভরাজী প্রণেতা চণ্ডীচরণ সেন বাসণ্ডাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। চণ্ডীচরণ তাঁহার পিতা নিমচাঁদের চতুর্থ সন্তান। তাঁহার জ্যেষ্ঠা তিনজন ভগ্নী ছিলেন। বাল্যকালে ইনি জ্যেষ্ঠ-ভগিনীপতি বাউকাঠী নিবাসী আনন্দচরণ সেনের তত্ত্বাবধানে বরিশাল জিলাস্কুলে শিক্ষালাভ করেন; এবং ১৮৬৩—৬৪ খৃঃ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন। অতঃপর

ইন্‌জিনিয়ারিং (Engineering) পড়িতে কলিকাতা উপস্থিত হ'ন; কিন্তু তিনি তদুপযুক্ত চিত্রবিদ্যায় (Drawing) বিশেষ পারদর্শী ছিলেন না বলিয়া সেই ইচ্ছা ত্যাগ করেন। তারপর ওকালতি পড়িতে আরম্ভ করেন এবং ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন শিক্ষানবিশী ভাবে মুন্‌সেফী কার্য্য করেন ও ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে ১২ই মে তারিখে উক্তপদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হ'ন। তৎপর সবজজ পদে উন্নীত হ'ন।

চণ্ডীচরণের হৃদয়ে বাল্যকাল হইতেই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বীজ নিহিত ছিল। নিরাকার অতীন্দ্রিয় অসীম ভগবানকে তিনি সসীম ভাবে উপাসনা করিতে ভাল বাসিতেন না, তাই ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে চণ্ডীচরণ প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হ'ন, এবং বাসণ্ডা গ্রাম পরিত্যাগ করেন।

চণ্ডীচরণের পাঁচ পুত্র ও পাচটী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা সকলেই কৃতবিদ্য, বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠা কন্যা কামিনীরায় বি, এ, বঙ্গের একটী অসাধারণ প্রতিভা। দ্বিতীয়া কন্যা যামিনী সেন এল্, এম্, এস ও তৃতীয়া কন্যা প্রেমকুসুম চৌধুরাণী * বরিশালে স্ত্রী সমাজের গৌরবস্থল। চতুর্থা কন্যা অল্প বয়সেই প্রাণত্যাগ করেন। পুত্রগণ মধ্যে যতীন্দ্র মোহন সেন বি, এ, নিশীথচন্দ্র সেন ব্যারিষ্টার, প্রভাতচন্দ্র সেন বি, এ, ললিত মোহন সেন ইন্‌জিনিয়ার, সুধীর কুমার সেন বি, এ, † প্রভৃতি সকলেই কৃতবিদ্য হইয়াছেন।

ক্রমান্বয়ে কন্যা ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুতে চণ্ডীচরণের শরীর ও মন উভয় ভাঙ্গিয়া পড়িল, এবং এই নিদারুণ শোকশেলই তাঁহার মৃত্যুরূপী হইয়া উঠিল। ১৯০৬ খৃঃ অব্দে ১০ই জুন তাঁহার মৃত্যু হয়।

চণ্ডীচরণ দাতা, সহৃদয় ও পরোপকারী ছিলেন। অনেক আত্মীয়স্বজন তাঁহার সাহায্যে বিশেষরূপে উপকৃত হইয়াছেন। তিনি জননী বঙ্গভাষার কণ্ঠে যে সমস্ত অমূল্য রত্নহার পরাইয়া গিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই মহার্ঘ।

যখন তিনি যশোহরে মুন্‌সেফি করিতেন তখন তত্রত্য ছাত্রসম্মিলনীতে ১৮৮০ খৃঃ অব্দে "A Discourse on Education" নামক তাঁহার একটী

* বগুড়া জিলার সেরপুর নিবাসী জমীদার বেনওয়ারী লাল চৌধুরীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়।

† ইনি বর্ত্তমানে কলিকাতার Sen & Sen নামক প্রসিদ্ধ দোকানের ও Sen & Pandit নামক Importing Agencyর একমাত্র পরিচালক।



স্বনামধন্যা যামিনী দেবী

জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ পঠিত হয়। ছাত্র-জীবন গঠনের জন্য এই বই খানি একটী অমূল্য উপদেশ। এই সময়ে তিনি কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে Vice President ছিলেন। ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে স্বনামখ্যাত উমেশচন্দ্র দত্তের অনুরোধে এই বই খানির দ্বিতীয় সংস্করণ হয়। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে তাঁহার "লঙ্কাকাণ্ড" প্রকাশিত হয়।

তৎপরে ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে "Uncle Tom's Cabin" নামক ইংরেজি পুস্তকের অনুবাদ "টমকাকার কুটীর" প্রকাশিত হয়। ইহা তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে তিনি "জীবনের গতি নির্ণয়" নামক একখানি জ্ঞানগর্ভ পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই পুস্তক খানি চণ্ডীচরণের দর্শন শাস্ত্রে জ্ঞানের পরিচায়ক। তৎপর যথাক্রমে তাঁহার "মহারাজা নন্দকুমার" বা "শতবৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের অবস্থা" "দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ" "মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা" বা "মেট্‌কাফ্‌ চরিত", "ঝান্‌সীর রাণী", "অযোধ্যার বেগম", "এই কি রামের অযোধ্যা", "পাহাড়ী বাবা" প্রভৃতি বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হয়। অবশেষে ১৯০৩ অব্দে তিনি "চল্লিশ বৎসর" নামক একখানি ক্ষুদ্র রুশ উপন্যাস বাঙ্গলায় অনুবাদ করেন। ইহাতে পাপ ও পুণ্যের একটী অপূর্ব্ব চিত্র বঙ্গসাহিত্য সমাজের সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই পুস্তক খানি তাঁহার শেষ রচনা। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধেও তিনি দুই খানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। সেই দুই খানি তাঁহার ভগবদ্‌ভক্তির অপূর্ব্ব স্ফুরণ।

শেষ জীবনে চণ্ডীচরণ রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া জ্ঞান-পিপাসার জন্য কঠিন তেলুগু ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময় তিনি ওয়াল্‌টেয়ার (Waltair) বাস করিতেন। অতি অল্প সময় মধ্যেই তিনি এই ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

কর্ম্মবীর চণ্ডীচরণই এই জিলার সর্ব্বপ্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতা। তাঁহার স্বদেশ-হিতৈষীতা, তেজস্বিতা, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী তাঁহাকে এই দেশের আদর্শস্থানীয় করিয়া রাখিয়াছে।

অস্মদ্দেশে স্ত্রী শিক্ষার অল্পতা হেতু শিক্ষিতা বঙ্গনারীর সংখ্যা অতিঅল্প। কিন্তু আধুনিক যুগের উচ্চ শিক্ষিতা রমণীগণের মধ্যে কুমারী তরু দত্ত, সরোজিনী নাইডু, মানকুমারী, কামিনীরায়, গিরীন্দ্রমোহিনী প্রভৃতি

বঙ্গনারীগণ বাস্তবিকই ললনাকুলের শীর্ষস্থানীয়া ও জ্ঞানগৌরবে বাঙ্গালী জাতির গরিমাস্থল।

১৮৫৪ খৃঃ অব্দে ১২ই অক্টোবর শ্রীমতী কামিনী বাসণ্ডাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি চণ্ডীচরণের জ্যেষ্ঠা কন্যা।

বাল্যকালের ক্রীড়াকলয়িত সুমধুর শিশু বাল্যের উচ্ছৃঙ্খল শত দুরন্তপনার মধ্যেও যখন তাঁহার ঠাকুরদাদার স্নেহ মধুর কণ্ঠের ছড়া শুনিত, তখনি নীরবে উৎকর্ণ হইয়া নির্ণিমেষ নয়নে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিত—যেন এমনি করিয়া বালিকা ভবিষ্য জীবনের কোন অজানা মধুর রাগিণী তাহার প্রাণের মধ্যে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে শুনিত।

পাঁচ বৎসর বয়সে ইঁহার হাতে খড়ি হয় এবং অক্ষরপরিচয়ের পর হইতে ইনি 'শিশুশিক্ষা' মাতার নিকট অধ্যয়ন করেন। তারপর কিছুদিনের জন্য একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু বালিকার বিকাশোন্মুখ প্রতিভা শিক্ষকের জ্ঞান অতিক্রম করিয়া উঠিল।

চণ্ডীচরণ কিছুদিন বরিশালে মুন্সেফি করিয়া পিরোজপুরে বদলি হইলেন। এই খানে বসিয়া আট বৎসর বয়সে কবি প্রথম কবিতা রচনা করেন। চণ্ডীচরণ গোপনে তাহা দেখিলেন, এবং কন্যার কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পড়াইতে লাগিলেন।

কামিনী দশ বৎসর বয়সে 'হিন্দুমহিলা' বিদ্যালয়ে প্রথম প্রবিষ্ট হ'ন এবং এই সময় হইতেই ইংরেজী ভাষা রীতিমত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। অল্পদিন পড়িয়াই ইতিহাসে সেই স্কুলের প্রথমস্থান অধিকার করেন। তারপর পুনরায় গৃহশিক্ষকের নিকট ও এক বৎসর পিতার নিকট শিক্ষা লাভ করেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে ইনি "বঙ্গমহিলা" বিদ্যালয়ে প্রেরিত হ'ন এবং সেই স্থানে উচ্চ প্রাথমিক (upper primary) পরীক্ষায় প্রেসিডেন্সী বিভাগে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করেন। ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে মাইনর পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। মাইনর পরীক্ষায় তৎকালে মেয়েদের শেলাইশিক্ষা বিষয় ইচ্ছাকৃত (optional) ছিল। কিন্তু কামিনী এ বিষয় না লইয়া, physics, mensuration, arithmatic প্রভৃতি পাঠ গ্রহণ করেন। এই সময় 'বঙ্গমহিলা' বিদ্যালয় 'বেথুন' বিদ্যালয়ের সহিত মিলিত হয়। তারপর কবি ষোড়শ বৎসর বয়সে



"আলো ও ছায়া"-রচয়িত্রী কামিনী দেবী।

Engraved & Printed by
K.V. SEYNE & Bros

প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বিংশতি মুদ্রা বৃত্তি পান। তারপর এফ, এ, এবং বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সংস্কৃতে দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্মান (honours) লাভ করেন।

এই সময় বেথুন বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষকের পদ শূন্য হইলে কবির পিতৃবন্ধু কমিটির অন্যতম সদস্য দুর্গামোহন দাশ, কামিনীকে উক্ত কর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। ইহাতে পিতার অনিচ্ছা ছিল, তিনি বলিতেন "শিক্ষার জন্য কন্যাকে বিদ্যাশিক্ষা করাইয়াছি, অর্থের জন্য নহে।" অবশেষে তিনি কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে সম্মতি দিতে বাধ্য হন। এতদ্ভিন্ন আরও একটী ঘটনা ইহার চাকরী গ্রহণের সুবিধা করিয়া দেয়। "মহারাজ নন্দকুমার" প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া কামিনীর পিতা কর্ত্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হন, এই কারণে তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। এ দিকে বেথুন-স্কুল-কমিটি হইতে অনুরুদ্ধ হইয়া কামিনী পুনরায় পিতার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। নিজে কর্ম্মচ্যুত হইলে চিরদিন যত্নে লালিত কন্যাকে দারিদ্র্য-কষ্ট ভোগ করিতে হয় এ জন্য তিনি তাঁহাকে কার্য্য করিতে অনুমতি প্রদান করেন। তিনি কন্যাকে লিখিলেন "তোমাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলাম জ্ঞানলাভ করিবে বলিয়া—চাকরীর জন্য নহে; তুমি খাটিয়া খাইবে ইহা মনে করিতেও আমার কষ্ট হয়। কিন্তু আমি চাকরী ছাড়িতেছি, এতকাল তোমাকে যে ভাবে রাখিয়াছি এখন সে ভাবে রাখিবার সাধ্য হইবে না, সুতরাং তোমার চাকরী করা সম্বন্ধে আর আমার আপত্তি নাই, তুমি নিজ আয় দ্বারা নিজ অভাব দূর কর।" অতঃপর কামিনী বেথুন বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। সেই দিনে ইহার "লক্ষ্যতারা" নামক কবিতা রচিত হয়। সেই হইতে আট বৎসর যাবৎ উক্ত স্কুলে থাকিয়াই নানা প্রকার ইংরেজী ও বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করেন। George Eliot, Browning, Emerson, Merlin প্রভৃতি গ্রন্থ ইঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। এই সময়ে ইনি কলেজে Botany, (উদ্ভিদ্ বিদ্যা) Logic (তর্কশাস্ত্র) ও মাঝে মাঝে সংস্কৃত শিক্ষা দান করিতেন।

১৮৮৮ খৃঃ অব্দে ইনি স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। দীক্ষার অব্যবহিত পরেই ক্রমান্বয় "নূতন আকাঙ্ক্ষা", "আশা পথে", "নীরবে", "যৌবন তপস্যা", প্রভৃতি কবিতা রচনা করেন। ইঁহার

বিখ্যাত গ্রন্থ "আলো ও ছায়া"র মধ্যে প্রায় দশ বৎসরের বিভিন্ন সময়ের কবিতা স্থান পাইয়াছে।

১৮৮৯ খৃঃ অব্দে সেপ্টেম্বর মাসে কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকাসহ "আলো ও ছায়া" প্রথম প্রকাশিত হয়। হেমচন্দ্রকে দুর্গা-মোহন দাশ যখন আলো ও ছায়ার পাণ্ডুলিপি দেখান তখন কবিবর জানিতেন না যে ইহা স্ত্রী-রচিত। তিনি কবিতা পড়িয়া মুগ্ধ হইলেন ও বহুবিধ সাধুবাদ প্রদান করিলেন। তিনি লিখিয়াছেন "বস্তুতঃ কবিতা-গুলির ভাবের গভীরতা, ভাষার সরলতা, রুচির নির্ম্মলতা এবং সর্ব্বত্র হৃদয়গ্রাহিতা গুণে আমি নিরতিশয় মোহিত হইয়াছি। পড়িতে পড়িতে গ্রন্থকারকে মনে মনে কতই সাধুবাদ প্রদান করিয়াছি। আর বলিতে কি, স্থলবিশেষে হিংসারও উদ্রেক হইয়াছে।" [কামিনী স্বীয় কবিতা প্রকাশে শৈশব হইতেই অতিরিক্ত ভয় এবং লজ্জা অনুভব করিয়া আসিতে-ছিলেন এবং আত্মগোপন পূর্ব্বক যে কবিবরের পশ্চাতে থাকিয়া আপনার সঙ্গীত শুনাইতে পারিয়াছিলেন, বিশ বৎসর পরে ১৯০৯ খৃঃ অব্দে 'আলো ও ছায়া' তাঁহারই নামে উৎসর্গ করিয়া স্বীয় হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।]

ক্রমে তাঁহার "নির্ম্মাল্য" ও "একলব্য" রচিত হয়। ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে ঢাকা নিবাসী স্বনাম খ্যাত সিভিলিয়ন্ মিঃ কে, এন্, রায়ের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে ইঁহার "পৌরাণিকী" প্রকাশিত হয়। তারপর ১৯০৪ খৃঃ অব্দে "গুঞ্জন" নামে কতগুলি শিশু-পাঠ্য কবিতা ও "জনৈকা জননী" প্রকাশিত হয়।

কামিনীর কবিত্বশক্তি অতুলনীয়। সুমধুর কবিতাগুলিতে ইঁহার পূত চরিত্র সম্যক ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইঁহার কবি-জীবন সার্থক। প্রার্থনা করি ইনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি বিধান করুন।

স্বনামধন্য প্রসিদ্ধ সমালোচক গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী বরিশাল জিলার আর একটী অমূল্য রত্ন। ইনি ১২৬৮ সালের চৈত্র মাসে সিদ্ধকাঠী গ্রামে বৈদ্যজমীদারবংশে জন্মগ্রহণ করেন। যে সূক্ষ্মদর্শিতা ও চিন্তাশক্তির অপূর্ব্ব বিকাশ ইঁহার ভবিষ্যজীবনে পরিলক্ষিত হইয়াছিল, বাল্যকাল হইতেই গিরিজাপ্রসন্নের বালচরিত্রে তাহার উন্মেষ-লক্ষণ দৃষ্ট হইত।



৺ গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী।

বরিশাল জিলা-স্কুলে বাল্য শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া গিরিজাপ্রসন্ন কলিকাতা সিটী-কলেজিয়েট-স্কুল হইতে প্রবেশিকা এবং উক্ত কলেজ হইতে এফ্, এ, এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, অতঃপর বি, এল, পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন।

পাঠ্যাবস্থায়ই তাঁহার প্রতিভার স্ফুরণ হইয়াছিল। ক্লাসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বালকদিগের মধ্যে তিনি রীতিমত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে গিরিজাপ্রসন্ন পাঠদ্দশাতেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং পাঠদ্দশায়ই বিমল যশোলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। বি, এ, পরীক্ষার সময়ই তাঁহার বিখ্যাত "গৃহলক্ষ্মী" নামক সদুপদেশপূর্ণ গ্রন্থখানির সূত্রপাত হয়, এই পুস্তক প্রথমতঃ তাঁহার একজন বন্ধু লিখিতে আরম্ভ করেন কিন্তু কিছু দিন পরে তিনি স্বয়ংই 'গৃহলক্ষ্মী' সমাপ্ত করিলেন।

যে বিখ্যাত পুস্তকে তাঁহার প্রতিভা সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়াছিল, গিরিজা-প্রসন্ন সেই বিস্তৃত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সমালোচনা গ্রন্থ—"বঙ্কিমচন্দ্র" রচনা বি, এল, পরীক্ষার সময়ে আরম্ভ করেন, এই বিখ্যাত পুস্তকে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রলিখিত উপন্যাসাবলীর সমালোচনা করা হয়। এই পুস্তকে তিনি যে মানব চরিত্র বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন—গভীর জ্ঞান ও যেরূপ চিন্তা শক্তির বিকাশ দেখাইয়াছেন, তাহাতে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। এমন কি তিনি নাকি বলিয়া-ছিলেন—"যে কল্পনা ও ভাব লইয়া এই চরিত্রগুলি চিত্রিত করিয়াছিলাম, গিরিজাবাবুর সমালোচনায় তাহারা আরও উজ্জ্বল ও মহান্ অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়াছে।"

কবি অনেক সময়ে নিজে যাহা কল্পনাবলে লিখিয়া থাকেন, ভাবুক সমালোচকের হস্তে তাহাই আবার উচ্চাদর্শের জ্যোতির্ম্ময় পূতপরিচ্ছদে, দেশের দুয়ারে—সাহিত্য-মন্দিরে—গম্ভীরতর উদ্দেশ্যে পূর্ণ হইয়া উঠে। তাই আজ "বঙ্কিমচন্দ্র" এত সমাদৃত; তাই গিরিজাপ্রসন্নের সমালোচনা পাঠ করিয়া, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলী পাঠের সার্থকতা উপলব্ধি হয়; আর সমালোচক, কবির হৃদয়প্লুত প্রীতিরসে অভিষিক্ত হইয়া থাকেন। কবি আপন মনে লিখিয়া যান, আর সমালোচক তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা

করেন। সমালোচকের কষ্টি পাথরের মুখে কবির কাব্য খাঁটী স্বর্ণে পরিণত হয়।

গিরিজাপ্রসন্নও আমাদের এই শ্রেণীর সমালোচক। এই পুস্তক ব্যতীত তিনি "হিতকথা" নামে একখানি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থরচনা করেন এবং পূর্ব্বলিখিত "কয়েক খানি পত্র" নামক গ্রন্থ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া "দম্পতির পত্রালাপ" নামে প্রকাশিত করেন। তাঁহার "গৃহলক্ষ্মী" পুস্তকে স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনোপলক্ষে—দম্পতির কর্ত্তব্য, সংসারের উন্নতি অবনতির মূলতত্ত্ব, স্ত্রী-জাতির কর্ত্তব্য প্রভৃতি অতি সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

লেখকের বা কবির মনোভাবই তাঁহাদের কাব্যে প্রকাশ পায়—এটা স্বাভাবিক নিয়ম। সুতরাং গিরিজাপ্রসন্ন যে কোমলতা, মাধুর্য্য, ধর্ম্মনিষ্ঠা, ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতি গুণগ্রামে ভূষিত ছিলেন, তাহা তাঁহার পুস্তকপাঠেই সম্যক্ উপলব্ধি হয়।

গিরিজাপ্রসন্ন জ্যোতিষশাস্ত্রেরও আলোচনা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিও লাভ করিয়াছিলেন। "গৃহলক্ষ্মী"তে তাঁহার জ্যোতিষাভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

গিরিজাপ্রসন্ন একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার চিত্ত ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। মন পরিষ্কার না হইলে ভগবানের চিন্তা করিতে পারা যায় না, তাই তিনি চিত্তশুদ্ধির জন্য শাস্ত্রোক্ত বিধিমত ব্রত-নিয়মাদি পালন করিতেন। ব্রহ্মচর্য্য তাঁহার এক রকম নিত্য সহচর ছিল। তিনি প্রত্যহ প্রাতঃস্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনান্তে ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিতেন, তৎপরে পূজা ইত্যাদি সমাধা করিয়া স্বীয় বিষয় কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন। এমনি করিয়া গিরিজা-প্রসন্ন হৃদয়কে ভগবানের পবিত্র আসন করিতে প্রয়াস পাইতেন।

তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য, নিত্য গঙ্গাস্নান ও ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠে ব্যাঘাত হয় এই জন্য গিরিজাপ্রসন্ন প্রায়ই কলিকাতা থাকিতেন। ১৩০৫ সনে কলিকাতায় প্লেগ মহামারী উপস্থিত হইল। তাঁহার বাসাবাড়ীতে সীতানাথ নামক একটী আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার্থীর উক্ত রোগ হইল। গিরিজাপ্রসন্ন স্বয়ং তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু রোগের প্রকোপ হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না; অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয়।

তখন গিরিজাপ্রসন্ন কতিপয় বন্ধুর পরামর্শে বাড়ীতে যাত্রা করেন; কিন্তু সেই সর্ব্বসংহারক ব্যাধি হইতে তিনি অব্যাহতি পাইলেন না। ২০শে ভাদ্র গিরিজাপ্রসন্নের জ্বর হইল এবং অনতিবিলম্বে প্লেগের সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইল, কিন্তু তাঁহার জ্ঞানের কোন বৈলক্ষণ্য ঘটিল না। অবশেষে ২২শে ভাদ্র প্রাতঃকালে ভগবানের ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার আত্মা ভগবানের পাদপদ্মে বিলীন হইয়া গেল।

বাখরগঞ্জে গিরিজাপ্রসন্নেব "গৃহলক্ষ্মী" গৃহলক্ষ্মীদের মহদুপকার সাধন করিয়াছে। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে স্ত্রী-শিক্ষা একরকম নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গিরিজাপ্রসন্ন এই অভাব প্রকৃতই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন রমণী অনন্ত শক্তি-স্বরূপিণী, স্বার্থ-ত্যাগ ও সংযমের জ্বলন্ত মূর্ত্তি। তাই তিনি হৃদয়ের আবেগে তাঁহার পুস্তকে বলিয়াছেন "তবে এক ভরসা আছে, ভারতে রমণী জাতি! তাহাদিগেরও অধঃপতন হইয়াছে, দিন দিন হইতেছে; তবুও রমণীতে ভারতের যে গৌরব আছে, পুরুষে তাহা নাই; অধঃপতনের অনুপাতে তাহারা এখনও অনেক উচ্চে অবস্থিত বলিতে হইবে। তাই মনে হইতেছে এই রমণী ভারতকে রাখিলে রাখিতে পারে।"

এই অভাবটা আরও অনেকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু কোন সন্তোষজনক ফল হইল না। গৈলানিবাসী আনন্দচন্দ্র সেনও গিরিজাপ্রসন্নের মত "গৃহিণীর-কর্ত্তব্য" নামক একখানা পুস্তক রচনা করিয়া স্ত্রীসমাজের উপকার সাধন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

বাখরগঞ্জে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছে। "বাখরগঞ্জ-হিতৈষিণী-সভা" এই জন্যই স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে এই সভা স্থাপিত হয়। বাটাজোড়ের ভূম্যধিকারী ব্রজমোহন দত্ত, উজীর-পুরের মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, গৈলার বিশ্বেশ্বর সেন, লাকু-টিয়ার সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ পি, এল, রায়প্রমুখ বাখরগঞ্জের কতিপয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ইহার অগ্রণী ছিলেন। ময়মনসিংহ নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার আনন্দ মোহন বসু ও ফরিদপুর নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ উকীল অম্বিকাচরণ মজুমদার এই সভার উন্নতিকল্পে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

তবে বাকলায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা যে সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে, তাহা

বলা যায় না। রায়েরকাঠীর রাজবংশীয়া বসন্তকুমারী ও কুসুমকুমারী, বাসণ্ডার কামিনী রায়, বি এ, ও যামিনী সেন এল, এম, এস; এম, আর, সি, পি,—(লণ্ডন—এই উপাধিটী ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে ইনি সর্ব্বপ্রথম পাইয়াছেন।) প্রভৃতি মনস্বিনীগণের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটী মহিলা প্রতিভার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তন্মধ্যে চাঁদসীর কাদম্বিনী বসু বি, এ; এল, আর, সি, পি; লাকুটিয়ার কুসুমকুমারী এবং গৈলার সরোজবাসিনীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাদম্বিনীর জন্মভূমি চাঁদসীগ্রাম, বঙ্গদেশে অপরিচিত নহে। ধন্বন্তরিকল্প ক্ষতচিকিৎসক স্বনামখ্যাত ডাক্তার পদ্মলোচন দাস চাঁদসী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পদ্মলোচন শুধু বঙ্গদেশে কেন, ভারতের অনেকস্থানে সুপরিচিত। তাঁহার পুত্রগণও বর্ত্তমান সময়ে ক্ষতচিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী। কুসুম কুমারী “স্নেহলতা” ও “প্রেমলতা” নামক দুইখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহাদের ভাব ও ভাষা হৃদয়স্পর্শী। সরোজবাসিনী “প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি” নামক গভীর ভাবপূর্ণ কবিতা পুস্তকের রচয়িত্রী। এই পুস্তকখানি মানকুমারীর “কাব্যকুসুমাঞ্জলি” হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।

চণ্ডীচরণ ও গিরিজাপ্রসন্নের লেখনী প্রধানতঃ ঐতিহাসিক ও সামাজিক গ্রন্থ প্রণয়নে নিযুক্ত ছিল। অস্মদ্দেশবাসিগণের মধ্যে কেহ কেহ ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়নেও বিশেষ কৃতীত্ব দেখাইয়াছেন। এই শ্রেণীর পুস্তকের মধ্যে প্রসিদ্ধ “ভক্তিযোগ” গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাটাজোড় গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী দত্তবংশে “ভক্তিযোগ”-প্রণেতা অশ্বিনীকুমারের জন্ম হয়। ইঁহার পিতা ব্রজমোহন দত্ত একজন স্বনামধন্য কৃতী পুরুষ ছিলেন। তাঁহারই যত্নে পটুয়াখালীতে প্রথমে সব-ডিভিসন স্থাপিত হয় এবং এখানে তিনি মুনসেফ ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করেন। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে অশ্বিনীকুমার পটুয়াখালীতে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে যখন ইনি কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, তখন একদিন বিখ্যাত লেপ্টেনাণ্ট্ গবর্ণর, আস্‌লি ইডেন্ (Ashley Eden) উক্ত কলেজ পরিদর্শনার্থ তথায় আগমন করিলে, বালক অশ্বিনীকুমার ইংরাজী ভাষায় একটী চিত্তাকর্ষক সনেট' (Sonnet) লিখিয়া তাঁহাকে উপহার দিলেন। সাহেব বাহাদুর অত্যন্ত গুণগ্রাহী ছিলেন; তিনি উক্ত রচনার

পারিপাট্য ও মাধুর্য্য দর্শনে তাঁহাকে অজস্র ধন্যবাদ প্রদান করেন ও তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া মুগ্ধ হ'ন। কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ রো (Mr. Rowe) অশ্বিনীকুমারের সনেট লিখিবার এবম্বিধ ক্ষমতা দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ও তাঁহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতে লাগিলেন।

অশ্বিনীকুমার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্, এ, উপাধি গ্রহণ করিয়া কয়েক বৎসর শ্রীরামপুর উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন শুধু বিদ্যালয়ের পুস্তক পাঠে উপযুক্ত শিক্ষা হয় না, মানুষকে মানুষ নামের উপযুক্ত করিতে হইলে চরিত্র গঠন আবশ্যক। তাই তিনি ছাত্রদিগের বিদ্যার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র গঠন শিক্ষা দিতেন এবং যাহাতে তাহারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন লইতেন। অশ্বিনীকুমার ছাত্রদিগকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন এবং তাহারাও তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিত ও হৃদয় ঢালিয়া ভালবাসিত।

অতঃপর তিনি ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বরিশালে আসিলেন। শীঘ্রই তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির কথা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং অত্যল্পকালমধ্যেই তিনি শুভ্রযশোরাশির অধিকারী হইলেন। কিন্তু আইন ব্যবসায় সকল সময়ে সততা রক্ষা হয় না মনে করিয়া অশ্বিনীকুমার আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার নিকট সৎপথের ধূলিরাশি অসৎপথের স্বর্ণমুষ্টি অপেক্ষা মূল্যবান ছিল।

অশ্বিনীকুমার তারপর পিতৃপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন এবং বহুচেষ্টা যত্ন ও সর্ব্বোপরি অসাধারণ প্রতিভাবলে উহাকে উচ্চশ্রেণীর কলেজে পরিণত করিলেন। ক্রমে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র গঠনের কয়েকটী উৎকৃষ্ট পন্থা উদ্ভাবিত করিয়া উহাকে আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত করিলেন। সত্য, প্রেম, পবিত্রতায় অশ্বিনীকুমারের জীবন গঠিত এবং ইহাই তাঁহার লক্ষ্য।

অশ্বিনীকুমারের কর্ম্মবহুল জীবনের বিস্তৃত কার্য্যাবলীর বিস্তৃত বিবরণ বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তিনি সাহিত্যজগতে যে কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন আমরা তাহারই বর্ণনা করিব। তাঁহার পবিত্র লেখনী হইতে যে অমৃতধারা প্রবাহিত হইয়াছে, যাহার মধুময় আস্বাদে বঙ্গের ধ্বংসপ্রায় উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র-জীবনে নবীন উৎসাহ, নবীন তেজ,

নবীন জীবনী-শক্তি বিকসিত হইয়াছে, সেই "ভক্তিযোগ", সেই অপার্থিব "প্রেম", সেই জগদম্বার মহোদ্বোধনের নবীন জ্যোতিঃ "দুর্গোৎসব তত্ত্ব" তাঁহারই অমৃতময়ী লেখনী-প্রসূত। এই ভক্তিযোগ দর্শনে সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থকারকে ভূয়সী প্রশংসা করেন। অশ্বিনীকুমার নানাপ্রকার পুরাণ ও বহু সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া গভীর জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন।

অশ্বিনীকুমার যে শ্রেণীর পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহা প্রধানতঃ নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক। আমরা এইখানে আর একজন সাহিত্যরথীর কথা বলিব, তাঁহার রচনাগুলি ঠিক এক শ্রেণীর না হইলেও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও মৌলিক গবেষণাপূর্ণ। ইনি বর্ত্তমানে এই জিলার একজন শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকার।

১২৬৪ সালের শ্রাবণ মাসে বরিশাল জিলার অন্তর্গত লতাগ্রামে স্বীয় মাতুলালয়ে মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পৈত্রিক বাসস্থান বানরিপাড়া গ্রামে; পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র গুহ-ঠাকুরতা। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার কবিত্বশক্তির বিকাশ হয় এবং দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময় ইনি মাসিক পত্রে কবিতা পাঠাইতে আরম্ভ করেন। মনোমোহন বসুর "মধ্যস্থ"পত্রে ইঁহার আদি-উদ্যম-প্রসূত কয়েকটী কবিতা প্রকাশিত হয়। অষ্টাদশ বৎসর বয়স্ক মনোরঞ্জনের "অশনি" নামক একটী কবিতা তাৎকালিক বাঙ্গালার বিখ্যাত মাসিকপত্র "বঙ্গদর্শনে" মুদ্রিত হয়। যদি তিনি একাগ্রমনে সাহিত্যচর্চ্চায় নিযুক্ত থাকিতেন তাহা হইলে মনোরঞ্জন আজ বাঙ্গালার একজন শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকার হইতেন সন্দেহ নাই। তিনি যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তন্মধ্যে "জীবন সহায়" "কবিতা-রঞ্জন" "কবিতা-কলিকা" "আশা-প্রদীপ" "কুম্ভমেলা" প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত পুস্তকদ্বয় তাঁহার গভীর গবেষণা, দার্শনিক তত্ত্ব ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচায়ক। এতদ্ভিন্ন তাঁহার নানাবিষয়ক মৌলিক প্রবন্ধ, সমালোচনা, কবিতা প্রভৃতি অদ্যাপি অনেক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে।

বরিশালের নিকটবর্ত্তী কাশীপুরের প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এ দেশের আর একজন সাহিত্যরথী। তাঁহার রচিত "কাশীপুর-কুসুম" ও "কাশীপুর-নিবাসীর সংগ্রহ" পুস্তকদ্বয় উল্লেখযোগ্য। এই পুস্তক দুইখানি তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও যথেষ্ট পরিশ্রমের পরিচায়ক। তিনি পোষ্টাফিসের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আর একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রশংসা-

ভাজন হইয়াছেন। তাঁহার "কাশীপুর-নিবাসী" নামক পত্রিকা বরিশাল্-বাসীর প্রভূত উপকার সাধন করিতেছে। বরিশালে যত প্রকার সংবাদপত্র বাহির হইয়াছে তন্মধ্যে এইটী সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী। প্রতাপচন্দ্র যেরূপ সুলেখক তদ্রূপ দেশের অনেক সৎকার্য্যের অগ্রণী।

বর্ত্তমান সময়ে লাখুটিয়ার দেবকুমার রায় চৌধুরী বরিশালের একজন প্রতিভাশালী শ্রেষ্ঠ কবি। ইঁহার কবিত্ব ও পুস্তক সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই নবীন উদীয়মান কবি স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা বলে বরিশালের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

উদীয়মান লেখকশ্রেণীর মধ্যে গৈলানিবাসী কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি "সাবিত্রী" "লিসিদাস" প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়া সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহার গবেষণাপূর্ণ অনেক প্রবন্ধ মাসিক পত্রিকায় বাহির হইতেছে।

বাঙ্গলায় সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে হইলে এইস্থানে আর একশ্রেণীর সাহিত্যের বিষয় সমুল্লেখ্য করা প্রয়োজন। বহু পূর্ব্ব হইতেই আমাদের অনেক প্রতিভাশালী লেখক সংবাদ-পত্রের আবশ্যকতা বুঝিয়া ইহার প্রচারে মনোনিবেশ করেন। সর্ব্বপ্রথমে বাসণ্ডা নিবাসী পূর্ণচন্দ্র সেন এই জিলায় মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। এই যন্ত্রেই প্রথমে "পরিমল-বাহিনী" নামক সংবাদপত্র মুদ্রিত হয়। তারপাশা নিবাসী হরকুমার রায় ইহার সম্পাদক ছিলেন। তারপর ১২৮ বঙ্গাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র কর "সত্যপ্রকাশ" নামে আর একটী মুদ্রাযন্ত্র আনয়ন করেন। এই যন্ত্রে "বরিশাল-বার্ত্তাবহ" নামক সংবাদ-পত্র প্রকাশিত হয়। ক্রমে ক্রমে এই সংবাদ-পত্রের আবশ্যকতা দেশবাসী সকলেই অনুভব করিতে লাগি-লেন তাই ক্রমশঃ "হিতসাধিনী" "বান্ধবরঞ্জিকা" "সত্যপ্রকাশ" "বঙ্গদর্শন" প্রভৃতি পত্রিকা বাহির হইতে লাগিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই পত্রিকা-গুলি অনেক দিন স্থায়ী হইতে পারিল না। তারপর প্রতাপচন্দ্র "কাশীপুর-নিবাসী" পত্রিকা বাহির করেন। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে। তৎপরে "বিকাশ" নামে আর একটী পত্রিকা বাহির হইত। বর্ত্তমানে "বরিশাল হিতৈষী" পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে: ইহার সম্পাদক দুর্গামোহন সেন বি, এ।

কবি যে সৌন্দর্য্য ভাষায় সৃষ্টি করেন, শিল্পী তাহা অসীম কৌশলে মানব চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত করেন। কাব্য ও কবিতা যেরূপ ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের একটী প্রধান উপাদান, শিল্পও তদ্রূপ ঐতিহাসিকদিগের প্রধান সাক্ষী। হোমারের ইলিয়াড, বাল্মিকীর রামায়ণ, ব্যাসের মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে যেরূপ তাৎকালিক সমাজ-চিত্র সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে, কলাকৌশলের পরাকাষ্ঠা গ্রীসের ভাস্কর্য্যসমূহ, ভারতের চারু কারুকার্য্যখোদিত সুবৃহৎ অট্টালিকা সমূহ, মিশরের পিরামিড্ প্রভৃতিও তাৎকালিক মানবের সৌন্দর্য্য-উপলব্ধির গভীরতা, জ্ঞানের প্রসারতা ও অপরিসীম কৌশলের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। রাস্কিন বলিয়াছেন "In true Art the hand, the head and the heart of a man go together" যে দেশের লেখক কবি, বৈয়াকরণ কবি, চিকিৎসক কবি, দার্শনিক কবি, ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক কবি, আইনজ্ঞ কবি, যে দেশ স্মরণাতীত যুগ হইতে কাব্যামৃত রসাস্বাদনে তৃপ্ত হইয়া আসিতেছে, সে দেশের শিল্পীর কারুকার্য্যে কত মাধুর্য্য, কত সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে তাহা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। জাতীয় অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে মানবের অন্তর্নিহিত গুণসমূহেরও অধঃপতন হয়; গ্রীসের সে শিল্পচাতুর্য্য, মহাভারত ও ইলিয়াডের মত কাব্য এখন কোথায়? পুরীর জগন্নাথের মন্দির, অজান্তা গুহা এবং তাজমহলের কারু-কার্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও একথা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

আমাদের বাকলারও এমন একদিন ছিল যে দিন তিনি তাঁহার সন্তান-গণের কলাকৌশলে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। যে সকল প্রাচীন মঠ-মন্দির প্রভৃতি এদেশে দৃষ্ট হয়, তাহার অনেকগুলির কারুকার্য্য বড়ই মনোহর। ইহাদের মধ্যে রায়েরকাঠীর সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির এবং পোনাবালিয়ার রামভদ্র রায়-প্রতিষ্ঠিত মঠ-মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে বিভিন্ন সময় নির্ম্মিত নবরত্ন, পঞ্চরত্ন প্রভৃতি চতুর্দ্দশটী মন্দির বিদ্যমান। বহুতর অশ্বত্থ এবং পাকুড় বৃক্ষ সমাচ্ছন্ন হইয়া এই মন্দির অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। মন্দিরে হিন্দু-মুসলমান-শিল্পের আশ্চর্য্য সম্মিলন দৃষ্ট হয়। মন্দিরগাত্র নানাবিধ মূর্ত্তি ও কারুকার্য্য-খোদিত ইষ্টক দ্বারা সজ্জিত। এই মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য রাজা শত্রাজিৎ রায়ের সময় আরম্ভ হইয়া রাজা জয়নারায়ণ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

মন্দিরের সম্মুখভাগে পঞ্চভুজাকৃতি শ্বেতপ্রস্তরে সংস্কৃত ভাষায় তাৎকালিক বঙ্গাক্ষরে মন্দিরনির্ম্মাতা স্থপতি কিঙ্করের নাম, উৎসর্গকর্ত্তা রাজা জয়-নারায়ণের নাম, উৎসর্গের সন-তারিখ, পূজকের নাম এবং যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রস্তর খোদিত হইয়াছিল তাহার নাম প্রভৃতি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। পোনাবালিয়ার রামভদ্র রায়-প্রতিষ্ঠিত মঠ-মন্দির, অস্মদ্দেশবাসিগণের গৌরবের সামগ্রী। স্থাপত্যশিল্পের এইরূপ উৎকৃষ্ট নিদর্শন এদেশে অধিক দৃষ্টিগোচর হয় না। মঠ-মন্দিরের অনতিদূরে মনোহর রায়-প্রতিষ্ঠিত দুর্গা-মন্দির ও কমলাকান্ত রায় স্থাপিত মনসা-মন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরদ্বয়ের গাত্রখোদিত লিপিপাঠে উহারা যথাক্রমে ১৭০০ * ও ১৭৩১ † শকে নির্ম্মিত বলিয়া জানা যায়। এখন ইহাদের ভগ্নদশা উপস্থিত। আশ্চর্য্যের বিষয়, রামভদ্রের মঠ-মন্দির উহাদের বহুপূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াও অদ্যাবধি অটল রহিয়াছে। এই মঠ-মন্দিরের দৃঢ়তা, এবং শিল্পচাতুর্য্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। মন্দিরগাত্রে ধ্রুবের তপস্যা, রাসলীলা, বস্ত্রহরণ প্রভৃতি নানাবিধ পৌরাণিক চিত্র খোদিত আছে, কিন্তু উৎসর্গ লিপিগুলি পল্লীবাসী Vandalগণের অত্যাচারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব এই মন্দির সর্ব্বপ্রথম কি উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। খোদিত চিত্রগুলি সকলই কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধীয়; তদ্দৃষ্টে অনুমান হয় রামভদ্র "কালাচাঁদ" নামক সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণবিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারই বাসের জন্য মধিপুরস্থিত কাছারী-বাড়ী যাইবার পথে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু ইহা তাঁহার স্বীয় ভবন হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া নিজগৃহের সম্মুখেই কালা-চাঁদের বর্ত্তমান ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

যে সকল স্থপতি আমাদের দেশকে একদিন উন্নতির উচ্চ শৃঙ্গে

* ব্যোম ব্যোম সমুদ্র চন্দ্র গণিতে শাকে গতে হায়নে।
সানন্দো হরকৃষ্ণরায় তনয়ো হর্ম্ম্যং বুধা নির্ম্মমে ॥
দুর্গায়া ভবদুঃখসাগরতরেস্তৎ প্রীতয়ে যত্নতঃ।
সেন শ্রীলমনোহরো হরমনোহারাম্বাপদার্চাপরঃ ॥

† শক্রেণ গুণাচলক্ষিতি মিতে শাকে গতে হায়নে।
স্বর্গার্থং জনকাত্মজা শিবচন্দ্রস্যাত্মজা * * ॥
শ্রীকৃষ্ণাত্মজকৃষ্ণকিঙ্কর সুতঃ পদ্মাবতী সেবতঃ।
প্রাসাদং * * ণ সেনকমলাকান্ত * * নির্ম্মমে ॥

স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রায়েরকাঠীস্থিত সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির-নির্ম্মাতা কিঙ্কর ও রাজা শিবনারায়ণের শিবমন্দির-নির্ম্মাতা রামকান্ত ব্যতীত অন্যান্য সকলের নাম বর্ত্তমান যুগে বিলুপ্ত প্রায়।

অস্মদ্দেশে চিত্র-শিল্পেরও যথেষ্ট চর্চ্চা ছিল। রায়েরকাঠী নিবাসী গিরীশচন্দ্র রায় ও নলচিড়া নিবাসী ঈশানচন্দ্র কর চিত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বর্ত্তমানে রায়েরকাঠীর কৈলাশচন্দ্র দাস ও খলিসাকোটা নিবাসী দুর্গানাথ ভট্টাচার্য্য তৈল-চিত্র অঙ্কণে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের নাম অস্মদ্দেশের চিত্রকরগণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কীর্ত্তিপাশার সংলগ্ন রণমত্তি গ্রামে চন্দ্রকুমার পাল চিত্রবিদ্যা ও মৃত্তিকা দ্বারা প্রতিমাদি প্রস্তুতে বিশেষ পারদর্শী। ইহার নাম বাখরগঞ্জের সর্ব্বত্র পরিচিত, অল্পকাল মধ্যেই ইনি স্বীয় গুণপনা দ্বারা যশস্বী হইয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় নামক আর একটী তরুণবয়স্ক যুবক চিত্রবিদ্যায় বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। শুক্তাগড় গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার অন্য একনাম ঠাকুরচাঁদ। ইনি স্বনামখ্যাত পণ্ডিত বনমালী বেদান্ততীর্থের ভ্রাতুষ্পুত্র। সুরেন্দ্রনাথের সরলতা, উদারতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা অতি শৈশবেই পরিলক্ষিত হইত। বর্ণপরিচয়ের পর হইতেই সুরেন্দ্রনাথের শিল্পকার্য্যের দিকে বেশী মনোযোগ দৃষ্ট হইত। ইনি বাল্যকালে মাটির দুর্গাপ্রতিমা এবং বহুবিধ কল-কব্জা প্রস্তুত করিতেন। বাল্যকালের দুই একটী কার্য্যেই তাঁহার প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইত। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার দ্বারদেশ পর্য্যন্ত গিয়া ঠাকুরচাঁদ ফিরিয়া আসিলেন। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে তাহার চিত্ত কোন দিনই আকৃষ্ট ছিল না। কিন্তু চিত্রবিদ্যায় বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেন। বনমালী বেদান্ততীর্থ যখন কাশী সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, তখন ঠাকুরচাঁদ কয়েক বৎসর কাশী ধামে পাঠাভ্যাস করেন। কাশীধামের প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহের ভগ্নাবশেষ চিহ্নগুলি দেখিয়া তাঁহার মন সেই প্রাচীন চিত্রগুলির দিকে আকৃষ্ট হইল এবং ভারতীয় প্রাচীন শিল্পকলার উদ্ধারসাধনে তদনুরূপ চিত্রাঙ্কন করিতে লাগিলেন। সেই হইতে বিদেশীয় শিল্পচাতুর্য্য তাঁহার চক্ষে ভাল লাগিত না। ভারতের সন্তান ভারতের লুপ্ত শিল্প পুনরুদ্ধার করিতে বিশেষ যত্নবান হইলেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বালক বহুপ্রকার

বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও সেই সাধনায় নিযুক্ত রহিলেন। তারপর সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা আর্টস্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ হাবেল্ আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ভারতীয় চিত্রকলার কতগুলি শ্রেষ্ঠ আদর্শ তাঁহার ছাত্রদের চক্ষের সম্মুখে ধরিলেন। ঠাকুরচাঁদ সেই আদর্শে চিত্র অঙ্কিত করিতে লাগিলেন এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই হাবেল্ সাহেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন, তারপর তাঁহারই অনুগ্রহে সুরেন্দ্রনাথ মাসিক আট টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইলেন।

সকল সৎকার্য্যেই সুরেন্দ্রনাথ অগ্রণী ছিলেন। কিছুকাল পরে দেশের উন্নতিকল্পে শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ হাটার্সলি তাতের (Hatersly Loom) ব্যবহার শিখিতে লাগিলেন। আশা ছিল যে, গ্রামে ইহা শিক্ষা দিয়া গ্রামবাসিদিগের নিকট শিল্পের একটী সহজ পন্থা তুলিয়া ধরিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে আশা সফল করিতে পারিলেন না।

কয়েকবৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় যে প্রাচ্য-শিল্প-প্রদর্শনী বসিয়াছিল তাহাতে সুরেন্দ্রনাথের ছবিগুলিই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিল, এবং অচিরেই তাঁহার যশ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। সুরেন্দ্রনাথ ঐ সময়ে পুরস্কার বাবদ প্রায় আটশত টাকা প্রাপ্ত হন।

সুরেন্দ্রনাথের চিত্রগুলি সাধারণের কাছে তত ভাল লাগিত না এবং বাজারে সেরূপ বিক্রয় হইত না, এই জন্য তাঁহার জনৈক বন্ধু তাঁহাকে রবিবর্ম্মার পদানুসরণ করিতে বলিলেন; কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন "বরং না খাইয়া মরিব, কিন্তু যাহাকে চিত্র-বিদ্যার আদর্শ বুঝিয়াছি, অর্থলোভে তাহা হইতে কখনও বিচ্যুত হইব না।" এই একাগ্রতা, এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠাবলেই সুরেন্দ্রনাথ এত অল্প বয়সে শুভ্র বিমল যশের অধিকারী হইয়াছিলেন; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ না হইতেই মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

উল্লিখিত চিত্র-শিল্পিগণ ব্যতীত শীতলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক আর এক নবীন যুবক চিত্র ও ভাস্কর্য্য বিদ্যায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। ইঁহার বাসস্থান কাঁন্তিপাশার সংলগ্ন গোবিন্দধবলগ্রামে। ইনি কোথাও শিল্প বিদ্যা শিক্ষা করেন নাই। ইঁহার অন্তর্নিহিত প্রতিভা স্বতঃই

বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। শিল্পীর মার্জ্জিত রুচি ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টির অপূর্ব্ব ক্ষমতা লইয়া যেন শীতলচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। শৈশবে মৃত্তিকা দ্বারা নানাবিধ সুন্দর পুতুল প্রস্তুত করা ও রঙ্গিন পেন্সিলের সাহায্যে চিত্র অঙ্কিত করা ইঁহার খেলার একটী অঙ্গ ছিল। স্বহস্তে বহুবিধ ছবি আঁকিয়া শিশু শীতলচন্দ্র বাল্য ক্রীড়াভূমিটীকে সজ্জিত করিতেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইঁহার কলাবিদ্যাও পরিমার্জ্জিত হইতে লাগিল। গ্রাম্য মধ্য-ইংরাজি বিদ্যালয় হইতে মাইনার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডাক্তারী শিক্ষার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। মহানগরীর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শিল্প ও নানাপ্রকার কারুকার্য্য শীতলচন্দ্রের হৃদয়ে অদম্য উৎসাহের সৃষ্টি করিল। তিনি নবীন উৎসাহে নির্জ্জনে বসিয়া আপনার প্রতিভার উৎকর্ষ সাধন করিতে লাগিলেন। কলিকাতার প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া শীতলচন্দ্র মোম ও ছুরির সাহায্যে যে সকল মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতেন, তাহা দেখিলে বাস্তবিকই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তাঁহার বালসুলভ চাপলতা-প্রসূত নিপুণতাপূর্ণ ফটোফ্রেম, নানাবিধ গহনার কেস্, আয়না-বসান কড়ির বাক্স, মোমের নির্ম্মিত শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরবৎ কতিপয় মূর্ত্তি ও সুন্দর সুন্দর কয়েকটী চিত্র বালকের নিপুণ হস্তের ও বিকাশোন্মুখ প্রতিভার সাক্ষ্য দিতেছে।

শীতলচন্দ্রের প্রথম-উদ্যম-প্রসূত কয়েকটী চিত্র সর্ব্বপ্রথমে স্বনামখ্যাত সাহিত্যরথী দীনেশচন্দ্র সেনের "রামায়ণী কথা" নামক পুস্তকে প্রকাশিত হয়। দীনেশচন্দ্র ইঁহাকে অন্যতম সাহিত্যসেবী কুমার শরৎকুমার রায়ের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। উপযুক্ত ক্ষেত্র অভাবে নবীন প্রতিভা শুকাইয়া যাইবে ভাবিয়া শরৎকুমার ভাস্কর্য-বিদ্যার অনুশীলনের জন্য নবীন শিল্পীকে একখণ্ড নাতিবৃহৎ শ্বেত মর্ম্মর-প্রস্তর প্রদান করেন। শীতলচন্দ্র সেই প্রস্তর দ্বারা একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর লক্ষ্মী-মূর্ত্তি প্রস্তুত করিলেন। এই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বঙ্গের কতিপয় শ্রেষ্ঠব্যক্তি ইঁহার সুনিপুণ ভাস্কর্য্য বিদ্যার যথেষ্ট প্রশংসা করেন, তারপর দীনেশচন্দ্র ইঁহার অসাধারণ গুণপনার আংশিক পরিচয় "প্রবাসী" পত্রিকায় প্রকাশিত করেন।

এই শ্রেণীর ভাস্কর অস্মদ্দেশে বিরল। ইনি বর্ত্তমানে ডাক্তারী পাশ করিয়া চিত্রবিদ্যায় রত আছেন। ভরসা করি, এই নবীন শিল্পী কলাবিদ্যায় উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করিয়া আমাদিগকে আরও গৌরবান্বিত করিবেন।

আমাদের দেশে যখন শিল্প ও অন্যান্য বহুপ্রকার কলাবিদ্যার অনুশীলন হইত, তখন ম্যাঞ্চেষ্টার, আমেরিকা, সেফিল্ড প্রভৃতির কোন জিনিষ এদেশে আসিত না। তৎকালে তাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও এদেশবাসিগণ অজ্ঞ ছিলেন। তখন আমাদের দেশের তৈয়ারী জিনিষপত্রেই আমাদের সকল কার্য্য সমাধা হইত। মাধবপাশা, গাবখান ও লক্ষ্মণকাঠী প্রভৃতি স্থান বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল। গ্রাম্য তাঁতীগণ এমন চমৎকার সুচিক্কণ বস্ত্র প্রস্তুত করিত যে, সেগুলি বিভিন্নদেশে বহুমূল্যে বিক্রীত হইত। বিশ বৎসর পূর্ব্বেও অস্মদ্দেশের বাজারে এই সকল বস্ত্র বিক্রয় হইত; কিন্তু নূতন স্রোত আসিয়া তাহার চিহ্ন পর্য্যন্তও লোপ করিয়া দিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে শুধু এই সকল স্থানের স্মৃতিটুকু মাত্র জাগরুক আছে। নলচিড়ার দক্ষিণপূর্ব্ব কোন এক নগণ্য ক্ষুদ্র পল্লিতে পঞ্চাশ-ষাইট বৎসর পূর্ব্বে কাগজ তৈয়ার হইত। এই কাগজের জন্যই উক্ত গ্রামের নাম কাগজীনগর হইয়াছে। এই গ্রামের অধিবাসিগণ ঢেঁকির সাহায্যে কাগজ প্রস্তুত করিয়া স্বীয় স্বীয় জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। তৎকালে কাগজীনগরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের বিদ্যার্থী ছাত্রবৃন্দ এই কাগজই ব্যবহার করিতেন।

উজীরপুর গ্রামে যে সকল ইস্পাত নির্ম্মিত শাণিত অস্ত্র, ছুরী, কাঁচি, নিব্ প্রভৃতি প্রস্তুত হইত তাহা অতীব চমৎকার। আমাদের দেশের সকল অভাবই ইহাদ্বারা দূরীভূত হইত এবং সুদূর আরাকাণ, মণিপুর, ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত স্থানে প্রভূত পরিমাণে রপ্তানি হইয়া তাহাদেরও যথেষ্ট উপকার সাধন করিত। উজীরপুরে এই সমস্ত কারবার এখনও কিছু কিছু বর্ত্তমান আছে। বর্ত্তমানে স্বদেশী নিবগুলির মধ্যে "উজীরপুর-নিব্" এখনও শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া পূর্ব্ব গৌরবের সামান্য স্মৃতিটুকু জাগাইয়া রাখিয়াছে।

রহমতপুর নিবাসী ভূম্যধিকারী স্বনামপ্রসিদ্ধ বরদাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠপুত্র সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বর্ত্তমান যুগে এই জিলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী। তিনি অসাধারণ শক্তি ও জ্ঞান-গরিমার যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা অতীব প্রশংসনীয়। ইনি বহুকাল হইতেই জ্যোতিষশাস্ত্রের গভীর গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। কতিপয় বৎসর হইল ইনি (Solar system) সৌর জগতের গতি প্রদর্শক একটী অভিনব যন্ত্র আবিষ্কার ও নির্ম্মাণ করিয়াছেন। গত ১৯১০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার ভারত-শিল্প-প্রদর্শনীতে এই যন্ত্র প্রদান করিয়া সুধী-

সমাজে যথেষ্ট যশোভাজন হইয়াছেন। এই যন্ত্রটী ঘড়ীর চাকার ন্যায় চাকাদ্বারা নির্ম্মিত। কর্ত্তৃপক্ষ এই অদ্ভুত ক্ষমতা ও অভিনব শিল্পচাতুর্য্য দর্শন করিয়া ইঁহাকে একটী স্বর্ণপদক প্রদান করিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ "Calculatirg apparatus" নামে আর একটী যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহাদ্বারা মিশ্রযোগ-বিয়োগ প্রভৃতি অতি সত্বর প্রদর্শিত হয়। সম্প্রতি হিন্দু-জ্যোতিষের মর্ম্ম ও গণনা অতি সহজে সাধারণের বোধগম্যের জন্য "সিদ্ধান্ত চক্র" নামক একটী যন্ত্র ও "সিদ্ধান্ত-দীপিকা" নামক একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। পুস্তকখানি এখনও প্রকাশিত হয় নাই। এই যন্ত্র ও পুস্তকের সাহায্যে যে কোন সামান্য শিক্ষিত ব্যক্তি অতি সহজে পঞ্জিকার তিথি, নক্ষত্র, বার ও যোগ নির্ণয় করিতে পারিবেন। এই শিল্পীর কৃতীত্বে গৌরবান্বিত ও সমগ্র বাকলা ইঁহার গৌরব প্রভায় উজ্জ্বল। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি ইনি উত্তরোত্তর শিল্পের উন্নতি করিয়া সমগ্র বঙ্গদেশকে উজ্জ্বলতর প্রভায় মণ্ডিত করুন।

ক্ষীরোদবিহারী সেন বর্ত্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ হাফটোনব্লক-প্রস্তুতকারক বলিয়া বঙ্গদেশে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। গৌরনদী থানার মাহিলাড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকে ইঁহার তাদৃশ মনোযোগ ছিল না। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার চিত্র অঙ্কন ও খোদাই কার্য্যে দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছিল। জীবনের যে লক্ষ্য ইনি হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন তাহার অনুশীলনে ক্ষীরোদবিহারী বাল্যকাল হইতেই বিশেষ যত্নবান ছিলেন।

কৈশোরের প্রারম্ভেই ইনি আলোকচিত্র (photograph) শিক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে ঢাকায় গমন করেন। অতি অল্পসময় মধ্যে ইনি এই বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত হইলেন। অর্থের সংস্থান আবশ্যক মনে করিয়া ক্ষীরোদ-বিহারী অতি সামান্য বেতনে ঝালকাঠী, পরে, পিংনা ও কিশোরগঞ্জ স্কুলে চিত্রবিদ্যার শিক্ষক হইলেন। কিছুদিন পরে উক্ত কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া হাফটোনব্লক-প্রস্তুত-প্রণালী শিখিবার জন্য কলিকাতা আগমন করেন ও সুপ্রসিদ্ধ Messrs U. Ray & Co. আফিসে চাকরী গ্রহণ করিয়া উক্ত কার্য্যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। ইহার পর ইনি এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসে কয়েক দিন এই কার্য্য করিয়া বম্বে

"টাইমাইস্ অব্ ইণ্ডিয়া" আফিসে কার্য্য করেন এবং এই খানে ইনি বিশেষ সম্মানিত হ'ন। পরের চাকরী করা ইঁহার ইচ্ছা ছিল না, তবে জ্ঞান-পিপাসার জন্য এই চাকরীকে ইনি কখনও অবজ্ঞা করেন নাই। স্বাবলম্বন-চিন্তা বাল্যকাল হইতেই ক্ষীরোদবিহারীর অত্যন্ত বলবতী ছিল; তাই অতি সত্বর চাকরী ছাড়িয়া কলিকাতায় স্বীয় নামে হাফ্‌টোন ব্লকের কারবার খুলিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার স্বহস্তখোদিত ব্লক কলিকাতার শ্রেষ্ঠ ব্লকশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইল। ইহার পর ইনি স্বীয় ব্যবসায়ের আয় হইতে টাকা সংগ্রহ করিয়া ১৯১১ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে বিলাত যাত্রা করেন।

তিনি লণ্ডনে আসিয়া মাত্র তিন মাস শিক্ষা লাভ করিলেন এবং কঠোর পরিশ্রমের সহিত জ্ঞাতব্য সকল বিষয় অবগত হইলেন। তারপর তাঁহার শিক্ষকের অনুরোধে সাপ্তাহিক দুই পাউণ্ড দুই শিলিং বেতনে সেইস্থানে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ক্রমাগত নয় মাস কার্য্য করিলেন; কিন্তু বিলাতে কাজ শিক্ষা করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তাই ডিসেম্বর মাসে পুনরায় তিনি কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন।

বর্ত্তমান "K. V. Seyne & Bros" কারখানাই ক্ষীরোদবিহারীর অসাধারণ যত্ন ও চেষ্টার ফল। তাঁহার নির্ম্মিত ছবির বিশেষ পরিচয় বাহুল্য মনে করি, বর্ত্তমানে সর্ব্বত্রই এই কারখানার ছবি বিশেষ প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছে।

এই অধ্যায়ে সংস্কৃত চর্চ্চা ও বঙ্গসাহিত্যসেবা সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাই অস্মদেশের পক্ষে যথেষ্ট নহে। আমাদের দেশে পূর্ব্বকথিত পণ্ডিতবর্গ ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে এমন আরও অনেক লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা জ্ঞানচর্চ্চায় আপনাদিগকে উৎসর্গ করিয়া স্বদেশের হিতসাধন করিতেছেন; ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকে নাটক, দর্শন, ব্যাকরণ প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়া, কেহবা আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র আলোচনা দ্বারা ইতিমধ্যে সাহিত্যের ও এদেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। বাগপাড়ানিবাসী রজনীনাথ ভট্টাচার্য্য, "অভিমন্যুবধ" নাটক-রচয়িতা মহেশচন্দ্র দাশ, কীর্ত্তিপাশা-নিবাসী কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, সুন্দরনিবাসী হরনাথ বসু, উজীরপুরনিবাসী পণ্ডিত রজনীনাথ পদরত্ন, বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক-

পণ্ডিত কামিনীকান্ত বিদ্যারত্ন ও কালীশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, গুক্তাগড়নিবাসী অধ্যাপক বনমালী বেদান্ততীর্থ এম, এ, চাঁদসীনিবাসী সীতানাথ সাংখ্যতীর্থ, ও হরনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ব্যাকরণ, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রে বাঙ্গলাবাসিগণের কৃতিত্ব যাহাই হউক না কেন, আয়ুর্ব্বেদচর্চ্চায় যে তাঁহারা একদিন বঙ্গের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করা যায় না। ভারত-বিশ্রুত নিদান-গ্রন্থ-প্রণেতা মহামতি মাধবকর * ও কলাপ-ব্যাকরণের পঞ্জী-রচয়িতা মহাত্মা ত্রিলোচন দাশ কবীন্দ্রের নাম গৌড়জন সহজে বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। বাঙ্গলাবাসিগণের মধ্যে যাঁহারা স্বদেশের এই গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় মনীষির নাম পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়েও খলিসাকোটানিবাসী ঋষিকল্প সুপণ্ডিত পার্ব্বতীচরণ রায় সেই গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন প্রতিভাশালী সুচিকিৎসক অধুনা অস্মদ্দেশে আর নাই। এতদ্ভিন্ন ভাটিয়ানিবাসী সুপণ্ডিত শ্রীনাথ সেন গভীর জ্ঞান ও চিকিৎসা-নৈপুণ্য দ্বারা দেশবিখ্যাত হইয়াছেন। পরবর্ত্তী আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে অনেকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির সহিত স্বীয় স্বীয় ব্যবসায় নিযুক্ত আছেন।

আমাদের দেশে এরূপ আরও অনেক উদীয়মান কবি ও শিল্পী আছেন, যাঁহারা উপযুক্ত ক্ষেত্র অভাবে নির্জ্জন গৃহ-পল্লীতে বসিয়া স্বীয় স্বীয় অন্তর্নিহিত গুণসমূহের অনুশীলনে নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদের কবিত্ব ও শিল্পচাতুর্য্য ক্ষুদ্র অর্দ্ধশিক্ষিত জনসমাজে সীমাবদ্ধ। হায়! উপযুক্ত অর্থ অথবা পৃষ্ঠপোষক অভাবে তাঁহাদের অমূল্য গুণসমূহ ক্ষুদ্র পল্লীর ভিতরেই লয়প্রাপ্ত হইতেছে।

সম্পূর্ণ।

* গ্রন্থকার জাতিতত্ত্ব-বারিধি-প্রণেতার অনুবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বে ইহাকে চক্রপাণিদত্তের সমকালীন লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ ইনি তাঁহার বহুপূর্ব্বে সম্ভবতঃ ৮ম শতাব্দীরও পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

"Madhavakara in his Nidana quotes bodi from the Uttaratantra, and as the Nidana was one of the medical works which were translated for the Caliphs of Bagdad, it can safely be placed in the 8th century at the latest." Page. XXIX. P. C. Ray's Hindu Chemistry Vol. I.

কতিপয় ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	যাহা আছে	যাহা হইবে
২	ফুঃ নোঃ-৫	Reysu-S-Salatin	Riyazu-S-Salatin
৫	১৬	এবং আরাকান	এবং পূর্ব্বে আরাকান
৬	১১	ঢাকা,	তখন ঢাকা,
৮	৮,৯	৬৩৬-৬৪৬	৬২৯-৪৫
১০	৩	ক্রমশঃ	উহার বেগ ক্রমশঃ
১১ ও ১২	২০ ও ১	তাই...যে গাঙ্গ	গাঙ্গ
১৩	১০	মিত্রদ্রোহী	মিত্রদ্রোহীতা
১৫	১৮	ধরণদি, অদমপুর	ধরণদি ও অদমপুরের বিল
১৮	২৬	করিরা	করিয়া
১৯	১০	নদীমুখনিঃস্থত	নদীমুখনিস্থত
২০	১৭	১৫৮৩	১১৮৫
”	ফুঃ নোঃ-৯	Gladwin's	Gladwin's and Blochmann's (combined)
২১	১৯	উর্ম্মিমালা	ঊর্ম্মিমালা
৩৭	২৪	বাকলা	সমতট ?
”	২৫	৬১৬-৬৭৬	৬২৯-৪৫
৩৮	ফুঃ নোঃ-৮	সেনবংশপ্রদীপ	সোমবংশপ্রদীপ
৪০	”-১	যেন	যেমন
”	”-১৩	দসাসা	দশাসা
৪৬	”-১	উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ
৪৭	”-১৩	শ্রুতিপাঠ	শ্রুতিপাঠক
৪৯	১১	১১৯১	১১৯ বা ১১৯৯
৫০	ফুঃ নোঃ-৫	Blochman's	Blochmann's
৫৩	১	ইনি	ইহার কুট
”	২০	পূর্ব্ব	পশ্চিম
৬০	ফুঃ নোঃ-১	Lachua	Kachua
৬১	১৭	তিনি	নাসিরসাহ
৬৬	ফুঃ নোঃ-২	আদিপুরুষ	পূর্ব্বপুরুষ
৬৭	” ”	এই সংগ্রহ	এই প্রবাদটী সংগ্রহ
”	১	অপ্প	অল্প
৬৮	৯	রলফফিচ্	রলফ ফিচ্
৭৫	¶ চিহ্নিত ফুটনোটের পরিবর্ত্তে		২২৯ পৃঃ * চিহ্নিত ফুটনোট

৭৯	১০	তাঁহার	বাকলার অবনতির যুগে
৮১	ফুঃ নোঃ-১	Berner's	Bernier's
৮৩	৮	সায়েস্তাখাঁ প্রভৃতি	সায়েস্তাখাঁর অব্যবহিত পরবর্ত্তী
৮৬	ফুঃ নোঃ-১৫	Perpitrated	Perpetrated
৮৮	২৯	সেইকি	সেফি
৯৩	২১	through	threw
„	২৯	Danger	danger
৯৪	ফুঃ নোঃ-৫	P. 412	P. 124
৯৯	২	ন্যায়, পরায়ণতা	ন্যায়পরায়ণতা
১০০	৬	বৈদিক	আদিবৈদিক
১০০	২১ et seq	বাঙ্গলা	বাকলা
১০১	২	অম্বষ্ঠকুলপ্রদীপ সম্ভূত	অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত
„	ফুঃ নোঃ-৯	বল্লালসেন	বল্লালেন
„	„-১২	ভূপস্য	ভূপশ্চ
„	„-১৩	কুরুতে ইতি	কুরুতেহ্তি
১০২	ফুঃ নোঃ-২	অপকার্য্য	অপ্যকার্য্য
১০৩	৮	"ওষধিনাম বংশ"	"ওষধি নাথবংশ"
„	১০	জাতিতে	জাতিতে নাকি
১০৫	৯	স্বজ্জেহি	স্বজ্জোহি
„	১৭	উদূরবান্	উদূঢ়বান
১০৬	ফুঃ নোঃ-১	বহুতিথে	বহুতিথে
১০৯	১৫	কণ্টকী	কণ্টক
১১০	১২	লিখিবার	শিখিবার
১১৩	২৬	লিপিবৃত্তি	কায়স্থগণ লিপিবৃত্তি
„	„	অন্যান্য অসবর্ণ	অন্যান্য
১১৫	১	পর্য্যাপ্ত	পর্য্যাপ্ত
১২৮	ফুঃ নোঃ-১০	cast	caste
১৩০	১৫	দাসত্ত্বো	দাসত্বে
১৩১	১৯	stanđerd	standard
১৩৪	ফুঃ নোঃ ৪	commended	commanded
১৩৫	১২	সেলিমবাদ	আধুনিক রাজনগর উমেদপুর
১৪১	৬	সরকার	সরকার ও মহাল
১৪২	৪	১০টা	৯টা
„	৫	৩৭টা	৩৮টা
১৬৮	৭	বেলফ্কিচ্	ব্লকফিচ্
১৬৯	২৮	পশ্চিমবঙ্গে	মধ্যবঙ্গে
১৭৫	ফুঃ নোঃ ২	গৌরীবায় এবং	গৌরীরায়
১৭৬	৮	Afterword	Afterwards
১৭৬	ফুঃ নোটঃ ৭	সেনবংশের	সেন ও গুপ্তবংশের

২০৮	ফুঃ নোঃ ৭	বসন্তকুমার তরঙ্গিণী	তরঙ্গিণী দেবী বসন্তকুমার (অগ্রজা) (মধ্যম)
২২২	১৬	জলায়ের	জলায়ের
২৪৯	২০	ইন্দুভূষণ মিত্র প্রভৃতি	সখানাথ মিত্র
২৫৭	৭	হর্ষচিত্তে	হৃষ্টচিত্তে
২৬৩	২১	শ্রীরামের	শ্রীরামের
২৬৮	২	তঁহোর	তাঁহার
২৬৯	১	সেলিমাদের	সেলিমাবাদের
”	১৪	ত্রম্বকেশ্বর	ত্র্যম্বকেশ্বর
”	ফুঃ নোঃ ৭	দেবস্ত্রম্বক ভৈববঃ	দেবস্ত্র্যম্বকভৈরবঃ
২৭২	ফুঃ নোঃ ২১	নরেন্দ্র	অতএব নরেন্দ্র
২৭৩	২	সেনভূমে কাঞ্চীগাঁ নগরে	সেনভূমে
২৭৮	৯	ত্রম্বক	ত্র্যম্বক
২৭৯	৬ etseq	হরেকৃষ্ণ	হরকৃষ্ণ
”	ফুঃ নোঃ ৫	নিলকমল	নীলকমল
২৮৩	১	রাজদ্রোহী	রাজদ্রোহ
”	২	অবধিকার	অধিকার
২৮৫	১৫	প্রতিজ্ঞা	প্রতিভা
৩১৩	১৪	সাহায্য	সাদৃশ্য
৩১৭	১৭	এই সময়ে	সম্ভবতঃ এই সময়ে
৩৩০	৯	ইবাব খাঁ	ইরাচ খাঁ
৩৪৫	হেডিং	অরঙ্গপুরপুর	অরঙ্গপুর
৩৩৪	৩	বস্থুদ্রিষট	বস্বদ্রিষট্
৩৬৯	১০	সূর্য্যচন্দ্র	পূর্ণচন্দ্র
৩৭৮	১৮	পাহিদাস	পাহিদাশ
৩৭৯	৯	বংশধরগণের	বংশধরগণের মধ্যে
৩৮২	২১	পাঁচ হাজার	পাঁচ শত
”	২৪-২৫	পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে	পাঠানশাসনকালে
৩৯৯	২৩	“বঙ্গদর্শন”	“বঙ্গদর্পণ”

গ্রন্থকার প্রণীত পুস্তকাবলী।

১। কনকলতা	(উপন্যাস)	২য় সংস্করণ	...	৸০
২। চিতোর উদ্ধার	"	"	...	১৲
৩। চণ্ডবিক্রম	"	...	...	১৷৷০
৪। প্রমোদবালা	"	...	...	৷৶০
৫। মায়াবিনী	"	...	...	৷৶০
৬। কিরণসিংহ	"	...	...	১৷০
৭। সুধামুখী	"	...	...	৷৶০
৮। রাজস্ব	(নাটক)	...	...	১৲
৯। প্রভাবতী	নাটক	যন্ত্রস্থ		
১০। উষা-হরণ	নাটক	যন্ত্রস্থ		
১। দনুজ দলনী	নাটক	যন্ত্রস্থ		
১২। সুরথ-সমাধি	নাটক	যন্ত্রস্থ		
১৩। বাকলা	(ইতিহাস)	...	...	২৲